

লীলা নাগ

অজয় রায়

সাহিত্য প্রকাশ



প্রচ্ছদ : অশোক কর্মকার
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৭১

প্রকাশক : মফিদুল হক, সাহিত্য প্রকাশ, ৩৭/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০
হরফ বিন্যাস : কম্পিউটার প্রকাশ, ৩৭/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স, ৬০/এ-১ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

লীলা নাগ পরিচিতি

নাম	:	লীলাবতী নাগ/পরবর্তীকালে : লীলা নাগ বিবাহোত্তর কালে—লীলা রায়
জন্ম তারিখ	:	২ অক্টোবর, ১৯০০
জন্মস্থান	:	গোয়ালপাড়া শহর, আসাম (তখন পিতা গোয়ালপাড়া মহকুমার এস. ডি. ও)
পিতা	:	গিরিশচন্দ্র নাগ; নিবাস : গ্রাম—পাঁচগাঁও, থানা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার
আদি নিবাস	:	ঢাকার 'বারদি' গ্রাম
পিতৃপরিচয়	:	প্রথমে কটক র‍্যাভেনশ কলেজে দর্শনের অধ্যাপক; আইন ব্যবসা; আসাম সিভিল সার্ভিসে যোগদান। ১৯১৬ সালে অবসর গ্রহণের পর ঢাকায় বকশি বাজারে স্থায়ীভাবে বসবাস।
মাতা	:	কুঞ্জলতা দেবী চৌধুরী

শিক্ষা জীবন

শৈশব	:	গোয়ালপাড়া শহর
প্রাথমিক	:	১৯০৭-১৯১১ ব্রাহ্ম স্কুল (কলিকাতা)
স্কুল শিক্ষা	:	১৯১১-১৯১৭ ইডেন গার্লস স্কুল, ঢাকা
১৯১৭	:	প্রবেশিকা : ১ম বিভাগ (বৃত্তিসহ)

কলেজ শিক্ষা

১৯১৯	:	মাধ্যমিক আর্টস, কলকাতা বেথুন কলেজ, ১ম বিভাগ (বৃত্তিসহ)
১৯২১	:	বি. এ (ইংরেজিতে সম্মান সহ), কলকাতা বেথুন কলেজ (মেয়েদের মধ্যে ১ম, বৃত্তিসহ পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ)
১৯২১	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি বিভাগে ১ম পর্বে ভর্তি
১৯২৩	:	এম. এ (ইংরেজি), ২য় শ্রেণী
১৯৩৯	:	সহপাঠী ও সহযোদ্ধা দার্শনিক-বিপ্লবী অনিল রায়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ।

কর্মজীবন

১৯২১-২২	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অবস্থাতেই নারী শিক্ষা, নারী অধিকার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন, নিখিল বঙ্গীয় ভোটাধিকার কমিটির সহ-সম্পাদিকা নির্বাচিতা হন। উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যায় (১৯২২) দুঃস্থ মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ— এতদুদ্দেশে

		'ঢাকা মহিলা কমিটি' গঠন।
		বিপ্লবী অনিল রায়ের উদ্যোগে গোপন বিপ্লবী সংস্থা "শ্রীসংঘ" গঠিত হলে ১ম নারী সদস্যা হিসেবে যোগদান।
১৯২৩	:	ঢাকায় 'দীপালি সংঘ' নামে নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্য—"ঘুমন্ত অর্ধচেতন নারী সমাজের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারীদের অধিকার সচেতন করে তোলা।"
		দীপালি সংঘের উদ্যোগে 'দীপালি হাই স্কুল' প্রতিষ্ঠা; বর্তমানে এটি 'কামরুন্নেসা হাই স্কুল' নামে পরিচিত (অভয় দাস লেন), ঢাকা।
১৯২৪	:	দীপালি সংঘের উদ্যোগে আরও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি, ".. ... ... বর্তমান যুগে নারী শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে; কিন্তু সুযোগ ও ব্যবস্থার অভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। বিদ্যালয়ে স্থানাভাবহেতু বহু বালিকার শিক্ষা লাভে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে। এই অভাব দূর করার আকাঙ্ক্ষায় ১৯২৪ সালে আর একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই কার্যে বহু অর্থ ও অবৈতনিক সাহায্য দানে দীপালি সংঘ বিশেষ সহায়তা দান করিয়াছে।"
১৯২৬	:	'দীপালি ছাত্রী সংঘ' প্রতিষ্ঠা ও কলকাতায় এর কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ।
		রবীন্দ্রনাথের ঢাকা আগমন (৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬) ও দীপালি সংঘ পরিদর্শন।
১৯২৮ (২ ফেব্রুয়ারি)	:	লীলা নাগের অনন্য কীর্তি ভিন্নধর্মী বিদ্যানিকেতন 'নারী শিক্ষা মন্দির' প্রতিষ্ঠা। এখানে তিনি মহিলাদের 'বয়স্ক শিক্ষা' ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা সহায়তা দানের জন্য এখানে ছিল বেশ কয়েকটি বিশেষ বিভাগ : সংস্কৃতি বিভাগ, কোচিং বিভাগ, শিল্প বিভাগ, আশ্রম বিভাগ... ... ...। বর্তমানে এটি শের-এ-বাংলা মহিলা মহাবিদ্যালয় নামে পরিচিত।
১৯৩০	:	কলকাতায় দীপালি সংঘের কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ ও এর উদ্যোগে সেখানে 'দীপালি শিক্ষা মন্দির' স্থাপন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

১৯২৪	:	অনিল রায় প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী ও সমাজসেবী সংগঠন 'শ্রীসংঘের' কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ও বিপ্লবী জীবনের শুরু।
১৯২৮	:	সাইমন কমিশন বিরোধী হরতাল কর্মসূচিতে ঢাকার মহিলা মিছিলে নেতৃত্ব দান।
		কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান; 'মহিলা কংগ্রেস' গঠনে নেতৃত্ব দান—সুভাষ বসুর সান্নিধ্য লাভ ও তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া।
১৯২৯	:	অনিল রায় আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হলে 'শ্রীসংঘে'র নেতৃত্ব গ্রহণ; সংঘের বিপ্লবী ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, অস্ত্র সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগ।
১৯৩০	:	মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান; ঢাকায় আশালতা সেনের সাথে 'মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি' গঠন।
১৯৩১	:	লীলা নাগের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় 'জয়শ্রী' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ (১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩৮) : এতে লেখা হয়—"নববর্ষে এই নূতন প্রচেষ্টা আরম্ভ করিলাম। বাংলায় মহিলাদের মুখপত্র স্বরূপ কোন পত্রিকা এ পর্যন্ত ছিল না; এই অভাব দূর করিবার প্রয়াসে জয়শ্রী প্রকাশিত হইল।"
১৯৩১ (২৮ অক্টোবর)	:	'জয়শ্রী' পত্রিকা অফিসে পুলিশি আক্রমণ; সম্পাদককে সতর্কীকরণ।

১৯৩১ (২০ ডিসেম্বর) থেকে ১৯৩৮ : বিপ্লবী কাজের জন্য গ্রেপ্তার। কারাবাস (ঢাকা, রাজশাহী, সিউড়ি, মেদিনিপুর, হিজলি জেলে); কারা কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময় ছিলেন প্রতিবাদ মুখর; হিজলি জেলে কয়েকদিন অনশনও করেছিলেন।

১৯৩৫-১৯৩৮ : 'জয়শ্রী' পত্রিকা প্রকাশ নিষিদ্ধ

১৯৩৮ (৮ আগস্ট) : মুক্তি লাভ

১৯৩৮ : 'জয়শ্রী' পত্রিকার পুনর্প্রকাশ
কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক গঠিত 'ন্যাশনাল প্লানিং কমিটি'তে মহিলা উপসমিতিতে সদস্য নির্বাচিত।

১৯৩৯ : কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সুভাষ বসু কর্তৃক বামপন্থীদের নিয়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠনে অংশগ্রহণ ও যোগদান।
'ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকা' সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৪০ (জুলাই) : অনিল রায় ও লীলা নাগ কলকাতায় গ্রেপ্তার ও আগস্ট মাসে মুক্তি।

১৯৪১ (২৬ জুন) : সুভাষ বসুর দেশত্যাগ ও ফরওয়ার্ড ব্লক পরিচালনায় লীলা নাগকে যথাযথ নির্দেশ দান।

১৯৪২ : 'জয়শ্রী' পত্রিকার প্রকাশ পুনরায় নিষিদ্ধ। দিনাজপুর জেলে পুনরায় কারারুদ্ধ। আজাদ হিন্দ ফৌজের সাথে গোপন সংযোগ স্থাপন।

১৯৪৬ : যুদ্ধ শেষে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ।
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে কলকাতা, ঢাকা ও নোয়াখালিতে ব্যাপক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ; দাঙ্গা রোধে 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউট' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলা।

১৯৪৭ : দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত; নতুন পরিস্থিতিতে নয়া কর্মসূচি প্রণয়ন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেশত্যাগ না করায় উদ্বুদ্ধকরণ। মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের সংগঠিত করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ--এতুদ্দেশে বেগম সুফিয়া কামালের সাথে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি' গঠন।

১৯৪৯ : তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বাধ্য হয় 'পূর্ব পাকিস্তান' ত্যাগ।

১৯৫০-আমৃত্যু : পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এবং ভারতীয় রাজনীতিতে অব্যাহত অংশগ্রহণ। 'জয়শ্রী' পত্রিকার অব্যাহত প্রকাশ ও সম্পাদনা।

১৯৫২ : স্বামী অনিল রায়ের মৃত্যুবরণ।

১৯৫৩ : জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত 'প্রজা সোসালিস্ট পার্টি'তে যোগদান।

১৯৭০, ১১ জুন : মৃত্যুবরণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী বিপ্লবী লীলা নাগ

র ঙ্গ লা ল সে ন

বাংলাদেশের নারী জাগরণের আন্দোলনে ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে যে সকল মহীয়সী মহিলা নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ছাত্রী তেজস্বিনী লীলাবতী নাগ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। লীলা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকা অবস্থায় বাংলার বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসংঘের প্রথম সারির নেতা অনিল রায়ের আত্মীয়তা অর্জন করেন। কর্মজীবনে ভারতবর্ষের বৃটিশবিরোধী জাতীয়তাবাদী বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, যথা মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের সান্নিধ্য লাভ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদও তাঁর ভাগ্যে জোটে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কাছেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের কর্মজীবন সংগঠন ও সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় ভরপুর। বিপ্লবী লীলা নাগের কর্মকাণ্ড এতই ব্যাপক যে স্বল্প পরিসরের এ নিবন্ধে তার সামান্য অংশও আলোচনা সম্ভব নয়। তবু এখানে আমি যৎকিঞ্চিৎ তাঁর কীর্তিময় জীবন-সংগ্রামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছি।

লীলা নাগের জন্ম আসামের গোয়ালপাড়ায় ২ অক্টোবর, ১৯০০ সালে। তাঁর পিতা প্রতিভাবান গিরিশচন্দ্র নাগ বাংলা-আসাম সিভিল সার্ভিসের কর্মচারি হিসেবে তখন গোয়ালপাড়ায় মহকুমা হাকিম। লীলা নাগের পিতৃপুরুষের বাড়ি বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর থানার পাঁচগাঁও গ্রামে। যতোটুকু জানা যায়, তাঁর পৈতৃক ভূ-সম্পত্তির পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। পিতার উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ সরকারি চাকুরি লীলা নাগের পারিবারিক প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। সে অর্থে তিনি মৌলভীবাজারে সমাজ কাঠামোর একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। গিরিশচন্দ্র নাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে শীর্ষ স্থান অধিকার করে এম. এ ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কিছুদিন উড়িষ্যার কটকের এক কলেজে অধ্যাপনা

করেন। আইন ব্যবসায়েও তিনি কিছুদিন নিয়োজিত ছিলেন। পরে এসব ছেড়ে সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। লীলাবতীর মাতা কুঞ্জলতা দেবী ছিলেন সিলেটের ঢাকা দক্ষিণ গ্রামের প্রকাশচন্দ্র দেবচৌধুরীর কন্যা। লীলাবতীর মাতৃকুল ছিল রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারী। তাঁর পিতা গিরিশচন্দ্র নাগ সিলেটের ব্রাহ্ম নেতা প্রকাশচন্দ্র দেবচৌধুরীর প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন। এভাবে লীলা নাগের পিতৃপরিবারে উদার চিন্তাধারার বিকাশ ঘটতে থাকে। লীলা নাগের চারিত্র্য শক্তি গঠনে তাঁর পিতৃপরিবার প্রকৃত ভূমিকা রেখেছিল। তাঁর মা-বাবা ও মাতামহের আদর্শনিষ্ঠা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বলতে গেলে, তাঁর আদর্শনিষ্ঠা পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত এক দুর্লভ গুণ। লীলাবতীর পিতা গিরিশচন্দ্র নাগ ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী ও নির্ভীক ব্যক্তি। তিনি যখন ঢাকার মানিকগঞ্জ সাব-ডিভিশনের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন এক অভিযুক্ত ইংরেজ আসামিকে শাস্তি দিতে ভয় পান নি। তজ্জন্য তাঁর পদোন্নতি বন্ধ হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্র নাগ চাকুরি থেকে অবসর নেয়ার পর দিল্লিতে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। লবণ কর বাতিলের প্রতিবাদে তিনি এর সদস্য পদও ত্যাগ করেন। লীলা নাগ এভাবে কৈশোরেই অনুকূল পারিবারিক পরিবেশে স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত হবার সুযোগ পান।

লীলা নাগের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় বিহারের দেওঘরের একটি অখ্যাত স্কুলে। কলকাতার এক ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেন। ১৯১১ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত তিনি ঢাকার ইডেন হাই স্কুলে অধ্যয়ন করেন এবং সে স্কুল থেকে তিনি বৃত্তি পেয়ে প্রবেশিকা পাস করেন ১৯১৭ সালে। কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পাস করার পর লীলা নাগ কলকাতার বেথুন কলেজে ভর্তি হন। বেথুন কলেজ হোস্টেলে প্রথমে তাঁর কলকাতার সহপাঠীরা তাঁকে 'ঢাকার মেয়ে' বলে অবহেলা করতো। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাঁর সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা ও চরিত্রগুণে সকলকে আকৃষ্ট করেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব পড়ে তাঁর কলেজ জীবনেই। লীলা নাগ লেখাপড়ার সাথে সাথে বৃটিশবিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ছাত্র জীবনেই লীলা নাগের নেতৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। 'তিনি বেথুন কলেজে 'সিনিয়র ছাত্রনেতা'র সম্মান লাভ করেন। কলেজের 'রি-ইউনিয়ন' তাঁরই সৃষ্টি। লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ নিয়ে বেথুন কলেজের অধ্যক্ষার সাথে তাঁর মতানৈক্য ঘটে। লীলা নাগের নেতৃত্বে ছাত্রীরা ধর্মঘট করে। অধ্যক্ষা এতে হার মানেন। ইতোপূর্বে বেথুন কলেজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বড়লাট পত্নীকে ছাত্রীরা নতজানু হয়ে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতো। লীলা নাগের নেতৃত্বে ছাত্রীদের দুর্বার প্রতিবাদে এ অবমাননাকর প্রথা বিলুপ্ত হয়। বেথুন কলেজে অধ্যয়নকালেই লীলা নাগের মনে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হতে থাকে। ১৯১৭ সালের ২ অক্টোবর তাঁর সপ্তদশ জন্মদিন উপলক্ষে তিনি যে চিঠি পিতাকে লেখেন, তাতে এর প্রমাণ মিলে। লীলা নাগ লেখেন, "আমার ক্ষুদ্র শক্তি যদি একটি লোকের উপকার করতে পারতো, তবে নিজেকে ধন্য মনে করতুম।

সত্যি বলছি—এ আমার বক্তৃতা নয়, এটা আমার প্রাণের কথা। এই আমার Ideal–আশীর্বাদ করো যদি এ জন্মে কিছু না করতে পারি, আবার যেন এই আমার প্রিয় ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করি, একে সেবা করে এ জন্মের আশা মিটাতে।"

লীলা নাগ কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে বি এ পাস করে ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়তে আসেন। জন্মলগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। তত্ত্বগতভাবে যদিও আইনগত বাধা ছিল না। Dacca University Act, 1920 (XVII of 1920)'এর ৫নং ধারায় বলা হয়েছে : "The University shall be open to all persons of either sex and of whatever race, creed or class.. ।" লীলা নাগের একাগ্রতা ও দৃঢ়তা দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য শিক্ষাবিদ স্যার পি. জে. হার্টগ মুগ্ধ হয়ে পরিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়ে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করেন। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষাবর্ষে যে দু'জন ছাত্রী ভর্তি হন, লীলা নাগ ছিলেন অন্যতম। অপর ছাত্রীর নাম সুষমা সেনগুপ্ত। সুষমা সেনগুপ্ত ছিলেন জগন্নাথ হলের প্রথম প্রভোস্ট ও আইন অনুষদের ডীন অধ্যাপক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের মেয়ে। লীলা নাগ ভর্তি হন ইংরেজি বিভাগে এম. এ পড়তে, আর সুষমা সেনগুপ্ত অর্থনীতি বিষয়ে বি. এ সম্মান শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। উভয়ের মধ্যে ছিল খুবই হৃদ্যতা। দু'জন এক সাথে 'লেডিজ ওয়েটিং রুম'-এ বসে থাকতেন। তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী তাঁরা অধ্যাপকদের সাথে স্ব-স্ব ক্লাসে যেতেন। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কাছে এটি হাস্যকর মনে হবে। গত আশি বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ মেয়েদের জন্য চারটি ছাত্রী আবাস রয়েছে। ছাত্রী হিসেবে লীলা নাগের সসম্ভ্রম গাম্ভীর্য শিক্ষক ও সহপাঠীদের সসম্মান স্বীকৃতি পায়। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। মেধাবী লীলা নাগ ১৯২৩ সালে কৃতিত্বের সাথে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ছাত্রী হিসেবে তাঁর নামে একটি ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। লীলা নাগের দু'জন সুযোগ্য-সহপাঠী ছিলেন। এঁরা হলেন ঢাকা জিলার মানিকগঞ্জের অনিল রায় এবং বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজারবাসী আলতাফ হোসেন। প্রথমজন পরে লীলা নাগের জীবনসঙ্গী ও বিপ্লবের সাথী হন, আর আলতাফ হোসেন ছিলেন করাচির বিখ্যাত 'ডন'-পত্রিকা সম্পাদক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন শেষ করে লীলা নাগ প্রথমেই অবহেলিত পশ্চাৎপদ নারী সমাজের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকায় বেশ কয়েকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'দীপালি সংঘ', 'দীপালি স্কুল', 'নিউ হাই স্কুল', 'নারীশিক্ষা মন্দির', 'শিক্ষাভবন' ও 'শিক্ষা-নিকেতন'। এছাড়া, তিনি ঢাকায় বারোটি অবৈতনিক বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। এসব প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের নানাবিধ শিল্প শিক্ষা ও বয়স্কদের সাক্ষরতা লাভের ব্যবস্থা ছিল। লীলা নাগের অসামান্য সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় মেলে

১৯২৩ সালে দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বাংলার নারী সমাজের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে তাদের সচেতন ও স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে মূলত দীপালি সংঘের প্রতিষ্ঠা। আর এ কাজে ঠাকুর পরিবারের সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী এনা রায় ছিলেন তাঁর অন্যতম সহযোগী। লীলা নাগ ও সুষমা সেনগুপ্ত (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই ছাত্রী) ছিলেন দীপালি সংঘের যুগ্ম-সম্পাদিকা। ঢাকা শহরের মেয়েরা এ সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত হয়। দীপালি সংঘের প্রতিষ্ঠার মাত্র আট বছরের মধ্যে এটি নারীমুক্তির সংগ্রাম থেকে মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির বৈপ্লবিক সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। এতে বাংলার বৃটিশ সরকার দীপালি সংঘের কর্মতৎপরতার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ঢাকার পাড়ায়-পাড়ায় দীপালি সংঘের শাখা গড়ে ওঠে। ছাত্রীদের 'স্টাডি সার্কেল' গঠন করে লীলা নাগ সাদারল্যান্ডের '*ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ*' *গ্রন্থটি পাঠ* করার ব্যবস্থা করেন। এতে মেয়েরা ভারতবর্ষের পরাধীনতার গ্লানি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সুযোগ পায়। ১৯২৪ সাল থেকে দীপালি সংঘের উদ্যোগে প্রত্যেক বছর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে লীলা নাগ বাংলার নারী সমাজকে নারীমুক্তি সংগ্রামের এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দেন। ১৯২৬ সালে তাঁর প্রচেষ্টায় 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' স্থাপিত হয়। ছাত্রী-তরুণীদের আবেগ প্রবণতাকে সংহত শক্তিতে রূপদান করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। ঐ সময় ঢাকা ও কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগলে লীলা নাগের চেষ্টায় 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। ১৯২৬ সালে ঢাকায় লীলা নাগের সৃজনশীল কর্মতৎপরতার আরও দুটি ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। সে দু'টি ঘটনা হচ্ছে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠান ও কবিগুরুকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন। যুব সম্মেলনে বিখ্যাত বাঙালি সমাজবিজ্ঞানী বিনয়কুমার সরকার আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। উক্ত সম্মেলনে লীলা নাগ পুরুষপ্রধান হিন্দু সমাজে প্রচলিত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত 'দায়ভাগ' প্রথার বিরুদ্ধে যে ভাষণ দেন তা উপস্থিত সকলকে চমৎকৃত করে। মেয়েদের ভোটাধিকার ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার কথাও তাঁর বক্তব্যে উচ্চারিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের শুভাগমন ঘটলে দীপালি সংঘ কবিগুরুকে ১৯২৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে আন্তরিক সম্বর্ধনা জানায়। অভিনন্দন সভায় কবি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেন, "এশিয়ায় এতো বড় মহিলা সমাবেশ আর কখনও দেখি নাই।" প্রবাসী পত্রিকায় এই মহতী সভার উল্লেখ করে লেখা হয় : কবি অতিশয় প্রীত হন এবং বলেন, "তিনি অন্য কোথাও একত্র সমাবিষ্ট এতো মহিলার অভিনন্দন পান নাই" (বিবিধ প্রসঙ্গ, *প্রবাসী*, মাঘ ১৩৩২ বাংলা)। ১৯২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি যখন কবিগুরুর সঙ্গে ঢাকায় লীলা নাগের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, তখন তিনি তাঁকে দেখে বলেন, "লীলা আমাদের এনার মতো দেখতে।" উক্ত মন্তব্যে লীলা নাগ রবীন্দ্রনাথের কাছে কতো প্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কবিগুরু লীলা নাগের কর্মশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁকে শান্তিনিকেতনে কোনো নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান।

কিন্তু এর পূর্বে তাঁর পথ নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ায় লীলা নাগের পক্ষে কবির অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

এ পথ হচ্ছে রাজনৈতিক জীবন, যাকে তিনি একটি জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করেন। লীলা নাগের কাছে রাজনীতি ছিল বন্ধনমুক্তির এক অন্তহীন অভিযাত্রা। লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত দীপালি সংঘের সাথে অনিল রায় প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসংঘের সংযোগের ফলে ঢাকায় এ দুটি সংগঠন নারী আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে সমন্বয় ঘটায়। দেশমাতৃকার সেবা ও বিদেশি শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি উভয়ের অভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত হয়। ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে বাংলার বিপ্লবী সংগঠনসমূহের দলনেতারা যোগদান করেন। বিপ্লবী অনিল রায় ও নারী সংগঠক লীলা নাগ উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। শহীদ যতীন দাসের লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনে আত্মাহুতির সশ্রদ্ধ স্মরণে কলকাতা মনুমেন্টের পাদদেশে সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর লাঠি চালনার প্রতিবাদে লীলা নাগের নেতৃত্বে ঢাকায় উদ্বেলিত জনসমুদ্রের শোভাযাত্রা সেদিনকার ভারতে অতুলনীয়। ১৯৩০ সালে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত 'মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি'র উদ্যোগে ঢাকায় মহিলারা গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। আদর্শগত কারণে ১৯২৯ সালে অনিল রায়ের বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসংঘ দ্বিধাবিভক্ত হলে এবং ঐ সময় অনিল রায়সহ অনেক নেতার গ্রেফতার হওয়ার কারণে এর মূল অংশের নেতৃত্ব লীলা নাগের ওপর ন্যস্ত হয়। ঐ সময় লীলা নাগ তাঁর গঠনমূলক কাজের দায়িত্ব ঢাকার নারীশিক্ষা মন্দিরের অধ্যক্ষা উষা রায়ের ওপর ছেড়ে দেন। আর নিজে বৈপ্লবিক সংগঠনের সংহতি সাধনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহে তিনি বারবার ঢাকা-কলকাতা যাওয়া-আসা করেন। ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাড়ায় বিপ্লবীদের বেশ কয়েকটি ঘাঁটি ছিল,—এগুলির দায়িত্বে ছিল মেয়েরা। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল মামলার জন্য লীলা নাগ ঢাকা থেকে ইন্দুমতি সিংহকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে দেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবের অগ্রনায়ক সূর্য সেনের পরামর্শে ভারতের প্রথম বিপ্লবী শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার লীলা নাগের সঙ্গে দীপালি সংঘের সদস্যারূপে বিপ্লবী পাঠ গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বরে দীপালি প্রদর্শনীর কাজ শেষে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরলে লীলা নাগ গ্রেফতার হন। কারণ, ঐ সময়ে অভিযোগ করা হয় যে, শ্রীসংঘের সদস্যা শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী গুলি করে কুমিল্লার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনস্‌কে হত্যা করেছেন। লীলা নাগ হচ্ছেন ভারতবর্ষে বিনাবিচারে আটক প্রথম মহিলা রাজবন্দি। গ্রেফতারের আগে লীলা নাগ নিজেই সিলেটের বিভিন্ন মহকুমার বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের খোঁজখবর রাখতেন। ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৩৭ সালের ৮ অক্টোবর পর্যন্ত লীলা নাগ পরপর ঢাকা, রাজশাহী, সিউড়ি, মেদিনীপুর জেল ও হিজলী মহিলা বন্দিশালায় আটক ছিলেন। তিনি ১৯৩২

সালের ২৬ এপ্রিল থেকে ৪ মে পর্যন্ত সিউড়ি জেলে অনশন করেন। জেলে থাকাকালীন লীলা নাগ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৬-৩৭ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ঢাকায় মহিলা আসনে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে মনোনয়ন পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাম ভোটার তালিকায় মুদ্রিত না হওয়ায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন নি। ১৯৩৭ সালের অক্টোবরে কারামুক্তি লাভের পর সিলেটের মহিলা সম্মেলনে তাঁকে বিপুল সংবর্ধনা জানানো হয়। লীলা নাগের কারামুক্তি উপলক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে যা বলেন তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কবি ১৩৪৫ বাংলার ২৪ বৈশাখ লীলা নাগকে যে চিঠি লেখেন তাতে বলেন : "কারাবাস থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তুমি বেরিয়ে এসেছো শুনে আরাম বোধ করলুম। মানুষের হিংস্র বর্বরতার অভিজ্ঞতা তুমি পেয়েছো। আশা করি এর একটা মূল্য আছে, এটা তোমার কল্যাণ সাধনাকে আরো বেশি বল দেবে। কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করে পাশব বলে মনুষ্যত্বকে চিরকালের মতো পিষ্ট করে দেবে, কিন্তু মনুষ্যত্বের মহিমার জোরেই সেটা সত্য না হোক। পশুশক্তির ঊর্ধ্বে জয়ী হোক তোমার আত্মার শক্তি।"

লীলা নাগ ছিলেন আজীবন বিপ্লবী। তার সেবামূলক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কখনও থেমে যায় নি। আসলে তিনি ছিলেন দশভূজা। লীলা নাগের মতো বিপ্লবী ও কর্মোদ্যোগী মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব। একনাগাড়ে ছয় বছর কারাবাসের পর আবার বিপুল উদ্যমে ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে গঠনমূলক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে সমানভাবে নিয়োজিত করেন। মানুষের প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসাই ছিল এর মূল কারণ। ১৯৬৪ সালের আগস্টে তাঁর নিজের কথায় বলেন : "চির বিপ্লবীর জীবন চাই, মানুষকে ভালোবাসি, চিরদিন বেসেছি। আমার সকল কাজের উৎসাহ তাই; কিন্তু ভালোবাসা আমার বন্ধন নয়, প্রেরণা ও আনন্দ।"

জেল থেকে বের হয়ে তিনি ঢাকায় নারী শিক্ষা মন্দির ও শিক্ষাভবনকে পুনর্গঠিত করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি তাঁর মায়ের নামে স্বগ্রামে 'কুঞ্জলতা প্রাথমিক বিদ্যালয়'টি প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি এখনও সরকারি হয় নি, তবে কোন ক্রমে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছে। যেহেতু বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলছেন, সেহেতু বাংলাদেশে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা বিদ্যোৎসাহী লীলা নাগের বিদ্যমান একমাত্র উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়টির প্রতি সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করছি। ঢাকা শহরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানের পুরাতন পরিচয় আজ আর নেই। কোনো কোনোটি একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে, কোনোটি নতুন নাম ধারণ করেছে। কিন্তু তাঁর মায়ের নামাঙ্কিত পাঁচগাঁও-এ উক্ত বিদ্যালয়টিকে রক্ষা ও উন্নত করতে অন্তত এ বিপ্লবী মহীয়সী নারীর অমূল্য অবদানকে সামান্য স্বীকৃতি দেয়ার স্বার্থে দেশবাসীর এগিয়ে আসা উচিত। কারণ বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে তিনি আমৃত্যু ভালোবেসে গেছেন। এখন বাংলাদেশের মানুষ

নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেবে–এ বিশ্বাস আমার আছে। লীলা নাগ শুধু ঢাকা শহরে ও স্বগ্রামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন নি, তিনি তাঁর সহপাঠী, বিপ্লবী সাথি ও জীবনসঙ্গী অনিল রায়ের মাতুলালয় ঢাকার মানিকগঞ্জের বায়রা গ্রামে ১৯৩৮ সালে কৃষক সন্তানদের শিক্ষার জন্য একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য, গ্রামটির অধিবাসী অধিকাংশই মুসলমান। তাছাড়া, তিনি সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মেয়েদের জন্য একটি ক্লাব গঠন করেন। আর এসব জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়তে তিনি সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীর কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেন।

১৯৩৯ সালের ১৩ মে লীলা নাগ অনিল রায়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সে সময় থেকে তিনি ক্রমশ লীলা রায় নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। ঐ সময়েই তাঁরা উভয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-এ যোগদান করেন। এর কয়েকদিন আগে লীলা রায়ের প্রস্তাবে ও নেতৃত্বে সর্বপ্রথম 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' গঠিত হয়, যা ভারতীয় নারী সমাজের সাথে বাংলার নারী সমাজকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পৃক্ত করে। ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে নেতাজী সুভাষ বসুর অনুরোধে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি সাপ্তাহিক '*ফরওয়ার্ড ব্লক*' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন লীলা রায়।

লীলা নাগের কর্মময় জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত '*জয়শ্রী*' পত্রিকা, যা তাঁর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে ১৯৩১ সালের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্ভবত '*জয়শ্রী*'ই বাংলাদেশে প্রথম মহিলা মাসিক পত্রিকা, যার নামকরণ করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবির নিম্নোক্ত আশীর্বাণী নিয়ে পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে।

"বিজয়িনী নাই তব ভয়
দুঃখে ও বাধায় তব জয়।
অন্যায়ের অপমান
সম্মান করিছে দান
জয়শ্রীর এই পরিচয়।"

পত্রিকার প্রচ্ছদ আঁকেন শিল্পগুরু নন্দলাল বসু। শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা এঁকে পাঠালেন ছবি এবং দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঠান কবির গানের স্বরলিপি। বাংলাদেশে তখন মহিলা মাসিক পত্রিকা প্রকাশের এই প্রচেষ্টা সত্যিই এক দুঃসাহসিক উদ্যোগ। প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা লীলা নাগের ভাষায় : "মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও শঙ্কাহীন দেশসেবার ভাব জাগ্রত করার উদ্দেশ্য নিয়েই 'জয়শ্রী' আত্মপ্রকাশ করলো।" আরো স্পষ্টতরভাবে সম্পাদিকা লিখলেন : "এ পত্রিকার উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার দেশসেবা।" লীলা নাগের গ্রেফতারের পরই সরকার 'জয়শ্রী'র জামানত দাবি করে। পত্রিকা প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে সরকার পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। তবু বাংলার নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে 'জয়শ্রী'র সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ময়মনসিংহের মাসিক 'সৌরভ', মাসিক 'উত্তরা', 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' প্রভৃতি পত্রিকায় লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত 'জয়শ্রী' পত্রিকার ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে লীলা রায়ের কর্মজীবনে। সময়োপযোগী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে লীলা রায় বাংলার সমাজজীবনে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার অপূর্ব নিদর্শন রেখে গেছেন। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহাতাণ্ডবের মধ্যেও ১৯৪১ সালের ২৪ আগস্ট দীপালি সংঘের অনুসরণে শিক্ষাভবন স্কুল প্রাঙ্গণে একটি মহিলা সংগঠন স্থাপন করেন, যার নাম 'নাইনটিন ফরটি ওয়ান ক্লাব' বা 'যুগদাবী চক্র'। এই ক্লাব উদ্বোধন করেন ভারত বিখ্যাত দার্শনিক শিক্ষাবিদ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, যিনি বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাড়ার মহিলারা উক্ত ক্লাবের প্রতি আকৃষ্ট হন। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করলে ক্লাবটি বৃটিশ সরকারের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়।

লীলা রায় ছিলেন চিন্তা ও কর্মে অসাম্প্রদায়িক। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ঢাকা ও কলকাতায় সংঘটিত হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনে ও নিরীহ মানুষকে নির্ভীকভাবে রক্ষা করার কাজের মধ্যে এর পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৪১ সালের গোড়ার দিকে ঢাকায় মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এটি বৃহত্তর ঢাকা জেলার নরসিংদী এলাকায় ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। দাঙ্গা দমনের উদ্দেশ্যে বাংলার অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস নেতা শরৎ বসুকে ঢাকা ও নরসিংদীর রায়পুরা যাওয়ার ব্যবস্থা করেন লীলা নাগ। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টে জিন্নাহর 'Direct Action Day' তে কলকাতা, ঢাকা ও নোয়াখালী অঞ্চলে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটে। কলকাতায় ঐ সময় লীলা রায় ও অনিল রায় উভয়ে বিপ্লবী সাথীদের নিয়ে উপদ্রুত হিন্দু-মুসলিম এলাকা থেকে বিপন্ন নিরীহ লোকজনের জীবনরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বিপন্নদের নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেন। কলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গায় বিপন্নদের উদ্ধার কার্যে লীলা রায়ের চরিত্রের এক দুর্লভ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময় লীলা রায় অনিল রায়কে সাথে নিয়ে নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মৌলবী আশরাফউদ্দিন চৌধুরীকে কলকাতার পার্ক সার্কাস এলাকা থেকে উদ্ধার করে তাঁকে রাসবিহারী এভিনিয়্যুর নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসেন। পরে তাঁরা দক্ষিণ কলকাতার এক বাড়িতে চৌধুরী সাহেব এবং সৈয়দ নওশের আলী ও অন্যান্য অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদী বাঙালি মুসলিম নেতাদের দীর্ঘদিন রেখে তাঁদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করেন। আর শরৎ বসু এ মহৎ কাজে তাঁদের সাহায্য

করেন। মৌলবী আশরাফউদ্দিন চৌধুরী ১৯৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কুমিল্লা জেলার স্বগ্রাম সুয়াগঞ্জ থেকে সেদিনকার ঘটনা সম্পর্কে যা লিখেছেন, তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। "Direct Action Day-র পরে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে দাঙ্গা হয়, তাতে এই মহীয়সী নারীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা কখনও ভুলিবার নহে। তিনি অসংখ্য নিরীহ মুসলমানের প্রাণরক্ষার জন্য স্বীয় জীবনকে বহুক্ষেত্রে বিপন্ন করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে নজির হিসাবে রক্ষিত হওয়ার যোগ্য। তিন দিনের মধ্যে পার্ক সার্কাস অঞ্চল হইতে তিনি একটি মোটরে করিয়া উপদ্রুত অঞ্চল হইতে যেভাবে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়া আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা আজও মনে হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে।" ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতের বিহারে ও পূর্ববাংলার নোয়াখালীতে সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে নোয়াখালীর দাঙ্গার পর সেখানকার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা রামগঞ্জ থানায় মহাত্মা গান্ধী পৌঁছার পূর্বেই লীলা রায় ও অনিল রায় তাঁদের মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের নিয়ে পৌঁছে ক্যাম্প খুলে ছয় দিনে নব্বই মাইল ঘুরে চারশ অবরুদ্ধ হিন্দু নারীকে উদ্ধার করেন। নোয়াখালীর উপদ্রুত এলাকায় তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউট'-এর নামে ১৭টি ক্যাম্প খুলে তাঁরা দীর্ঘকাল বিপন্নদের উদ্ধার, সেবা ও সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে সেবাকার্যে নিয়োজিত লীলা রায় ও অনিল রায়ের অভূতপূর্ব কর্মশক্তি দেখে মহাত্মা গান্ধী মুগ্ধ হন। আর ঐ সেবাকার্যের মাধ্যমেই তাঁরা গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করেন।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে যে বাংলাকে অবিভক্ত রাখার শেষ চেষ্টা শরৎ বসু, কিরণশঙ্কর রায়, আবুল হাশিম, ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী করেন, তার সাথেও লীলা রায় ও অনিল রায় যুক্ত ছিলেন। দেশ বিভাগ যখন তাঁরা ঠেকাতে পারলেন না, তখন উভয়ে পূর্ববাংলায় থেকে সংখ্যালঘুদের স্বার্থে ও দেশের কল্যাণে কাজ করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকার তাঁদের এ মহান কাজে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করে। তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। দেশ বিভাগের এক বছর পর তাঁরা প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে কলকাতায় চলে যান। অথচ ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই লীলা রায় ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংহতি' নামক একটি সমিতি গঠন করেন। নিজের মাতৃভূমিতে থেকে জনসেবার এমন মনোবৃত্তি মনে হয় সত্যিই দুর্লভ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গণবিরোধী মুসলিম লীগ সরকার লীলা রায়ের নিঃস্বার্থ সেবামূলক কর্মকাণ্ডও সহ্য করেন নি।

কলকাতায় চলে যাওয়ার পরেও লীলা রায় ও অনিল রায়ের কর্মতৎপরতা এতোটুকু থেমে থাকে নি। তাঁরা সেখানে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে সর্বক্ষণ নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সময়ে অগণিত মানুষ পূর্ববঙ্গের আপন বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ভারতে চলে যায়। পশ্চিমবঙ্গে

প্রাদেশিক ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগাযোগ করে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেন। লীলা রায় পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার কঠোর সমালোচনা করেন। ১৯৫০ সালের ২৩ মার্চ তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয় কল্যাণ কমিটির সভায় ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পদত্যাগও দাবি করেন। লীলা রায় কেবল পূর্ববঙ্গের শরণার্থীদের নিয়েই উদ্বিগ্ন ছিলেন না। তিনি ১৯৬০ সালের আগস্টে আসামে তীব্র বাঙালি বিদ্বেষের বিরুদ্ধেও প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে লাখ লাখ নরনারী পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা সীমান্ত পার হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। লীলা রায় তখন অসুস্থ শরীর নিয়েও কলকাতায় 'All Bengal Citizen's Convention'-এ উপস্থিত হয়ে তাঁর সমবেদনা প্রকাশ করেন। সেদিনের ঘটনাবলি সম্পর্কে তিনি তাঁর এক সহকর্মীকে লেখেন : "প্রতিদিন নৃশংসতম অত্যাচারের কাহিনী শুনে শুনে চুপ করে থাকাও পাপ—সেই পাপের ভাগী আমরা হয়েছি। যা আসে আসুক, কেবল প্রার্থনা করি মানুষ যেন তার মধ্যে থেকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকে, আর আমার দেশ ও জাতির ভাগ্যে যেন অমৃতের আস্বাদ জোটে।" এরপরই 'পূর্ববাংলা বাঁচাও' কমিটির উদ্যোগে সংঘটিত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে ১৯৬৪ সালের ২৫ মার্চ প্রায় এক হাজার নারী-পুরুষ নিয়ে কলকাতায় আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। আর এটাই লীলা রায়ের জীবনের শেষ কারাবরণ।

বিপদে ভেঙে না পড়া হচ্ছে লীলা রায়ের ব্যক্তিগত চরিত্রের আরেক বিশেষ দিক। জীবনের দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তেও তাঁর দেশপ্রেম ও আত্মপ্রত্যয় কতো গভীর এবং উন্নয়নচিন্তা কতো সুদূরপ্রসারী ছিল তার সাক্ষাৎ-পরিচয় পাওয়া যায় ১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর এক সহকর্মীকে লিখিত চিঠিতে। তিনি বলেছেন, "আমি (জীবনের) anchor বলতে দুটো জিনিসকে জানি : ভগবানে বিশ্বাস, মানুষকে ভালোবাসা, দেশকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করা, তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে' নিজেকে identify করা। আমাদের দেশ গ্রামপ্রধান—ডোবা, নদী-নালা, হাজার বঞ্চনা-দৈন্যে ভরা। কিন্তু আমেরিকা অথবা ইংল্যান্ড হবে না, করতে অন্তত আমরা চাই না, আমি চাই আমার দেশকে আমরা উন্নত করবো, অন্য দেশের copy হিসেবে নয়, নিজের বিশিষ্ট চাহিদা, সম্ভাবনা, রুচি ও প্রয়োজনানুসারে।" তাঁর এ কথাগুলো দরিদ্র বাংলাদেশের অবহেলিত নারীসমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজও বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

প্রায় আড়াই বছর একটানা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে লীলা রায় ১৯৭০ সালের ১১ জুন দেহত্যাগ করেন। তাঁর সত্তর বছরের জীবন হঠাৎ যেন থেমে গেল। সত্যি কথা বলতে কি লীলা রায় জীবনে যেমন ছিলেন বিজয়িনী, তাঁর মহাপ্রয়াণও তাঁকে তেমনি বিজয়িনীর মর্যাদা দিয়ে গেল। শেষবারের মতো সংজ্ঞাহীন হওয়ার কয়েক

মাস পূর্বে (২৩ জুন, ১৯৬৭) তিনি মাত্র কয়েকটি কথায় মানুষের মহত্তম পরিচয়ের যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তাতে তার বিপ্লবী সত্তা অমর হয়ে থাকবে। তাঁর কথায় : "জয়পরাজয়, সাংসারিক সার্থকতা ব্যর্থতা এসবে কি মানুষের কিছু পরিচয় আছে? আছে তার চিন্তায়, ব্যবহারে, সংগ্রামে।" অতএব আমৃত্যু সংগ্রাম করে যাওয়াই হচ্ছে মহীয়সী লীলা রায়ের জীবনের পরম প্রশান্তির সর্বোত্তম পথ ও প্রকৃত পরিচয়। আর সেটাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম ছাত্রী বিপ্লবী লীলা নাগের জীবন ও কর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর।

বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায় ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ

বি জ য় কু মা র না গ

কবি, সাহিত্যিক, সুরকার, সুরসাধক, গীতিকার, দার্শনিক সমাজবিজ্ঞানী শৌর্যে-বীর্যে-সাহসে শারীরিক ক্ষিপ্রতায় এবং ডন-কসরতের দক্ষতায় অদ্বিতীয়, সর্বোপরি অনিল রায় ছিলেন ভারত ইতিহাসের এক অনন্য বিপ্লবী।[১] এতো বিচিত্র গুণাবলির সমাহার কিভাবে তাঁর মধ্যে হয়েছিল তা ভেবে কোনো কূল-কিনারা পাওয়া যায় না। আঠারো-উনিশ বছর বয়সে বেদ উপনিষদই-বা কি করে এমনভাবে রপ্ত করলেন তারও কোনো ব্যাখ্যা মেলে না। যেন সীমিত আধারে অসীমের আত্মপ্রকাশ। যদি তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করতেন, যদি ভগবদ্ সাধনায় তন্ময় হতেন তাহলে ভারতীয় অধ্যাত্মজগতে তিনি হয়তো উচ্চ কোটিতে অবস্থান করতেন। আজ শতবর্ষে তাঁর বহুধা রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান করি। তাঁর এই বিকাশের একটি সূত্র সম্ভবত স্বামী ব্রহ্মানন্দের ঢাকা পরিক্রমণ ও সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ ও আশীর্বাদ প্রদান। বিশ দশকের গোড়ায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রায় এক মাসকাল ঢাকায় অবস্থান করেন—অনিল রায় এই সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দের আশীর্বাদ লাভ করেন ও মিশনে যোগদানের আহ্বান পান। স্বামী প্রেমানন্দও ঢাকায় দীর্ঘ সময় থেকেছেন এবং অনিল রায় প্রায়শই তাঁকে কীর্তন প্রভৃতি শোনাতেন। অনিল রায় শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও স্বামী প্রেমানন্দের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণেরই কৃপালাভ করেছিলেন। তাই বহুধা গুণের আধার অনিল চন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনে অসীমের প্রকাশ ঘটেছিল।

ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমায় মামাবাড়ি বায়রা গ্রামে ১৯০১ সালের ২৬ মে অনিল রায়ের জন্ম হয়। পৈতৃকবাড়ি ঢাকা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত নবাবগঞ্জ থানায় গোবিন্দপুর গ্রামে। কিন্তু কর্মক্ষেত্র ঢাকা শহরে। পিতা অরুণচন্দ্র রায় ঢাকা জেলার সরকারি শিক্ষা বিভাগে উচ্চ পদাধিকারী, ঢাকার তাঁতিবাজারে বাসাবাড়ি

মহল্লায় প্রথম দিকে বসবাস করতেন এবং পরবর্তীকালে সাত নম্বর বকশীবাজারে বাড়ি কিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

তাঁতিবাজার বাসাবাড়ি মহল্লার এক কিশোর প্রতিদিনই বইয়ের পাঁজা নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে মগ্নচিন্তায় স্কুলে যাতায়াত করে। পথচারীর স্বভাবতই তাঁর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হতো। পাড়ার এক কনিষ্ঠের ভাষায় যিনি পরবর্তীকালে সহকর্মী ও সহযাত্রী 'চোখে মুখে ঐ বয়সেই তাঁর একটু বৈশিষ্ট্যের ছাপ লক্ষ্য করা যেত।' এই কিশোরই ভবিষ্যতের আলোড়নকারী, অসামান্য সংগঠক বিপ্লবী অনিল রায়।

পাড়ার এক তরুণ বিপ্লবীর নজর পড়েছিল অনিলচন্দ্রের দিকে–সালটা ১৯১৪। অনিলচন্দ্র ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। ঐ তরুণ বিপ্লবী সংগঠক প্রমথ দেব চৌধুরী, ওরফে ধনদা বা টেনাদা নামে পরিচিত। 'ওরা থাকতেন বাসাবাড়ি লেনের উত্তর দিকের শেষ বাড়িতে। বাড়ির ছাদ ছিল না–টিনের চৌচালা। ধনদা ঐ বাড়ির বড় ছেলে, লম্বা ও স্বাস্থ্যবান... ভালো কুস্তি জানতেন। দাদাও ভালো কুস্তি জানতেন। ধনদা ও দাদা প্রায়ই কুস্তি করতেন।'[২] এরই মধ্যে প্রমথ দেব চৌধুরী অনিলচন্দ্রকে গোপন বিপ্লবী দলে টেনে নিলেন।

এই গোপন দলের গোড়াপত্তন করেছিলেন বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ। 'ধনদার বাসার আরেক প্রান্তে একতলার একটি ঘরে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক সবসময় থাকতেন। আমার মনে হতো উনি ঐ বাড়ির গৃহশিক্ষক।...সেই ভদ্রলোক প্রখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ।'[৩] তিনি ঢাকার রাজার দেউড়ী পল্লীতে 'অনুশীলন সমিতি'র কেন্দ্রে যুক্ত থেকে তাঁতিবাজারে অবস্থিত মল্লবীর পরেশনাথের ডন-খানায় ডন-কসরতের ফাঁকে ফাঁকে তরুণদের বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দিতেন।[৪] ১৯০৮ সালের নভেম্বর মাসে পুলিন দাস ১৮১৮ সালের ৩ আইনে গ্রেফতার হলে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে হেমচন্দ্রের কর্মপদ্ধতি নিয়ে মতভেদ হয় এবং তিনি পৃথক সংগঠনের উদ্যোগ নেন। এই সংগঠন 'অজানা বিপ্লবী দলে' পরিগণিত হয়। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেলে হেমচন্দ্র ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। দলের দায়িত্ব তখন তাঁর সহকারী প্রমথ দেব চৌধুরী, কালিদাস ঘোষ ও প্রমথকুমার চক্রবর্তীর ওপর বর্তায়। হেমচন্দ্রের নির্দেশেই এঁরা এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রমথ দেব চৌধুরী ও হরিদাস দত্ত ঢাকা জুবিলী স্কুলের সহপাঠী ছিলেন। হরিদাস দত্ত ইতোপূর্বে ঢাকা ছেড়ে চলে গেছেন কলিকাতায় এবং কলিকাতায় ১৯১৪-এর ২৬ আগস্ট রডা কোম্পানির মসার পিস্তল ও গুলি লুণ্ঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

১৯১৪ থেকে ১৯২০ হেমচন্দ্র ঘোষ ভারতরক্ষা আইনে বন্দি থাকাকালীন সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্বে ছিলেন প্রমথকুমার চক্রবর্তী ও সহকারী কালিদাস ঘোষ। এই সময় অনিলচন্দ্রকে রিক্রুট করে প্রমথ দেব চৌধুরী তাঁকে প্রমথ চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এই সময় এই অনামা বিপ্লবী দল আদর্শগত নিষ্ঠায়, জীবনযাত্রায়, কৃচ্ছ্রতায়, ত্যাগে ও সেবায় সমৃদ্ধ একটি দক্ষ, সুসংহত গোপন সংগঠনরূপে গড়ে ওঠে।[৫] ১৯১৫ থেকে ১৯১৯-এই চার বছর দলের

সাংগঠনিক কাজে অনিল রায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছেন। বলতে গেলে ১৯২০ সালের মধ্যেই ঢাকায় সংগঠনের রাশ কার্যত অনিল রায়ের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। তাঁর মেধা-বুদ্ধি, সাহস-শৌর্য, সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বশক্তি অনায়াসে তাঁকে এই প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল।[৬]

অনিল রায়ের ছাত্রজীবনও এরই মধ্যে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে—১৯১৯ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আই. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২১ সালে সম্মানের সঙ্গে বি. এ পাস করে ১৯২৩-এ ইংরেজিতে এম. এ পাস করেন। এই পরীক্ষার রচনাপত্রে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পান। "এই পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি ঘটনা বিপ্লবী অনিলচন্দ্রের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের আংশিক প্রকাশক। তিনি সংস্কৃতে এম. এ পরীক্ষা দিবার জন্য তৈরি হইতেছিলেন। তাহার অধ্যাপকগণ তখন তাহার সংস্কৃতজ্ঞানের প্রশংসা করিয়া তিনি অনায়াসেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহাতেই অনিলচন্দ্র বিষয় পরিবর্তন করিয়া ইংরাজি ভাষায় এম এ পরীক্ষা দেওয়া স্থির করিলেন। ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা, খ্যাতির লোভ ও আকাঙ্ক্ষা বিপ্লবী জীবনের আদর্শ বহির্ভূত ইহাই ছিল তাহার বিষয় পরিবর্তনের যুক্তি।"[৭] আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং স্বীয় প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির প্রতি অনীহা অনিলচন্দ্রের সমগ্র জীবনকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। মাত্র দু'সপ্তাহের অনুশীলনে ১৯২৫ সালে আইনের ফাইনাল পরীক্ষাটিও তিনি সেরেছিলেন।

গ্রিক ইতিহাসে দার্শনিক প্লেটোর কথা জানা যায়। তাঁর শারীর ও মননশক্তির বিকাশের অন্যতম কেন্দ্র ছিল জিমনাসিয়াম বা আখড়া। অনিল রায়ের বিপ্লব কর্মের একটি আসর এই কুস্তির আখড়া, যেখানে কিশোর তরুণদের শরীর গড়ে তোলা হতো, আর এই সজীব মাটির তলে কিশোর-তরুণদের নিজের প্রয়োজনমতো যেন মনস্বী অনিলচন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে এঁরা প্রত্যেকেই এক একটি জ্যোতিষ্ক স্বরূপ দীপ্যমান হয়েছিলেন।

বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবী সংগঠনে নতুন ব্রতীকে আকর্ষণ করা হচ্ছে গুণগত মান বিচারে। স্কুল-কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র, লেখাপড়ায় কৃতী, ভালো স্বাস্থ্য, এসব দেখেই সেদিন অন্ধকার নির্জনতায় গোপনে মন্ত্রগুপ্তির জন্য অনিল রায় সমীপে পৌঁছে দেয়া হতো। সম্ভবত অনিল রায়ের নির্দেশ ও পরিকল্পনামতোই বিপ্লব ব্রতীদের সংগ্রাহক-সংগঠক ছেলেদের ধরতেন। এই মন্ত্রগুপ্তির প্রথম পর্যায়ে যাঁদের নাম পাই তাঁরা হলেন সত্যগুপ্ত, রসময় শূর, মণীন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, ভবেশ নন্দী, প্রফুল্ল মুখার্জি, প্রফুল্ল দত্ত প্রমুখ। প্রথম পর্যায়ের মন্ত্রগুপ্তি প্রাপ্ত অনেকে দেশ বিভাজনের সময় বি. ভি গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে পড়েন।

অনিল রায়ের সহকর্মীর তালিকা ব্যাপক এবং তা কর্মধারা অনুযায়ী বিভক্ত, প্রথম পর্যায়ের বিপ্লবকর্ম, এ্যাকশান প্ল্যান সম্পৃক্ত, দ্বিতীয় পর্যায় গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সংগ্রাম, কংগ্রেসের বাইরে ফরওয়ার্ড ব্লক পর্যায়, বিয়াল্লিশের বিপ্লব-যুদ্ধোত্তর সংগ্রাম। কিন্তু এই বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মধারার

মধ্যে বিপ্লব চেতনা দৃঢ়ভাবেই রয়েছে—অনিল রায় তাঁর সকল চিন্তাভাবনা ও কর্মসূচিতে অত্যন্ত সচেতনভাবে সেই বিপ্লব চেতনাকে সংযুক্ত রেখেছেন। অথবা বলা যায় অনিল রায়ের বিপ্লব চেতনা—তাঁর জীবনাদর্শ অত্যন্ত সুচারুভাবে সহকর্মীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল।

বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে অনামা বিপ্লবী দলে ক্রমান্বয়ে যাঁদের তিনি দলে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তাঁরা হলেন—ডা. ভূপাল বসু, ডা. অরুণকুমার নন্দী (পরে বিশিষ্ট চিকিৎসক), অদিতি গুপ্ত, সুরেশ মুখার্জি, কুমুদ দত্ত, অনিল ঘোষ (পরে বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি নামে ঢাকা ও কলকাতায় একটি প্রকাশন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা), অনিল দাস (১৭ জুন ১৯৩২, শহীদ) ড. শৈলেশচন্দ্র রায় (পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপক), বেণুগোপাল রায়, ক্ষিতীশ রায়, রেবতী বর্মণ, শচীন ভৌমিক, প্রতাপ গুহ মুস্তাফি, জ্যোতিষ গুহ, অশোক সেন (পরে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ), অমলচন্দ্র রায়, প্রভাতচন্দ্র নাগ, সুধীরচন্দ্র নাগ, নিকুঞ্জ সেন, সুপতি রায়, জিতেন সেন, কমলাকান্ত ঘোষ, সুনীল দাস, ভূপাল গুহ, অতীন্দ্র নাথ বসু, সুবোধ ঘোষ, সুকুমার দত্ত, অপূর্ব রায়, বীরেন দে, হেমেন গুপ্ত, সারদা বসু প্রমুখ। কত নাম তার ইয়ত্তা নেই।

নারীদের মধ্যে বিপ্লবচেতনা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্জয় অভিযানে যাঁকে তিনি প্রথম মন্ত্রগুপ্তি দিয়েছিলেন তিনি বিপ্লবী লীলা নাগ (পরে তাঁর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে 'রায়')। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। বিপ্লবসাধনায় নারীর অংশগ্রহণ এবং এমন সর্বগুণান্বিতা ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণ বিপ্লব ইতিহাসে অনন্য স্বাক্ষর। বিপ্লবী দলে লীলা নাগের যোগদানের পর তাঁরই হাত ধরে বহু নারী শ্রীসংঘের পতাকাতলে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন। এই নারী বাহিনীর নেত্রী ছিলেন লীলা নাগ এবং তাঁর আদর্শবাদে প্রত্যয় দিয়েছিলেন বিপ্লবী অনিল রায়—সংগঠনের 'দাদা' বলে যাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

"অনিল চন্দ্র তখন দেশের শক্তির উৎস, তাঁহার মন্ত্রে দলে প্রাণের জোয়ার আসিল। সাহিত্যে-সঙ্গীতে কীর্তনে-গানে একদিকে উৎসারিত হইতে লাগিল অজস্র রসপ্রবাহ, আর একদিকে সংস্কৃতি কেন্দ্র, পাঠচক্র, কুস্তির আখড়ার মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইল শক্তিকণা! শুরু হইল নৈশ বিদ্যালয়। পত্তন হইল Social Welfare League. তার প্রথম সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ঢাকা হলের তৎকালীন প্রভোস্ট ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র হইল মুসলমান, গরীব গৃহস্থ ও মজুরদের ছোট ছোট ছেলে। সেকালে বিপ্লবীদের মূল কর্মপ্রচেষ্টা স্কুলের মধ্যবিত্ত ঘরের ছাত্র, বিশেষত হিন্দু ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অনিলচন্দ্র তখনই বিপ্লব সাধনায় জনসাধারণের যোগ ও অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বিশেষত অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সেবার যোগ যে সার্থক-বিপ্লবের জন্য আশু প্রয়োজন তাহা তিনি তখনই বুঝিয়া ছিলেন। সেজন্য গুটি কয়েক মুসলমান

ছেলেকে বৈপ্লবিক দলের সংস্পর্শেও আনিয়াছিলেন। এই প্রয়োজনীয়তা বোধে ১৯৩৮ সালে ডিটেনশন হইতে বাহির হইয়া আবার তিনি মুসলমান কিষানপ্রধান বায়রা গ্রামে শ্রীযুক্ত লীলা রায় ও সহকর্মীদের সহযোগে একটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান কিষানপ্রধান ঐ অঞ্চলে তাঁদের চাঁদার সাহায্যে এই স্কুল পত্তন হয়।"[৮] স্কুলটি আজও বর্তমান এবং এখন সেখানে কলেজও হয়েছে। অনিল রায়-লীলা রায়ের গঠনাত্মক কর্মধারা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বিপ্লবসাধক অনিল রায়ের প্রকৃত পরিচয় ও চিরন্তন স্বাক্ষর রয়ে গেছে তাঁর রচনাসম্ভারে। একটি মুহূর্তও তাঁর অপচয় হওয়ার সুযোগ নেই, কি জেল জীবনে কি মুক্ত জীবনে। জেল জীবনে সর্বদা অনুসন্ধান চলতো নির্জন নিরালা। কারণ এই দীর্ঘ সময়টিতে পড়াশোনা ও লেখায় সময় অতিবাহিত করতে হবে—এই সময়টাই তো কর্মহীন সাধনার সময়। সহবন্দি বেণুগোপাল রায়কে তাই তিনি বলছেন—"সময় নষ্ট না করে শরীর ঠিক রেখে, যতো পারো পড়ে যাও, আলোচনা কর, হজম কর। কতদিন এইভাবে থাকতে হবে জানি না, কিন্তু সময় যখন পাওয়া গেল, বাজে দিকে মন না দিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার কর।"

অনিল রায়ের আদর্শগত মতবাদের স্বাতন্ত্র্য ছিল। এবং তারই প্রেক্ষিতে স্বাধীন ভারতের আদর্শগত রূপরেখা[২] তিনি এঁকেছিলেন। নর-নারী, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মানুষে মানুষে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার বার্তা তাঁর রচনায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। এই ভাবনার রূপরেখা বিশ দশকে গোপনে শ্রীসংঘের সদস্যদের মধ্যে প্রচারিত হতে দেখা গেছে, যা সাঙ্কেতিক ভাষায় Typed Copy নামে পরিচিত ছিল। এই প্রচারপত্রে বিভিন্ন বিপ্লবের তত্ত্ব ও প্রয়োগ এবং ভবিষ্যৎ ভারতের রূপরেখা স্থান পেয়ে দলের বিপ্লব-চিন্তাকে সেদিনকার পরিপ্রেক্ষিতে যথাসম্ভব পূর্ণরূপ দিতে সচেষ্ট ছিল। স্বাধীনতা লাভের জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রত্যয়গুলির ওপর তো বটেই, সমাজ-বিপ্লবের প্রত্যয়গুলির ওপরও যথাসম্ভব স্পষ্টতর রূপে 'Typed copy' তে জোর দেয়া হয়েছিল।[৯]

'শ্রীসংঘ' ও তার নেতা অনিল রায়ের আদর্শগত স্বাতন্ত্র্য এইখানেই। "বকসা ক্যাম্পেই বিপ্লবের আদর্শ ও লক্ষ্যের মূল্যায়ন নিয়ে কোনো কোনো সহবন্দিদের মনে গভীর সংশয় দেখা দেয়ার ফলে সে-সময় তাদের মধ্যে নির্বিচারে মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনের প্রত্যয়গুলো গ্রহণে প্রবল উন্মুখতা দেখা দিলে সেই আদর্শগত সঙ্কটকালে বন্দিশালায় সমাজ বিপ্লবের পর্যায়গুলো গভীর মনন ও বিশ্লেষণের দ্বারা সমাজ বিজ্ঞানের আধুনিকতম সূত্রগুলো আলোচনা করে মার্কসীয় ভাবধারার ভ্রান্তি সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সতীর্থদের অবহিত করেন।"[১০] বকসা ক্যাম্পেই তিনি সাহিত্য সভায় 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' শীর্ষক সাহিত্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধটি পাঠ করেন ও 'ধর্মানুভূতির জগৎ বিজ্ঞানের এলাকার বাইরে' তত্ত্বটি উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, "বিংশ শতকে যে নব বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা জড়বাদকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; অন্তত বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া জড়বাদ বা নাস্তিক্যবাদকে সমর্থন করা

চলিবে না। একথা সংখ্যাধিক বিজ্ঞানী আজ সজোরে প্রচার করিতেছেন।"[১১]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে-কোনো শাখায় বা কর্মযজ্ঞের যে-কোনো দিকে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য কীর্তি স্থাপন করার ক্ষমতা অনিল রায়ের ছিল। অন্যান্য কাজের তুলনায় তাঁর সর্বাধিক আগ্রহ ছিল দর্শন, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাধনা ও গবেষণায়। এতে পরম সাফল্যও অর্জন করেছিলেন। বিশ ও ত্রিশ দশকে মার্কসবাদী তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর যে বিশ্লেষণ তা আশির দশকে রুশ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বিপর্যয়ে স্পষ্ট হয়েছে। অনিল রায় ছিলেন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা—যাঁর মূল্যায়ন আজও হয় নি।

১৯৩৮-এর আগস্টে মুক্তি পাওয়ার পর নিরলস সাধনার মধ্য দিয়ে ডায়ালেকটিক যান্ত্রিকতার মার্কসীয় কারাগার থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করে জীবন দর্শনের ক্ষেত্রে বস্তুসত্তা ও প্রাণ-সত্তার ঊর্ধ্বে realityর চূড়ান্তরূপ নির্ণয়ে তিনি যেমন অদ্বৈত সত্তার প্রসঙ্গ অবতারণা করেন, তেমনি সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কেবল অর্থনৈতিক বা জড়শক্তি নয়, বহুশক্তির (Plural Forces) প্রয়োগ সম্পর্কেও সকলকে অবহিত করেন। দৈহিক ও আত্মিকের, সমাজ ও ব্যক্তির, চৈতন্য ও জড়ের, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের সমন্বয়, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, ভারতের সঙ্গে বিশ্বের–এই বহুমুখী সমন্বয়ই ভারতীয়ত্বের মূলকথা এবং এই জীবনদর্শনই মার্কসবাদের জীবনদর্শনের বিকল্পরূপে অনিল রায় উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বন্দিশালার দিনগুলোতে এই সমন্বয়ের চর্চা করে বিকল্প সমন্বয়ধর্মী মানবীয় প্রমূল্যের ভিত্তিতে সমাজবাদের উপস্থাপনই তাঁর আদর্শনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের মূর্ত প্রকাশ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে কারামুক্তির পর '*নেতাজীর জীবনবাদ*' রচনায় যার আদর্শনৈতিক পরিণতি। 'বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ—মার্কস-মর্গান থিওরির সমালোচনা', (জয়শ্রীতে ধারাবাহিক প্রকাশিত—গ্রন্থাকারে আজও প্রকাশিত হয় নি), '*সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ*' ইত্যাদি গ্রন্থগুলোতেও মার্কসীয় চিন্তাধারার বিকল্প সমাজবাদী প্রত্যয় রচনার স্বাক্ষর রেখেছেন।[১২] অনিল রায়ের আরেকটি মৌলিক-গ্রন্থ '*হেগেলীয় দর্শন*'–এই দর্শনের ডায়ালেকটিকের সমালোচনা করে বলেছেন, "বিশ্বজগতের সকল গতিই স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতির মাত্র তিনটি পর্যায়কে অবলম্বন করে সামনে এগিয়ে চলেছে, এবং এই ডায়ালেকটিকের ত্রিতালকে মেপে নিয়েই বিশ্বলোকের সকল সঙ্গীত ছন্দিত হচ্ছে—একথা আজকের জগতের সমাজতত্ত্ব কিংবা কোনো তত্ত্বই স্বীকার করবে না।"[১৩] অত্যন্ত সুচারুরূপে তিনি প্রমাণ করেছেন 'হেগেলীয় দর্শন' একদেশদর্শী।

এই সব মৌলিক তত্ত্বের আলোচনা ও বিশ্লেষণের পর যুদ্ধোত্তর পর্বে জেল থেকে বেরিয়ে ১৯৪৬ সালে যখন পুনরায় ফরওয়ার্ড ব্লক দলে আদর্শবাদের দ্বন্দ্ব দেখা দিলো অনিল রায় সকল মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা করে লিখলেন—'ভারতবর্ষ'কে বাঁচতে হলে নেতাজীর জীবনবাদকেই একদিন গ্রহণ

করতে হবে। তাঁর সাম্যবাদ, তাঁর বহুমুখী সমন্বয়, এ সবই ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ, ফ্যাসিবাদ সকল মতবাদের আতিশয্যকে ছেড়ে ভারতবর্ষকে নেতাজীর পথে নতুন সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। এই সমন্বয়ই এ-যুগের বাণী। এই বাণীই মানুষের বন্ধনমুক্তি ঘটাতে পারে। নেতাজীর জীবনবাদই এই বন্ধনমুক্তির যুগদর্শন।' (*নেতাজীর জীবনবাদ* পৃ ৮৪, ১৯৪৮)

অনিল রায়ের সারা জীবনের পঠন-পাঠন ও মননের কিছু প্রকাশ ঘটেছে কয়েকটি প্রকাশিত গ্রন্থে; আর সমসাময়িক ঘটনায় তাঁর প্রতিক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার ভূমিকার পরিচয় পাই জয়শ্রীতে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলি ও বিভিন্ন সময়ের সম্পাদকীয় রচনাসমূহে। বিপ্লবী লীলা নাগ অনিল রায়ের জীবন সাথি হয়ে বিপ্লবী লীলা রায় হয়েছিলেন। তিনি নারী জাগরণ, নারী সচেতনতা ও নারী সমাজের একটি মুখপত্ররূপে 'জয়শ্রী' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু লীলা নাগ (রায়) ও অনিল রায় বন্দি জীবনে আদর্শবাদের দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে ১৯৩৮ সালের পর যখন 'জয়শ্রী' পত্রিকাকে নবরূপে সাজালেন সেদিন দার্শনিক বিপ্লবী অনিল রায় আদর্শবাদের লড়াইয়ে মুখ্যত মার্কসবাদী চিন্তাধারার বিপরীত মেরুতে জয়শ্রীকে স্থাপন করলেন। একদিকে তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারশীল চিন্তাধারা মাকর্সবাদী চিন্তাধারাকে সমালোচনার মাধ্যমে বিপর্যস্ত করে তুললো, অন্যদিকে একটি নিজস্ব মতবাদ গড়ে তোলায় তিনি উদ্যোগী হলেন। এই ভারতীয় মতবাদের উদ্‌গাতা অনিলচন্দ্র সুভাষচন্দ্রকে বেছে নিলেন নেতৃত্বের পাদপীঠে। অনিল রায়ের গভীর মনন ভবিষ্যতের স্পষ্ট রূপরেখা অঙ্কনে সহায়ক হয়েছিল। তাই কংগ্রেসের নেতৃত্বের দিশেহারাভাব বৃটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারত সম্বন্ধে দাবি জানানোর দোলায়মান অবস্থায়—সুভাষচন্দ্রের আপোসহীন সংগ্রামের পেছনে শক্ত ও বলিষ্ঠভাবে অনিল রায় ও লীলা রায় তাঁদের সহযোগীদের নিয়ে সমবেত হয়েছিলেন। অনিল রায়-লীলা রায়ের যুগ্মভাবনা এবং তাঁদের স্বপ্ন—নেতাজীর স্বপ্নকে সার্থক করতে ব্যক্তিজীবন ও গোষ্ঠীজীবন সমর্পিত হয়েছিল এবং এই সমর্পণে 'জয়শ্রী' পত্রিকা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে—রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রমবিবর্তন ও সমাজ বিপ্লবে রাজনৈতিক দলগুলোর যথাযথ ভূমিকা পালনের ব্যর্থতা 'জয়শ্রী'কে আরও সংগ্রামী ও সংহত করে তুলেছে। তাই অনিল রায়-লীলা রায় ও তাঁদের বিশিষ্ট অনুগামীদের অনুসরণ করে 'জয়শ্রী'র পতাকা তলে আজও চলেছে সমাজ বিপ্লব, মানবিকতা বোধ, মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রাম। এই সংগ্রামে অতীতের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ধ্রুবতারারূপে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংগঠকদের পথের দিশারি রূপে কাজ করছে। এই কর্মধারায় ভৌগোলিক, জাতিগত, ধর্মীয় কোনো ব্যবধানই বাধা হবে না—অনাগত ভবিষ্যৎ তারই বার্তা বহন করছে।

অনিল রায়ের কতিপয় সহকর্মী

১. **লীলাবতী নাগ—লীলা রায়** : জন্ম ২ অক্টোবর ১৯০০, প্রয়াণ ১১ জুন ১৯৭০। ১৯২৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা থেকে বেরিয়ে এসে ধনীর দুলালী, সুন্দরী, শিক্ষাজগতে সুপরিচিতা লীলাবতী নাগ—নারী শিক্ষার উন্নতি বিধানে ঢাকাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলেন। ১৯২৩-৩১ এই আট বছরে একাধিক স্কুল প্রতিষ্ঠা গৃহস্থবাড়ির নববধূদের ঘোমটার আড়ালে হিন্দু বাঙালি পরিবারের হৃদয়হীন অবিচার, সংস্কারের বেড়াজালে অত্যাচার-নিপীড়ন, এসব থেকে মুক্তির জন্য এক দুঃসাহসী প্রয়াসে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, সেই সঙ্গে দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠা, নারীর সার্বিক বিকাশ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণের উদ্যোগ। এসব কর্মের ভাবনায় যেমন লীলাবতী নাগ নিজে এবং কতিপয় বন্ধু সহপাঠী বা সমবয়সী নারী ছিলেন তেমনি অদূরে একটি সজাগ দৃষ্টি প্রতিনিয়ত কাজ করতো—সেই সজাগ দৃষ্টির মানুষটি হলেন অনিল রায়, বিপ্লবকর্মে যাঁর আত্মনিবেদন দীর্ঘকাল পূর্বে হয়ে গেছে—যাঁর বিপ্লবকর্মের আঙিনায় বহু তরুণ এসে ভিড় করেছেন। বয়সে তরুণ কিন্তু মননে প্রাজ্ঞ অনিলচন্দ্র ক'বছরের মধ্যেই লীলাবতীকে বিপ্লবকর্মে দীক্ষা দিলেন এবং তাঁকে তাঁর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ স্থির করে দিলেন। সত্যবাদিতা, সমাজ সংস্কারে ব্রতী, ইংরেজি সাহিত্য ও চারুকলায় যাঁর স্বভাবজ আকর্ষণ অফুরন্ত দেশপ্রেমে উদ্বেল এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ী নারী গোপন বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। যে বিপ্লবকর্মে সত্যাসত্য বিচারের স্বাধীনতা হয় ক্ষুণ্ন, সারল্য, স্বাভাবিক চাপল্য, প্রগল্‌ভতা বিসর্জন দিয়ে কঠিনতর লক্ষ্যে যার হয় স্থিতি—এই সময়কার মানসিক দ্বন্দ্ব, ঝঞ্ঝা, সমাজ ও পরিবেশের প্রতিকূলতার কিছু অভিব্যক্তি পাওয়া গেছে পরবর্তী জীবনে। পুরুষের সমকক্ষ হয়ে বিপ্লবী সংগঠনে নেতৃত্ব দেয়ার বিরল দৃষ্টান্ত লীলা নাগ (রায়)। অনিল রায়—লীলা নাগের জীবনে যে অবিস্মরণীয় বিপ্লব তরঙ্গ এনেছিলেন তারই স্বীকৃতি লীলা রায়ের একটি ছত্রে—"আমার শৈশব ও যৌবনের দীর্ঘ দিন কেটেছে Rational upbringing ও ভাবধারার মধ্যে। দিবালোকের স্পষ্টতার মধ্যে তার ছাপ তীব্র হয়ে আছে জীবনে। তারপর যোগাযোগ হলো যথার্থ হিন্দু সভ্যতা মনন ও জীবনধারা ও mysticism-এর একটি শ্রেষ্ঠ product-এর সঙ্গে। কতবার ধাক্কা খেয়েছি, মন গ্রহণ করতে পারে নি, বুদ্ধি-বিচার বিচলিত হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু পেলাম তাঁর নিকট যা আমার পূর্বপুরুষের হাজার হাজার বছর ধরে রক্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। আমার জীবনে অলক্ষ্যে যাঁর স্পর্শ নিজের মধ্যে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই যেন আমার সেই অপূর্ব জীবন সাথিটিকে পেলাম। পেলাম এমন কিছুর আস্বাদ যার রূপ নেই, স্বাদ আছে, যার প্রকৃতি ধরাছোঁয়া যায় না, কিন্তু অনুভূতিতে যাঁকে পাওয়া যায়। এই কি আমার পূর্বপুরুষের হাজার বছরের সঞ্চিত দান? হবে বা!! কিন্তু এঁর ছোঁয়া বিচার করায় না, বিশ্বাস করায়, প্রশ্ন করে না, প্রশ্নের অতীত মীমাংসায় উপনীত হয়।" (লীলা রায় দিনলিপি, ২৯ মে–২ জুন, ১৯৬৩)।

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে যোগদান, ১৯২৬-এ 'দীপালি ছাত্রী সংঘ' নামে ছাত্রী সংগঠন প্রতিষ্ঠা, ১৯৩০-এ কলকাতায় বিপ্লবকর্মের কেন্দ্রস্বরূপ মহিলাদের আবাস 'ছাত্রীভবন' প্রতিষ্ঠা, ১৯৩১ 'জয়শ্রী' মাসিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা। ২০-১২-১৯৩১ তারিখে গ্রেফতার ও প্রথম কারাবরণ এবং ১৯৩৮-এ কারামুক্তি। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার পর জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মহিলা উপ-কমিটির সদস্যা হন। ১৩-৫-১৯৩৯ তারিখে অনিল রায়–লীলা নাগের মহামিলন। এরপর থেকে লীল নাগ লীলা রায় নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। ১৯৪১ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের পরই গ্রেফতার হন; 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সাপ্তাহিকের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ; মার্চ ১৯৪২-এ গ্রেফতার বরণ; জুন ১৯৪৬-এ কারামুক্তি। দেশ বিভাগ বিরোধে সোচ্চার হন, উদ্বাস্তু ত্রাণে ও সেবায় আত্মনিয়োগ, ভারতীয় গণপরিষদের সদস্যা, প্রজা সোসালিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভানেত্রী, বিভিন্ন গণআন্দোলনের নেতৃত্ব ও কারাবরণ। ১৯৬৩ সালে এক বিস্ময়কর মহাপুরুষের যোগাযোগ, প্রথাবদ্ধ রাজনীতি পরিত্যাগ ও এক বৃহত্তর মানবমুক্তি এবং কল্যাণকর্মে আত্মনিয়োগ। যে ইতিহাস আজও অপ্রকাশিত।

২. **ক্ষিতীশ রায়** : (ক্ষিতীশচন্দ্র রায়) : ১০ এপ্রিল ১৯৬৩-এ প্রয়াণ। অনিল রায়ের স্বগ্রামবাসী এবং কৈশোর থেকেই সহযাত্রী। মনের জগতে, চিন্তার জগতে বিপ্লবের স্ফূরণকর্মের জগতে উত্তরণের পরই তাকে সার্থক বিপ্লব বলা চলে। মনের রাজ্য থেকে কর্মের রাজ্যে এই অতিক্রমণই বিপ্লবীর যথার্থ পরিচয়। Non conformist—অনাসক্ত বিপ্লবীর মানবিক চরিত্রে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঢাকার বিপ্লবকর্মের উদ্যোগ পর্বে মালিটোলার মেসে তাঁর ঘরটি ছিল একটি বিপ্লবী চক্র। তিনি কখনো সামনে আসতেন না—স্বাধীনতাপূর্ব যুগেও যেমন স্বাধীন ভারতের কালেও তেমনি বরাবরই তরুণদের ভিড় থাকতো তাঁর ঘরে। ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, গণিত, অর্থনীতি... ইত্যাদি জ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল না—অথচ সে বিষয়ে কোনো সোচ্চার প্রকাশ ছিল না। ১৯৩০-এ অনিল রায়ের সঙ্গে এপ্রিলে গ্রেফতার হয়ে হুগলী, হিজলী, দেউলীতে বন্দি নিবাসে কাটিয়ে ১৯৩৮-এ মুক্তি পান। দুরন্ত ছেলেদের তাঁর হেফাজতে দিয়ে বাবা-মা'রা নিশ্চিন্ত থাকতেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কিছুকাল তিনি Indian Statistical Institute'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরে কলিকাতায় যাদবপুর অঞ্চলে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। কখনো আড়াল থেকে সামনে আসেন নি। আজীবন বিপ্লবী অনিল রায়-লীলা রায়ের প্রতি আনুগত্য বর্তমান ছিল।

৩. **বেণুগোপাল রায়** : প্রয়াণ ৯ জানুয়ারি ১৯৬৩ তারিখে ৮১ বছর বয়সে। মেছুয়াবাজারের এক মেসে সহকর্মী ক্ষিতীশচন্দ্র রায় ও মানিক দত্তের সঙ্গে গ্রেফতার হয়ে ঢাকা জেলে নীত হন এবং সেখান থেকে আলীপুর দুয়ার, বকসা শিবির এবং রাজস্থানে দেউলী শিবিরে বন্দি থাকার পর ১৯৩৮ সালে মুক্ত হন।

বিপ্লবী অনিল রায়ের অত্যন্ত স্নেহধন্য, অনিল রায় ও লীলা রায়ের প্রতি গভীর আনুগত্য আজীবন পোষণ করেছেন। 'দাদাকে যেমন দেখেছি : অনিল রায় স্মৃতি' জয়শ্রীতে প্রকাশিত (অগ্রহায়ণ ১৯৬৩) রচনাটি বেণুগোপাল রায়ের শ্রীসংঘ ও অনিল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহকর্মীদের প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক দলিল।

৪. **শৈলেশচন্দ্র রায়** : জন্ম ১৪ নভেম্বর ১৯০৪, প্রয়াণ আগস্ট ১৯৬৩। ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগনার মালিতা গ্রামের অখিলচন্দ্র রায় ও শ্রীমতী মনোরমা রায়ের পুত্র। ১৯২১ ঢাকায় আসেন গ্রামের ধ্রুবতারা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে। বহু তীক্ষ্ণধী, মেধাবী পরীক্ষার্থী সেবার পরীক্ষার হল থেকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে বেরিয়ে এলেন—শৈলেশচন্দ্র রায় তাঁদের অন্যতম। শৈলেশচন্দ্র ঢাকায় পোগোজ স্কুলে দশম শ্রেণীতে প্রবেশ করে একজন মেধাবী ছাত্রের সহযাত্রী হলেন, সেইসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে 'মানুষ গড়ার' কাজে গোপন বিপ্লবী দলের শিক্ষানবীশি গ্রহণ করলেন। ছাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা সে-সময় তাঁর সহপাঠী-সহযোগী ছিলেন তাঁরা হলেন—অনিল ঘোষ, অনিল দাস, রেবতী বর্মণ, কমলাকান্ত ঘোষ, হরিপদ চক্রবর্তী, বেণুগোপাল রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় প্রমুখ। 'অনিল, যুগান্তর নেতা বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর যোগাযোগে, বোমার খোলের একটি ভালো prototype সংগ্রহ করে এনেছেন। সহকর্মী নীরো পোদ্দার বাছাই করার কারিগর নিয়ে বোমার খোল তৈরিতে ব্যস্ত। শৈলেশ রায় ও অনিল দাস—দুই রসায়নের গবেষক ছাত্র বোমার ফর্মুলা অনুসরণে বোমা তৈরিতে নিয়োজিত। কাজ এগিয়েছে অনেক। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল অভিযান এসে গেল। শৈলেশচন্দ্র গ্রেফতার হয়ে গেলেন। অনেকে আত্মগোপন করলেন। ঢাকা জেল থেকে হিজলী বন্দিশালা হয়ে শৈলেশচন্দ্র রাজস্থানের দেউলী বন্দিশিবিরে দীর্ঘ ক'বছর বন্দি থেকে ১৯৩৮-এর শেষে মুক্তি পান। দেউলী বন্দিশিবিরে অনিল রায় তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব মন্থন করে মার্কসীয় তত্ত্বের একদেশদর্শিতার গুরুতর ভ্রান্তি সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সতীর্থদের অবহিত করেন। এই পঠন-পাঠনে দেউলী বন্দিশালায় অনিল রায়ের অন্যতম নিষ্ঠাবান সঙ্গী ছিলেন শৈলেশচন্দ্র।' ('শৈলেশদা' : ড. শৈলেশচন্দ্র রায়—সুনীল দাস শ্রাদ্ধবাসরে স্মৃতি তর্পণ, জয়শ্রী, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৯৬৩)।

জেল থেকে মুক্ত হয়ে শৈলেশচন্দ্র অনিল রায়-লীলা রায়ের অন্যতম সহযোগীরূপে জয়শ্রী সম্পাদনার কাজে যুক্ত হলেন। গ্রন্থপরিচয়, রাষ্ট্রীয় ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা প্রবন্ধ এই সময় জয়শ্রীতে প্রকাশিত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন বিভাগের অধ্যাপকরূপে শৈলেশচন্দ্রে কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বিভাগের সংবর্ধনার উত্তরে বিপ্লবী অনিল রায়-লীলা রায় ও শ্রীসংঘ প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'This influence is still continuing in me unabated.' মানুষ শৈলেশচন্দ্র ছিলেন অপরূপ, অতুলনীয়।

৫. **অনিল দাস** : জন্ম ১৮ জুন ১৯০৬, শহীদ ১৭ জুন ১৯৩২।

অনিল দাসের জন্ম ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার পাইকপাড়া গ্রামে। অনিল দাসের নেতৃত্বে পাইকপাড়ার যুব-গোষ্ঠী শ্রীসংঘের বিপ্লব সাধনায় যুক্ত হন, এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য : সুবোধ মজুমদার (ময়না), অনিল দে (পাগল), কালীপদ নাগ, চপল মজুমদার, শান্তি দাস, বিনয় মজুমদার প্রমুখ। মা কিরণবালা দেবীর নিকট তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। ১৯১৯ সালে ঢাকার পোগোজ স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার স্বল্পকালের মধ্যে 'শ্রীসংঘের' বিপ্লবকর্মে যুক্ত হন। পোগোজ স্কুলে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে শ্রীসংঘের সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অনিল ঘোষ, শৈলেশ রায়, রেবতী বর্মণ, হরিপদ চক্রবর্তী, ভূপেশ চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে। ঢাকায় প্রতিবেশী বেণুগোপাল রায় শ্রীসংঘে তাঁর সতীর্থ ছিলেন। আত্মত্যাগের পরীক্ষার মধ্য দিয়েই ধীরে ধীরে অনিল দাস বৃহত্তর বিপ্লবী জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। খেলাধূলায়, ডন-কুস্তিতে, সমাজসেবায়, সমাজ বিরোধীদের দমনেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। তাঁর সংঘ 'loyalty', বন্ধু ও সহকর্মী বাৎসল্য প্রবাদ বাক্যের মতো ছড়িয়ে আছে। তিনি ছিলেন সাধারণের বন্ধু। অবহেলিত, অবজ্ঞাত, করুণাশ্রয়ী মানুষের পাশে তিনি সর্বদা সংগ্রামী সাথিরূপে বিরাজমান থাকতেন। এম.এস-সি পাস করার পর অনিলকুমার গণিত বিষয়ে কয়েকখানি পাঠ্য বই লিখেছিলেন। 'জয়শ্রী' পত্রিকা প্রতিষ্ঠাত্রী- বিপ্লবী লীলা নাগের সঙ্গে পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৩১-এর জানুয়ারিতে ঢাকার ফরাশগঞ্জ-সবজিমহল এলাকায় সর্বপ্রথম সাফল্যের সঙ্গে ডাকব্যাগ ছিনতাই কাজ সমাপন হয়, এবম্বিধ আরো কিছু পরিকল্পনার পরিকল্পক অনিল দাস এবং সর্বশেষে ১৩ মে ১৯৩২ শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রমনা প্রান্তে নীলক্ষেতের নিকটবর্তী রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং-এ অনিল দাসের নেতৃত্বে নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী ৮/১০ জন সহকর্মীর সহায়তায় লুণ্ঠন করেন। ৬ জুন অনিল দাস গ্রেফতার হন এবং তারপর তাঁর ওপর বর্বর অত্যাচারে ১১ দিন পর ১৭ জুন মাত্র ২৬ বছর বয়সে নিঃশেষে আত্মদান করলেন—পুলিশ কোনো গোপন তথ্য উদ্ধার করতে পারলো না। রাজশক্তি এই অনমনীয় বিপ্লবীর কাছে পরাস্ত হলো।

৬. **অনিলচন্দ্র ঘোষ** : (১৭. ১. ১৯০৫–৮. ১২. ১৯৬৩)। দর্শনা–মানিকগঞ্জ, ঢাকা। বাবা জগদীশচন্দ্র ছিলেন গীতার বাংলা অনুবাদক ও বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা। কৈশোরে স্বাধীনতা সংগ্রামে আকৃষ্ট হয়ে বিপ্লবী সংস্থা শ্রীসংঘে যোগ দেন। সহপাঠী অন্তরঙ্গ বন্ধু শহীদ অনিল দাস। জয়শ্রী প্রতিষ্ঠায় বিপ্লবী লীলা নাগের সহযোগী ছিলেন। ১৯২৮ সালে ঢাকা থেকে বাংলায় এম এ পাস করেন। ১৯৩০ সাল থেকে তিনি আত্মগোপন করে বিপ্লবকর্ম চালিয়ে যান এবং ১৯৩৪ সালে গ্রেফতার হয়ে চার বছর বন্দিজীবন কাটান। ১৯৪২ সালেও 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে পুনরায় গ্রেফতার হন। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫০ সালে কলিকাতায় চলে যান। দীর্ঘদিন ঢাকার 'নারী শিক্ষা মন্দির' বর্তমানে শেরে বাংলা

মহাবিদ্যালয়ের কর্মসমিতির মধ্যে তাঁর স্থান ছিল। কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরির প্রসার ঘটান। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা—বিজ্ঞানে বাঙালি, বাংলার ঋষি, বীরত্বে বাঙালি, ব্যায়ামে বাঙালি, বাংলার বিদুষী, বাংলার মনীষী প্রভৃতি গ্রন্থ তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। অনিল রায় ও লীলা রায়ের কর্মজগতের সঙ্গে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি যুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের কর্মযজ্ঞের তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

৭. **অতীন্দ্রনাথ বসু** : জন্ম নভেম্বর ১৯০৯, ১২ অগ্রহায়ণ মালখানগর, বিক্রমপুরে এবং প্রয়াণ ১৭-১০-১৯৬১। ছাত্রজীবনেই বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসংঘের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৬-এ দুটি বিষয়ে লেটার-সহ ম্যাট্রিকে চতুর্থ স্থান পেয়ে তিনি পাস করেন। গ্রাম থেকে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এলেন—এখানেই সেবারের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী রেবতী বর্মণের সঙ্গে পরিচয় হয়। রেবতী বর্মণ বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ের শ্রীসংঘ দলভুক্ত এবং কলিকাতা শাখার অন্যতম সংগঠক। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে বড়লাট আরউইনের স্কটিশচার্চ কলেজে এক সভায় আসার কথা, সঙ্গে থাকবেন ছোটলাট অ্যান্ডারসন ও পুলিস কর্তা টেগার্ট। এই সুযোগ হারাতে অতীন্দ্রনাথ নারাজ। তিন বন্ধুতে মিলে এই তিন বৃটিশ সেনাকে শেষ করে দেয়ার পরিকল্পনা নিলেন। প্রস্তুতির আভাস পুলিশ পেয়ে গেল। অতীন্দ্রনাথ গ্রেফতার হলেন। ১৯৩০ সালে বি. এ. পরীক্ষার প্রথম হলেন। এরপর জেল থেকে বন্দি হিসেবে ১৯৩৩ সালে এম এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় হলেন। পরে অর্থশাস্ত্রে পি-এইচ. ডি. (১৯৪২) এবং প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছিলেন। বন্দি অবস্থায় জেল থেকে তিনি ফরাসি ভাষা নিয়ে বি. এ পাস করেন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় তিনি বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে বন্দি নেতা ও সহকর্মীদের জেল থেকে মুক্ত করে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বিপ্লবের কাজে সহায়তার পরিকল্পনা করেন। এই সময় বন্দি বিপ্লবী অনিল রায় ও প্রধানত বিপ্লবী লীলা রায়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও গোপন নির্দেশ আদান-প্রদান চলে। এবারও তাঁর পরিকল্পনা পুলিশের নজর কাড়ে এবং ১৯৪২-এর শেষের দিকে গ্রেফতার হয়ে যান। ১৯৪৬-এর মার্চে মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস এবং মার্কসীয় দর্শন পড়াতেন। *Crossroads of Science and Philosophy*, *বিজ্ঞান ও দর্শন*, *Social Dynamics*, *বিক্লাস* প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ *নৈরাজ্যবাদ* বিশ্বের পণ্ডিত মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থ রচনা কালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। সেখানেই তাঁর আকস্মিক প্রয়াণ হয়। ১৯৫২ সালে স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লক-এর প্রতিনিধিরূপে বিধানসভায় নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৮ সালে রাজ্যসভার সদস্য হন। রাজ্যসভার allowance-এর সব টাকা তিনি সে সময় প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির দুস্থ কর্মীদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দান করে যান। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার একজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরূপে অতীন্দ্রনাথ চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

৮. **সুনীল দাস** : জন্ম ১২ জুন ১৯০৯, প্রয়াণ ১৮ এপ্রিল ১৯৭০। জন্ম স্থান : মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ। পিতা নিবারণচন্দ্র দাস, মাতা কিরণবালা। তাঁর স্বগ্রাম ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার পাইকপাড়া। ১৯২৫ সালে ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯২৭-এ জগন্নাথ কলেজ থেকে আই এ পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করেন, ১৯৩০ সালে রসায়ন অনার্সসহ বি. এস-সি এবং পরবর্তীকালে এম. এস-সি কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন। এম. এস-সি'র থিসিস ছিল 'Raman Effect in Inorganic Compounds'—'অজৈব যৌগের ওপর রমণক্রিয়ার প্রভাব।' ১৯৩২ সালের জুন সংখ্যায়—'American Journal of Physical Chemistry' পত্রিকায় জে সি ঘোষ ও এস কে দাসের যৌথ নামে রচনাটি প্রকাশিত হয়।

সুনীল দাসের বিপ্লবী দল শ্রীসংঘে দীক্ষা গ্রহণের বর্ণনাটি তাঁরই জবানিতে জানতে পারি—"তখন ছিল শীতকাল। এক অমাবস্যার রাত্রিবেলা, ঢাকার পীঠস্থান ঢাকেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন আমলাপাড়ার মাঠে নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হলাম অনিল ঘোষের সঙ্গে। নিঃসীম নীরবতার নিরন্ধ্র অন্ধকার এক উত্তেজনক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তার মধ্যে দ্রুত নিশ্বাস ফেলে সময় গুনছি। এই বুঝি আমাদের 'দাদা' আসছেন যাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হবে! সেদিন আমার অজান্তে ই মনের নিভৃতে উপলব্ধি করছিলাম যে সেই রাত্রির একাকীত্বের নিথরতায় আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায় উন্মোচিত হতে চলেছে—বৈপ্লবিক সংগ্রামে আমার দীক্ষা গ্রহণের মুহূর্ত সমাগত।

মনের নিভৃতে আমাকে যখন এই সর্বগ্রাসী ভাবনা অভিভূত করতে চাইছে, বুঝতে পারলাম গুনগুন স্বরে সঙ্গীতের কলি গাইতে গাইতে কে জানি দ্রুত এগিয়ে আসছেন। অনিল ঘোষ সচকিত হয়ে উঠলেন, আমিও নিজেকে সজোরে ঝাঁকি দিয়ে সজাগ হয়ে উঠলাম। নিমেষেই দেখতে পেলাম মাথা চাদরে ঢাকা এক শক্তিমান পুরুষ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। অনিল ঘোষ বলে উঠলেন, 'সুনীল আমাদের দাদা এসেছেন প্রণাম করো।' আমি পাদস্পর্শ করতেই উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে গাঢ় আলিঙ্গনে গ্রহণ করলেন। দাদা সেদিন মানব জীবনের তিনটি অমোঘ সত্যকে উপনিষদের বাণীর মধ্য দিয়ে তুলে ধরে বজ্রনির্ঘোষে বলেছিলেন : মনে রাখবে আত্মা অবিনশ্বর, মৃত্যু জীবনের অলঙ্ঘনীয় শর্ত, কর্মে তোমার অধিকার আছে, কর্মফলে অনধিকারী।

তারপর তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের এবং স্বামী বিবেকানন্দের নাম দিয়ে অভীর মন্ত্র উচ্চারণ করে বিপ্লবী জীবনের প্রবেশপথে আমাকে দীক্ষা দিয়ে দেন।

সেদিন দীক্ষান্তের প্রসঙ্গ ছিল আগামী দিনের দুর্ধর্ষ মুক্তি সংগ্রামের, বিপ্লবীর জীবন পরাধীনতার গ্লানি মুক্তির জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম–সশস্ত্র সংগ্রাম যার দুস্তর পর্যায়।" (সুনীল দাস 'আত্মআবিষ্কার'-বিপ্লবী সুনীল দাস স্মৃতি সংখ্যা, জয়শ্রী, ভাদ্র ১৯৩৩)। ১৯৩৩ থেকে একটানা, বিভিন্ন জেলে ও হাসপাতালে, লালবাজার, প্রেসিডেন্সি জেল, হিজলী বন্দিনিবাস, মেডিকেল কলেজ, বাঁকুড়া, সালতোড়া কাটিয়েছেন। মুক্তি পেলেন ১৯৩৮, ৩ আগস্ট। অনিল রায়ের সমাজবাদী ভাবনা

প্রতিষ্ঠায় সুনীল দাস ছিলেন একনিষ্ঠ সহযোগী। দক্ষিণ কলকাতা ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক, পরবর্তীকালে অখণ্ড বাংলার ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাদেশিক কমিটির সহযোগী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৪২ সালে আত্মগোপন অবস্থায় ছদ্মবেশে এক আস্তানা থেকে অন্যত্র যাওয়ার সময় গ্রেফতার হন, আলিপুর ও দমদম জেলে দীর্ঘ বছর কাটিয়ে ১৯৪৬ সালে জুনে মুক্তি পান। বাংলা ফরওয়ার্ড ব্লকের অন্যতম সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন, কিষাণ ও শ্রমিক আন্দোলন এবং সংগঠনের সংগঠকরূপে কাজ করেন। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কাজে আত্মনিয়োগ, ২৭ এপ্রিল ১৯৪৯-এ স্বাধীন ভারতে বন্দিমুক্তি আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায় পুলিশের গুলিতে একমাত্র বোন লতিকা সেনের জীবনাবসান হয়। ১৯৫৩ সালে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলে যোগদান, ১৯৫৭ সালে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের প্রার্থীরূপে রাসবিহারী কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। বিধানসভায় দলের সম্পাদকরূপে কাজ করেন। ১৯৫৫ সালে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ। ১৯৫২ সালে খাদ্য আন্দোলনে পুলিশের লাঠির আঘাতে মাথা ফাটে। ১৯৫৫-৬৮ পশ্চিমবঙ্গ হিন্দ মজদুর সভার সভাপতি, ১৯৬২ সালে প্রজা স্যোসালিস্ট দলের সভাপতি হন। ১৯৭০ সালে জনতা পার্টির সহ-সভাপতি।

১৯৭০ সালের জুন মাসে বিপ্লবী লীলা রায়ের প্রয়াণের পর 'জয়শ্রী' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন। জয়শ্রীর সম্পাদকরূপে তিনি জয়শ্রীর সুবর্ণ জয়ন্তী ও হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জয়শ্রীর এই দুইটি বিশেষ সঙ্কলন গ্রন্থ তাঁর সম্পাদনার কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। জয়শ্রী প্রকাশন প্রকাশিত সুভাষ-রচনাবলিরও তিনি ছিলেন প্রধান সম্পাদক। বিপ্লবী সুনীল দাসের জীবনে অনিল রায় ও লীলা রায়ের অবস্থান এক বিস্ময়কর ব্যাপ্তিতে রয়েছে—যে কারণে তিনি সবসময়ে এদের অখণ্ড সত্তারূপে ধারণ করে নিজেকে অখণ্ডের অংশরূপ ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর এই সমগ্রের অংশ ভাবনা বিপ্লব ইতিহাসে আত্মনিবেদনের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

অনিল রায়-লীলা রায়ের একীভূত সত্তায় বাংলার তথা ভারতের বিপ্লব ইতিহাসে অনুগামী আদর্শবাদী একনিষ্ঠ সেবকের অন্তহীন যাত্রায় 'জয়শ্রী' পত্রিকা একটি ঘনীভূত রূপ। 'জয়শ্রী' আজ আর একটি শুধু মাসিক পত্রিকা নয়—এটি একটি আদর্শ, বিপ্লব সাধনার অনন্য প্রতীক। দুই বিপ্লবীর প্রাণসত্তা জয়শ্রীতে সঞ্চারিত হয়ে ভবিষ্যতের পথে চলেছে তার অন্তহীন অভিযাত্রা। শতবর্ষে এই বার্তাই অখণ্ড বাংলার পল্লীতে পল্লীতে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আমাদের। বাংলা থেকে রণিত হয়ে তা ভারত ও বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হবে।

দ্রষ্টব্য : অনিল রায়ের সহকর্মীদের মধ্যে—তাঁর নিকট বিপ্লব মন্ত্র-প্রাপ্ত, কতিপয় সংগঠকের পরিচয় এখানে বিবৃত হলো। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে, হরিবিষ্ণু কামাথ, আর এস রুটকর, শার্দুল সিংহ, কবিশের, আশরাফউদ্দীন আহ্‌মদ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, অগণিত নারী-পুরুষ তাঁর সহকর্মী ছিলেন, যাঁদের কথা এই স্বল্প পরিসর রচনায় লেখা সম্ভব হলো না, এজন্য মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

অনিলচন্দ্র রায়/অনিল রায় রচিত গ্রন্থ ও অসঙ্কলিত রচনাপঞ্জি

(প্রথম দিকে অনিলচন্দ্র রায় লিখতেন এবং পরবর্তীকালে লিখতেন অনিল রায়)

প্রকাশিত পুস্তক

১. *জাগ্রত পারস্য*, শ্রী অনিল চন্দ্র রায় এম. এ. বিএল প্রণীত, প্রকাশক, অনিল চন্দ্র রায়, ঢাকা ১৯২৯
২. *সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ*, অনিল রায়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৭, চতুর্থ, মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৭১
৩. *নেতাজীর জীবনবাদ*, অনিল রায়, প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮, সপ্তম মুদ্রণ, জানুয়ারি ১৯৭১
৪. *হেগেলীয় দর্শন*, অনিল রায়, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৭১
৫. *ধর্ম ও বিজ্ঞান*, প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭১
৬. *নেতাজীর ডাক*, গীতিনাট্য
৭. *বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ* (মার্কস-মর্গান থিওরির সমালোচনা) [অপ্রকাশিত]

ইংরেজিতে লেখা পুস্তক

১. *Party and Leaderhip*
২. *What Netaji Stands For*

প্রবন্ধমালা : সব ক'টিই জয়শ্রীতে প্রকাশিত

১. অথা তো পথ জিজ্ঞাসা, আশ্বিন ১৩৪৫
২. বৈজ্ঞানিকের জগৎ, ফাল্গুন ১৩৪৫
৩. সংহতির পথ, বৈশাখ ১৩৪৬
৪. শঙ্কর মায়াবাদ ও ভারতের দুর্গতি, কার্তিক ১৩৪৬
৫. গান্ধীবাদ, অহিংসা ও ভবিষ্যৎ সমাজ, ফাল্গুন ১৩৪৬, চৈত্র ১৩৪৬, বৈশাখ ১৩৪৭
৬. অস্থায়ী জাতীয় রাষ্ট্র, আষাঢ় ১৩৪৭
৭. ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব, কার্তিক ১৩৪৭
৮. স্বাধীনতার রূপান্তর, অগ্রহায়ণ ১৩৪৭
৯. রাজনৈতিক দল ও নেতা, পৌষ ১৩৪৭
১০. দল ও দলাদলি, মাঘ ১৩৪৭
১১. সোস্যালিজম এবং কম্যুনিজম, ফাল্গুন ১৩৪৭
১২. ফরওয়ার্ড ব্লক : শ্রেণীচেতনা ও রুশীয় নারোদনিকী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮
১৩. ভারতীয় রাজনীতিতে বামপন্থা, চৈত্র ১৩৪৭
১৪. ভারতবর্ষের সংখ্যালঘু, শ্রাবণ ১৩৫৪
১৫. এই কি স্বাধীনতা, ভাদ্র ১৩৫৪
১৬. নূতন সমাধান চাই, আশ্বিন ১৩৫৪

১৭. সংখ্যালঘুর আনুগত্য, আশ্বিন ১৩৫৪
১৮. স্বাগত ১৯৪৮, পৌষ ১৩৫৪
১৯. ইসলামী সংস্কৃতি, শ্রাবণ ১৩৫৫
২০. ইসলামী রাষ্ট্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৫
২১. সংস্কৃতির বিপর্যয়, আশ্বিন ১৩৫৫
২২. বামপন্থা ও পাকিস্তান, শ্রাবণ ১৩৫৭
২৩. ইতিহাস ব্যাখ্যা, কার্তিক ১৩৫৭
২৪. পূর্ববাংলায় হত্যালীলায় মর্মন্তুদ কাহিনী, জয়ন্ত দাশগুপ্ত ছদ্মনামে ধারাবাহিক রচনা, ১৩৫৭—বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন, পৌষ
২৫. হায়! বৈশাখ ১৩৫৭
২৬. এই শান্তি আন্দোলন, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮
২৭. বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টার এক অধ্যায়, জয়ন্ত দাশগুপ্ত ছদ্মনামে ধারাবাহিক রচনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮, আষাঢ় ১৩৫৮
২৮. নির্বাচনে বামপন্থার ভূমিকা, আষাঢ় ১৩৫৮
২৯. সাহিত্যে বাস্তববাদ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫৮
৩০. বামপন্থীরা কি ব্যর্থ হবে? কার্তিক ১৩৫৮

English Articles

1. Marxian Metaphysics - A Logical Congruity, *Forward Bloc Weekly*, Nov. 23 & Nov. 30, 1939
2. The Dynamics of Revolution. *Forward Bloc Weekly*, Jan 1947
3. Philosophy of Netaji, *Forward Block Weekly*, April 5, 1949, May 2, 1949
4. Can the Left Unite? *Forward Block Weekly*, May 31, 1949, 21 June, 5 July, 1949

প্রাসঙ্গিক কথা ও উল্লেখপঞ্জি

১. অনিল রায় প্রসঙ্গে নানাজনের বক্তব্য :

ক. '... At the head of these brilliant and dedicated youngmen stood Anil Chandra Roy who deserves more than a passing mention. He seemed to have descended on twentieth-century Dacca from Renaissance Europe, the world of Leonardo da Vinci and Michaelangelo or Walter Ralegh and Francis Bacon. As a school student he was a neighbour of Pramatha Chaudhuri, who attracted by this 'marvellous boy' introduced him to Pramatha Chakrabarty. The latter made him a member of Sri Sangha a cultural organisation which behind a facade of socio-cultural activities, was keeping alive the embers of Hemchandra Ghose's political party.

Before long Anil was initiated into the doctrine of political revolution. A man of impressive appearance, he was a gymnast of exceptional skill. Neither a sculptor nor a painter, he was a musical prodigy displaying equal virtuosity in ancient and modern songs and also a talented instrumentalist. He mastered classical music and could sing Hindi and Urdu songs with equal ease and felicity. Himself a poet, he composed many songs and also set the compositions of others to appropriate tunes. He was a master of many languages and having read for M. A. in Sanskrist appeared in English in which subject too, he passed with credit. His proficiency in Sanskrit drew him to the mysteries of Hinduism and at one time it was thought that he might join the order of monks at Belur...'

খ. ... বাংলাদেশের বিপ্লবী নেতাদেরকে আমি চিনি। তাঁদের মধ্যে যথার্থ মানুষের অভাব নেই। তাঁরা জাতির বরেণ্য ব্যক্তি। কিন্তু একাধারে প্রচণ্ড শক্তি-সম্পন্ন, প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল, ধীমান, সুপণ্ডিত, রসবেত্তা, শিল্পজিজ্ঞাসু ও সুকুমার অন্তরবিশিষ্ট অপূর্ব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বিপ্লবী মহলেও তাঁর মত একজন খুব কমই দেখা যায়। আমি চিরদিন বুঝে এসেছি, অনিলদার পরিচয় তাঁর অন্তর্নিহিত স্নেহপ্রবণতায়, ছোটবড় প্রত্যেকের মধ্য থেকে তাঁর শিক্ষালাভের সহজ চেষ্টায়, মুক্তির কাছে নতি স্বীকার করার স্বভাবে। এই জন্যই আমি তাঁকে শেষ দিন পর্যন্ত শ্রদ্ধা করে এসেছি। সুদূরতম অতীতে 'Friend, Philosopher and Guideর যে আসন তাঁকে আমরা দিয়েছিলাম, সে আসন আমার পক্ষে তাঁর জন্য শেষ দিন পর্যন্তই অব্যাহত ছিল।—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, জয়শ্রী, পৌষ-মাঘ ১৩৩৮।

গ. 'এখন আমরা যাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি, তিনি অনিলবাবু, শ্রীসংঘের নেতা। উনি কুস্তিগীর, পালোয়ান ব্যক্তি। এ গেল বাহ্যিক পরিচয়, চোখ থাকিলেই নজরে পড়ে। ইনি সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী ও সাহিত্যরসিক— কবিতা ও প্রবন্ধ উভয় বিভাগেই লেখনী চালনা করিয়া থাকেন, পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি আছে, সঙ্গীত শাস্ত্রেও পড়াশোনা নাকি গভীর, দর্শন ইত্যাদিতে বিশেষ অনুরাগ, এককথায় অনিলবাবুর মধ্যে বিভিন্ন ও বিপরীত বহু বিষয়ের একটা সমাবেশ রহিয়াছে। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ইনি। বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনে প্রবীণদের তুলনায় নবাগন্তুক বা নবীন।'

—এ বর্ণনা ১৯৩১ সালের, অনিলচন্দ্রের বয়স তখন ৩১।

'কিরণদা (মুখার্জি) ছিলেন বয়সে সকলের বড় এবং সকলেরই তিনি দাদা। সুরেন ঘোষ, রবি সেন, প্রতুল গাঙ্গুলী, পূর্ণ দাস, অরুণ গুহ, ধীরেন চ্যাটার্জি প্রমুখ সকল নেতাকেই বৃদ্ধ কিরণদা তুমি বা তুই বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কিন্তু একটিমাত্র ক্ষেত্রে তাঁহার এই সম্বোধনের ব্যতিক্রম হইত। অনিলবাবুকে তিনি 'আপনি' বলিতেন। অনিলবাবুর মধ্যে

এমন কিছু ছিল, যার জন্য কিরণদার মুখ হইতে তাঁহার অভ্যস্ত তুমি বা তুই সম্বোধন নির্গত হইতে পারে নাই। সেই এমন কিছুটাই অনিল চন্দ্রের ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ সর্বব্যাপী।'—অমলেন্দু দাশগুপ্ত, বকসা ক্যাম্প।

ঘ. '...আমার পক্ষে অনিল রায় সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে গেলে Hero worship মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যিই তিনি বড়দের মধ্যে বড় ছিলেন। দেহের ও মনের উৎকর্ষে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। চরিত্রের শুচিতায়, জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতায় এবং প্রতিভার দীপ্তিতে অনিল রায় ছিলেন অনুপম।'—রেবতী বর্মণ, জয়শ্রী, পৌষ-মাঘ ১৩৫৮.

ঙ. '১৯২৬—কলেজে পড়তে এসে বিপ্লবী দলে ভর্তি হয়েছি। বিপ্লবী নেতার সম্বন্ধে অপরিমিত কৌতূহল। নাম শুনলাম ঢাকার অনিল রায়—শ্রীসংঘের স্রষ্টা, তাঁর হাতে তৈরি হয় মৃত্যুঞ্জয়ী ছেলের দল। উপনিষদ, এরিস্টটল, লাঠি, কুস্তি, এতে তাঁর দখল সমান। অনিল রায় ও শ্রীসংঘের ছেলে পুলিশের এবং গুণ্ডার দলের বিভীষিকা। যখন দাঙ্গা বাধে তখন উন্মত্ত জনতার লাঠি ও ছোরার মাঝে উপস্থিত হন নিরস্ত্র অনিল রায়। তাঁর সুবিপুল কৌশলের সামনে পশুর থাবা নিস্তেজ হয়ে যায়।'—ড অতীন্দ্রনাথ বসু, জয়শ্রী, পৌষ-মাঘ, ১৩৫৮।

চ. '...তাঁর কাছে এসে তাঁর চরিত্রের বিশালতা, বিচিত্রতা ও গভীরতায় বিস্মিত হয়েছি, মনে হয়েছে-তিনি গগন আমি গোষ্পদ। জীবনের সুদুর্লভ ফলবান মুহূর্তগুলোতে তাঁর প্রতিচ্ছায়া ধারণ করতে পেরে নিজেকে *ধন্যোস্মি কৃতকৃতার্থ* ভেবেছি। ক্ষুদ্রকে কখনও তিনি অবহেলা করেন নি। তাঁর মন্ত্র ছিল—*মানসং ভারতে অপরিমাণং*।—নরেন সরকার, জয়শ্রী, পৌষ—মাঘ, ১৩৫৮

২. অমলচন্দ্র রায়, 'স্মৃতির পাতা থেকে', বিপ্লবী অনিল রায়, ৯৯তম জন্মদিবস সংখ্যা, জয়শ্রী

৩. তদেব

৪. সুনীল দাস, অনিল রায়, জয়শ্রী, সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ, ১৯৭১

৫. তদেব

৬. প্রমথ কুমার চক্রবর্তী, 'পুরানো কথা', জয়শ্রী, ১৯৭১

৭. 'বিপ্লবী ও দার্শনিক অনিল রায়', ক্ষিতীশচন্দ্র রায় লিখিত, ১৬ জানুয়ারি তারিখে (১৯৫২) বিপ্লবী অনিল রায়ের শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত; 'জয়শ্রী', অনিল রায় স্মৃতি সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৩৫৮

৮. তদেব

৯. সুনীল দাস, অনিল রায়, জয়শ্রী, সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ, ১৯৭১

১০. তদেব

১১. অনিল রায়, ধর্ম ও বিজ্ঞান, ভূমিকা

১২. সুনীল দাস, অনিল রায়, জয়শ্রী, সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ, ১৯৭১

১৩. অনিল রায় হেগেলীয় দর্শন, ১৯৭১

দীপালি সংঘ—নারী সংগঠন থেকে বিপ্লবী সংগঠন

সা গ রি কা ঘো ষ

দুর্জয় সঙ্কল্প, দৃঢ় অনমনীয় চরিত্রবল, প্রচণ্ড কর্মশক্তি, বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, স্বদেশ ও স্বজাতির অপমানে বেদনাবোধ, স্বদেশ ও স্বজাতির ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আর্তমানবের প্রতি সীমাহীন সহানুভূতি ও ভালোবাসা, সর্বোপরি অসাধারণ শক্তির অধিকারী এক অসামান্য মহীয়সী নারী, বাংলাদেশের উজ্জ্বল গৌরব বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়—যিনি একদা ঢাকা শহরে, বর্তমান বাংলাদেশের রাজধানী, লীলা নাগ নামে পরিচিত ছিলেন। সে সময়ে ঢাকা শহরে লীলা নাগের নাম ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল—কর্মক্ষমতা ও সংগঠন শক্তির প্রভাবে বাংলাদেশের শত শত ছেলেমেয়েকে নেতৃত্ব দিতে পেরেছেন।

লীলা রায়ের জন্ম ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর। সুতরাং শতবর্ষ উদ্‌যাপনে ১৯৭১ সালের ২ অক্টোবর উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। সম্প্রতি জানতে পারলাম বাংলাদেশের ঢাকা শহরে "লীলা নাগ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন পরিষদ" গঠিত হয়েছে। জেনে খুবই আনন্দ বোধ করছি। ঢাকা শহর লীলা নাগের কর্মভূমি, তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় বিচিত্র ও দুঃসাহসী কর্মধারার ভিতর দিয়ে কেটেছে ঢাকা শহরে—কি নারী আন্দোলনে, কি বৈপ্লবিক আন্দোলনে বা শিক্ষাক্ষেত্রে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন এই ঢাকায়। ঢাকা তাঁর জীবনের প্রাণকেন্দ্র। আমাদের পরম সৌভাগ্য ঢাকা শহরে এই মহীয়সী নারীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছি, তাঁর কর্মযজ্ঞে কিছু অংশ নিতে পেরেছি। তাই বিপ্লবী লীলা নাগ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন পরিষদ থেকে যখন আহ্বান এসেছে তাদের উদ্যোগে বিপ্লবী স্মারকগ্রন্থে লেখা দেয়ার, তখন সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদেরই নির্বাচিত বিষয়, 'দীপালি সংঘ—নারী সংগঠন থেকে বিপ্লবী সংগঠন' সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিবেশন করার চেষ্টা করছি। লীলা নাগের ছাত্রজীবন থেকে একটি সংগ্রামী মন বহু অন্যায়ের প্রতিবাদে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, যার স্বাক্ষর স্কুল জীবনে, বেথুন

কলেজে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীভর্তির সুযোগ সৃষ্টিতে, নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার আদায়ে সহ-সম্পাদিকার ভূমিকা ও অন্যান্য কাজে তার বিস্তৃত আলোচনায় আমি যাবো না। তাঁর জীবনের বিচিত্র কর্মধারা ও জীবনী নিয়ে অনেকে আলোচনা করবেন।

দীপালি সংগঠন লীলা নাগের অনন্যসাধারণ কীর্তি। ১৯২৩ সালে লীলাবতী নাগ এম এ পাস করে মেয়েদের মধ্যে কাজ করার তীব্র আগ্রহ অনুভব করেন। সমাজে মেয়েরা অবহেলিত, মর্যাদাবোধ ও শিক্ষার অভাবে মেয়েদের ওপর সামাজিক নির্যাতন তার মনকে বেদনার্ত করে তোলে। কৈশোর থেকেই মেয়েদের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। মেয়েদের মুক্তি সংগ্রামের জন্য মাত্র ১২ জন সহকর্মী নিয়ে তিনি গড়ে তোলেন 'দীপালি সংঘ'। সে যুগে মেয়েদের সংগঠিত করে কর্মে নিয়োগ করা এক অসাধ্য ব্যাপার—লীলা নাগ সেই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হলেন। দীপালি সংঘ সকল মেয়ের মধ্যে দীপের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসের পাতা উদ্‌ঘাটিত করে লীলা রায়ের বিভিন্ন পত্র ও লেখা থেকে দীপালি সংঘের প্রথম দিকের কথা জানা যায়। ঢাকায় দীপালি সংঘের প্রথম ১২ জন সদস্যের নামের তালিকাও জানা যায়। ১২ জন সদস্যের নাম নিম্নরূপ :

১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত :

1. Mrs. R. C. Roy
2. " Amal Bose
3. " M. Chaudhary
4. " Phula Gupta
5. Miss Lila Nag
6. " Miss Bina Datta
7. Miss Latika Roy
8. " Leela Roy
9. " S. Das Gupta
10. Monoroma Bose
11. Kamala Bose
12. Bina Datta

দীপালি সংঘের হিসাবের রসিদ থেকে এঁদের নাম জানা যায়। হিসাব খাতায় পরিপূর্ণ হিসাব রাখা হতো। নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে লীলা নাগ নিজে সব হিসেব রক্ষা করতেন। হিসাব অত্যন্ত নিখুঁত ছিল। প্রতি মাসের হিসাব, সদস্যের চাঁদা, সংগৃহীত অর্থের আয়-ব্যয়ে এতটুকু ত্রুটি ছিল না।

১৯২৪ সালে বঙ্গলক্ষ্মীর প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় দীপালি সংঘের সম্পাদিকা লীলা নাগের নিবেদন থেকে ঢাকার দীপালি সংঘের বিবরণে তার পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ডের পরিচয় পাওয়া যায়। দীপালি সংগঠনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় সম্পাদিকা লিখেছেন, দীপালির উদ্দেশ্য জ্ঞান-কর্ম আনন্দহীন নারী সমাজকে জ্ঞানে ও কর্মে প্রতিষ্ঠিত করে সজীব, সতেজ ও আনন্দময় জীবন গঠন করতে সহায়তা করা, রুদ্ধ

কারার নিরানন্দ পরিত্যাগ করে শতবর্ষের জড়তা বিসর্জন দিয়ে বাংলার নারী সমাজকে স্বনির্ভর করতে ও মুক্তির বাণী এই মহীয়সী নারী শুনিয়েছিলেন। দীপালি সংঘের উদ্দেশ্য সাধনে তার কর্মক্ষেত্র ছিল ব্যাপক—সমাজসেবা, শিল্প চর্চা, জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তার। সমাজসেবা বিভাগের কাজ ছিল মহিলাদের অর্থকরী শিল্প, স্বাস্থ্য ও শিল্পায়ন ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া। দীপালি সংঘ সকল স্তরের নারীদের মধ্যে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ ও প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো এবং সম্পাদিকা লীলা নাগ সারা বাংলাদেশে সুপরিচিত হয়ে উঠলেন। সকল প্রচেষ্টায় নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতনতা জাগানো এবং সামাজিক কুপ্রথা, দুর্নীতি প্রভৃতি দূর করার চেষ্টা করা। পাড়ায় পাড়ায় কেন্দ্র গড়ে উঠলো দীপালি সংঘের শাখার এবং তারই পরিচালনায় ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলো। দীপালির উচ্চমানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢাকা শহর উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো।

প্রথম দু' বছরে দেখা যায় পাঁচটি শাখা সমিতি ঢাকা শহরে নানা এলাকায় গড়ে ওঠে—যেমন : যথাক্রমে ওয়ারী, বকশীবাজার, রাজার দেউড়ী, তাঁতিবাজার ও নারিন্দা।

প্রতি সপ্তাহে একদিন করে শাখা সমিতির অধিবেশন হতো। পড়াশোনা, শিল্প শিক্ষা, বেতের কাজ, চরকায় সুতো কাটা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদান হতো। জ্ঞান ও শিক্ষা বিভাগ থেকে নানা বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা হতো। নারী সমাজকে সচেতনতার সঙ্গে অল্প ব্যয়ে সেলাই, বস্ত্র বয়ন, তাঁত, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত শিক্ষারও ব্যবস্থা হতো।

দীপালি সংঘ ও লীলা নাগ এক অভিন্ন সত্তা—লীলা নাগ গোড়াতেই শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী হয়েছেন—নারী-পুরুষের সমানাধিকারের সমস্যাটি প্রবলভাবে তুলে ধরেছেন দীপালির কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে। ঢাকায় মেয়েদের প্রথম বেসরকারি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করে লীলা নাগ তার অবৈতনিক অধ্যক্ষের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এটি 'দীপালি স্কুল' নামে পরিচিত হয়ে গেল। 'দীপালি' ইতোমধ্যে লীলা নাগের সকল কর্মোদ্যমের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরপর তিনি নারী শিক্ষা মন্দির, শিক্ষা ভবন, শিক্ষায়তন নামে কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। দীপালি স্কুল পরবর্তীকালে 'কামরুন্নেসা স্কুল' নামে পরিচিত হয়। এদের মধ্যে নারী শিক্ষা মন্দির,—বয়স্ক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, শিল্পকলা প্রভৃতি নানা বিভাগ খুলে একটা নতুন ধরনের শিক্ষা প্রবর্তনের আদর্শ তিনি এখানে স্থাপন করেন। নারী শিক্ষা মন্দির ঢাকা শহরে অন্যতম বৃহৎ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় বর্তমানে "শেরে বাংলা বিদ্যালয়" নামে পরিচিত। ১৯৭১ সালে এই বিদ্যালয়টি দেখার সুযোগ হয়েছিল বর্তমান লেখিকার।

লীলা নাগ এই দীপালি সংঘকে কেন্দ্র করে ঢাকা শহরের সর্বস্তরের মহিলাদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। ঢাকার বিশিষ্ট অধ্যাপক ও তাঁদের সহধর্মীনিদের পৃষ্ঠপোষকতা তিনি লাভ করেছিলেন। সে যুগে অধ্যাপকদের স্ত্রীদের এগিয়ে আসা

এক অসাধারণ ব্যাপার। এঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী ড. জ্ঞান ঘোষ ও ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদাদের নাম উল্লেখযোখ্য।

বাংলা ও আসামের বিভিন্ন শহরে দীপালি নাম দিয়ে কয়েকটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। ঢাকা শহরে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের আগমন হলে 'দীপালি' তাদের অভ্যর্থনা জানাত—এরকম কয়েকটি অনুষ্ঠানের কথা জানা যায়। ১৯২৬ সালে দীপালির পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে আয়োজিত সভা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। রবীন্দ্রনাথকে তাঁরাই প্রথম অভিনন্দন দেন। এই মহতী সভা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সমগ্র এশিয়ায় এরকম সুশৃঙ্খল মহিলা সভা আর দেখি নি।" এই মহতী সভার উল্লেখ করে প্রবাসী পত্রিকায় লেখা হয়, "কবি সাতিশয় প্রীত হন এবং বলেন, তিনি অন্য কোথায়ও একত্র সংবর্ধিত এতোজন মহিলার অভিনন্দন পান নি" (বিবিধ প্রসঙ্গ, মাঘ, ১৩৩২)। রবীন্দ্রনাথ লীলাবতীকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি শান্তিনিকেতনের কাজের ভার নিতে সম্মত আছেন কি না। কিন্তু সে সময় থেকেই লীলা নাগের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক রূপান্তর দেখা যায়। তখন ঢাকাতেই কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত করায় রবীন্দ্রনাথের সে অনুরোধ রক্ষার অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। গুরুসদয় দত্ত তাঁকে কলকাতায় এসে 'সরোজিনী নারীমঙ্গল সমিতির' ভার নিতে বলেন। একই কারণে তিনি সে ভার নিতেও রাজি হন নি।

১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য একটি সভা আহ্বান করা হয়। মহিলারা দেশবন্ধুর জীবনী পাঠ ও তাঁর অপূর্ব দেশপ্রেম সম্পর্কে আলোচনা করে শোকসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯২৬ সালে দীপালি মহাত্মা গান্ধীকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের আয়োজন করে। তিন হাজার মহিলার সমাবেশে তাঁকে সংবর্ধিত করা হয় এবং তাঁকে দশ সের সুতো উপহার দেয়া হয়। ৩০ জন মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা সভার শৃঙ্খলা রক্ষা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী দীপাসি সংঘের কার্যাবলি দর্শনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

দীপালি কর্তৃক আয়োজিত এই সকল অনুষ্ঠান ব্যতীত আরও সভা-সমিতির ব্যবস্থা করা হয়। তার মধ্যে "নারীর সমানাধিকার" সম্পর্কে আলোচনা সভা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "নারীকে ও রাজনীতি ক্ষেত্রে সমান অধিকার দেয়া উচিত"—এই মর্মে আলোচনা হয় এবং গৃহীত প্রস্তাবসমূহ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করা হয়।

দীপালির কর্ম প্রণালী ও সভা-সমিতির বিবরণ পাঠ করলে বিস্ময় জাগে। ৭৫ বছর পূর্বে এই ধরনের মহিলা সভার আয়োজন এবং আলোচনা সভায় বিপুল সংখ্যক মহিলার উপস্থিতি যা আজকের যুগে চেষ্টা করেও সম্ভব হয় না। মহীয়সী লীলা নাগের অসাধারণ সংগঠনী শক্তির প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছে। নারী আন্দোলনের পথিকৃৎরূপে ইতিহাসের পাতায় তিনি চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

দীপালি সংঘের কার্যাবলির মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি—দীপালি কর্তৃক আয়োজিত প্রদর্শনী। বর্তমানে প্রদর্শনীর ছড়াছড়ি—শহরে, গ্রামে গ্রামে

সবসময় প্রদর্শনী লেগেই আছে; কিন্তু দীপালি যে যুগে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে তখন সারা ভারতবর্ষের কোথায়ও তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। নানা ধরনের বিক্রয়যোগ্য সম্ভার নিয়ে এসেছেন মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা। চারুশিল্প, কারুশিল্প ও বস্ত্রশিল্পের সম্ভার তো ছিলই। সব রকম পণ্যই দীপালি সংঘের বিভিন্ন কেন্দ্রের সদস্যদের তৈরি; কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে সবচাইতে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো দীপালি সংঘের কয়েকজন মহিলা সদস্যের তৈরি খাবার। ঢাকার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডা. সুরেশচন্দ্র গুপ্তের কন্যা গিরিবালা গুপ্তের তৈরি রকমারি খাবার বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল—এই গিরিবালা গুপ্ত সকলের কাছে 'গিরিজী' নামে পরিচিত। গিরিজীর তৈরি খাবার ছাড়াও তার তৈরি জ্যাম, জেলি, আচার প্রদর্শনীর ক'দিন প্রচুর বিক্রি হতো। আজকের যুগে প্রদর্শনীতে এসব তো স্বাভাবিক। কিন্তু সেই যুগে দীপালির এই প্রদর্শনীটি ছিল ঢাকার নারী সমাজের সামাজিক অবরোধ থেকে আত্মপ্রকাশের গবাক্ষ বিশেষ। মহিলাদের হাতে তৈরি করা জিনিসও সেই পণ্য ক্রেতাদের কাছে অবাধে হাজির করার আনন্দ তো ছিলই। তার সঙ্গে যুক্ত হতো আরেক মাত্রা। যারা তৈরি করতেন তারা সকলেই মহিলা আর পণ্য যারা ক্রয় করতেন তাদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই ছিল অধিক। দুয়ের আত্মপ্রকাশের অপ্রতিহত সুযোগ ঘটতো এই প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীর আবেদন কয়েক বছর পর কেবল ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল না—পূর্ববঙ্গের সীমানা ছাড়িয়ে পশ্চিম বাংলাতেও ছড়িয়ে পড়ে। দীপালি সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী ১২ জন মহিলার বাইরেও দীপালি সংঘের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় সদাজাগ্রত ছিলেন সর্ববিষয়ে লীলা নাগের অন্তরঙ্গ সহকর্মী বিভামতী সেন। দীপালির সংগঠনগত সকল কাজে বিভা সেনের অবদান তুলনাহীন। বহুজনের মধ্যে অপর এক উচ্চশিক্ষিত মহিলা উষারাণী রায় যিনি শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চপর্যায়ের সরকারি শিক্ষিকার পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সরকারি উচ্চপদের হাতছানি, সরকারি পদের বেতন, পেনসন ইত্যাদির সম্ভাবনা দু'হাতে ঠেলে সরকারি কাজে ইস্তফা দিয়ে অনেক কম বেতনে চাকরি জীবনের অনিশ্চিতির ঝুঁকি নিয়ে দীপালি সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। লীলা নাগের প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষা মন্দিরের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর ভারপ্রাপ্ত হয়ে তিনি ঢাকায় এলেন। আর বাসস্থান করে নিলেন বিভা সেনের পরিচালনায় স্কুলের ছাত্রীদের আবাসিকার অন্যতম সদস্যরূপে। বিশ দশকের উপান্তে তিনি দীপালি সংঘের সম্পাদিকার দায়িত্বভার নিয়ে দীপালি প্রদর্শনীর আহ্বায়িকার এবং পরিচালনার ভারও গ্রহণ করেন। উষা রায় সকলের কাছে 'রাঙ্গাদি' নামে পরিচিত। সকলের কথা উল্লেখ করতে না পারলেও গিরিদি, বিভাদি ও রাঙ্গাদির নাম দীপালির অনুষঙ্গরূপে এসেই যায়।

দীপালি সংঘের সভা-সমিতি ও প্রদর্শনীর কাজে ও প্রয়োজনে বিপ্লবী সংগঠন 'শ্রীসংঘে'র সহযোগিতা ও আনুকূল্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোপন বিপ্লবী দলের সংগঠক নেতা অনিল রায় ছিলেন লীলা নাগের প্রতিবেশী ও সহপাঠী।

দীপালি সংঘের প্রতিষ্ঠা থেকেই নানা কাজে অনিল রায়ের সহযোগিতা দীপালিকে উন্নীত করে।

সমাজসেবা ও লোকশিক্ষার আপেক্ষিকভাবে মসৃণ পথে চলতে চলতে সকলের অলক্ষ্যে লীলা নাগ বিপ্লবের বন্ধুর পথে পা বাড়ালেন। ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সাল এই চার বছরের মধ্যে বিরাট পরিবর্তন এলো। দীপালি সংঘের লক্ষ্য ও আদর্শ এবং কার্যক্রমে রূপান্তর ঘটলো। তিনি অনুভব করলেন নারী সমাজের মুক্তি জাতীয় মুক্তি ব্যতীত সম্ভব নয় এবং রাষ্ট্রীয় মুক্তি ছাড়া নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তির মুক্তি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অনিবার্যভাবে জাতীয় মুক্তির অনুষঙ্গ রূপে বিপ্লববাদকে তিনি গ্রহণ করে নিলেন। সেই সময়ে নানা জীবন জিজ্ঞাসায় তিনি উদ্বিগ্ন। জাতীয় আন্দোলনে হিংসা-অহিংসার সমস্যা, কোন পথ শ্রেয়—অহিংস অসহযোগ না বিপ্লব, রাজনৈতিক দলের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে গোপন সংগঠন, মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের পথে অন্তরায় হবে কি না ইত্যাদি নানা প্রশ্নের মীমাংসা খোঁজেন। অনিল রায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। এই পারস্পরিক আলোচনার পরিণতিতে লীলা নাগের কাছে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনাদর্শ অবারিত হয়ে গেল। লীলা নাগ বিপ্লবী দল 'শ্রীসংঘে' যোগ দিলেন এবং শ্রীসংঘে তিনি জনপ্রিয় নেত্রীরূপে অধিষ্ঠিত হলেন অচিরাৎ। ৭৫ বছর পূর্বে সংগঠিত এই ঘটনায় দেশের লোক বিস্মিত হয়েছিল। দীপালি সংঘ মেয়েদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির স্নেহধন্যা ব্রাহ্ম সমাজের প্রিয়দর্শিনী, দীপালি সংঘের একচ্ছত্র নেত্রী—এ হেন লীলা নাগের বিপ্লবী দলে যোগদান ভারতের বিপ্লববাদের ইতিহাসে এক অসাধারণ ও ঐতিহাসিক ঘটনা।

দীপালি সংঘের বৈপ্লবিক রূপান্তরের পূর্বে ১৯২৬-২৭ সালে লীলা নাগ দীপালি ছাত্রী সংগঠন, গড়ে তোলেন। ১৯৩০ সালে গোয়াবাগানে গড়ে ওঠে ছাত্রীভবন। ছাত্রী চাকরিজীবী মহিলা এই আবাসিকায় স্থান পেলেও প্রধানত এটি দীপালি সংঘের সঙ্গে সম্পর্কিত বিপ্লবী দলের মহিলা কর্মীদের মিলন কেন্দ্র ছিল। তার সহকর্মী রেণু সেন ছাত্রীভবন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বিপ্লবী দল শ্রীসংঘে যোগদানের অল্পকালের মধ্যেই তিনি নেত্রী পর্যায়ে উন্নীত হলেন। এখন শুধু মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, কর্মসূচির প্রয়োগ কাছ থেকে কাজ নয়—দলের ছেলেরা নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনায় রত হতেন। তাঁর সঙ্গে ছেলেরা কাজের নির্দেশ নিয়ে যাচ্ছেন। বিপ্লবী দলে নারী নেতৃত্বের কথা ইতোপূর্বে শোনা যায় নি। নারী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় অন্তরায়ও ছিল। সমাজের উচ্চস্তরে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্বীকার করে নেয়া কঠিন ছিল; কিন্তু লীলা নাগের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং সহজাত নেতৃত্ব বিপ্লবী দলে সহজেই প্রতিষ্ঠা পেল। ১৯২৮ সালে কলকাতার কংগ্রেসের পর বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন সমগ্রভাবে জাতীয় আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হলো। লাহোর জেলে ততোদিনে

অনশনের পর বিপ্লবী যতীন দাস আত্মাহুতি দিলেন। কলকাতায় মনুমেন্টের তলায় সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর পুলিশের লাঠি চালনা চললো। এই ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা শহরে বিরাট মহিলা শোভাযাত্রা বের হয়। মহিলাদের এতো বড় উদ্বেলিত জনসমুদ্র ভারতবর্ষে ইতোপূর্বে আর দেখা যায় নি। গণআন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলন যুক্ত হয়ে গেছে। গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় অনেকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হলো যে তার দেশসেবার এটাই পথ। ১৯৩০-এ ঢাকায় তার নেতৃত্বে গঠিত হলো মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি। উক্ত কমিটির উদ্যোগে মহিলারা লবণ আইন ভঙ্গ করে সত্যাগ্রহে যোগ দেন। তার বিপ্লবী কার্যাবলির সঙ্গে সাধারণ মানুষ তখন অপরিচিত।

বাংলার বিপ্লবীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন বৈপ্লবিক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার কিছুকাল পরে বিপ্লবের সঙ্কেত জানিয়ে দিয়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক কর্ম সম্পন্ন হলো। পরে বিপ্লবী দলের নেতারা একের পর এক বন্দি হলেন। শ্রীসংঘের নেতা অনিল রায় ও তাঁর সহকর্মীরা অনেকে গ্রেফতার হন। অনেকে আত্মগোপন করেন। অতঃপর লীলা নাগের ওপর দলের সর্বময় কর্তৃত্ব এসে পড়ে। দীপালি সংঘ ও ছাত্রীসংঘের যোগাযোগে একদিকে যেমন এই সময় দলে দলে মেয়েরা লীলা নাগের নেতৃত্বে বিপ্লবী দলে যোগ দেন, তেমনি অন্যদিকে সহকর্মীদের সঙ্গে বোমা-ফর্মুলার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আলোচনা, আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের জন্য কলকাতা ও ঢাকায় আসা-যাওয়া—দ্রুততালে তিনি তার বৈপ্লবিক কর্ম সম্পন্ন করছেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার দলের বিপ্লবীরা আগ্নেয়াস্ত্রের দাবি নিয়ে ঢাকায় লীলা নাগের কাছে আসছেন। তাদের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে—কে কার আগে অস্ত্র সংগ্রহ করবেন। লীলা নাগ প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধান করে বিভিন্ন কেন্দ্রে অস্ত্র দেয়ার ব্যবস্থা করেন। আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে চট্টগ্রামের বিপ্লবী শ্রীমতী ইন্দুমতি সিংহ বিশেষ সহায়তা করেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের অন্যতম সদস্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, দীপালি সংঘের প্রাক্তন সদস্যা, আত্মদান করে শহীদ হলেন। ১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লায় দুই বিপ্লবী মহিলা শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করেন।

২০ ডিসেম্বর (১৯৩০) দীপালি প্রদর্শনীর কাজ সেরে শ্রান্ত দেহে বাড়ি ফেরার পর সেই রাতেই লীলা নাগ গ্রেফতার হন। তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী রেণু সেন একই সঙ্গে গ্রেফতার হন। লীলা নাগ ভারতবর্ষে বিনাবিচারে আটক প্রথম মহিলা রাজবন্দি। লীলা নাগের গ্রেফতারের পর আরও অনেক মহিলা সহকর্মী বন্দি হন এবং বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭-এর অক্টোবর পর্যন্ত লীলা নাগ ঢাকা, রাজশাহী, সিউড়ী, মেদিনীপুর বন্দিশালায় আটক থাকাকালে সরকারের অন্যায় নিপীড়নের বিরুদ্ধে বেশ ক'বার অনশন করেন।

১৯৩৭ সালে কারামুক্তির পর স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেন, গুপ্ত বিপ্লব পন্থার যুগ তখন শেষ হয়েছে। সংগঠনী প্রতিভা লীলা নাগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ১৯২০-৩১ সাল পর্যন্ত বাংলার নারী জাগরণের আন্দোলনে লীলা রায়ের অবদান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। ১৯৩১ সালে লীলা নাগের অপূর্ব কীর্তি মহিলা সমাজের মুখপত্র 'জয়শ্রী' আত্মপ্রকাশ করে। যে জয়শ্রী পত্রিকার প্রকাশ বৃটিশ সরকার বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কারামুক্তির পর ফিরে এসেই পত্রিকা আবার নবরূপে প্রকাশ পেল।

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রারম্ভে দলে যে আদর্শের সংঘাত শুরু হয়, লীলা রায় ও অনিল রায় সেই প্রশ্নে সুভাষ বসুকে সমর্থন করেন। ভারতের খ্যাতনামা বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসংঘ সুভাষ প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দেয়। সুভাষের আদর্শ প্রচারের কর্মযজ্ঞে নিজেদের সমর্পণ করে। দীপালির অনুকরণে ঢাকা শহরে লীলা রায় মেয়েদের সংগঠিত করার জন্য ১৯৪১ সালে '41 club' প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা নাম "যুগদাবী চক্র"-এই সংগঠনটি উদ্বোধন করেন বিখ্যাত দার্শনিক স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ। 'শিক্ষাভবন' বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শৈল সেন, পরবর্তীকালে কলিকাতার নামী বিদ্যালয় শিক্ষা বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষয়িত্রী, শান্তি বসু (পরবর্তীকালে সরকারি কলেজের অধ্যক্ষা ও পরে ডি ডি পি আই), বিশিষ্ট অধ্যাপক জ্ঞান চৌধুরীর কন্যা অমিতা চৌধুরী, রমা সেন, সুলতা ঘোষ (পরে চৌধুরী), ফুলু চৌধুরী, আরও অনেকে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, ড্রিল, প্যারেড, রিভলবার চালানো শেখানো হতো। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এই সংগঠন পুলিশের নজর এড়াতে পারে নি—পুলিশের রোষানলে শিগ্‌গিরই এই সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। ছাত্রজীবনে এই সংগঠনের সঙ্গে আমাদেরও পরিচয় হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর তাঁর সম্পর্কে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লীলা রায় সোচ্চার হয়ে ওঠায় ১৯৪২-এ তিনি আবার বন্দি হন। জীবনে বারবার তাঁকে কারাবাসে কাটাতে হয়েছে। ১৯৪২-এর আন্দোলনে তাঁর সঙ্গে শ্রীসংঘ ও ফরোয়ার্ড ব্লকের বহু কর্মী বিপ্লবী হেলেনা দত্ত, আশা রায়, শৈল সেন, উমা দেবী, ছায়া গুহ, প্রভা মজুমদার, লাবণ্য প্রভা সেন, গৌরী সেন প্রমুখ কারারুদ্ধ হন। ১৯৪২-৪৬ সালে জেল জীবনেও মেয়েদের সংগঠিত করার ইতিহাস দেখা যায়। মেয়েদের সংগঠিত করা তার সারা জীবনের সাধনা। পরাধীন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের এবং নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ লীলা রায় অবিভক্ত বাংলার নারীমুক্তির সংগ্রামে অত্যুজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেন। নারীমুক্তির সংগ্রামের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিশের দশকে দীপালি সংঘের প্রতিষ্ঠা। মধ্য চল্লিশে পরিবর্তিত সমাজ পরিবেশেও তাঁর প্রতিপূরণ হয় নি। রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের বৃহত্তর বৈপ্লবিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দানের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বিপ্লবী দেশনেত্রী নারী সমাজের বঞ্চনার কথা কখনও ভোলেন নি। তাই কারামুক্তির পরই ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'জাতীয় মহিলা সংহতি'। দীপালি সংঘের দীপ আবার নতুনভাবে প্রজ্বলিত

হলো জাতীয় মহিলা সংহতির মাধ্যমে। ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত এই সংহতির সভানেত্রী লীলা রায়, সহ-সভানেত্রী অধ্যাপিকা নলিনী মিত্র, সম্পাদিকা আনোয়ারা খাতুন ও বহু গণ্যমান্য মহিলা জড়িত হয়ে ঢাকায় শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে লীলা রায় অক্লান্ত চেষ্টায় ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান মহিলাদের সংগঠিত করে বিরাট শান্তি মিছিল বের করেন। সেই মিছিলে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়ায় আজও নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করি। আন্দোলনের মাধ্যমে নারী সমাজের সার্বিক মুক্তি-প্রয়াস সমাজ বিপ্লবের বৃহত্তর ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করে দেয়াই ছিল জাতীয় মহিলা সংহতির প্রধান লক্ষ্য। বিশ দশকের শেষে নারী সমাজের সংগ্রামের প্রয়োজন শেষ হয় নি। বর্তমানের জটিলতর পরিস্থিতিতে তা আরও ব্যাপক ও তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কলকাতায় ও বাংলার বিভিন্ন জেলায় জাতীয় মহিলা সংহতি ব্যাপক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। লীলা রায় সভানেত্রী, শৈল সেন সম্পাদিকা। কর্মপরিষদে অনেক খ্যাতনামা মহিলা যুক্ত হন। লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল স্নিগ্ধ-প্রভা মিত্র, বিখ্যাত চিকিৎসক ডা. কনক বীণা দাশ গুপ্তা, কল্যাণী ভট্টাচার্য, লেক গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী সুষমা সেনগুপ্ত, সমাজসেবী কল্যাণী ভট্টাচার্য, বিপ্লবী হেলেনা দত্ত, আশা রায়, হাসিকণা রায়, লাবণ্য প্রভা বসু, ছায়া গুহ, উষা রায়, সুলতা গুহ চৌধুরী, বামনা গুহ, আগমনী লাহিড়ী, গীতা বসু মল্লিক, বন্দনা সেন, কণা রায়, রেণু ঘোষ, গৌরী দত্ত, শোভা ঘোষ, নীলিমা কুমার, ইন্দু ভট্টাচার্য, ছবি গাঙ্গুলী, সুস্মিতা শিকদার, সাগরিকা ঘোষ ও আরও অনেকে। জাতীয় মহিলা সংহতির আবেদন দীপালির মতো সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হয় এবং বহু বিশিষ্ট মহিলা 'জাতীয় মহিলা সংহতি'র সম্মেলনে ও লীলা রায় স্মৃতিসভার আহ্বানে সাড়া দেন। বিশিষ্ট মহিলা অধ্যাপিকা শান্তি সুধা ঘোষ, পুষ্পময়ী বসু, ডা. রমা চৌধুরী, বাণী রায়, চারুশীলা দেবী, রাধারানী দেবী, প্রিন্সিপাল নলিনী দাশ, প্রভা দত্ত, আশাপূর্ণা দেবী, উমা দেবী, কমলা দাশগুপ্তা, লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, জ্যোতির্ময়ী দেবী, রেণুকা রায়, ডা. ফুলরেণু গুহ প্রমুখ।

'জাতীয় মহিলা সংহতি'র কথা উল্লেখ করার কারণ, দীপালি সংগঠনের কথা লিখতে বসে আজ এ কথাই মনে হয়েছে—দীপালির আদর্শ ও কর্মপন্থার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে জাতীয় মহিলা সংহতি। বিশ দশকের শেষ পর্যায়ে সহস্রাব্দের প্রথমে নারী সমাজের সংগ্রামের প্রয়োজন আজও শেষ হয় নি। বর্তমান জটিলতর সমাজ পরিস্থিতিতে তা আরও ব্যাপক এবং তীব্রতর হয়ে উঠেছে। জাতীয় মহিলা সংহতি প্রতিষ্ঠাত্রী লীলা রায়ের আদর্শ ও সঙ্কল্পকে রূপায়িত করার জন্য সেবা ও সংগ্রামের কাজ আজও সাধ্যমতো করে যাচ্ছে। দীপালি সংগঠন ও জাতীয় মহিলা সংহতি অভিন্ন সত্তা।

লীলা রায়

ফুলরেণু গুহ

লীলা রায়ের সঙ্গে কবে কিভাবে প্রথম আলাপ হয়েছিল আজ আর তা আমার ঠিক মনে নেই, তবে তাঁর সঙ্গে আমার, বিশেষ করে আমার স্বামীর, যথেষ্ট পরিচয় ছিল। বয়সে তিনি আমার চেয়ে বড় ছিলেন অনেকটাই। আর আমাদের মতো মেয়েদের কাছে তখন তিনি ছিলেন সাহস, প্রত্যয়, নিষ্ঠা ও ত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নোয়াখালির দাঙ্গার সময়ে আমরা দু'জনেই গেছিলাম ত্রাণের কাজে। তখন একটা গোটা দিন এবং রাত তাঁর সঙ্গে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। খুব কাছ থেকে তখন তাঁকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। নানা রকমের কথা হয়েছিল সেদিন তাঁর সঙ্গে। তাঁর কথা, কাজ, ব্যক্তিত্ব ছিল মুগ্ধ হয়ে থাকার মতো।

আসামের গোয়ালপাড়ায় তাঁর জন্ম হয়েছিল আজ থেকে একশো বছর আগে ২রা অক্টোবর তারিখে। ছোটবেলা থেকেই বরাবর লেখাপড়ায় ছিলেন সবার সেরা। সেদিনের অবিভক্ত বাংলায় ঢাকার ইডেন হাই স্কুলে তাঁর ছাত্রীজীবন শুরু হয়। কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে ১৯২১ সালে বি. এ. পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতক হন এবং পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ করেন। আর তার দু'বছর পর ইংরেজিতে এম. এ. পাস করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তিনিই হলেন এম. এ ক্লাসের প্রথম এবং একমাত্র ছাত্রী। তাঁর পাণ্ডিত্যের চেয়েও বেশি আকৃষ্ট করতো তাঁর অসামান্য নিরলস জনসেবা, আর বিশেষত নারী-চেতনা প্রসারে তাঁর সক্রিয় প্রয়াস ও বিবিধ উদ্যোগ।

যে বছর তিনি বি. এ পাস করেন, সে বছরই মেয়েদের ভোটের অধিকার সম্বন্ধে মতামত জানানোর জন্য বাংলাদেশে যে 'নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার সমিতি' গঠিত হয়, লীলা নাগ ছিলেন তার সহকারী সম্পাদিকা।

নারী শিক্ষা প্রসারে তাঁর ছিল অসামান্য অবদান। এম. এ. পাস করার কয়েক

বছরের মধ্যেই তিনি নিজের উদ্যোগে ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠা করেন মেয়েদের একটি হাই স্কুল। সে সময়ে ঢাকার মেয়েদের জন্য সরকারি স্কুলটি বাদ দিলে এটিই ছিল মেয়েদের আর একমাত্র হাই স্কুল।

১৯২৩ সালে মাত্র বারোজন সতীর্থকে সঙ্গে নিয়ে লীলা নাগ গড়ে তোলেন 'দীপালি সংঘ'—মেয়েদের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য এক অভিনব কেন্দ্র। ঢাকার আশপাশে বিভিন্ন পাড়ায় ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হতো দীপালি সংঘের উদ্যোগে। মেয়েদের স্বাবলম্বী করার জন্য হস্তশিল্প শেখার ব্যবস্থা, মেয়েদের উদ্যোগে নানা জনহিতকর কাজের ব্যবস্থা প্রভৃতিও ছিল দীপালি সংঘের নানা কাজের অন্যতম। বাৎসরিক দীপালি প্রদর্শনীতে মেয়েদের পরিচালিত এবং তাদের তৈরি শিল্পসামগ্রীর প্রদর্শনী হতো প্রতিবছর। এছাড়া, আরো যে প্রায় ৬-৭টি মেয়েদের হাই স্কুল লীলা নাগ প্রতিষ্ঠা করেন, তার কোনো কোনোটি (ভিন্ন নামে) আজও ঢাকা শহরে হাজার হাজার মেয়েদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিতরণ করে চলেছে।

যে কথা না বললে লীলা নাগের পরিচয় সম্পূর্ণ হবে না তা হলো তাঁর বিপ্লব চেতনা ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। ঢাকা ও কলকাতায় ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর তিনি মহিলা সমিতি গঠন করে মেয়েদের মধ্যে লাঠিখেলা, ছোরা খেলা ইত্যাদি প্রচলন করেন। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরেন।

১৯৩০ সালে গান্ধীজীর ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তাঁর নেতৃত্বে ঢাকায় 'মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি' গঠিত হয়। এই সময় বিপ্লবী দলেরও তিনি নেতৃস্থানীয়া ছিলেন। সে সময় গান্ধীজীর আদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন শত শত মহিলা। কিন্তু লীলা নাগের বৈশিষ্ট্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই আপাত-বিরোধী ধারা—গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ এবং নেতাজীর সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন—দুয়েতেই তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বস্তুত, তৎকালে বাংলার বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রীসংঘের শ্রী অনিল চন্দ্র রায়ের সান্নিধ্যে এসে লীলা নাগ শ্রীসংঘে যোগদান করেন এবং উত্তরোত্তর বিপ্লবী কার্যকলাপে জড়িত হন। এই সময়েই (১৯৩৯ সালে) তাঁদের বিবাহ হয় এবং উভয়েই ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী আন্দোলনে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

মোটামুটিভাবে ১৯২৩ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত প্রায় এক দশক জুড়ে বাংলার নারী জাগরণের আন্দোলনে লীলা নাগের অবদান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে।

১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তাঁকে উপর্যুপরি সিউড়ি, মেদিনীপুর ও হিজলী জেলে বন্দী করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে ১৯৩১ সালে তিনি 'জয়শ্রী' নামে মহিলা সমাজের মুখপত্র প্রকাশ করা শুরু করেন। কারামুক্তির পর এই পত্রিকা নব কলেবরে নতুন উদ্যমে তিনি পুনঃপ্রকাশ শুরু করেন।

এই পত্রিকার নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম সংখ্যার জন্য জয়শঙ্খ আঁকা প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ছাপার জন্য পাঠিয়েছিলেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর শান্তিনিকেতনের শিল্পীরা ছবি পাঠিয়েছিলেন অলঙ্করণের জন্য। ১৯৪০ সালে তিনি নেতাজী সুভাষের অনুরোধে তাঁর প্রবর্তিত সাপ্তাহিক 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ইতোমধ্যে তিনি নেতাজীর সভাপতিত্বে গঠিত 'জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি'র অধীন মহিলা সাব-কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে বহু সভা-সমিতি, সম্মেলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। কখনো নিষ্ক্রিয় বসে থাকার মানুষ ছিলেন না লীলা রায়। ইংরেজ শাসনের প্রকাশ্য বিরোধিতার জন্য ১৯৪২ সালে তিনি আবার গ্রেফতার হন এবং চার বছর দিনাজপুর জেলে আটক থাকেন। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি জাতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ভারতীয় সংবিধান রচনায় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৪৬ সালে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে বৃটিশ বিভেদ-নীতির উস্কানিতে কলকাতায়, বিহারে, নোয়াখালিতে পর পর যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়, সে সময় লীলা রায় ছুটে গিয়েছিলেন দুর্গতদের ত্রাণে, সেবা ও সাহায্যের জন্য। তৈরি করেছিলেন 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইন্‌স্টিটিউট'। সে সময়কার একদিনের জন্য তাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের কথা দিয়ে এ লেখা শুরু করেছিলাম। আজ তাঁর শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে তাঁর সেই দৃপ্ত, তৎপর, সংবেদনশীল, স্নেহশীলা প্রতিমূর্তি ভেসে উঠেছে মনের মধ্যে।

শেষ বয়সে উপর্যুপরি কঠিন রোগের আঘাতে শয্যাশায়ী হওয়ার আগ পর্যন্ত চিন্তায়, ভাবনায়, কর্মে তিনি কত হাজার হাজার নারী-পুরুষের প্রেরণাদাত্রী হয়েছিলেন তা বলা বাহুল্য—তা সে উদ্বাস্তু সেবা ও পুনর্বাসনই হোক, চাকরিরতা মেয়েদের আবাসনই হোক বা দুস্থ মেয়েদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠাই হোক। এছাড়া, শুনেছিলাম, তিনি ছবি আঁকতেন ভালো, গান-বাজনাও করতেন আর নানারকম রাঁধতে ভালোবাসতেন।

পরিশেষে বলি, ওঁর চেয়ে বড় মহিলা সংগঠক আমি এই ৮৮ বছরের জীবনে আজ অবধি দেখি নি। ওঁর উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায় এত বড় মহিলা সংগঠন গড়ে উঠেছিল, যার কোনো তুলনা পাওয়া যায় না। সে সব সংগঠনের সেদিনের সদস্যরা আজও তাঁকে স্মরণ করে, তাদের প্রিয়, শ্রদ্ধেয় 'দিদি'র কথা বলতে গিয়ে অভিভূত এবং বিচলিত হয়ে যায়। এমনই ছিল তাঁর সংগঠনের জন্য নিষ্ঠা, আন্তরিকতা আর উৎসর্গ। আর, এ সবই তিনি আহরণ করেছিলেন জীবন থেকে, মানুষের থেকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে সুভাষচন্দ্র ও বাংলার বিপ্লবী

ক্ষ ণে শ্ব র ঘো ষা ল

উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে, ভিন্ন ভিন্ন রক্ত, ভাষা, পোশাকের বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্য আত্মসাতের মধ্য দিয়ে চলেছে ভারতের ইতিহাস মনীষা। কোনো দেশের ঐতিহ্যের অগ্রগতির প্রবাহ এগিয়ে চলে মানবতার সমুদ্রতটে মিলিত হতে। ভারতের হিন্দুসভ্যতার সংস্কৃতিতে যুক্ত হয়েছে মুসলিম সভ্যতার অবদান। মুসলিম আগমনের আবির্ভাব হয়েছিল বিজয়ী শক্তিরূপে; কিন্তু তাঁরা ভারতবর্ষকে গ্রহণ করেন আপন বাসস্থানরূপে। তাঁরা সুখে-দুঃখে হয়ে গেলেন এখানকার স্থানীয় জনগণের সাথী। শিল্পকলার বিকাশে, সঙ্গীতচর্চায় তাঁরা বাড়িয়ে তোলেন সংস্কৃতির উৎকর্ষ। তাঁদের রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন স্বৈরতন্ত্রী হলেও তাঁদের প্রশাসন গ্রামভারতের স্বশাসিত পঞ্চায়েতী কাঠামোয় এবং জনগণের দৈনন্দিন জীবনচর্চায় হস্তক্ষেপ করে নি।'[১] সুভাষচন্দ্র বলেছেন, বৃটিশ আগমনের সঙ্গে এলো নতুন এক ধর্ম, নতুন সংস্কৃতি, নতুন সভ্যতা, যা ভারতীয় সংস্কৃতি সভ্যতার সঙ্গে ঐক্য চাইলো না। তারা প্রভুত্বের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিল ভারতবাসীর বুকে। ভারতবাসী দেখলো একটি বিদেশি জাতি ভারতের মাটিতে রাজনৈতিক আর্থিক সাংস্কৃতিক আধিপত্য স্থাপনে তৎপর। গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হলো তাদের করাল আক্রমণ, সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলো বিধ্বস্ত করতে। ফলে এক বর্গফুট জমিতেও রইলো না ভারতীয়দের স্বাধীনতার লেশ। এর ওপর বৃটিশ ধর্ম-প্রচারকগণ প্রচার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থায় এবং প্রশাসনে ভারতকে ইংরেজি ধাঁচে গড়ে তোলার সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হলেন। নতুন ধর্ম, সংস্কৃতি তাকে গ্রাস করতে উদ্যত—এই আশঙ্কায় ভারতের অন্তরাত্মা হলো বিদ্রোহী।[২] এই বিদ্রোহই একদিন জাতীয় আন্দোলনের পথ বেয়ে রূপ নেয় বৃহত্তর সংগ্রামের, যার পরিণতি ঘটে আজাদ হিন্দ্ বিপ্লবে- স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষপর্বে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সুবাদে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ইংরেজরা ভারতের মাটিতে পা রাখার জায়গা করে নেয়। তারা ইংল্যান্ডরাজের কাছ থেকে সনদ লাভ করে বাণিজ্যে একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়। প্রশাসনিক কর্তৃত্ব লাভে তৎপর হলে স্থানীয় শাসকবর্গের সঙ্গে তাদের অনিবার্য সংঘর্ষ ঘটে। বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাত এই ক্ষমতাদ্বন্দ্বের প্রধান দিকচিহ্নরূপে প্রতিভাত। নানা কৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতায় ১৭৫৭ সালের ১২ জুন পলাশির প্রান্তরে পরাজয় বরণ করতে হয় সিরাজকে। যুদ্ধজয়ী ক্লাইভ প্রথমে মীরজাফর পরে মীর কাশিমকে সিংহাসনে বসান। তাঁরা অবশ্য ছিলেন পুতুল নবাব, নেপথ্যে প্রশাসন চালিয়েছেন ক্লাইভ স্বয়ং। ক্ষতিপূরণের অজুহাতে এঁদের কাছ থেকে প্রভূত অর্থ আদায় করেন ক্লাইভ। বাণিজ্যে বাধাহীন দস্যুবৃত্তি করে তাঁরা ইংল্যান্ডে পাচার করেন কোটি কোটি মুদ্রা।

১৭৬৫-তে দিল্লির দুর্বল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ইংরেজ লাভ করে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি। ইংরেজ কোম্পানি রাজস্ব আদায়ের সার্বিক অধিকারের সঙ্গে লাভ করে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব।[৩] ১৭৭২ সালে (বাংলা ১১৭৬) ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে বাংলায় প্রাণবলি হয় লক্ষ লক্ষ মানুষের। এর প্রেক্ষাপটে ঘটে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। ১৭৭৩ সালে লর্ড নর্থের রেগুলেটিং আইনে বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রশাসনকে একজন গভর্নর জেনারেলের অধীনে স্থাপন করে ইংরেজ তার অবস্থান করে সুদৃঢ়। এদের প্রধান কার্যালয় হলো অবশ্য বাংলায়। ইংরেজ অত্যাচারের বিরোধী নন্দকুমারকে ১৭৭৫ সালের ৫ আগস্ট জাল দলিলের মিথ্যা অপবাদে প্রকাশ্যে ফাঁসি দিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস বুঝিয়ে দিলেন তাঁদের নৃশংসতার প্রতিবাদ করার অধিকার কারো নেই। ১৭৭৪ সালে পিটের ইন্ডিয়া অ্যাক্টে বৃটিশ প্রভুত্ব কায়েম হলো ভারতের বুকে। ১৮৫৩ সালের নতুন সনদে কোম্পানির (বৃটিশ) ওপর বৃটিশ রাজের নিয়ন্ত্রণ হলো ব্যাপক এবং গভীর। ইতোমধ্যে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা পৌঁছে গেছে চরমে, দেশ ছেয়ে গেছে অবিশ্বাস্য রকমের দুর্নীতিতে আর বিশৃঙ্খলায়।[৪] ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল অধিবাসীদের ওপর জমিদারি অত্যাচার, ভূমি থেকে উচ্ছেদ, নারী নির্যাতন তাদের বিদ্রোহী করে তোলে। অপমানের প্রতিশোধে দুই ভ্রাতা সিধহো, কানহোর নেতৃত্বে দশ হাজার সাঁওতাল অধিবাসী নিজেদের সরকার গঠনের উদ্যোগে দুর্দম সংহতি গড়ে তোলেন। তাঁদের সশস্ত্র আক্রমণে নিহত হলেন বাংলোবাসী অনেক ইউরোপীয় পুলিশ অফিসার, ইংরেজ ব্যবসায়ী, রেলকর্মী। বিভিন্ন অঞ্চলে হাজার হাজার সাঁওতাল অধিবাসী ঐক্যবদ্ধ অভিযান চালিয়ে ভাগলপুর রাজমহল অঞ্চলে নিজেদের অধিকার কায়েম করে কোম্পানি শাসন উচ্ছেদ ও নিজেদের স্বাধীন সুবা প্রতিষ্ঠার বিষয় ঘোষণা করেন। সশস্ত্র সাঁওতাল বিদ্রোহীদের সংখ্যা দাঁড়ায় পঁয়ত্রিশ হাজারের ওপরে। ১৮৫৬ সালে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটলে তাঁদের ওপর নেমে আসে নৃশংস অত্যাচার।[৫]

এর পরের বিদ্রোহাত্মক ঘটনা প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ থেকে আদেশ এলো এনফিল্ড রাইফেলে টোটা দাঁতে কাটতে হবে—এই টোটা তৈরি হয়েছিল গরু কিংবা শূকরের চর্বি দিয়ে। বৃটিশ সরকার ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইলেও তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিরা মনে করলেন বিষয়টি বৃটিশের ধর্মান্তকবণ প্রচেষ্টার চক্রান্ত।[৬] ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৭ বাংলার ১৯তম পদাতিক বাহিনী রাইফেল নিতে অস্বীকার করে এবং ২৯ মার্চ ব্যারাকপুরে ৩৪তম বাহিনী বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহে মঙ্গল পান্ডের ফাঁসি হয় এবং যে জমাদার দাঁড়িয়ে থেকে বৃটিশ সমর্থনে এগিয়ে আসে নি তাকে ফাঁসি দেয় ইংরেজ। এই বিদ্রোহ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে উত্তর ভারতের মীরাটে। ১০ মে তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর ৭০০ সৈনিক জেল ভেঙে বন্দি সহকর্মীদের মুক্ত করে। ১১তম পদাতিক বাহিনী এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইউরোপীয়দের হত্যা করে এবং পরে রওনা হয় দিল্লি অভিমুখে। ১১ মে তাঁরা দিল্লিতে বাহাদুর শাহকে নেতৃত্বে বরণ করে তাঁকে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে ঘোষণা করেন।[৭] তাঁরা জনসমর্থন লাভ করে দিল্লির সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করলেন। বহু ইউরোপীয় নিহত হন তাঁদের আক্রমণে।

এই খবর দেশময় প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাউনিতে ছাউনিতে লাগলো বিদ্রোহের ঢেউ। ফিরোজপুর, মজফফরপুর, মজফফরনগর, আলিগড়ে সিপাহিরা বিদ্রোহ করে। ক্রমশ তা ছড়িয়ে পড়লো পাঞ্জাব, নৌসেরা, অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এটোয়া, মেনপুরি, রূঢ়কি, ইটামথুরা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, মোরাদাবাদ, বুদাউন, আজমগড়, সীতাপুর, বারানসী, কানপুর, ফৈজাবাদ, দরিয়াবাদ, ফতেপুর, ফতেগড়, হাথরসে প্রভৃতি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। সিপাহিরা ইউরোপীয় নিধন, জেল ভেঙে কয়েদিদের মুক্তিদান ও ট্রেজারি লুণ্ঠন করেন এবং বহু সরকারি অফিস পুড়িয়ে দেন। অনেকে দিল্লি গিয়ে বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হন। বিদ্রোহের আগুন আরো ছড়ালো—ঝাঁসি, গোয়ালিয়র, নিমাক, ঢাকা, চট্টগ্রাম, দানাপুর, জগদীশপুর, গয়া, দেওঘর, রামগড়, কোলাপুর, আমেদাবাদ, সিন্ধুর হায়দারাবাদে। কিন্তু রাজভক্ত ব্যহিনীর সুশৃঙ্খল আক্রমণে তাঁরা দিল্লিতে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন; ফলে বাহাদুর শাহকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। বৃটিশের বিচারে দণ্ড হিসেবে বাহাদুর শাহ ও তাঁর বেগম জিন্নাত মহল নির্বাসিত হন সুদূর বার্মায়। রেঙ্গনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বাহাদুর শাহ। বাহাদুর শাহর পুত্র-পৌত্রদের গুলি করে হত্যা করে হডসন।[৮]

নানাসাহেব কানপুর ছাউনি আক্রমণ করলে (৬.৬.৫৭) বহু ইংরেজের হয় প্রাণবলি। তিনি হ্যাভলকের বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েও ৬০০০ সৈন্যের বাহিনী গড়ে তুলে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন। ইংরেজদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হলেও পরে নানাসাহেবকে চলে যেতে হয় গঙ্গার উত্তরাঞ্চলে। সিপাহিদের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে ইংরেজ প্রশাসনের ওপর আস্থা শিথিল হয়ে পড়ে। তাঁরা বিদ্রোহী সিপাহিদের সহায়তা করেন। অযোধ্যায় বৃটিশ প্রশাসন বিধ্বস্ত হয়। বেগম হজরত

মহলের নেতৃত্বে তাঁর নাবালক পুত্র বিরজিস কাদিরকে ৭ জুলাই লক্ষ্ণৌতে অভিষিক্ত করা হয় নবাবপদে। অযোধ্যা ও তার কাছাকাছি অঞ্চলে গড়ে ওঠে স্বাধীন প্রশাসন। দুর্গে দুর্গে সমাবিষ্ট হয় সমর্থক সৈন্য বাহিনী। ইংরেজদের লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি অবরুদ্ধ হয়। লক্ষ্ণৌতে এক লক্ষের বেশি বিদ্রোহী সিপাহির সমাবেশ ঘটে। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে হেনরি লরেন্স বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। কিন্তু ইংরেজদের সংহত আক্রমণে লক্ষ্ণৌর পতন ঘটে।

অন্যদিকে কুনুয়ার সিং দানাপুর আক্রমণ করে ডানকানের বাহিনীকে বিপর্যস্ত করেন। তাঁর সমর্থনে গণবিদ্রোহে সমবেত হন দশ হাজার সশস্ত্র ব্যক্তি। তিনি ফৈজাবাদের ১৪ হাজার বিদ্রোহী সিপাহির সহায়তায় আজমগড় অধিকার করেন। কিন্তু যুদ্ধে কামানের গোলায় আহত হয়ে তাঁকে স্থানত্যাগ করতে হয়। বিদ্রোহীরা ছোট নাগপুর অঞ্চলের উপজাতীয়দের এবং পালামৌর জনগণের সমর্থন লাভ করেন।[৯] সিংহভূমের কোলরা বিদ্রোহে যুক্ত হয়ে ১৮৫৯ পর্যন্ত বিদ্রোহের শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন পীতাম্বর নীলাম্বরের নেতৃত্বে। সম্বলপুরের সুরেন্দ্র সাই ১৮৬৪ পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ চালিয়ে গঠন করেছিলেন একটি সমান্তরাল সরকার।[১০] ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে তাঁতিয়া, নানাসাহেবের ৪০০০ সৈন্যের সহায়তায় কানপুর আক্রমণ করেছিলেন; কিন্তু তিনি হ্যাভলকের বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। পরে তিনি গোয়ালিয়রের সিপাহিদের সহায়তায় কালপী ও এর পরে কানপুর অধিকার করেন। বৃটিশের প্রতি আক্রমণে এ সবই প্রতিহত হয়। নানাসাহেবকে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

ঝাঁসির রানী লক্ষ্মী বাইয়ের প্রতিরোধ এক ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছে। ঝাঁসি বাহিনীতে ছিল ১৫০০ সিপাহি, দশ হাজার সশস্ত্র বুন্দেলি। বৃটিশ বাহিনী ঝাঁসির দুর্গ আক্রমণ করলে দুর্গ থেকে অবিরাম গোলাবর্ষিত হয়, ঝাঁসির রানীর নেতৃত্বে। রানীকে সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে তাঁতিয়া তাঁর বাইশ হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁসির দিকে অগ্রসর হলে রোজের বাহিনীর প্রবল বাধায় কালপীতে ফিরে আসতে বাধ্য হন। রানী গোপনে কালপী এসে তাঁতিয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে গোয়ালিয়রে উপস্থিত হলে সিন্ধিয়ার বাহিনী সিন্ধিয়াকে উপেক্ষা করে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করে। তাঁরা গোয়ালিয়র ট্রেজারি দখল করে নানাকে পেশোয়া বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু ইংরেজদের প্রতি-আক্রমণে রানীকে যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। রোজ রানীকে বিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা সাহসী বলে অভিহিত করেছেন।[১১] রানীকে নেতৃত্বের মহিমায় রঞ্জিত করে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা।[১২] নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁর নারী বাহিনীর নামকরণ করেন এই বীর নেত্রীর নামে। ঝাঁসির রানী বাহিনীর কর্মকাণ্ড আজাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। তাঁতিয়া বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে ১৮ এপ্রিল ১৮৫৯ ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন।

গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং বলেছিলেন, সিন্ধিয়া বিদ্রোহী পক্ষে যোগ দিলে তিনি তল্পি গুটিয়ে নেবেন পরদিনই।[১৩] সিপাহিদের ব্যাপক সশস্ত্র আক্রমণে

বৃটিশরাজের পরাজয় আসন্ন হয়ে ওঠে। জনসাধারণও যুক্ত হয়েছিলেন এই বিদ্রোহে। কিন্তু সিপাহি ও গণবাহিনীগুলোতে ত্রুটি ছিল সংহতির, বিশ্বাসঘাতকতা ছিল একশ্রেণীর সিপাহি ও দেশীয় নৃপতিদের। সর্বোপরি বিশেষ অভাব ছিল বড়মাপের নেতৃত্বের। প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ অর্থাৎ সিপাহি বিদ্রোহ আশু ব্যর্থ হলেও ভারতীয় মানসে বৃটিশ রাজশক্তির প্রতিরোধে ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখে গেছে, যুগিয়েছে বৈপ্লবিক প্রেরণা।

এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর বড় ধরনের বৃটিশবিরোধী অভিযান পরিলক্ষিত হয় নি; যদিও ওয়াহাবি আন্দোলন, রাম সিংয়ের নেতৃত্বে শিখদের অধিকার আন্দোলন (১৮৬৩-১৮৭১), মুণ্ডা নেতা বিরসার আন্দোলন (১৮৯৫-১৯০০), ১৮৬১ সালে আসামের কৃষক বিদ্রোহ, জন্তিয়া পাহাড়ের বিদ্রোহ (১৮৬০-৬৩), আসাম সমতলের আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।[১৪]

এরপর প্রশ্ন জাগলো, তাহলে মুক্তির পথ কী। এই যুগেই আবির্ভূত হলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ, রামমোহন, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর। আত্মিক প্রমূল্যে এঁরা দেশকে মুক্তির নতুন আঙিনায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। দেশ জানলো পরাধীনতার গ্লানিকে অতিক্রম করেই তবে সার্বিক মুক্তির ঝরনায় বিকশিত হতে পারে ব্যক্তি ও সমাজজীবন—অন্য পথ নেই। এইভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্যোতিষ্করা স্বাধীনতা, সাম্য, সমন্বয়ের মন্ত্রে ভারতের ঐতিহ্যমণ্ডিত সংহত উদার জাতীয় ভাবনার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে গেলেন দেশকে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'যত মত তত পথ'-এর সাধনার সন্ধান দিলেন। তাঁর শিষ্য বিশ্বখ্যাত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ প্রেম আর ত্যাগের আদর্শে দেশ সেবার আহ্বান জানালেন। বললেন আপন মুক্তির সঙ্গে চাই জগতের হিত। ডাক দিয়ে বললেন, "ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অন্ধ, মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"[১৫] জানালেন, "বহু বছর ধরে ভারতবর্ষ বারবার বিজিত হয়েছে এবং সর্বশেষে এসেছে ইংরেজ। যত জাতি ভারতে এসেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হলো এই ইংরেজ। ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুয়া রেখে গেছে অপূর্ব মন্দির, মুসলমানেরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ আর ইংরেজরা স্তূপীকৃত ব্রান্ডির ভাঙা বোতল আর কিছু নয়। আমাদের দেশে দেশে যখন দুর্ভিক্ষে মানুষ মরছে তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে টিপে ধরেছে, আমাদের শেষ রক্তটুকু তারা নিজ তৃপ্তির জন্য পান করে নিয়েছে আর আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা তাদের নিজেদের দেশে চালান দিয়েছে।[১৬] ভগিনী ক্রিস্টিনের একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী জানান : "বিদেশি শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তিজোট তৈরি করতে চেয়েছিলাম। সেজন্যই আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেরিয়েছি।... দেশের কাছ থেকে আমি সাড়া পাই নি, দেশটা মৃত।"[১৭]

১৮৮৫ সালে জন্ম হয়েছে কংগ্রেসের কিন্তু তাদের ক্রিয়াকর্মে ছিল না কোনো আন্দোলনের ছোঁয়া। অহিংস উপায়ে আবেদন, নিবেদনে আইনি পথে কিছু আদায়

করা যায় কি না—সে উদ্দেশ্যেই তার অভিযাত্রা। সারদানন্দজীকে কংগ্রেস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন, "ভারতের লোকগুলো কংগ্রেস কংগ্রেস করে মিছামিছি হৈ-চৈ করছে কেন? কতকগুলো হাউড়ে লোক এক জায়গায় জুটে কেবল গলাবাজি করলেই কি হয়? চেপে বসুক নিজেদের independent বলে declare করুক, হেঁকে বলুক আজ থেকে আমরা স্বাধীন হলাম। আর সমস্ত স্বাধীন government‌কে নিজেদের declaration পত্র পাঠিয়ে দিক, তখন একটা হৈ-চৈ উঠবে।" বলে চললেন, "বিধিমত কাজ করে যা, তাতে যদি গুলি বুকে পড়ে, প্রথমে আমার বুকে পড়ুক।"... "পড়ুক গুলি আমার বুকে, আমেরিকা, ইউরোপ একবার কি রকম কেঁপে উঠবে... আমার রক্ত পড়লে সারা জগতে একটা সাড়া পড়ে যাবে। কংগ্রেস জোর গলায় স্বাধীনতা declare করুক।..."[১৮]

কংগ্রেসের সে অবস্থা তখন ছিল না। মনে পড়ে ত্রিপুরি কংগ্রেসে ১৯৩৯-এ সুভাষচন্দ্রের চরমপত্র প্রদানের কথা। ১৯৪২-এ বৃটিশরাজকে উচ্ছেদ করতে আহূত হয়েছিল ভারত ছাড়ো আন্দোলন 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র শপথ নিয়ে। ঐতিহাসিক বিপ্লবী পণ্ডিত সখারাম দেউস্করের সঙ্গে আলোচনাকালে স্বামীজী বলেছিলেন, "সমস্ত দেশটা বারুদ কারখানায় পরিণত হয়েছে, একটি অগ্নি স্ফুলিঙ্গই একে প্রজ্বলিত করে দিতে পারে।"[১৯] স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছতে বীর সন্ন্যাসীর এই সাগ্নিক আহ্বান কশাঘাতরূপে জাগিয়ে দেয় ভারতের যুব সমাজকে।

বাংলার বিপ্লবীরা স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি সংগঠনে মিলিত হয়ে গড়ে তুললেন অনুশীলন সমিতি পি. মিত্রের নেতৃত্বে ১৯০১ সালে। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন স্বামীজী সন্ন্যাসী হয়েও দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতেন অবিরত। ভাবতেন সশস্ত্র বিপ্লবের বিষয়। বিপ্লবীদের ওপর স্বামীজীর প্রভাব ছিল অনিবার্য। এ বিষয় উল্লিখিত হয়েছে সিডিসন কমিটির রিপোর্টেও।

সশস্ত্র আক্রমণে বৃটিশ বিতাড়নের উদ্দেশ্যে গুপ্ত সমিতি গড়েছিলেন বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে, কিন্তু ১৮৮৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি জেলের মধ্যে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর জীবনাবসান হয়। ১৮৯৭-এ চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকারের হাতে নিহত হন দুই বৃটিশ অফিসার ব্র্যান্ড ও স্টুয়ার্ট। ধৃত হয়ে তাঁদের মৃত্যুবরণ করতে হয় ফাঁসিতে। বরোদা থেকে অরবিন্দ কর্তৃক প্রেরিত ব্যক্তিরা যুক্ত হন অনুশীলন সমিতিতে। এঁদের সফলতা-বিফলতার কাহিনী রোমাঞ্চকর।[২০] বাংলা হয়ে উঠেছিল বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি।

১৯০২ সালে স্বামীজী ইহলোক ত্যাগ করলেন, কিন্তু তাঁর বাণীর সম্মোহনী প্রভাবে স্বাধীনতার নেশায় আপ্লুত হলো বাংলার তরুণ দল। বাংলার এই আন্দোলনের জনক ছিলেন স্বামীজী।[২১] ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দিলেন লর্ড কার্জন। প্রতিবাদের ঝড় উঠলো দেশময়। বাংলার জাতীয় উন্মেষকে শুরুতেই বিনষ্ট করার বৃটিশ প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে দু'হাজার প্রতিবাদ সভা সংগঠিত হলো। সভাগুলোতে লক্ষ্য করা গেছে হাজার হাজার মানুষের

সমাবেশ।[২২] পূর্ব বাংলা থেকে সত্তর হাজার নাগরিকের স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিবাদপত্র পৌঁছে দেয়া হলো সেক্রেটারি অফ স্টেটের কাছে।[২৩] প্রিন্স অফ ওয়েলসের অভ্যর্থনা বয়কটের আন্দোলন আহূত হলে, সে আন্দোলন রূপান্তরিত হলো স্বদেশী আন্দোলনে—সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে। ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসি যুবমানসে আনে বৈপ্লবিক জোয়ার। এই আন্দোলন পরিচালনায় যুক্ত হন আবদুল্লা রসুল, লিয়াকত হোসেন, আবদুল হালিম গজনভি, ইউসুফ খান বাহাদুর, মুহম্মদ ইসমাইলের মতো ব্যক্তিত্ব। নারীগণ এগিয়ে আসেন বিদেশি দ্রব্য বয়কট করতে।[২৪] জাতীয় আন্দোলন আবেদন-নিবেদনের পথ থেকে সরে নতুন খাতে বইতে থাকে; এর সঙ্গে যুক্ত হন অরবিন্দ, তিলক, লাজপত এবং বিপিন পাল। ১৯০৫ সালে ঘটে যায় একটি অভূতপূর্ব আন্তর্জাতিক ঘটনা—জাপানের হাতে রাশিয়ার মতো ইউরোপীয় শক্তির পরাজয়। বিপ্লবী মানসে সৃষ্টি করে এক প্রতিশ্রুতিময় আবেগ।

১৯০৬ থেকে ১৯১৬ এই দশটি বছরে বৈপ্লবিক জাগরণ দ্রুততালে অগ্রসর হয়ে ফেলে আসা কয়েকটি দশকের আহরণকে অতিক্রম করে। লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন ১৯১১ সালে; ভাবলেন এর ফলে প্রতিহত হবে হিংসাত্মক আন্দোলনের অগ্রগতি। বিবেকানন্দের প্রভাবে দীপ্যমান অরবিন্দ তখন গড়ে ওঠা জাতীয় ভাবনার ঋত্বিকরূপে প্রতিষ্ঠিত। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য হলো স্থির—পথ সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন। এই আন্দোলনে বিবেকানন্দের মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতার অবদান এবং অরবিন্দকে তাঁর সহায়তাদান বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। অরবিন্দ যেমন ছিলেন এই বিপ্লব যুগের প্রধান ধারক, তেমনি এ যুগের মহান কবিরূপে আবির্ভূত হন রবীন্দ্রনাথ। জীবনস্পর্শী এই আন্দোলনের প্রবাহ বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেল ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আঙিনায়। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থীদের সঙ্গে চরমপন্থীদের বিচ্ছেদ ঘটে গেল। ১৯০৯ সালে মর্লি মিন্টো শাসন সংস্কারে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টি করা হয় মুসলিম সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে। আলিপুর বোমার মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন অরবিন্দ। ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর পক্ষে দাঁড়ান। পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন জাতীয় আন্দোলনের কর্ণধাররূপে ত্যাগের মহিমায় প্রখ্যাত হন দেশবন্ধুরূপে। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদেরও পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, যদিও তিনি কোনো বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নি। ত্যাগের প্রবাদপুরুষ দেশবন্ধুই ছিলেন সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক গুরু ও পথ-প্রদর্শক।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহারে বৃটিশের প্রতিশোধমূলক পরিকল্পনা হলো কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানী স্থানান্তর। এই চক্রান্তের বদলা নিতে প্রস্তুত হলো বিপ্লবীরা। ১৯১২ সালের ২১ ডিসেম্বর নদীয়ার পোড়াগাদার বসন্ত বিশ্বাস, রাসবিহারী বসুর নির্দেশে মারণবোমা নিক্ষেপ করলেন শোভাযাত্রায় হস্তি পৃষ্ঠে আরূঢ় হার্ডিঞ্জকে লক্ষ্য করে। ভাইসরয় আহত ও সংজ্ঞাহীন হলেও বেঁচে যান। এই

ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহু বিপ্লবী; অবোধ, দীননাথ, বালমুকুন্দ, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, প্রমুখ দেশ তনয়রা। দীননাথের বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে যান বসন্ত বিশ্বাস প্রমুখ। অনেককে ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ করতে হয়। পুলিশের দৃষ্টি পড়ে যতীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু গণেশ পিংলে এবং অবশ্যই রাসবিহারী বসুর ওপর। রাসবিহারী বসু দেশে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে কয়েকটি সৈন্যশিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এদের মধ্যে দুটি রেজিমেন্ট অভ্যুত্থানের সহায়তা করতে সম্মত হয়। বিপ্লবীরা সিদ্ধান্ত নেন অমৃতসর থেকে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান কার্যকরী করবেন জার্মানি থেকে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ পৌঁছলেই। বাংলা অঞ্চলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাঘা যতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি) আর রাসবিহারী উত্তর ভারতের। বিপ্লব সংগঠনের দিন ধার্য হয়েছিল ১৯১৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। বিপ্লব বিফল হলে রাসবিহারী বসুকে দেশত্যাগের অনিবার্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ১৩ মে ১৯১৫ বৃটিশ গোয়েন্দাদের ফাঁকি দিয়ে সানকিমারু জাহাজে দেশত্যাগ করে আশ্রয় গ্রহণ করেন জাপানে।

আমেরিকা থেকে কামাগাতামারু জাহাজ কলকাতায় পৌঁছলে সেখানে এবং বজবজে বিদ্রোহাত্মক ঘটনা ঘটে। বাইরের বিপ্লবীদের সহায়তায় এস. এস. মাভারিক জাহাজে পাঠানো অস্ত্র বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেবেন এমন পরিকল্পনা ছিল যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, যদুগোপাল মুখার্জি ও তাঁদের সহযোগীবৃন্দের। লক্ষ্য এইভাবে তাঁরা ভারতীয় বিপ্লব সফল করে তুলবেন। কিন্তু পরিকল্পনা মাফিক অস্ত্র এসে পৌঁছলো না। পুলিশ পূর্বেই খবর পেয়ে বুড়ি বালামের তীরে বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ও তাঁর সহযোগীদের আক্রমণ করে। অসমযুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেন চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ। ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ করেন নীরেন ও মনোরঞ্জন। যতীনের হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।[২৫]

১৯০৭ থেকে ১৯১৪ কংগ্রেসের সঙ্গে সংযোগের কোনো আবেগ ছিল না বিপ্লবীদের। ১৯১৪ সালে তিলকের মুক্তির পর তিলক ও এ্যানি বেসান্ত বিপ্লবীদের নিয়ে এলেন কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে।[২৬]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বৃটিশ যুদ্ধের পটভূমিকায় ভারতের অভ্যন্তরে ও বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে জার্মানির সহযোগিতা কামনা করছিলেন। স্বভাবতই জার্মানি তাঁদের সাহায্য দানে সম্মত হয়। জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের নেতৃত্বে গঠিত হয় ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স কমিটি (ভারতের স্বাধীনতা কমিটি)। জার্মান সরকার এই কমিটিকে স্বীকৃতি দেয়। কমিটির নেতৃবৃন্দ ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগে তৎপর হন। বার্লিনের কমিটি গদর পার্টির সঙ্গে একত্রে কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইন্দোচীনেও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা সংক্রমিত হয়। সেখানে বরকতুল্লা ও চম্পকরাম পিল্লাই সৈন্য সংগ্রহ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। উদ্দেশ্য জার্মানির সহায়তায় সেখানে একটি বৃটিশবিরোধী বাহিনী গড়ে তোলা। রাজা মহেন্দ্র

প্রতাপের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে একটি ইন্দো-জার্মান মিশন পাঠানো হয় এবং ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় অস্থায়ী ভারত সরকার (Provisional Government of India)। একটি চুক্তির মাধ্যমে আফগান সরকার এই অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে।[২৭] পরিকল্পনা ছিল রাসবিহারী বসু স্বাধীনতা ঘোষণা করলে মহেন্দ্র প্রতাপ ভারত সীমান্তে প্রবেশ করবেন। ভারতের স্বাধীনতার স্বার্থে তাঁরা বিদেশি সহায়তা লাভে সচেষ্ট হয়ে জার্মানিতে যান। তাঁরা জার্মানির অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় চরিত্র নিয়ে নিষ্ফল বিতর্কে লিপ্ত হন নি। ১৯১৮ সালে জার্মানির পরাজয় ঘটে যায় এবং অপমানজনক ভার্সাই চুক্তিতে সই করতে হয় জার্মানিকে। এরই মধ্যে উপ্ত হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ। ভারতীয় বিপ্লবীদের বৃটিশবিরোধী বিপ্লব প্রচেষ্টায় তখনকার মতো ছেদ পড়ে যায়।

১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টের ভিত্তিতে বৃটিশের নতুন সংস্কারে জন্ম হয় দ্বৈত শাসনের। ১৯০৯ এবং ১৯১৯ সালের দু'টি শাসন সংস্কার রচিত হয়েছিল বিপ্লবী আন্দোলনের আশঙ্কায়, অহিংস আন্দোলনের প্রভাবে নয়—এই মতটিই প্রবলতর। এরই মধ্যে শত শত বিপ্লবীকে অবর্ণনীয় নির্যাতন, আত্মাহুতি, দ্বীপান্তরের কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়।

১৯১৯-এর শাসন সংস্কারের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশজুড়ে গড়ে ওঠে প্রতিবাদের ঢেউ। অমৃতসরে এই আন্দোলন দমনে জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে দেশময় উচ্চারিত হলো ধিক্কারের বাণী। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি পরিত্যাগ করলেন। ১৯২০ সালে কলকাতা কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত হলো অসহযোগ নীতি। বিপ্লবীদের দমনকল্পে বৃটিশ রচনা করেছিল রাউলাট বিল। বিপ্লবীরা অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতা ও জনসমর্থন লক্ষ্য করে বৃটিশবিরোধী কর্মকাণ্ডে নতুন দিগন্ত খুঁজে পাওয়ার প্রত্যাশায় অসহযোগ আন্দোলনে সহায়তা করতে অগ্রসর হন। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই সন্ধিক্ষণে ১৯২১-এর জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র আই সি এস চাকরি ত্যাগ করে ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। গান্ধীজীর পরামর্শে তিনি দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করলেন। বাংলার তথা ভারতের যুবশক্তি একটা ব্যাপক আন্দোলনের জন্য অপেক্ষা করছিল গভীর আগ্রহে। এই সময় বৃটিশ যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারত আগমন (নভেম্বর ১৯২১) এনে দেয় আন্দোলন গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ। আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় ব্যাপক ধরপাকড়। দেশবন্ধু, মতিলাল নেহরু, লাজপত রাও, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্রসহ পঁচিশ হাজার কংগ্রেস কর্মীকে গ্রেফতার করে বৃটিশ সরকার। ১৯২১-এর ডিসেম্বরে আমেদাবাদ কংগ্রেসের সময় এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় চল্লিশ হাজারে। গান্ধীজী বরদৌলিতে আইন অমান্যের ডাক দেন, কিন্তু ৫ ফেব্রুয়ারি চৌরিচৌরার গণআক্রমণে পুলিশ হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে বন্ধ করে দেন সে আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ছিলেন এই আন্দোলন প্রত্যাহারের বিরোধী।

১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে কাউন্সিল প্রবেশের বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে মতান্তর হলো দেশবন্ধুর। তিনি (দেশবন্ধু) মতিলাল নেহেরুর সহায়তায় গড়ে তোলেন স্বরাজ্য পার্টি। ২৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে বিশেষ অধিবেশনে সমর্থিত হলো দেশবন্ধুর প্রস্তাব। ১৯২৪-এর ১ মার্চ গোপীনাথ সাহার মৃত্যু হয় প্রেসিডেন্সি জেলে। তিনি কুখ্যাত পুলিশ টেগার্টকে গুলি করেন; কিন্তু ভুলবশত অন্য এক ইংরেজ নিহত হয়। এই অপরাধেই গোপীনাথের মৃত্যুদণ্ড। ১৬ জুন ১৯২৫ মানুষের অন্তরের বন্ধু দেশবন্ধুর প্রয়াণ ঘটে দার্জিলিংয়ে। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের ভারত আগমনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে লাজপত রাও পুলিশের লাঠিতে জখম হয়ে ১৭ নভেম্বর (১৯২৮) মৃত্যুবরণ করেন। এই বছরেই মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে যে খসড়া সংবিধান রচিত হয় তা গৃহীত হয় ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে। গান্ধীজী ঘোষণা করলেন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ অর্জিত না হলে শুরু হবে ট্যাক্স বয়কটসহ অসহযোগ আন্দোলন। কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব ১৩৫০-৯৭৩ ভোটে[২৮] বাতিল হলেও যুবশক্তি সংগঠিত সত্তার পরিচয় দেয়। জাতীয় আন্দোলনে ১৯২৮ এর কলকাতা কংগ্রেস এক নতুন দিকদর্শী সম্মেলন। এই কংগ্রেসে দেখা যায় শ্রীসংঘের অনিল রায়. লীলা নাগ এবং তাঁদের সহযোগী নেতৃবৃন্দ সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে সমবেত। তখনো শ্রীসংঘ অবিভক্ত। ১৯২৮-এর এই কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র পরিচালিত বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অধিবেশন শেষ হলেও রয়ে গেল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স সংগঠন। বাংলার হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যগুপ্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, জ্যোতিষ জোয়ারদার প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ উক্ত সংগঠনটিকে একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন।[২৯] নেতৃবৃন্দের মধ্যে সংঘটিত হলো কিছু দুঃখজনক পরিস্থিতি এবং বিপ্লব সম্পর্কে কৌশলগত মতান্তর, যার ফলে শ্রীসংঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বি. ভি. বা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দল।

১৯২৯-এর ১৩ সেপ্টেম্বর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন বন্দিদের অনশন ধর্মঘটে যোগ দিয়ে বিপ্লবী যতীন দাস সঙ্কল্প নিলেন আমরণ অনশনের। ৬৪ দিন অনশনের পর মৃত্যুবরণ করেন যতীন দাস। তাঁর ভ্রাতা হাওড়া স্টেশনে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে পৌঁছলে পরিলক্ষিত হয় শোকবিহ্বল বিপুল সমাবেশ। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে দুই লক্ষ লোকের শোভাযাত্রা মরদেহ নিয়ে কেওড়াতলা শ্মশানে পৌঁছায়। বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স কোরের (১৯২৮) অফিসার ও সদস্যবৃন্দ যোগ দিয়েছিলেন এই শোকমিছিলে।[৩০] বিশ দশকের প্রারম্ভকাল থেকেই বিপ্লবীদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগের বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন সকল বিপ্লবী নেতৃবৃন্দই। অনুশীলন, যুগান্তর প্রভৃতি বিপ্লবী দলগুলো সমবেত হয়ে ১৯২৭-২৮ সালে ইউনাইটেড রেভলিউসনারি পার্টি গঠন করে সুভাষচন্দ্রকে সভাপতিরূপে বরণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে।[৩১] গণআন্দোলন অখণ্ড বিপ্লবের সোপান। বিপ্লবীরা সে পথ অন্বেষণ করেছেন। সুভাষচন্দ্র কোনো বিপ্লবীদলে যোগদান করেন নি। তিনি তাঁর দর্শনভিত্তিক অখণ্ড বিপ্লবের মতাদর্শে অটল থেকে ভারতজোড়া

গণআন্দোলনের প্রেক্ষায় স্থাপন করেন নিজেকে। পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে বিপ্লবীদের অনেকে বৃহত্তর আন্দোলনে যুক্ত করেন নিজেদের। অনেকে এর থেকে বিযুক্ত হয়ে মার্কসবাদ গ্রহণে তৎপর হন। বৃটিশ শক্তি জাতীয় আন্দোলনকে ভিতর থেকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে বাইরে ও জেলের ভিতরে আন্তর্জাতিক কমিউনিজম প্রচারে সহায়তা করে।

জাতীয়তাবিরোধী অবস্থানের বিপক্ষে জাতীয় বিপ্লবপন্থার একটি পূর্ণ দর্শনের প্রয়োজন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রচেষ্টার প্রধান ঋত্বিক ছিলেন শ্রীসংঘের বিপ্লবী নেতা অনিল রায়। মার্কসীয় বস্তুবাদের আঘাতে যে আদর্শগত সঙ্কটের সৃষ্টি হয় তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বকসা ক্যাম্পের অভ্যন্তরে গভীর প্রত্যয়ে বিজ্ঞান ও ধর্মের, বস্তু ও চেতনার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে মার্কসীয় তত্ত্বের একদেশদর্শী আতিশয্য সম্পর্কে সতর্ক করে দেন সকলকে এবং বিপ্লবী বন্ধুদেরও। বিবেকানন্দের আদর্শে প্রভাবিত অনিলচন্দ্র ভারতীয় জীবনবোধের উপর দাঁড়িয়ে একদিকে গান্ধীবাদের অহিংসা ও অছিবাদ এবং অন্যদিকে মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদ, শ্রেণীসংগ্রাম, ধর্ম, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে মার্কসের মতামতের সমালোচনা করে একটি জাতীয় সমাজবাদী দর্শনের পূর্ণ রূপরেখা উপস্থাপিত করেন। তাঁর মতে, বহু শক্তির সমন্বয়েই হয় সমাজের পরিবর্তন। হেগেল দর্শনের সমালোচনা করে লিখলেন '*হেগেলীয় দর্শন*'। দমদম জেলে একটি পাঠচক্রের ভিত্তিতে রচনা করলেন *সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ*।[৩২]

দৈহিক ও আত্মিকের, সমাজ ও ব্যক্তির, চৈতন্য ও জড়ের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, ভারতের সঙ্গে বিশ্বের বহুমুখী সমন্বয়ই ভারতীয়ত্বের মর্মকথা। এই জীবনদর্শনই তিনি উপস্থাপিত করেন মার্কসবাদের বিকল্পরূপে। ভারতবর্ষে বিপ্লবী সমাজবাদী দর্শনের সংগঠিতরূপের ঐতিহাসিক অভাব পূরণ করেন এই বিদগ্ধ বিপ্লবী দার্শনিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কারারুদ্ধ হন অনিল রায়। মুক্তির পর *নেতাজীর জীবনবাদ* গ্রন্থে ঘটে তাঁর দার্শনিক প্রতীতির পরিণতি।[৩৩] তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মধ্যে লক্ষ্য করেছিলেন জাতীয় বিপ্লবের ও ভারতীয় জীবনবোধের মূর্ত প্রতীককে। লাউসে লিখেছেন : With rigorous logical consistency Roy used his pluralist position as a basis to attack not only Marxian monism but what he considered Gandhiji's monist insistence on nonviolence... Roy developed his own variety of socialism which he considered to be consistent with traditional Indian thought. This became the ideology of the majority of the members of the Shree Sangha."[৩৪] বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যে নিকুঞ্জ সেন "ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা", অতীন্দ্রনাথ বসু "Crossroads of Science and Philosophy", অমলেন্দু ঘোষ "কেন আমি মার্কসবাদী নই", সুনীল দাস "ভূমি সমস্যা ও কৃষি আন্দোলনের ধারা", সমর গুহ "নেতাজীর মত ও পথ" প্রভৃতি পুস্তক রচনার মধ্য দিয়ে উক্ত

বিপ্লবী দর্শনকে করে তোলেন আরো দৃঢ়মূল। আরো কিছু আদর্শনৈতিক গ্রন্থও রচিত হয় এই মতাদর্শের অনুসরণে।

এই নবগঠিত আদর্শনৈতিক শিবিরের মুখপত্র হয়ে উঠে 'জয়শ্রী' লীলা নাগের সম্পাদনায়। প্রতিপক্ষরা এই গোষ্ঠীর নামকরণ করেছেন জয়শ্রী গ্রুপ। জয়শ্রী আন্দোলনের প্রাণপ্রতিমা ছিলেন লীলা নাগ, বিপ্লবী নারী আন্দোলনের অনন্যা সংঘ নেত্রী। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বিজয়িনী নাই তব ভয়... জয়শ্রীর এই পরিচয়"।[৩৫] ১৯৩১ সালে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত কোনো পত্রিকার অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায় নি। জয়শ্রী লেখে : ভাবী ভারত সমাজতন্ত্রের রীতি অনুসারে গঠিত হবে। অতএব দেশের শ্রমিক কৃষকশ্রেণীর সহযোগে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, আইনসভা ও স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয় দলের হস্তগত করা আবশ্যক, বিদেশী দ্রব্য বয়কটের কর্মসূচি গ্রহণ করা উচিত। জয়শ্রী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা শ্রীমতী লীলা নাগের সাত বছর কারাবাসের পর ১৩৪৫ সালে যখন দ্বিতীয় পর্যায়ে জয়শ্রীর আষাঢ় সংখ্যা প্রকাশিত হয় তখন সেখানে লেখা হলো : বিশ্বমানবের অবিচ্ছিন্ন প্রগতিতে আমরা বিশ্বাসী। বিভিন্ন মতবাদ ও পন্থাকে যুক্তিচালিত বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা জয়শ্রী গ্রহণ-বর্জন করবে। জয়শ্রী তার আদর্শনৈতিক মতবাদের পথ ধরে অগ্রসর হয় এবং অনিল রায় প্রতিষ্ঠিত বৈপ্লবিক দর্শনের লক্ষ্য অনুযায়ী প্রবন্ধটি প্রকাশ করে। ব্যাপকতর আঙিনায় মহিলাদের সীমানা পেরিয়ে জয়শ্রী রূপান্তরিত হয় সর্বজনীন লোকে। শ্রীমতী নাগের প্রাণিক আবেদনে সাড়া দিয়ে বহু অগ্নিকন্যা বিপ্লবী আন্দোলনে সমবেত হয়ে দেশপ্রেমে ও ত্যাগে পুরুষ বিপ্লবীদের সমান মর্যাদায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে এই সংগঠিত ত্যাগদীপ্ত আন্দোলন এক অনন্য ঘটনা। লীলা নাগ মেয়েদের দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২৩-এ। বিপ্লবী নেতা পুলিন দাসের তত্ত্বাবধানে মেয়েদের লাঠি, ছোরা খেলা প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতার গোয়া বাগানে সহ-সম্পাদিকা রেণু সেনের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে ছাত্রীনিবাস। ১৯৩০-এ পুলিশ কমিশনার টেগার্টের ওপর গুলি নিক্ষেপের ঘটনায় যুগান্তরের অনুজা সেন মৃত্যুবরণ করেন, দীনেশ মজুমদার হন বন্দি। ডালহৌসি স্কোয়ার বোমার মামলায় বহু বিপ্লবীর হল কারাবাস, দ্বীপান্তর। ছাত্রীভবনের অনেক অগ্নিকন্যাকে গ্রেফতার বরণ করতে হয়। ১৯২৬-এর ৮ ফেব্রুয়ারি দীপালি সংঘ প্রদত্ত অভিনন্দনের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন : 'এশিয়ায় এত বড়ো মহিলা সমাবেশ আর কখনো দেখি নাই।' লীলা নাগের নাম তখন রূপকথার মতো ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো পথ কী। সহিংস বিপ্লব সাধনা না, অহিংসা অসহযোগ। শ্রীসংঘ নেতা অনিল রায়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর জিজ্ঞাসার হলো সমাধান। লীলা নাগ বিপ্লবী দল শ্রীসংঘে যোগদান করলেন—হলেন বিপ্লবী দল ও আন্দোলনের নেত্রী। মেয়েরা তখন দলে দলে দীক্ষিত হচ্ছেন বিপ্লব মন্ত্রে–এ এক অভিনব ঘটনা। বিপ্লবী মানসও তখন রক্ষণশীলতা থেকে মুক্ত ছিল না। প্রশ্ন উঠেছিল, "Shall we be guided by a woman?" পৌরুষের বিরুদ্ধ

মননকে অতিক্রম করেছিল নারী আন্দোলনের বিপ্লবী অভিযান।

১৯৩০-এ ময়দানে শহীদ যতীন দাসের স্মরণসভায় সুভাষচন্দ্রের ওপর বৃটিশ পুলিশের লাঠি চালনার প্রতিবাদে ঢাকায় লীলা নাগের নেতৃত্বে উদ্বেলিত জনসমুদ্রের শোভাযাত্রা ছিল ভারতে অতুলনীয়। আবার এই বছরেই তাঁর নেতৃত্বে মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটির উদ্যোগে ঢাকার মহিলারা যোগ দেন লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে। গণ আন্দোলনে অনিবার্য অংশগ্রহণের সঙ্গে চলছে বৈপ্লবিক সংগ্রামেরও দায়িত্ব বহন।

৬ এপ্রিল ১৯৩০ গান্ধীজী আইন অমান্য করেছিলেন ডান্ডিতে। দেশময় অহিংস আন্দোলনের প্রবাহ বইলো লবণ সত্যাগ্রহে। বিপ্লবীরা এর থেকে দূরে থাকলেন না। বৃটিশ নিপীড়ন চূড়ান্ত আকার ধারণ করলো। ১৮ এপ্রিল সূর্য সেনের (মাস্টারদা) নেতৃত্বে দখল হলো চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার। সকল বিপ্লবী দলের সদস্যকে গ্রেফতার করলো সরকার। শ্রীসংঘের অনিল রায় ও তাঁর সহকর্মীদের অনেকে গ্রেফতার হলেন, অনেকে করলেন আত্মগোপন। দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন লীলা নাগ। চট্টগ্রাম বিপ্লবের অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার তাঁর বিপ্লবী জীবনের গোড়ায় পাঠগ্রহণ করেন লীলা নাগের কাছে, দিপালি সংঘের সদস্য হিসেবে, চট্টগ্রাম বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের পরামর্শে। ১৯৩২-এর ১৭ জুন বিপ্লব সহযোগী অনিল দাস জেলের ভিতর পুলিসের নৃশংস অত্যাচারে প্রাণ হারান।

লবণ আইন ভঙ্গে বাড়লো বৃটিশ অত্যাচার, বেআইনি ঘোষিত হলো কংগ্রেস। মাস্টারদার রিপাবলিকান আর্মির সিদ্ধান্ত হলো বৃটিশের প্রতি সশস্ত্র আক্রমণ। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সত্যাগ্রহের জন্য আহ্বান করা হলো যোগদানকারীদের নাম। এই আবেদনে স্বাক্ষর করলেন সূর্য সেন, সম্পাদক, জেলা কংগ্রেস কমিটি। অম্বিকা চক্রবর্তী সহ-সভাপতি, গণেশ ঘোষ, সদস্য কার্যকরী সমিতি। এরই আড়ালে ১৮ এপ্রিল রাত ৯টায় স্থির হলো আক্রমণের লক্ষ্যগুলো হবে পুলিশ ব্যারাক, অস্ত্রাগার, অক্সিলিয়ারি ফোর্সের অস্ত্রাগার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ অফিস, ইউরোপিয়ান ক্লাব রেলওয়ে। বিপ্লবীরা দখল করলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার, প্রচুর অস্ত্র এলো হাতে। বিপ্লবীরা গড়লেন অস্থায়ী সামরিক সরকার। ঘোষিত হলো স্বাধীনতা।[৩৬] জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে প্রাণাহুতি দিলেন ১১ জন শহীদ। ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণে আত্মাহুতি দিলেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। চট্টগ্রামের বিপ্লব আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রচনা করেছে এক আত্মবলিদানের উজ্জ্বল দিকচিহ্ন।

পাঞ্জাব কেশরী লাজপত রাও এর মৃত্যুর জন্য দায়ী সান্ডার্স নিহত হলে ভগৎ সিংয়ের ওপর জারি হলো গ্রেফতারি পরোয়ানা। সাইমনের উপস্থিতির প্রতিবাদে ১৯২৯-এ বোমা নিক্ষিপ্ত হয় দিল্লির এ্যাসেমব্লি হাউসে। ১৯৩০-এর ৭ অক্টোবর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেওর ফাঁসি হয়। এই বছরই ডিসেম্বরে রাইটার্স অভিযান করলেন বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। সিম্পসন নিহত হলেন। বাদল গুপ্ত পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে প্রাণ বিসর্জন দিলেন, বিনয়ের মৃত্যু হলো হাসপাতালে, দীনেশের ফাঁসি হলো ৬ জুলাই। ২০

ডিসেম্বর ১৯৩০ লীলা নাগ সহকর্মী রেণু সেনসহ গ্রেফতার হলেন। তিনি বিনাবিচারে আটক প্রথম মহিলা রাজবন্দি। ১৯৩১-এর ১৬ সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকার হিজলী জেলে অহেতুক গুলি চালিয়ে তারকেশ্বর সেন ও সন্তোষ মিত্রকে হত্যা করে এবং একশজন আহত হন। সুভাষচন্দ্র বি. পি. সি. সির করপোরেশনের অল্ডারম্যানশিপ পদ থেকে পদত্যাগ করেন। সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত একত্রে মনুমেন্ট ময়দানে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন। সেখানে লক্ষ লোকের সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩১-এর ৭ এপ্রিল মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট পেডি নিহত হন যতিজীবন ঘোষ ও বিমল দাসগুপ্তের গুলিতে। ২৮ অক্টোবর ১৯৩১ নিহত হলেন ডুর্নো। ১৪ অক্টোবর নিহত হলেন স্টিভেনস স্কুলছাত্রীদ্বয় শান্তি, সুনীতির হাতে। ১৯৩২-এর ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কনভোকেশনে স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করেন বীণা দাস। ৩০ এপ্রিল ১৯৩২ হিজলীর বদলায় নিহত হন ডগলাস। ২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ মেদিনীপুরে নিহত হলেন তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ। ২ অক্টোবর '৩৪ শ্রীহট্টের অসিত ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়ে গেল। বিপ্লবী আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জন দেন বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য শহীদ। তাঁদের নামের তালিকা অতি দীর্ঘ। বিপ্লবী অগ্নিকন্যাদের নামের তালিকাও দীর্ঘ। ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনেও বহু ভগিনী-জননী সংগ্রামী ইতিহাসে তাঁদের উজ্জ্বল অবদান রেখে গেছেন উল্লিখিত বিপ্লবী কন্যাদের মতো। কল্পনা দত্ত, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, হেলেনা দত্ত, শোভারাণী দত্ত, শান্তিসুধা ঘোষ, মাতঙ্গিনী হাজরা, বেলা মিত্র, কমলা দাশগুপ্ত প্রমুখদের নামও অক্ষয় হয়ে থাকবে। স্বাধীনতা আন্দোলনে আরো স্মরণীয় হয়ে আছে সরলা দেবী চৌধুরাণী, বাসন্তী দেবী, নেলী সেনগুপ্তা, হেমপ্রভা মজুমদার, লাবণ্য প্রভা দত্ত, চারুশীলা দেবী প্রমুখদের অবদান।

ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো খণ্ড বিপ্লবের কর্মকাণ্ড। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে নানা বিচার-বিবেচনা করে বি. ভি.-এর কর্মী ও নেতৃবৃন্দ বকসা ক্যাম্পে সমবেত হয়ে তাঁদের দল ও গুপ্ত সমিতি ভেঙে দিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠিত হলে তাঁরা তাকে সমর্থন জানালেন। বলা হলো বি. ভি. বেঁচে থাকবে একটি সংগ্রামী আদর্শরূপে।[৩৭]

১৯৩৮-এ মুক্তির পর অনিল রায়-লীলা নাগ তাঁদের সহকর্মীদের নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সুভাষচন্দ্রের সহযোগী হলেন। ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন। সভাপতির ভাষণের মধ্যে তিনি বললেন : "বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা শাসন কায়েম রাখার নীতিই হচ্ছে সাম্রাজ্য শাহীর ভিত্তি, এ সত্য সকলের বিদিত—এই নীতি অনুসারে আয়ারল্যান্ডের জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে আলস্টারকে অবশিষ্ট আয়ারল্যান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।... ক্ষমতা হস্তান্তরকে অকেজো করে দেয়ার জন্য এরূপ অন্তর্বিভাজন অপরিহার্য।" এই ভাষণেই তিনি বলেছিলেন : ভারতের স্বাধীনতার অর্থ হলো

মানবতার মুক্তি। সুভাষচন্দ্র বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের কথা তুললেন; গান্ধীপন্থীরা তা পছন্দ করলেন না। তাঁদের প্রত্যাশা ছিল বৃটিশের সঙ্গে একটা সমঝোতা। সুভাষচন্দ্র এই সময় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিটি গঠন করে কংগ্রেসের মধ্যে পরিকল্পনার মানসিকতা প্রবেশ করিয়ে দিলেন। এইসব বিষয় মহাত্মার মনকে সুভাষ-বিরোধী করে তোলে। সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন ইউরোপে যুদ্ধের মেঘ ঘনায়মান। তিনি চাইছিলেন এই সুযোগে ভারতবর্ষে বৃটিশের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে। তিনি ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মসূচি সফল করতে ১৯৩৯-এ দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতির পদে প্রার্থী হয়ে গান্ধীজীর সরাসরি বিরুদ্ধতার ঢেউ অতিক্রম করে নির্বাচনে জয়ী হন। সুভাষচন্দ্র জানালেন : "বৃটিশের কাছে আমাদের জাতীয় দাবি পেশ করতে হবে চরমপত্রের আকারে। তাতে একটা সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে। উত্তর না পাওয়া গেলে আমাদের জাতীয় দাবি পূরণের জন্য প্রয়োগ করতে হবে আমাদের হাতের অস্ত্র। বৃটিশ এখন সারা ভারত সত্যাগ্রহ আন্দোলন মোকাবিলায় অক্ষম। এই পন্থা গ্রহণ না করলে জাতীয় জীবনে আমরা হারাবো এক অনন্য সুযোগ।" সুভাষচন্দ্রের এই দৃপ্ত আহ্বানের ফল হলো বিপরীত। কংগ্রেসের অসহযোগ এখন প্রযুক্ত হলো তারই সভাপতির বিরুদ্ধে। কুখ্যাত পন্থা প্রস্তাবরূপে এই অসহযোগিতা দাঁড়ায় প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতায়। সভাপতি পদ ত্যাগ করতে হলো সুভাষচন্দ্রকে '৩৯-এর এপ্রিলের শেষে। রবীন্দ্রনাথ এই সময় সুভাষচন্দ্রকে লেখেন, "কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তুমি যে মর্যাদাবোধ এবং ধৈর্যের নিদর্শন রেখেছ তাতে তোমার নেতৃত্ব আমার প্রশংসা ও বিশ্বাস অর্জন করেছে। বাংলাকে তার আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য এরূপ ত্রুটিহীন সৌজন্যবোধ এখনও রক্ষা করতে হবে, যাতে তোমার আপাত পরাজয় স্থায়ী বিজয়ে উত্তীর্ণ হয়ে ওঠে।"[৩৮]

স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের পথে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম হলো মে '৩৯-এ। এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসকে আন্দোলনে নামতে বাধ্য করা। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরূপে অনিল রায়-লীলা নাগ ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। ১৯৩৯-এর ১৩ মে লীলা নাগ ও অনিল রায় পরস্পরকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন। চিরসংগ্রামী দু'টি আত্মা পরস্পর আত্মিক মিলনের মধ্যে কঠোরতম সংগ্রামকে বরণ করে নিলেন।

২২. ১০. ৩৯-এ কংগ্রেস বিভিন্ন প্রদেশে অধিষ্ঠিত কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলোকে পদত্যাগ করতে আহ্বান জানালে তারা ১৫. ১১. ৩৯-এ পদত্যাগ করে। এই পদক্ষেপে আশা করা গিয়েছিল কংগ্রেস অতঃপর বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের আহ্বান জানাবে, কিন্তু তা ঘটলো না। সুভাষচন্দ্র বামপন্থীদের ফ্রন্ট গঠন করে আন্দোলনে উদ্যোগী হলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধ মনোভাবের আশঙ্কায় তারা ফ্রন্ট থেকে সরে পড়ে। তারা কংগ্রেস নিরপেক্ষ আন্দোলনে সামিল হতে অস্বীকার করে এবং এমন আন্দোলন সংগঠিত হলে তাকে সরাসরি বাধা দেয়ার ভয় দেখায়।[৩৯] সুভাষচন্দ্র অদম্য দৃঢ়তায় ভারতবর্ষময় আন্দোলনের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য দশ

মাসের মধ্যে এক হাজার সভায় বক্তৃতা করেন।[৪০] মাদ্রাজের সমুদ্র সৈকতে এরূপ এক সমাবেশে উপস্থিত ২ লক্ষ লোকের সমক্ষে সুভাষচন্দ্র যেদিন বক্তব্য পেশ করছিলেন সেদিন ছিল ৩ সেপ্টেম্বর '৩৯, ইউরোপে জার্মানির বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘোষণার দিন। কংগ্রেস ও বামপন্থীদের (ফরওয়ার্ড ব্লক ব্যতিরেকে) বিরোধ সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র তাঁর অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলেন। কংগ্রেসের চিরাচরিত 'সংগ্রাম-আপস-সংগ্রাম' নীতির বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র ঐতিহাসিক রামগড়ের সভায় (মার্চ ১৯৪০) আপোস বিরোধী সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। পাশেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিল কংগ্রেসের সভা। আপোসবিরোধী সভার সমাবেশ হয়েছিল কংগ্রেস সভার থেকে বৃহত্তর। মওলানা আজাদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের উক্ত সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়; পূর্ণ স্বাধীনতার থেকে ন্যূন কিছু গ্রহণ করবে না ভারতীয় জনগণ।[৪১] কিন্তু এই কংগ্রেসে রাখা হলো না কোনো নির্দিষ্ট কর্মসূচি। ফরওয়ার্ড ব্লকের আপোসবিরোধী সম্মেলনে যোগদান করে কিষান সভা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে। এই সম্মেলনে সুভাষচন্দ্রের সহযোগী হন হেমচন্দ্র ঘোষ, সত্যরঞ্জন বক্সী, অনিল রায়, লীলা রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে শ্রীসংঘ ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নেতা ও কর্মী বন্ধুগণ, অমর বসু, হেমন্ত বসুর দল, অনুশীলন সমিতির বহু সদস্য, পূর্ণদাস মহাশয়, তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তরবঙ্গ গ্রুপ।[৪২] অনুশীলন সমিতির প্রখ্যাত নেতা বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (ত্রৈলোক্য মহারাজ) সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে উত্তর প্রদেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। তিনি ভারতের অনেক বামপন্থী ও বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও আলোচনা এবং বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যদলের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিষয়ে অবহিত করেন সুভাষচন্দ্রকে।[৪৩] রামগড়ের আন্দোলন ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং এর লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন। ১৯৪০-এর মে মাসে ঢাকা সম্মেলনে ঘোষিত হয় জনগণের হাতে সব ক্ষমতা' অর্জনের নীতি।[৪৪] ১৯৪০-এর ৩ জুলাই কুখ্যাত হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আহ্বান জানালেন সুভাষচন্দ্র। তাঁকে গ্রেফতার করা হলো ২ জুলাই। বন্দি করা হলো ফরওয়ার্ড ব্লকের সকল নেতাকে। তবুও হিন্দু-মুসলিম ছাত্রসমাজ রাজপথে নেমে পড়লে প্রমাদ গুনলেন হক মন্ত্রিসভা। উক্ত মনুমেন্ট ছিল সিরাজের নামে বৃটিশ আরোপিত বন্দি হত্যার কলঙ্ক–সৌধ। কলকাতা নগরীর বুক থেকে উৎখাত হলো হলওয়েল মনুমেন্ট। কিন্তু মুক্তি পেলেন না সুভাষচন্দ্র। তিনি জেলে আমৃত্যু অনশনের সঙ্কল্প ঘোষণা করলে সরকার তাঁকে অন্তরীণ করলো তাঁর এলগিন রোডের বাসগৃহে।[৪৫] জেলে যাওয়ার আগে ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকার সম্পাদনার ভার অর্পণ করেন লীলা রায়ের ওপর।

সুভাষচন্দ্র বাইরে থেকে যুদ্ধকালীন অবস্থার সুযোগ নিয়ে সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলার স্বার্থে ১৭ জানুয়ারি '৪১ গোপনে গৃহ থেকে অন্তর্ধান করলেন। বিভিন্ন নেতার কাছে তিনি কি কি নির্দেশ রেখে যান তা অজানার গভীরে। অন্তর্ধানের মাত্র ৫ দিন পূর্বে অনিল রায়, লীলা রায়কে তাঁদের সংযুক্ত প্রদেশ ও বিহারে গোপনে

ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনের কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সুভাষচন্দ্রের লেখা দু'খানি পরিচিতি পত্র থেকে এ বিষয় জানা গেছে। সুভাষচন্দ্র কাবুল, তাসখন্দ, মস্কো হয়ে জার্মানি পৌঁছান এপ্রিলের প্রথম দিকে। কাবুল ত্যাগ করার আগে তিনি রেখে যান তিনটি চিঠি। তার মধ্যে একটি ছিল শ্রীমতী রায়ের উদ্দেশে। ৩ মে ১৯৪১ জার্মান সরকারের কাছে এক প্রস্তাবে জানান বৃটিশ প্রভাব-প্রতিপত্তি দূর করতে চাই জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তির বর্তমান সম্পর্কের স্থিতাবস্থা।[৪৬] জার্মানিতে তিনি বহু পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলেন ৩০০০ সৈন্যের এক ভারতীয় বাহিনী। আশা ছিল এই বাহিনী বন্ধু রাশিয়ার ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে প্রবেশ করবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ২২ জুন '৪১ জার্মানি চুক্তিভঙ্গ করে রাশিয়া আক্রমণ করলে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনায় দারুণ বিপর্যয় নেমে আসে।

এবারে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে জাতীয় আন্দোলনের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক।

১০ মে ১৯৪০ বৃটিশের প্রধানমন্ত্রী পদে বৃত হন চার্চিল। ২০ মে ১৯৪০ নেহেরুজী এক বিবৃতিতে বলেন, "বৃটেন যখন মরণপণ সংগ্রামে রত, সে সময় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে ভারতের পক্ষে মানহানিকর।[৪৭] অনুরূপভাবে মহাত্মাজী বলেন : "বৃটেনের ধ্বংসের মধ্যে আমরা স্বাধীনতা চাই না। উহা অহিংসার পথ নয়।"[৪৮] ২৭ জুন পুনায় কংগ্রেস কমিটির সভায় বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব গৃহীত হয়—শর্ত স্বাধীনতার দাবি মানতে হবে। কিন্তু কোনো যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করা অহিংস নীতির পরিপন্থী হওয়ায় গান্ধীজী কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সহযোগিতা প্রস্তাবের জবাবে মৌনী রইলেন বড়লাট। জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র বন্দি হওয়ার পর যুব সমাজ আন্দোলনের জন্য উদগ্রীব হলে কংগ্রেস সহযোগিতার প্রস্তাব তুলে নিয়ে গান্ধীজীকে আন্দোলনের নেতৃত্বে আহ্বান করে। ১৭ অক্টোবর ১৯৪০ প্রতিনিধিমূলক আন্দোলন শুরু হয় কিন্তু এই আন্দোলনে তেমন উৎসাহ পরিলক্ষিত হলো না। ৭ ডিসেম্বর ১৯৪০ জাপান মিত্র শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ জাপানি আক্রমণে পতন হলো সিঙ্গাপুরের। ৭ মার্চ পতন ঘটলো রেঙ্গুনের। বার্লিন থেকে ভেসে এলো সুভাষচন্দ্রের উদাত্ত আহ্বান। এরূপ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে চার্চিল ভারতে ক্রিপস মিশন নিয়োগের কথা ঘোষণা করলেন।

এই সময় সুভাষপন্থীদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট ও এম. এন. রায়পন্থীরা প্রচারপত্র দেন "Shoot them"। বৃটিশ রাজের পৃষ্ঠপোষক তখনকার 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা ১৩ মার্চ ১৯৪২ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 'Fascist in India'তে কমিউনিস্টদের প্রশংসা করে সুভাষপন্থীদের Fascist আখ্যা দিয়ে তাদেরকে বন্দি করে হত্যার জন্য প্ররোচিত করে সরকারকে। ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকার সম্পাদিকা লীলা রায় এর যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন : 'We shall not stand it' প্রবন্ধে। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড

পত্রিকা ১৯ থেকে ২১ মার্চ (১৯৪২) প্রকাশিত হয় এই প্রবন্ধ।[৪৯]

ক্রিপস মিশন দিল্লি এসে পৌঁছল ২৩ মার্চ ১৯৪২। ২৯ মার্চ ক্রিপস কংগ্রেস সভাপতি মওলানা আজাদের সঙ্গে আলোচনা কালে তাঁর হাতে তুলে দিলেন ক্রিপস প্রস্তাবগুচ্ছ। আজাদ লক্ষ্য করেছিলেন জাপান থেকে ক্রমাগত বেতার প্রচার ভারতে বিপুলসংখ্যক মানুষের মনে বৃটিশবিরোধী প্রভাব বিস্তার করেছে। বিভ্রান্ত আজাদ বুঝতে চাইলেন না নেতাজীর আহ্বানে আলোড়িত ভারত মানস তখন জাতীয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনে উন্মুখ। ক্রিপস ছিল সোভিয়েতে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত। তাঁর দৌত্যগিরির ফলেই নাকি সোভিয়েত এসে গিয়েছিল বৃটেনের সান্নিধ্যে অর্থাৎ হিটলার স্তালিনবিরোধী ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ছিল নাটের গুরুর ভূমিকা।[৫০] ১৯৪১-এর জুনে জার্মানির রাশিয়া আক্রমণে যুদ্ধের গতি চলে আসে মিত্র পক্ষের অনুকূলে। এমন করিৎকর্মা দূত ক্রিপস ভারতে এলেন চার্চিলের দূত হয়ে, কংগ্রেসের মন গলাতে। ক্রিপস প্রস্তাবে ছিল যুদ্ধোত্তর গঠনতন্ত্রে কিছু বাধ্যতামূলক শর্ত—১. দেশীয় নৃপতিদের প্রতিনিধিত্ব, ২. বৃটিশ ভারতীয় ইউনিয়নের কোনো প্রদেশ ভারত ইউনিয়নে যোগদান না করলে অর্জন করবে ইউনিয়নের সমকক্ষ মর্যাদা ৩. জাতিগত এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থে বৃটেনের স্বীকৃত দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার, ৪. অনিচ্ছুক দেশীয় রাজ্যের চুক্তির নবীকরণ প্রয়োজন। ভারতীয় জনগণের সহযোগিতায় ভারত সরকার কর্তৃক দেশের সামরিক ও নৈতিক বিষয়ের এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের দায়দায়িত্ব গ্রহণ। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আজাদের এবং আজাদের সঙ্গে ক্রিপসের আলোচনা ১১ এপ্রিল ১৯৪২ পর্যন্ত প্রসারিত হলো। সামরিক কোনো দায়দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে থাকবে না। ক্রিপস বললেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানও পূর্বশর্ত। আপোসের পক্ষে জওহরলালজীর অনুকূল মনোভাব থাকলেও তিনি মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন।[৫১] গান্ধীজী ছিলেন প্রস্তাবগুচ্ছের বিপক্ষে। তিনি এই প্রস্তাবগুচ্ছকে 'একটি ভগ্নায়মান ব্যাঙ্কের ওপর পরবর্তী দিনাঙ্ক দেওয়া চেক' বলে উপহাস করলেন।[৫২] ক্রিপস-আজাদ আলোচনা চলাকালেই সুভাষচন্দ্র বেতার ভাষণে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জানান, বৃটিশের যুদ্ধে অনিচ্ছুক ভারতবর্ষকে যুক্ত করাই এই চুক্তির লক্ষ্য। বৃটেন একতরফা ঘোষণা করেছে ভারতবর্ষ যুদ্ধবাজ দেশ এবং সেজন্যই শুরু হয়ে গেছে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ। ভারতবাসী স্বেচ্ছায় যুদ্ধে যোগ না দিলে তার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।[৫৩] যাই হোক ক্রিপস বিফল হয়ে দেশে ফিরলেন ১২ এপ্রিল। চার্চিল ক্রিপসের ব্যর্থতার সংবাদে আনন্দিত হয়ে মন্ত্রীসভাগৃহে নৃত্য করেছিলেন।[৫৪] এতেই প্রমাণিত হয় ক্রিপস মিশন ছিল ভারতে আন্দোলন প্রতিহত করার বৃটিশ চক্রান্ত। ক্রিপস প্রস্তাবের বিপক্ষে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মনোভাব বিষয়ে আজাদ বলেন : সুভাষচন্দ্রের জার্মানি যাত্রা গান্ধীজীর মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। সুভাষচন্দ্রের সাহসিকতা ও উপায় নির্ধারণের নিপুণ বিষয়ে সপ্রশংস হয়ে পড়েন গান্ধীজী। তাঁর এই মনোভাবে যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে

তাঁর (গান্ধীজীর) মতামত রঞ্জিত হয়ে পড়ে।[৫৫] ২০ এপ্রিল ১৯৪২ সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করেন, তিনি ত্রিশক্তির (জার্মানি-ইতালি-জাপান) কাজের সমর্থক নন; তাঁর ধ্রুব লক্ষ্য ভারতবর্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শক্তির অপসারণ।[৫৬] ৩ মে গান্ধীজী ঘোষণা করেন—ভারতের মাটিতে বৃটিশের উপস্থিতির অর্থ হলো বিদেশি শক্তিকে ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণ।[৫৭] তিনি আজাদকে জানালেন, যদি জাপ-বাহিনী ভারতে প্রবেশ করে তারা আমাদের শত্রু হিসেবে নয়, আসবে বৃটিশের শত্রু হিসেবে। তিনি ঘোষণা করেন, বৃটিশ বিতাড়নে তিনি আর ডুমস ডে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি নন।[৫৮] গান্ধীজী আজাদের কাছে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কথা ঘোষণা করলে বিস্মিত হন আজাদ। ১৯৪২ এ ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়ে যায় ৯ আগস্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে। ভারতবর্ষময় মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতনের প্রতিজ্ঞা নিয়ে আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং সহিংসরূপ ধারণ করে। বার্লিন থেকে নেতাজীর আহ্বান এলো আন্দোলনে যোগ দেয়ার। ভারতবর্ষময় বৃটিশবিরোধী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়লে সংঘাতে নিহত হলেন সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯২৮ জন এবং আহত হলেন ৩২০০ জন। বেসরকারি মতে নিহতের সংখ্যা অন্তত দশ হাজার আর গ্রেফতার হন ৬০২২৯।[৫৯] জিন্না—এই সংগ্রামে দুঃখ প্রকাশ করে মুসলিম জনতাকে আন্দোলনের সম্পূর্ণ বাইরে থাকার অনুরোধ জানান।[৬০]

আগস্ট আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল বিরোধীর। যুদ্ধে কমিউনিস্ট রাশিয়া মিত্র শক্তিতে যোগদানের ফলে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ভারতীয় কমিউনিস্টদের দৃষ্টিতে হয়ে যায় প্রগতিপন্থী। ভারতে বৃটিশ দু'শ বছরের সাম্রাজ্যবাদী শোষক হওয়া সত্ত্বেও তারা কমিউনিস্টদের মিত্র হয়ে পড়ে।[৬১]

১৯৪২-এর জুনে সুভাষচন্দ্র জার্মানিতে আই. এন. এর উদ্দেশে বলেন, স্বাধীনতা অর্জিত হয় শক্তি প্রয়োগে রক্তদানের মূল্যে।[৬২] জার্মানির সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধার পর সুভাষচন্দ্র জার্মান Admiral Canarisকে বলেন তাঁর প্রশ্নের উত্তরে : "আপনি যেমন জানেন, আমিও তেমনি জানি, জার্মানি এ যুদ্ধ জিততে পারবে না। কিন্তু এবার বিজয়ী বৃটিশ হারাবে ভারতবর্ষ।"[৬৩]

জার্মানিতে তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্ন ফলবতী হবে না বুঝে সুভাষচন্দ্র পূর্বপ্রাচ্যে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে যোগাযোগ করতে থাকেন জাপান দূতাবাসের সঙ্গে। ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ জার্মান ইউ বোট ইউ—১৯০ তে জার্মানির কিয়েল বন্দর ত্যাগ করে মাদাগাস্কারের অনতিদূরে পরিকল্পনা মাফিক জাপানি সাবমেরিন আইএনএ স্থানান্তরিত হয়ে শত্রু অধ্যুষিত ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে সুমাত্রার সাবাং-এ উপনীত হন—সঙ্গে ছিলেন আবিদ হাসান। সেখান থেকে যান টোকিও। এখানে জাপানি প্রধানমন্ত্রী তোজো ও অন্যদের সঙ্গে আলোচনা সেরে ২ জুলাই ১৯৪৩ সিঙ্গাপুরে পদার্পণ করেন। ৪ জুলাই ১৯৪৩ জাপান প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু ভারতীয় স্বাধীনতা লীগের সমস্ত দায়ভার সুভাষচন্দ্রকে অর্পণ করেন। মোহন সিংয়ের নেতৃত্বে পূর্বে গঠিত আই. এন. এ. তখন ভেঙে গেছে।

সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে অতি দ্রুত আজাদ হিন্দ ফৌজ, ঝাঁসির রানী বাহিনী, বালসেনা আত্মঘাতী স্কোয়াড সংগঠিত হলো এবং ২১ অক্টোবর ১৯৪৩ অস্থায়ী আজাদ হিন্দ্ সরকার প্রতিষ্ঠার বিষয় ঘোষণা করা হলো। ২৩ অক্টোবর ১৯৪৩ এই সরকার বেতার মারফত বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নয়টি রাষ্ট্র এই নবগঠিত সরকারকে স্বীকৃতি জানালো। রাষ্ট্রগুলো হলো : জার্মানি, জাপান, ইতালি, চীন নানকিং সরকার, মাঞ্চুকুয়ো, ক্রোয়েসিয়া, ফিলিপাইন, বর্মা, শ্যামদেশ। আয়ার্ল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধান ডি-ভেলেরা নেতাজীকে ব্যক্তিগত অভিনন্দন পাঠান। ইতোমধ্যে দুই ডিভিসন সৈন্য তৈরি হয়ে গিয়েছিল, তৃতীয় ডিভিসন তৈরির কাজ চলছিল, আরো দু'টি ডিভিসনের জন্য সৈন্য সংগৃহীত হচ্ছিল। আজাদ-হিন্দ বাহিনীর অসামরিক বিভাগের প্রশাসক কে. এস. গিয়ানী জানিয়েছেন, আজাদ হিন্দ্ বাহিনীতে ১৫০০ অফিসার ও ৫০,০০০ সৈনিক ছিলেন এবং আরো ৩০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল।[৬৪] জানা যায় ১৯৪৩-এর শেষে আই. এন. এ.তে অন্তর্ভুক্ত ছিল দু'লক্ষ সশস্ত্র সৈনিক।[৬৫] আজাদ হিন্দ্ সরকারের ঘোষণাপত্রে বলা হয় : "এই অস্থায়ী সরকারের কাজ হবে বৃটিশ ও তার মিত্র শক্তিগুলোকে ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করা; তারপর... ভারতবাসীর ইচ্ছানুযায়ী তাদের বিশ্বাসভাজন একটি সরকার গঠন।

"এই সরকার প্রত্যেক নাগরিককে যে-কোনো ধর্মপন্থা অনুসরণের স্বাধীন সমানাধিকার ও সমান সুযোগ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। সমগ্র জাতির সুখ-সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে আজাদ হিন্দ্ সরকার কৃতসঙ্কল্প। বিদেশি সরকার ভারতবাসীর মধ্যে অতীতে যে সব বিভেদ সৃষ্টি করেছিল এই সরকার তা নিঃশেষ করবে।..."[৬৬]

ভারতের স্বাধীনতা লীগকে ঢেলে সাজানো হলো। লীগ সৈন্যবাহিনীকে এবং সরকারি দপ্তরগুলোকে সাহায্য করতো সর্বপ্রকারে। মালয়ে লীগের শাখা ছিল ৭০টি। এদের সদস্য সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ। বর্মায় ও শ্যামে যথাক্রমে ১০০ ও ২৪। আন্দামান, সুমাত্রা, জাভা, বোর্নিয়ো, সেলিবিস, ফিলিপাইন, চীন, মাঞ্চুকুয়ো ও জাপানে স্থাপিত হয় লীগের শাখা। আজাদী বাহিনীগুলোর নামকরণ হয় : আজাদ বৃগেড, গান্ধী বৃগেড, নেহরু বৃগেড প্রভৃতি। আজাদী সৈনিকগণ একই রন্ধনশালায় তৈরি আহার্য গ্রহণ করতেন। নেতাজী নিজেই এই আহার্য খেয়ে দেখতেন এবং নিয়মিত ব্যারাকসমূহ পরিদর্শন করতেন। এই সময়ে বাংলায় আজাদী বাহিনীর প্রভাবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার এবং আজাদী সৈন্য প্রবেশের আশঙ্কায় বাঙালিকে পঙ্গু করে দেয়ার চক্রান্তে ১৯৪৩-এ ব্যাপক দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে বৃটিশ, আর তার সহযোগী হয়ে উঠেছিল তখনকার বাংলা সরকার। এই দুর্ভিক্ষে ও তার অনুষঙ্গ মহামারীতে কয়েক বছরে বাংলায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। উডহেড কমিশন ও অপর একটি রিপোর্টের গভীর অনুশীলনে এর পরিচয় মেলে। ২০ অক্টোবর ১৯৪৩ আজাদ সরকার প্রতিষ্ঠার দিবসে প্রথম অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র এই দুর্ভিক্ষে গভীর বেদনা প্রকাশ করে বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের জন্য এক

লক্ষ টন চাল পাঠানোর কথা বলেন; কিন্তু বৃটিশ সরকার তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অন্য কোনো উপায়ও ফলবর্তী না হওয়ায়।[৬৭] আজাদী ফৌজ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪-এর মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। নেতাজী ভারতের নেতৃবৃন্দের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান জোরদার অন্তর্বিপ্লব করার জন্য। নেতাজীর পরিকল্পনা ছিল বৃটিশবিরোধী অভ্যন্তরীণ আন্দোলনের বাইরে থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম দিয়ে সহায়তা করা। উদ্দেশ্য ভিতরে-বাইরে আক্রমণ করে বৃটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ ত্যাগে বাধ্য করা। ১৮ মার্চ ১৯৪৪ আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতভূমিতে প্রবেশ করে এবং এই মাসেই কোহিমা অধিকার করে। এপ্রিল মাসে (১৯৪৪) ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হয়। ৬ জুলাই নেতাজী স্বাধীনতা যুদ্ধে গান্ধীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন; তখন ভারতের অভ্যন্তরের আন্দোলন স্তিমিত প্রায়। আজাদ হিন্দ্ বাহিনী সংগঠনের পূর্ব থেকেই প্রাচ্য রণাঙ্গনে ক্ষয়-ক্ষতির জন্য জাপানের যুদ্ধভাগ্য পরিবর্তিত হলে তারা তাদের বর্মা রণাঙ্গনের বিমান বাহিনীকে প্রাচ্যে স্থানান্তরিত করে। বর্মা সীমান্ত সুরক্ষিত না থাকলে পূর্বদিক থেকে বৃটিশ আক্রমণের আশঙ্কা ছিল জাপানের। এর বিরুদ্ধে নেতাজীর আজাদী বাহিনীর সহায়তা ছিল তাদের অনিবার্য কাম্য এবং নেতাজীর গতিশীল নেতৃত্বের ওপর ভরসা করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। এই কারণেই জাপান একত্রে ভারত-বর্মা সীমান্ত যুদ্ধে সম্মত হয়। মে ১৯৪৪-এ শিগগির মৌসুমি আগমনে দুর্গম হয়ে ওঠে বর্মা সীমান্ত। ইতোমধ্যে ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা আজাদ হিন্দ্ সরকারের অধীনে আসে এবং সেখানে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের কাজ চলতে থাকে দ্রুততালে। নাগা অধিবাসীরা আজাদী বাহিনীকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আরাকান, কালাদান, হা, কালম, কোহিমা, ইম্ফলের প্রান্তরে প্রান্তরে আজাদী বাহিনীর যুদ্ধ জয়ের গৌরব সকলের মনে সৃষ্টি করে বিপুল উন্মাদনা। ইম্ফল রণাঙ্গনে জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছিল আজাদী বাহিনী। এই রণাঙ্গনে জাপানি জেনারেল মুতাগুচি একটি মারাত্মক ভুল করে বসেন। তিনি নেতাজীর নিষেধে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের বুদ্ধি অনুসারে ইম্ফল-কোহিমা সড়ক বন্ধ করে দেন। নেতাজী জানিয়েছিলেন, পলায়নের পথ উন্মুক্ত থাকলে পলায়ন করবে বৃটিশ যেমন তারা করে থাকে।[৬৮] মুতাগুচি ভেবেছিলেন ডিমাপুর-ইম্পল সড়ক বন্ধ হলে বৃটিশ বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনিবার্য, বন্দি হবে বহুসংখ্যক বৃটিশ ভারতীয় সৈনিক আর প্রচুর রসদ হবে হস্তগত। কিন্তু জাপানি বিমান বাহিনীর অনুপস্থিতির ফলে উন্মুক্ত আকাশ পথে বৃটিশ-আমেরিকার বিমান বাহিনী ইম্ফল দুর্গে রসদ পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে মৌসুমি ঋতুর অকাল আগমনে ভারত-বর্মা সীমান্ত প্লাবিত হলে বাধ্য হয়ে আজাদী বাহিনীকে পশ্চাৎ অপসরণ করিয়ে সুবিধাজনক প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে হয়।[৬৯]

জাপানের যুদ্ধভাগ্য আরো কঠিন হয়ে পড়লে জাপানি সৈন্যদের প্রাচ্যে সরিয়ে নিচ্ছিল জাপান। আজাদী সৈন্য বাহিনীকে তখন এককভাবেই বৃটিশের আক্রমণকে

প্রতিরোধ করতে হয় বর্মার অভ্যন্তরে দ্বিতীয় রণাঙ্গনে। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে আজাদী সরকারের প্রশাসনিক কর্তৃত্বে স্থানান্তরিত করে জাপান। নেতাজী ডিসেম্বর ১৯৪৩-এ আন্দামান গিয়ে দ্বীপ দু'টির নামকরণ করেন শহীদ ও স্বরাজ। নভেম্বর ১৯৪৪-এ টোকিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে একটি ঐতিহাসিক ভাষণে নেতাজী বলেন : কয়েক হাজার বছর আগেকার মতো আমাদের সংস্কৃতি-সভ্যতা যদিও মূলত একই, তথাপি আমরা পরিবর্তিত হয়েছি এবং সময়ের সাথে চলেছি। আমরা চাই এক আধুনিক ভারতবর্ষ।[৭০] ভারতবর্ষ রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হতে চেষ্টা করবে।[৭১]

১৯৪৫-এর মে মাসে পরিস্থিতির চাপে আজাদী বাহিনীকে যুদ্ধ শেষ করতে হয়। কিন্তু মালয়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য জুন, জুলাই ১৯৪৫-এ দুই ডিভিসন সৈন্য বাহিনী সংগঠনের তৎপরতা পরিদর্শন করছিলেন নেতাজী। তিনি ২০ জুন, ১৯৪৫ ওয়াভেল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নতুনভাবে আবার ভারত ছাড়ো আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান ক্রমাগত। ২১ জুন, ১৯৪৫-এ বলেন : "বর্তমান যুদ্ধকালে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব না হলেও যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা লাভের সুযোগ আমরা পাবো।"[৭২] নেতাজী সাবমেরিনে যাঁদের ভারতে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন অমৃক সিং গিল। তিনি ধরা পড়ে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি ছিলেন। তখন সেখানে বন্দি ছিলেন শ্রীমতী লীলা রায়। তাঁর কাছে গোপনে চিঠি পাঠিয়ে যোগাযোগ করেন গিল 'আলাদীন' ছদ্মনামে। চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ :

"On behalf of my comrades and the Supreme Leader of the Provisional Government of India, the C. I. C. of the Indian National Army, I bring you greetings

The fame of your work and your organising ability is well known not only inside India but also overseas. Your presence at this time in the Far of would have been more beneficial to the "Rani of Jhansi" Regt. East young Indian woman than to be rotting behind prison bars. The day is not far off when you will be free to shine and lead Indian women once again.

I assure you that the Indians outside India will carry their share of the burden in the Freedom Battle as far as is humanly possible under the noble and heroic leadership of Netaji S. C. Bose.

Allahdin"[৭৩]

৭ মে ১৯৪৫ জার্মানিকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। ৬ আগস্ট ১৯৪৫ আমেরিকা জাপানের হিরোসিমায় এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অসংখ্য নিরপরাধ নাগরিককে হত্যা করে। চুক্তির বিরুদ্ধে রাশিয়া জাপানের ওপর যুদ্ধ ঘোষণা করে ৮ আগস্ট ১৯৪৫। দ্রুত ঘটে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৮ আগস্ট তারিখে ১৯৪৫ তাইহোক (ফরমোজা) বিমান দুর্ঘটনার অন্তরালে আত্মগোপন করেন।

Hugh Toye লিখেছেন : "এতে সন্দেহ নাই যে আজাদ-হিন্দ্ বাহিনী তার বজ্রতুল্য ভাঙনের মধ্যেই ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের অবসান ত্বরান্বিত করে দিয়েছিল।"[৭৪]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "বৃটিশ বুঝতে পারলো তারা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে বসে আছে, যে-কোনো মুহূর্তে অগ্নি-উদ্গিরণ ঘটতে পারে। বৃটিশের ভারত ত্যাগের অন্তিম সিদ্ধান্তে সম্ভবত এই বিবেচনাই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" [৭৫]

এই ঘটনা সম্ভব হয়েছিল কি প্রকারে এখানে তারই আলোচনা হবে সংক্ষিপ্তভাবে।

বৃটিশ সরকার বহুসংখ্যক বন্দি আজাদী সৈনিককে ভারতবর্ষে নিয়ে এলে সমগ্র ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে পড়ে তাদের মুক্তির আন্দোলনের আবেগে। ৫ নভেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৫ পর্যন্ত লালকেল্লায় চলে—লেফটেন্যান্ট কর্নেল জি. এস. ধীলন, লে. ক. পি. কে. সাইগল ও মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ খানের বিচারের প্রহসন। ভারতব্যাপী বিপুল গণআন্দোলনের চাপে মকুব করা হয় এঁদের মৃত্যুদণ্ড। শাস্তির প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হয়। মুক্তির পরে হাজার হাজার আজাদী সৈনিক ছড়িয়ে পড়েন নিজেদের ও অন্যান্য গ্রামেগঞ্জে। তাঁদের মুখে আজাদী ফৌজ ও নেতাজীর এযাবৎ অজ্ঞাত অত্যাশ্চর্য কাহিনী শুনে ভারতবাসী বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হন। ১৯৪৬'র ৪ ফেব্রুয়ারি ক্যাপ্টেন রশিদের কারাদণ্ড হলে দিল্লি, বোম্বাই, কলকাতায় পরিলক্ষিত হয় দারুণ হিংসাত্মক আন্দোলন। হিন্দু-মুসলিম জনতা একত্রে রাস্তায় রাস্তায় বৃটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে হাঙ্গামা বাধিয়ে তোলে। নেহেরুজী অকিনলেককে লিখেছিলেন : আই. এন. এ'র জনপ্রিয়তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি আশ্চর্যজনক।[৭৬] পট্টভি সীতারামাইয়া জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে লিখেছেন; "... কিছুকালের জন্য অবশ্য মনে হলো শাহ্‌নওয়াজ, সাইগল, ধীলনের নাম জাতীয় নেতৃবৃন্দের নাম ম্লান করে দিয়েছে। মনে হয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ঔজ্জ্বল্য হ্রাস করে দিয়েছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের।"[৭৭]

রেঙ্গুনে আজাদী সৈনিকদের সঙ্গে বৃটিশ ভারতীয় বাহিনীর লোকদের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে ভারতীয় বাহিনীগুলোতে যে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয় তা অভূতপূর্ব।[৭৮] এই সময় বৃটিশ সরকার বৃটিশ ভারতীয় বাহিনী থেকে পনেরো লক্ষ সৈনিক ও অফিসারকে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তাঁরা দ্রুত বৃটিশ সরকারের ওপর তাঁদের আনুগত্য হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা দেশময় আজাদী সৈনিকদের মর্যাদা লক্ষ্য করে অজ্ঞাতসারে ভারতের স্বাধীনতা সৈনিকে রূপান্তরিত হয়ে যান।[৭৯]

১৯৪৫-এ ধর্মঘট হয় বিমান বাহিনীতে, অন্যদিকে নৌবাহিনীতে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। সমগ্র নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই নৌবিদ্রোহ

বোম্বাই, করাচি, কলকাতা, কোচিন, বিশাখাপত্তম, আন্দামান প্রভৃতি নৌঘাঁটিতে ছড়িয়ে পড়ে। নৌ-বিদ্রোহীদের অন্যতম দাবি ছিল আজাদী বন্দিদের মুক্তি। বিদ্রোহীরা নৌ-বাহিনীর নাম বদল করে রাখলেন "ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল নেভি"। নৌ-বাহিনীর ৭৮টি জাহাজ এবং তীরবর্তী ঘাঁটিগুলোর কর্মীবৃন্দ যোগদান করেন এই বিদ্রোহে। বোম্বাইতে ধর্মঘটে যোগ দেন ৭০০০ নৌসেনা।[৮০] কংগ্রেস এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে অগ্রসর হয় নি তাদের অনীহার ফলে। ড. কে. কে. ঘোষ তাঁর গবেষণা পুস্তকে (Indian National Army) ঠিকই লিখেছেন : "কংগ্রেস ভারতে যে বিপ্লবাত্মক জোয়ার সৃষ্টিতে সাহায্য করলো তাতে নেতৃত্ব দেয়ার অনিচ্ছা ও সম্ভবত অক্ষমতার জন্য তাঁরা সেই অবস্থা দমনে বৃটিশের মতো আগ্রহান্বিত হয়ে পড়লো।"[৮১]

১৯৪৬-এর মার্চে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বললো এ সময় বিপ্লবাত্মক ঘটনা কংগ্রেসের পথের বাধাস্বরূপ।[৮২] এই সময় দেশের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ছিল অগ্নিগর্ভ। বৃটিশ অবস্থা বুঝে ভারত ত্যাগে উদগ্রীব হয়ে তা কার্যকর করতে গোপন এবং হীন পরিকল্পনা রচনায় ব্যস্ত হলো। দেশের মধ্যে তখন স্বাধীনতার আবেগে সকল শ্রেণীর, সম্প্রদায়ের মানুষের ঐক্য ছিল অভূতপূর্ব। নৌবিদ্রোহের পর পাঁচ মাসের মধ্যে ১৬ আগস্ট, ১৯৪৬ মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকে কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হলে প্রাণবলি হয় হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের। আহত হন অসংখ্য। বৃটিশ সরকার নীরব থেকে বোঝালো তারাও চাইছিল এমন ঘটনা। এরপর দেশময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হলেন ১০ লক্ষ মানুষ, দু' লক্ষ নারীর হলো সর্বনাশ। বৃটিশ চক্রান্তে রক্তনদীর ওপর দাঁড়িয়ে বৃটিশ দেশভাগ করে বিদায় নেয়। সুভাষচন্দ্র বলেন, "আমি নিশ্চিত জানি পাকিস্তান স্বীকৃত হলেও সমস্যার সমাধান হবে না।"[৮৩]

প্রাক্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড এ্যাটলি কলকাতার গভর্নর হাউসে (১৯৫৬) তদানীন্তন অস্থায়ী রাজ্যপাল প্রধান বিচারপতি পি. বি. চক্রবর্তীকে বলেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের ফলে বৃটিশ ভারত বাহিনীগুলোর মধ্যে বৃটিশের প্রতি আনুগত্য শিথিল হয়ে যাওয়াই বৃটিশ শক্তির ভারত ত্যাগের কারণ।[৮৪]

পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রমাণ করে ধর্মই জাতীয় ঐক্যের একক মাপকাঠি নয়। এই উপমহাদেশে ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনের কারণগুলোর বিশ্লেষণ করবেন ভাবীকালের ইতিহাসকারগণ। আজ এই বিশাল অঞ্চলের ঐক্যের উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক বিষয়। ভাষার ঐক্যও অন্যতম উপাদান। অঞ্চলের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক উন্নতিতে কালের নিরিখে উল্লিখিত উপাদানগুলোর অবদান পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় সমাগত। আঞ্চলিক ঐক্য মানবতার ঐক্যেরও দিশারি হবে।

তথ্যসূত্র

1. Subhas Chandra Bose, *Indian Struggle*, P. 5
2. Ibid, P. 20
3. R. C. Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, Vol I. P. 16
4. *Indian Struggle*, P. 13
5. R. C. Majumdar. op. cit PP. 141-43
6. Ibid. P. 145
7. Ibid. P. 147
8. Ibid. P 157
9. Ibid. PP. 198-99
10. Ibid. P. 199
11. Ibid, P. 219
12. Ibid, P. 273
13. Ibid. P. 274
14. Ibid. PP. 283-85
15. *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, খণ্ড ৬, পৃ. ১৪৯
16. তদেব. খণ্ড ১০, পৃ. ২৩৮
17. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, *স্বামী বিবেকানন্দ*. পৃ. ২
18. মহেন্দ্রনাথ দত্ত, *লন্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ*, পৃ. ১৫৬
19. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পূর্বোক্ত পৃ. ২
20. R. C. Majumdar, op. cit. Vol I. P 455-59
21. *Indian Struggle* P. 21
22. R. C. Majumdar, Vol III. P. 7
23. Ibid, op cit. P. 8
24. Ibid, op. cit. P. 20-21
25. R. C. Majumdar, Vol II. P 440
26. R. C. Majumdar, op. cit. Vol III. P 308
27. Ibid, op. cit. P. 434-35
28 *Indian Struggle*, P. 157
29. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, *সবার অলক্ষ্যে* পৃ. ২২৭
30. নলিনীকিশোর গুহ. *বাংলার বিপ্লববাদ* পৃ. ৩৬১

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, *জেলে ত্রিশ বছর* পৃ. ১৫৬

31. *জেলে ত্রিশ বছর*, পৃ. ২০১ এবং *Freedom Struggle and Anuishilan Samiti*, Buddhadeva Bhattacharyya Edited P. 232
32 *জয়শ্রী সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ*, পৃ. ৬৬০
33. তদেব, পৃ. ৬৫৯
34. তদেব, পৃ. ৬৬০
35 তদেব, পৃ. ৬৩০
36 মনোরঞ্জন ঘোষ, *চট্টগ্রাম বিপ্লব* পৃ. ৭৯
37 *সবার অলক্ষ্যে...*, পৃ. ২১৯
38. Subhas Chandra Bose . *Crossroads* P. 173
39. *Indian Struggle*, P. 405
40. Ibid. P. 340
41. R. C Majumdar. Vol III, P. 600-01
42 *সবার অলক্ষ্যে...* পৃ. ১৪৬
43. *জেলে ত্রিশ বছর* পৃ. ২০১-০৭
44. *সুভাষ রচনাবলি* (৬) জয়শ্রী প্রকাশন পৃ. ১৪
45. শিশির কুমার বসু, *মহানিষ্ক্রমণ* পৃ. ৩০
46. *Indian Struggle*, P. 432
47. Ibid P. 344
48. Ibid
49. জয়শ্রী, আষাঢ় সংখ্যা ১৩৭৭ পৃ. ১৪৯
50. Maulana Abul Kalam Azad. *India Wins Freedom*, P. 47
51. Ibid P. 67
52. R. C. Majumdar Vol III. P. 626
53. *সুভাষ রচনাবলি* (৬) পৃ. ৭৬
54. Michael Edwards, *The Last Years of British India* P. 90
55. Azad. op cit. P. 40
56. *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose*, Publication Divnsion. Government of India P. 140
57. R. C. Majumdar, Vol III, P. 635
58. Ibid, P. 636
59. Ibid, P. 658
60. Ibid. P. 681
61. Ibid, P 688-89
62. *Selected Speeches* P. 147-53

63. N. G. Gunguley, *Netaji in Germany* P. 182
64. Kesar Singh Giani, *Indian Independence Movement in East Asia*, P. 103-04
65. Arun, *Testament of Subhas Bose* (1942-45) P. 271
66. Major General A. C. Chatterjee, *India's Struggle for Freedom* P. 137-38
67. ক্ষণেশ্বর ঘোষাল, *নেতাজী ও আজাদ-হিন্দ ফৌজ*, জয়শ্রী প্রকাশন, দ্রষ্টব্য দ্বিতীয় অধ্যায়-তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পঞ্চাশের মন্বন্তর ও বেদনাতুর নেতাজী
68. Hugh Toye, *The Springing Tiger* P. 120
69. ARVN P. 172
70. *Indian Struggle*, P. 104-113
71. Ibid, PP. 119-20
72. Shah Nawaj Khan, *My Memories of INA & Its NETAJI*, P. 264
73. জয়শ্রী সুবর্ণ জয়ন্তী গ্রন্থ পৃ. ৬৩৯
74. Hugh Toye. op. cit. P. 191
75. R. C. Majumdar, Vol III, P. 737
76. K. K. Ghosh, *The Indian National Army*, P. 224
77. Dr. Pattavi Sitaramayya, *The History of the Indian National Congress* P. 784
78. Hugh Toye, op. cit. P. 186
79. K. K. Ghosh, op. cit. P. 228
80. আনন্দবাজার পত্রিকা ২০ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬
81. K. K. Ghosh, op.cit. P. 267
82. Ibid P. 237
83. *Selected Speeches* P. 223-25
84. জয়শ্রী, আষাঢ় সংখ্যা

অনন্য বিপ্লব-সাধক জীবনশিল্পী : লীলা নাগ

নি বে দি তা দা শ পু র কা য় স্থ

পরিবার পরিচিতি

অনন্য বিপ্লব-সাধক জীবনশিল্পী লীলা নাগের জন্ম ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর। তাঁর পৈতৃক নিবাস শ্রীহট্ট জেলার মৌলভীবাজারের পাঁচগাঁও গ্রামে। পিতা গিরিশচন্দ্র নাগ ছিলেন অসম্ভব প্রতিভাবান। বাল্য ও কৈশোরে দারিদ্র্যের সাথে কঠোর সংগ্রামের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ পরীক্ষায় দর্শনে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পূর্বেই তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষের ব্যবস্থাপনায় কটক র‍্যাভেনশ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে অধ্যাপনা পেশা ত্যাগ করে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। অল্পকাল পরে তিনি বাংলা আসাম সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। কন্যা লীলার জন্মের সময় তিনি আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জিলার মহকুমা হাকিম ছিলেন। ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জে সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে তাঁর অফিসে অভিযুক্ত এক ইংরেজ আসামিকে ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পরামর্শে লঘু সাজা দিতে রাজি না হওয়ায় তাঁর প্রমোশন বন্ধ করে দেয়া হয়। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি দিল্লির কেন্দ্রীয় আইন সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। এক বছর পর 'লবণ কর' প্রবর্তনের প্রতিবাদে তিনি সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দান করেন।

লীলা রায়ের মার নাম কুঞ্জলতা নাগ। মার প্রভাবে কিশোরী লীলার জীবনে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ অঙ্কুরিত হয়। কৈশোরে পারিবারিক পরিবেশে স্বাদেশিকতার প্রভাবে লীলা বেড়ে ওঠেন। বঙ্গভঙ্গের পর বিলাতি বস্ত্র বর্জন, ক্ষুদিরামের শহীদ হওয়ার পুণ্য তিথিতে গৃহে অরন্ধন ও বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের জীবনী আলোচনা, রামায়ণ মহাভারত পাঠ—এই পরিবেশেই তাঁর কিশোর মানসের আদর্শ নিষ্ঠার, স্বাদেশিকতা ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের রেখাপাত নিয়ে ছাত্রী জীবনে প্রবেশ।

শিক্ষা জীবন

তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের শুরু দেওঘরে। সেখান থেকে কলকাতার ব্রাহ্ম গার্লর্স স্কুলে। এরপর ১৯১১ থেকে ১৯১৭ সাল একটানা সাত বছর ঢাকার ইডেন হাইস্কুলে পড়েন। শেষে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। ১৯১৬ সালে তাঁর পিতা অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ঢাকায় চলে আসেন। ১৯১৭ সালে ঢাকা থেকে লীলা পড়তে যান কলকাতার বেথুন কলেজে। পড়াশোনায় তিনি বরাবরই ভালো ছিলেন। পড়াশোনা ছাড়াও খেলাধূলায় তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তিনি ছাত্রীজীবনে নিয়মিত টেনিস, বেডমিন্টন, হাডুডু খেলতেন। কলেজের যে-কোনো আনন্দোৎসবে আগ্রহের সাথে অংশ নিতেন। বহুমুখী প্রতিভা ও মিষ্টি স্বভাবের জন্য তিনি সবার প্রিয়পাত্রী ছিলেন। অধ্যাপক ও অধ্যক্ষার অত্যন্ত স্নেহভাজন ছাত্রী ছিলেন। জনপ্রিয়তার কারণে তিনি সহজেই কলেজের 'সিনিয়র স্টুডেন্ট' নির্বাচিত হন।

কলেজের রি-ইউনিয়নের উদ্যোক্তা তিনি। লোকমান্য তিলকের মৃত্যুদিবস উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে কলেজ অধ্যক্ষার সাথে যে সংঘাত হয় তারই পরিণতিতে তিনি ছাত্রী-ধর্মঘটের আহ্বান জানান। বড়লাট পত্নীকে নতজানু হয়ে অভিবাদন জানানোর প্রথা উচ্ছেদের সংগ্রামে তিনি কলেজের ছাত্রীদের নেতৃত্ব দেন।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনগত বাধা না থাকলেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা তখনও প্রবর্তিত হয় নি। কিন্তু লীলার অনমনীয় দৃঢ়তাও স্বচ্ছ একাগ্রতার জন্য স্যার বিরন উপাচার্য প্রথম হার্টগ লীলাকে মাস্টার্স ক্লাসে ভর্তির ব্যবস্থা করলেন। লীলা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী।

১৯২৩ সালে লীলা নাগ ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ পাস করেন। পরীক্ষা পাসের পর বাংলার নারী সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন অভিশপ্ত জীবনে জ্ঞানের আলো বিকিরণের উদ্দেশ্যে বারোজন সাথি নিয়ে 'দীপালি সংঘ' গড়েন। এই বারোজনের মধ্যে ছিলেন ঠাকুর পরিবারের এনা রায়, ব্যারিস্টার পি. কে. বসুর কন্যাদ্বয় কমলা বসুও মনোরমা বসু, ব্রাহ্মসমাজের ডা. নেপাল রায়ের দুই কন্যা লতিকা রায়ও লীলা রায়, সিলেট মুরারীচাঁদ কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অপূর্বচন্দ্র দত্তর কন্যা বীণা দত্ত এবং সরোজ বসু। ছাত্রী থাকাকালীন অবস্থায় তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক রামানন্দের সান্নিধ্য লাভ করেন। জীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্তব্য নিয়ে তাঁর মনে এ সময় বিরাট একটি দ্বন্দ্ব ছিল। অবশ্য এ দ্বন্দ্বের অবসানও ঘটেছিল। তিনি তাঁর বাবাকে লিখেছিলেন 'আমার উদ্দেশ্য এই পৃথিবীতে খাঁটি হওয়া।'

নারীমুক্তি আন্দোলন : দিপালী সংঘের প্রতিষ্ঠা

'দীপালি সংঘ' স্থাপনের পর এর বিস্তৃতির দিকে লীলা মনোযোগী হন। পাড়ায় পাড়ায় এর শাখা স্থাপিত হয়। গড়ে ওঠে ছাত্রীদের জন্য স্টাডি সার্কেল। লীলা

নাগের চেষ্টায় গড়ে ওঠে নারী শিক্ষা মন্দিরসহ বারোটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল এবং শিল্প শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। ১৯২৪ থেকে শুরু হয় দীপালি প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনী বাংলার নারী সমাজকে পৌঁছে দেয় নারীমুক্তি সংগ্রামের এক নব দিগন্তে। ১৯২৬ সালে লীলা নাগ গঠন করেন দীপালি ছাত্রীসংঘ। এর মধ্য দিয়ে ছাত্রীদের প্রাণ-স্পন্দনের উদ্বেলতা পায় সংহত রূপ। একই বছর লীলা গঠন করেন 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'। পুলিন দাসের তত্ত্বাবধানে মেয়েরা শেখেন অস্ত্র চালনা ও লাঠি খেলা। একই বছর ঢাকায় দায়ভাগের বিরুদ্ধে লীলা জনসমক্ষে সর্বপ্রথম ভাষণ দেন। এই ভাষণ শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। নারীদের ভোটাধিকারের দাবি, আর্তত্রাণ ও অন্যান্য সমানাধিকারের দাবিতেও লীলা সোচ্চার ছিলেন। 'সারা বাংলা নারী ভোটাধিকার' কমিটির সহ-সম্পাদিকা হিসেবে কাজ করেন।

১৯২৬ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় দীপালি সংঘের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'এশিয়ায় এতো বড় মহিলা সমাবেশ আর কখনও দেখি নাই'। রবীন্দ্রনাথ লীলাকে শান্তিনিকেতনের কাজের ভার নিতে বলেছিলেন। কিন্তু লীলা কবিগুরুর অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নি। লীলার পথ আলাদা। যে কারণে তিনি কবিগুরুর অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন নি, সেই একই কারণে 'সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির' দায়িত্ব গ্রহণের জন্য গুরুসদয় দত্তের আহ্বানেও সাড়া দিতে পারেন নি।

মেয়েদের প্রতি অন্যায়-অবিচারও অসম্মানের বিরুদ্ধে লীলার চিরদ্রোহী মন ধীরে ধীরে অনিবার্যভাবে প্রসারিত হলো মাতৃভূমির পরাধীনতার পুঞ্জীভূত অবমাননা ও বেদনার অবসান সঙ্কল্পে।

বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ

১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে বাংলার বিপ্লবী দলগুলো সুভাষ চন্দ্রের চারপাশে সমবেত হতে থাকে। সহকর্মীদের সাথে-অনিল রায় ও লীলা নাগ সেখানে উপস্থিত হলেন। লীলা নাগ তখনও বিপ্লবী দলের নেপথ্যে রয়েছেন। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে বাংলার নারী আন্দোলনের ইতিহাস উপস্থাপনের সময় লীলা মঞ্চে উঠেন। বিপ্লবী দলে যোগদানের পথ এরই মধ্য দিয়ে প্রশস্ত হয়।

এই কয় বছরের মধ্যে দীপালি সংঘের বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে। দলে দলে মেয়েরা এর পতাকা তলে সমবেত হতে থাকে। বিপ্লবী নেত্রী লীলা নাগের কাছে দলের ছেলেরাও আসতেন নানা আলোচনার উন্মুখতা নিয়ে। দীপালি সংঘের নেত্রীরূপে লীলার সঙ্গে গণআন্দোলনের সম্পর্ক ছিল। শ্রীসংঘে যোগদানের পর বিপ্লবী আন্দোলনেও তিনি অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেলেন প্রথম সারিতে। এই দুই প্রকৃতির আন্দোলনের সাথে যুক্ত থেকে তিনি এগিয়ে চললেন। শহীদ যতীন দাসের লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনে আত্মাহুতির সশ্রদ্ধ স্মরণে, কলকাতার

মনুমেন্টের পাদদেশে সুভাষচন্দ্রের ওপর লাঠি চালনার প্রতিবাদে লীলা নাগের নেতৃত্বে ঢাকায় উদ্বেলিত জনসমুদ্রের শোভাযাত্রা সেদিনকার ভারতবর্ষে অতুলনীয়। ১৯৩০ সালে লীলা নাগের নেতৃত্বে গঠিত 'মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি'র উদ্যোগে ঢাকার মহিলারা লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দেন। এই আন্দোলনে লীলার অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন আশালতা সেন। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে প্রকাশ্য গণসংগ্রামের আড়ালে লীলা বৈপ্লবিক সংগ্রামের দায়িত্বও বহন করে চলেছেন।

১৯৩০-এর ১২ মার্চ ৭৯ জন সত্যাগ্রহী নিয়ে আরব সাগরতীরে ডান্ডিতে লবণ আইন ভঙ্গের জন্য গান্ধীজী পদযাত্রা শুরু করেন। ৬ এপ্রিল ডান্ডিতে তিনি আইন অমান্য করলেন। ১৮ এপ্রিল মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের মতো দুর্ধর্ষ বৈপ্লবিক অভিযান শুরু হয়। বাংলার সব বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয়দের ইংরেজ সরকার একযোগে দ্রুত গ্রেফতার করে। লীলা নাগের ঘনিষ্ঠ সহযোগী শ্রীসংঘের নেতা অনিল রায় ও তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই গ্রেফতার হন। কেউ কেউ আত্মগোপন করেন। তখন শ্রীসংঘের সর্বময় নেতৃত্বের দায়িত্ব লীলা নাগের কাঁধে বর্তায়। শ্রীসংঘে লীলার যোগদানের অল্প পর পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়। দলের সর্বময় নেতৃত্বভার সহসা লীলার ওপর এসে পড়াতে তিনি দুটো কাজে মন দিলেন—১. গঠনমূলক কার্য থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা ২. দলের সংহতি সাধন। নারীশিক্ষা মন্দিরের উষা রায় লীলার সহযোগী সহকর্মী ছিলেন। কাজেই তার ওপর গঠনমূলক কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিলেন লীলা। তাঁর সকল কাজের সহায়ক ছিলেন দুই আত্মগোপনকারী সহকর্মী–শহীদ অনিল দাস ও অনিল ঘোষ। দলের নেতৃত্বভার গ্রহণের পরই দলে দলে নতুন মেয়েরা এলেন দীপালি সংঘের যোগাযোগে শ্রীসংঘের পরিধিতে। ঢাকার ইডেন স্কুল ও কলেজ এবং কলকাতার ১১, গোয়াবাগানে প্রতিষ্ঠিত ছাত্রীসংঘ এবং ছাত্রীভবনই হলো শ্রীসংঘের মেয়ে সদস্যদের উৎস। এই মেয়েরাই পরে শ্রীসংঘে সংগঠকের ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে রেণু সেন, সুশীলা দাশগুপ্ত, লাবণ্য দাশগুপ্ত, প্রমীলা গুপ্ত, সুরমা দাস, হেলেনা দত্ত, অশ্রুকণা সেন, আশা রায়, উমাদেবী, ছায়াগুহ, প্রভা চৌধুরী, গৌরী সেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লীলা রায়ের সাথে অন্তরীণ হন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজে সক্রিয় ছিলেন রমা সেন, সুলতা ঘোষ, মাধুরী বসু, যূথিকা মিত্র, ফুলু চৌধুরী, শান্তি বসু, সাগরিকা ঘোষ, উমা সেন, বাসনা মুখার্জি, বীণা সেনগুপ্ত, অমিতা চৌধুরী, সুলেখা ঘোষ,অঞ্জলি রায়, হাসিকণা রায়, আরতি গুপ্ত, সতী দত্তগুপ্ত, বাসনা ঘোষ, চন্দ্রা বসু, অনিমা সেন, মিলন সেন, পুষ্পরেণু বসু, সুহাসিনী সেন, নীলিমা মিত্র, কণা সেনগুপ্ত, লীলা সেন, বন্দনা গুপ্ত, অলকা চৌধুরী, দীপ্তি চৌধুরী, বিউটি ঘোষ, শান্তি চক্রবর্তী, সান্ত্বনা দাস শর্মা প্রমুখ।

শ্রীসংঘের সদস্যরা সশস্ত্র বিপ্লব পরিচালনা করার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও বোমা তৈরি করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে অনার্সের ছাত্র অনিল দাস

(পরে শহীদ হন) ও শৈলেশ রায় (পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়ন বিভাগের প্রধান) বোমার ফর্মুলা নিয়ে কাজ করেছেন। ক্ষিতীশ রায় করেছেন সহায়তা। বোমার খোল তৈরি করেছেন ধীরেন পোদ্দার। বোমার খোলের ভালো নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন অনিল রায়। বোমার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করতেন লীলা নাগ। বোমার ফর্মুলার প্রয়োগের সাথে যুক্ত ছিলেন সঙ্গতটোলার সুরেশ কর, বঙ্গেশ্বর রায়, ছোট বিনয় বসু। অমল রায়, রেণু সেন ও নৃপেশ চক্রবর্তীকে নিয়ে অস্ত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে লীলা নাগ নিজে বারবার কলকাতা আসা-যাওয়া করেছেন। ছাত্রীভবনের মাসিমা কুমুদিনী সিংহের যুগীপাড়া বাইলেনের বাড়িটি ছিল বিপ্লবীদের মিলনক্ষেত্র। শ্রীসংঘের সদস্য-সমর্থকরা যোগাযোগ রক্ষার্থে এই বাড়িটি ব্যবহার করতেন। ছাত্রীভবনের সদস্যরা অস্ত্র সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, মামলার জন্য লীলা নাগ ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের ইন্দুমতি সিংহকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে দেন। সূর্য সেনের পরামর্শে অবিভক্ত ভারতের প্রথম নারী বিপ্লবী শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার দীপালি সংঘের সদস্যা হয়ে বিপ্লবী জীবনের পাঠ নিয়েছিলেন লীলা নাগের কাছে।

লীলা নাগ অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করে ঢাকায় ফিরে দলের সংহতি সাধন ও বৈপ্লবিক কর্মোদ্যমকে অগ্রাধিকার দেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দলের বিপ্লবীরা আগ্নেয়াস্ত্রের দাবি নিয়ে হাজির হতে থাকেন লীলার কাছে। বড়লাট লর্ড উইলিংডনের ট্রেনে বোমা নিক্ষেপের পরিকল্পনা করেছেন অতীন বসুরা। বোমার ফর্মুলার প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছেন সংশ্লিষ্ট বন্ধুরা। অ্যাকশনের পরিকল্পনা করেছেন কমলাকান্ত ঘোষ। চলছে পরিকল্পিত স্টিভেন্স নিধনের প্রস্তুতি পর্ব। ঢাকার বিভিন্ন পল্লীতে অস্ত্রের ঘাঁটির রক্ষক ছিলেন মেয়েরা। ঢাকার বকশীবাজার, চাঁদনি ঘাট, আজিমপুর, কায়েতটুলী, টিকাটুলি, ওয়ারি, ঠাটারিবাজার, বনগ্রাম, তাঁতিবাজার, সঙ্গতটোলা, বাংলাবাজার, গেন্ডারিয়া, ফরাশগঞ্জ, লক্ষ্মীবাজার, সিদ্ধেশ্বরী ছিল অস্ত্রের ঘাঁটি। এখান থেকে পূর্ববাংলায় অস্ত্র সরবরাহ করা হতো। কলকাতার সরবরাহ কেন্দ্র ছিল ছাত্রীভবন এবং ৩১, কানাই ধর লেন। কানাই ধর লেনে শ্রীসংঘের সদস্যদের পরস্পরের মিলন কেন্দ্র ছিল। শ্রীসংঘ দ্বিধাবিভক্তির পর দলের যারা বি. ভি.তে যোগ দিয়ে বৈপ্লবিক কর্মে জড়িত ছিলেন তাদের অনেকেই এই বাড়িতে অস্ত্র বিনিময় ও সহযোগিতার জন্য আসা-যাওয়া করতেন। শ্রীসংঘের নেপাল নাগ, অশোক সেন (পরে ভারতের আইনমন্ত্রী), সত্যভূষণ গুহ বিশ্বাস, বিধুভূষণ গুহ বিশ্বাস, অমিত ঘোষ, জ্যোৎস্না সরকার এই ঘাঁটিতে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। বি.ভি.র সুপতি রায়, মনোরঞ্জন সেন, শশাঙ্ক দাশগুপ্ত প্রমুখরা আসতেন।

১৯৩১-এর অক্টোবর মাসে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডুরনোর ওপর গুলিবর্ষণের মামলায় গ্রেফতার হওয়ার দু'মাস পর সুনীল দাস কারামুক্ত হন। কারামুক্তির পর লীলা নাগের নির্দেশে কলকাতায় দলের সাংগঠনিক কাজ তদারক করতে আসেন। কলকাতায় আসার অল্পদিন পর কলকাতা থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ঢাকা নিয়ে

যাওয়ার জন্য লীলা নাগের নির্দেশে অশোক সেনের হাতে তুলে দেন। যুগান্তর এবং অন্যান্য বিপ্লবী গোষ্ঠীর সহযোগে কলকাতায় একটি গোপন কো-অর্ডিনেশন বোর্ড তৈরি হয়। এই বোর্ড গঠনে লীলা নাগ যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁরই নির্দেশে সেই বোর্ডের সদস্য হিসেবে শ্রীসংঘের কান্তি ঘোষ মনোনয়ন পান।

১৯৩০ সালে ঢাকা শহরে ডুরনোর ওপর দিনের বেলায় গুলিবর্ষণের অভিযোগে ৩৩টি বাড়িতে পুলিশের নির্মম অভিযান ও সন্ত্রাস চালানো হয়। এই সন্ত্রাস ও বিভীষিকার তদন্তের জন্য সুভাষচন্দ্র বসু ও জে. এম. সেনগুপ্ত ঢাকায় আসেন। লীলা নাগ এ সময় অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের কাজে কলকাতায় ছিলেন। ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের একে একে গ্রেফতার করে পুলিশ তাঁকে অচল করে দেয়ার চেষ্টা চালায়। ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিটেনডেন্ট কোটাম তাদের বাড়ি তছনছ করতে গিয়ে বারবার প্রশ্ন করেছেন 'লীলা কোথায়?' পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ি সংলগ্ন শ্রীসংঘের দীর্ঘদিনের পাঠাগার ও ব্যায়ামাগারে পেট্রোল সংযোগে আগুন লাগান।

১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর বিনয়-বাদল-দীনেশের দুর্ধর্ষ রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের পর বিপ্লবীদের কার্যকলাপ আরো জোরদার হয়। ১৯৩১ সালের এপ্রিলে বি. ভি.র সদস্যদের গুলিতে পরপর তিনজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং আলিপুরের জেলা জজ গার্লিক ও কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স নিহত হন। ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সের হত্যাকাণ্ডের সাথে দু'জন তরুণী জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর দীপালির প্রদর্শনীর কাজ সেরে বাড়ি ফেরেন লীলা নাগ। বাড়ি ফেরার পর সেই রাতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়।

লীলা নাগ ভারতবর্ষে বিনাবিচারে আটক প্রথম মহিলা রাজবন্দি। লীলা নাগের গ্রেফতারের পর আরো অনেক মহিলা সহকর্মী গ্রেফতার ও বন্দি হন। কেউবা বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কৃত হন। জেলে গিয়ে লীলা নাগ কর্মীদের দলের সাংগঠনিক সংহতিকে বৈপ্লবিক ধারার মধ্য দিয়ে সক্রিয়দিকাভিমুখী করার নির্দেশ দেন। নেত্রীর নির্দেশে এ কাজের দায়িত্ব কাঁধে নেন অনিল দাশ। তাকে সহায়তা করেন অনিল ঘোষ।

দীর্ঘমেয়াদি কারাজীবনে লীলা নাগ মহিলা রাজবন্দিদের লেখাপড়ায় উৎসাহ যুগিয়েছেন। কাউকে ম্যাট্রিক, কাউকে বি. এ. অনার্স, কাউকে-বা এম. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবী অনন্ত সিংহের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইন্দুমতী সিংহকে জেলে থাকাকালীন অবস্থায় ম্যাট্রিক পাস করিয়েছেন লীলা নাগ। ইংরেজি না জানা বয়স্ক ছাত্রীকে পড়ানোর কৌশল তাঁর জানা ছিল বলেই ইন্দুমতিকে পড়িয়ে তিনি প্রচুর আনন্দ পেতেন। ইন্দুমতির সাথে এমনিতেই তাঁর হৃদ্যতা ছিল। গ্রেফতারের পূর্বে ঢাকার বিভিন্ন মহলে ইন্দুমতিকে সাথে করে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিচারাধীন বন্দিদের মামলা পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থও সংগ্রহ করে দেন।

১৯৩৬-এর সাধারণ নির্বাচনে ঢাকার মহিলা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে তিনি মনোনয়ন পান। কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় তিনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন নি। তাঁর পরিবর্তে হেমপ্রভা মজুমদার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৩৭-এর অক্টোবরে লীলা নাগ কারামুক্ত হন। কারামুক্তির আগেই অন্য সহকর্মীদের সাথে গোপন যোগাযোগ হয়। ফলে বাইরের পরিস্থিতি কিছুটা আঁচ করতে পারেন। ৮ অক্টোবর মুক্তি পাওয়ার পর তাঁর কর্মতৎপরতা আগের মতো শুরু হয়ে যায়। ১৯৩৮ সালে সিলেটের বিশাল মহিলা সম্মেলনে বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন লীলা। কারামুক্তির পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গৌরীপুর লজ থেকে একটি চিঠি লেখেন। ১৯৩৮-এর গোড়ার দিকে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ঢাকা সফরে এসে লীলাকে তাঁর পার্টিতে যোগ দেয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু মার্কসবাদভিত্তিক দলে যোগ দিতে লীলা সম্মত হলেন না। ১৯৩৮-এর জুলাই মাসে কলকাতার ২২ সি অশ্বিনী দত্ত রোড থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে 'জয়শ্রী' প্রকাশিত হয়। রেণু সেনের উদ্যোগে লীলা নাগ ঢাকা থেকে কলকাতায় জয়শ্রীর দফতর বদল করেন। জয়শ্রী প্রকাশিত হলে কবিগুরু আশীর্বাদ জানালেন 'মান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও, নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি।' আরো অভিনন্দন জানালেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, হাজেরা বেগম, কাকা সাহেব কালেলকার এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

১৯৩৮-সালে ৩ আগস্ট তারিখে কারামুক্তি ঘটে অনিল রায়ের। ৬ আগস্টে তিনি ঢাকা পৌঁছেন। ইতোমধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। কংগ্রেসের পরিধিতে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যেতে হবে। এই বোধের আলোকে অনিল রায় ও লীলা নাগের নেতৃত্বে 'শ্রীসংঘ' রূপান্তরিত হলো একটি আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে। এই গোষ্ঠীকে নিয়ে তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দেন। অল্পদিনের মধ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে চিহ্নিত হন। 'জয়শ্রী' এই মতাদর্শের বাহকরূপে পরিচিত হয়।

রাজনীতি লীলা নাগের প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ালেও নারীমুক্তি সংগ্রাম, শিক্ষা বিস্তার এবং অন্যান্য গঠনমূলক কাজের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। ঢাকায় নারী শিক্ষা মন্দির (বর্তমানে শেরে বাংলা স্কুল ও কলেজ)ও শিক্ষাভবন পুনর্গঠিত হয়। অনিল রায়ের মাতুলালয় মানিকগঞ্জের রায়রা গ্রামে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষক সন্তানদের জন্য একটি হাইস্কুল স্থাপন করেন। লীলা নাগ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে 'কংগ্রেস মহিলা সংঘ' স্থাপনের প্রস্তাব আনেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করেন সুভাষচন্দ্র। দলমত নির্বিশেষে বাংলার সব মহিলাকর্মী এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হন। জাতীয় সংগ্রামের সাথে নারী সমাজকে সংহত করার প্রথম উদ্যোগ লীলা নাগের নেতৃত্বেই নেয়া হয়। পরবর্তীকালে এই উদ্যোগের অনুসরণেই জন্মলাভ করে

কংগ্রেসের মহিলা সাব-কমিটিগুলো। হরিপুর কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা উপকমিটির রিপোর্ট রচনা করেন লীলা নাগ। ১৯৩৯-এর জানুয়ারিতে ত্রিপুরা কংগ্রেসের পূর্বে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সম্মেলনে জাতীয় দাবি সম্পর্কিত 'চরমপত্র' প্রস্তাবের উত্থাপক সুভাষচন্দ্র এবং সমর্থক লীলা নাগ।

ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান

ত্রিপুরীতে গান্ধী নেতৃত্বের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আপোসহীন নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব বাধে। ফলে অনিল রায় ও লীলা নাগ সুভাষচন্দ্রের মত ও পথের ঘনিষ্ঠ সহযাত্রী হয়ে আসেন। বিদ্রোহী কংগ্রেস কমিটি, ফরওয়ার্ড ব্লক ও বামপন্থী সংহতি গঠনে সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁরা সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। রাজনীতির গতিরোধের মধ্যে ১৯৩৯ সালের ১৩ মে লীলা নাগ ও অনিল রায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পরই লীলা নাগ লীলা রায় নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। এই মাসে তারা দু'জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরূপে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। এরপর শুরু হয় সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে তাঁদের ঢাকা, মানিকগঞ্জ সফর। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনা।

১৯৪০ সালের ২৭ জুনে নাগপুরে ফরওয়ার্ড ব্লকের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র। মূল প্রস্তাব উত্থাপক ছিলেন লীলা রায়। প্রস্তাবের বক্তব্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান ছিল। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত 'আমাদের দাসত্বের ও অবমাননার প্রতীক হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ করতে হবে' (সুভাষচন্দ্র বসু, ২৭. ৬. ৪০)। শুরু হয় হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণের আন্দোলন। ২ জুলাই, ১৯৪০ তারিখে গ্রেফতার হন সুভাষচন্দ্র। একই আন্দোলনে গ্রেফতার হন অনিল রায় ৯ জুলাই এবং লীলা রায়, ১০ জুলাই তারিখে। এরা মুক্তি পান ২৯ আগস্টে। জেল থেকে সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ পেয়ে সুভাষ বসু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সম্পাদনার ভার নিতে হয় লীলা রায়কে।

১৯৪১ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে অনিল রায় ও লীলা রায়ের শেষ সাক্ষাৎ হয়। অন্তর্ধানের পূর্বে সুভাষ তাঁদেরকে উত্তর ভারতে সংগঠন ও আদর্শ প্রচারের ভার নিতে বলে যান। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লকের সভাপতি সর্দার শার্দূল সিং কবিশ কলকাতায় আসেন। তিনি লীলা রায় ও অনিল রায়কে জানান যে সুভাষ চন্দ্র ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে তিনটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তার একটি ছিল লীলা রায়ের নামে। সে চিঠি লীলা রায়ের হাতে অবশ্য পৌঁছায় নি।

১৯৪১ সালের মে মাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে। নরসিংদী থানার রায়পুরা অঞ্চলে দাঙ্গার প্রকোপ ঘটে ভয়াবহ। শরৎচন্দ্র বসুকে ঢাকা ও রায়পুরা যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন লীলা রায়। পাকিস্তানের লাল সঙ্কেত হচ্ছে রায়পুরা দাঙ্গা।

মহিলাদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন ও স্বাবলম্বী করে তোলা এবং আত্মরক্ষার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে ঢাকার 'শিক্ষাভবন' স্কুল প্রাঙ্গণে 'দীপালি সংঘের' অনুসরণে লীলা রায় একটি মহিলা সংগঠন স্থাপন করেন। এই সংগঠনের নামকরণ করা হয় 'নাইনটিন ফরটিওয়ান ক্লাব ও যুগদাবী চক্র'। এই ক্লাব উদ্বোধন করেন দার্শনিক-শিক্ষাবিদ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান। স্বল্পকালের মধ্যে এই ক্লাবটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীমহলে এবং স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে। যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন তীব্রতর হলে এই ক্লাবটি সরকারের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণের পর যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। ভারতে ইংরেজ শাসকেরা ত্রস্ত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে শরৎচন্দ্র বসু ও ফজলুল হকের যৌথ উদ্যোগে বাংলার বিধান সভায় প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন দল গঠিত হয়। এই দলের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্র বসু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে ১৯৪১-এর ১১ ডিসেম্বরে ভারতরক্ষা আইনে বন্দি হন। তাঁর এই গ্রেফতারের প্রতিবাদে হাজরা পার্কে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিবাদ সভা। এই সভায় শরৎচন্দ্র বসুর গ্রেফতারের তীব্র নিন্দা জানান লীলা রায় ও অনিল রায়। সভায় বক্তৃতা দানের অপরাধে বন্দি হন অনিল রায়। কারাবাসের পর রাজবন্দিরূপে ১৯৪৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত আটক থাকেন অনিল রায়।

১৯৪১ সালে কলিকাতা যাদবপুর ও বেঙ্গল ক্যাম্পে লীলা রায়ের অনুসারীরা একটি শক্ত গোপন ঘাঁটি গড়েন। এতে ঢাকার সংগঠনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়। বেঙ্গল ক্যাম্পের সভাপতি হন কিরণ মিত্র। যুদ্ধের গতির সাথে সাথে ঘাঁটির গোপনীয়তা বাড়ে ও পলাতকদের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ১৯৪২'র সংগ্রামে এই ঘাঁটি থেকে ডা. অতীন বসু কাজ শুরু করেন। তাঁর কর্মতৎপরতাই মূলত এই ঘাঁটিকে সচল করে তোলে। কংগ্রেসের সাথে সুভাষ বসুর মতদ্বৈধতা ঘটলে সুভাষ বসু ও তাদের অনুসারীকে দমিয়ে রাখার জন্য শুরু হয় ষড়যন্ত্র। কলকাতার পথে পথে প্রাচীর পত্র এঁটে দেয়া হয়। এই প্রাচীর পত্রের লেখা ছিল এদের হত্যা করো। ১৯৪২ সালের ১৩ মার্চ স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ ফ্যাসিস্ট ইন ইন্ডিয়াতে সুভাষ বসুর অনুগামীদের বিশ্বাসঘাতক ও দেশের শত্রু সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দাবি করে। দক্ষিণ কলকাতার ১৯৪ বি, রাসবিহারী এভেন্যুতে অবস্থিত 'জয়শ্রী'র দফতর ও লীলা রায়ের বাসভবনের সামনে দিয়ে জনযুদ্ধবাদীদের মিছিল যায়। এই মিছিলের শ্লোগান ছিল 'তাদের হত্যা করো, ফ্যাসিস্ট হত্যা করো, ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীদের হত্যা করো। 'লীলা রায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তার ক্ষুরধার কলম থেকে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে বের হলো 'উই শেল নট স্টেন্ড ইট।'

পুনরায় কারাবরণ

লীলা রায় পরিস্থিতি অনুধাবন করে সহকর্মীদের জন্য গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে বললেন। ১১ এপ্রিল তারিখে লীলা রায়ের নেতৃত্বে একটি গোপন বৈঠক

হয়। গোপন আস্তানা ঠিক হওয়ার আগে ১২ এপ্রিল রাতে তাঁকে বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়। তাঁর সাথে দুই সহকর্মী কিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট ও রবি ভৌমিকও গ্রেফতার হন।

এবার জেলে এসে লীলা প্রথমে জেলের দেয়া ব্যবহার্য জিনিসপত্র প্রত্যাখ্যান করেন। গান্ধীজীও শেষে সুভাষ চন্দ্রের সংগ্রামের পথকে স্বীকার করে নিলেন। ১৯৪২-এর ৯ আগস্ট থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বেগবান হয়ে উঠলো। শ্রীসংঘের পরিধিতে যারা ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেছিলেন তারা সবাই এই পর্যায়ে গোপন বিপ্লবী দলের ভূমিকা নিয়ে আগস্ট সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দেখা দিলো গোপন লাল ইশতেহার প্রকাশ ও যুদ্ধবিরোধী প্রচারের প্রাবল্য। বহু ছাত্রছাত্রী যুবা তরুণ আদর্শগতভাবে বৈপ্লবিক সংগ্রামের নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে এসেছেন। আগস্ট বিপ্লব ঘোষণার পর নেতাদের গ্রেফতারে ঢল নামে। এ সময় লীলা রায়ের দুই ভ্রাতুষ্পুত্র অজিত কুমার নাগ সিলেটে এবং শিশির কুমার নাগ কুমিল্লায় গ্রেফতার হন।

দিনাজপুর জেলে থাকাকালীন জেল-ওয়ার্ডার রামস্বরূপ সিং বহির্জগতের সাথে লীলা রায়ের যোগাযোগের কাজ করতেন। ড. অতীন্দ্রনাথ বসু দিনাজপুর জেলে লীলা রায়ের সঙ্গে এবং দমদম জেলে অনিল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁদের জেল থেকে উদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন। কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তুতি টের পান। অতীন বসু গ্রেফতার হন। রামস্বরূপকে গ্রেফতার করে দার্জিলিংয়ে নির্জন কারাকক্ষে আটক করা হয়। এই ঘটনার পর দিনাজপুর জেল সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী দিয়ে এগারো মাস ঘিরে রাখা হয়। লীলা রায় জেল সঙ্গীদের নিয়ে নিজেদেরই তৈরি করা কালো কামিজ ও শালোয়ার পরে জেল প্রাচীর ডিঙ্গাবার মহড়া দিয়েছেন এবং তাঁরা রাতের অন্ধকারে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে জেল ওয়ার্ডের ছাদে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে শাসকদের মনে চমক ও ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন।

দিনাজপুর জেলে গুরুতর অসুস্থতায় লীলা রায়ের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়লে তাকে কলিকাতায় স্থানান্তর করতে কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করে। অতঃপর শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 'ন্যাশনালিস্ট স্টুডেন্টস অরগানাইজেশনের' উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে প্রচার-পুস্তিকায় এবং বিধান সভায় নিশীথ নাথ কুণ্ডু, ডা. মৈত্রেয়ী বসু, ড. নলিনাক্ষ সান্যাল প্রমুখের আন্দোলনের ফলে গভর্নমেন্ট তাঁকে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরে বাধ্য হয় এবং সেখানে অস্ত্রোপচারের পর তাঁর প্রাণ রক্ষা পায়। দিনাজপুর জেলের ওয়ার্ডার রামস্বরূপ সিংহ মুক্তি পাওয়ার পর লীলা রায়ের কাছে দীর্ঘদিন আশ্রয় পান।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অস্ত্রোপচারের পর প্রেসিডেন্সি জেলে থাকাকালে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কয়েকজন মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পেয়ে সেই জেলের 'কনডেমড' সেলে দিন গুনছিলেন। নেতাজী সুভাষ এঁদের সাবমেরিনে ভারতে পাঠিয়েছিলেন, পরে তাঁরা গ্রেফতার হন। এঁদের মধ্যে ছিলেন অমৃত সিংহ গিল। লীলা রায় এ সংবাদ

পেয়ে গোপনে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে অমৃত সিং গিল লীলা রায়কে গোপনে নেতাজীর ও তাঁর পক্ষ থেকে অভিনন্দন পাঠান। সিঙ্গাপুর থেকে রওনা হওয়ার পূর্বে নেতাজী অমৃত সিং গিলকে ভারতে পৌঁছে অন্যদের মধ্যে লীলা রায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের নির্দেশ দেন।

নতুন করে শুরু

১৯৪৬ সালের জুন মাসে কারামুক্ত হন অনিল রায় ও লীলা রায়। লীলা রায় জয়শ্রী ও ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকার নতুন পর্যায় শুরু করেন। দীপালি সংঘের মতো জয়শ্রী ও লীলা রায় অভিন্ন হয়ে পড়লো। নেতাজীর আদর্শ প্রচারের কাজে জয়শ্রীর যাত্রা শুরু হয়। ইতোমধ্যে লীলা রায় বাংলার বিধানসভা থেকে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে কলিকাতার ডাইরেক্ট এ্যাকশন ডে'র দাঙ্গায়, নোয়াখালি ও ঢাকার দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিপন্নদের উদ্ধারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে লীলা রায় ও অনিল রায় এগিয়ে আসেন। বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেন। নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, বাংলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মৌলবী আশরাফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরীকে পার্ক সার্কাস থেকে উদ্ধার করে লীলা রায় ও অনিল রায় তাঁদের ৪৭-এ, রাসবিহারী এভেন্যুর বাড়িতে এনে রাখেন। পরে সাদার্ন এভেন্যুর একটি বাড়িতে চৌধুরী সাহেব, নৌশের আলী এবং অন্য জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতাদের দীর্ঘকাল দক্ষিণ কলকাতায় বসবাস ও ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করেন। সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু এই বড়িটি পেতে সাহায্য করেন।

১৯৪৬-সালে অক্টোবরে নোয়াখালির দাঙ্গার পর সেখানকার সবচাইতে বিপর্যস্ত এলাকা রামগঞ্জ থানায় গান্ধীজীর আগে লীলা রায় ও অনিল রায় তাঁদের কর্মী বাহিনী নিয়ে পৌঁছেন। ক্যাম্প খুলে ছয়দিনে নব্বুই মাইল ঘোরেন এবং অবরুদ্ধ নারীদের উদ্ধার করেন। নোয়াখালির-উপদ্রুত অঞ্চলে ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউট নামে ১৭টি ক্যাম্প খুলে দীর্ঘদিন উপদ্রুতের উদ্ধার, সেবা ও সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। এ সময় তাঁরা গান্ধীজীর খুব কাছাকাছি আসার সুযোগ পান।

১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজীর সঙ্গে লীলা রায় দিল্লির ভাঙ্গা কলোনিতে দেখা করেন। রাজনীতি বিষয়ক এবং সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সময় তিনি বাংলার নেতা শরৎ বসুর স্থান কংগ্রেসে সুদৃঢ় করার বিষয়টি উত্থাপন করেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রসঙ্গে গান্ধী বলেন : ফরায়ার্ড ব্লক তো একটি নিষিদ্ধ সংস্থা।' লীলা সাথে সাথে প্রতিবাদ করেন। গান্ধী তখন স্মিতহাস্যে বলেন, "লীলা যখন বলছেন, তখন তো আমাকে মেনে নিতে হয়।"

'Wavell Plan' ঘোষিত হলে সুভাষবসু এর বিরোধিতা করেছিলেন। কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলির বৈঠকের সময় লীলা রায়, অনিল রায় প্রমুখরা উপস্থিত

ছিলেন। দেশ বিভাগের আসন্ন বিপর্যয় রোধের পথ নির্ধারণে লীলা রায়, অনিল রায় ও অন্যরা জওহরলাল নেহেরুর কাছে গেলে তিনি তাঁদের জানালেন 'দেশ বিভাগ পাকা হয়ে গেছে।' অনিল রায় ও লীলা রায় ছুটে গেলেন পাটনায় গান্ধীর কাছে। গান্ধী বললেন, 'আমার মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। জওহরলাল ও সর্দার প্যাটেলের কাছে যাও, যদি দেশ-বিভাগ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারো, আমি তার পুরোভাগে থাকবো। 'Bengal will rue the day partition takes place'। শরৎ বসুর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে অখণ্ড রাখার একটি চেষ্টা হলো। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। পূর্ববাংলার শহর-নগর-বন্দরে লীলা রায় ও অনিল রায় দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য বড় বড় সভা করলেন। কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো।

দেশ বিভাগ

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়। দেশ বিভাগের পর রায়-দম্পতি পূর্ববাংলায় হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দুঃখ বঞ্চনারও অংশীদার হয়ে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মুসলিম লীগের শাসকরা লীলা রায় ও অনিল রায়ের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। ১৯৪৮ সালে তাদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। দেশত্যাগের পূর্বে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের রজত-জয়ন্তী অধিবেশনে লীলা রায় 'সাহিত্য ও সমাজ' শীর্ষক অভিভাষণে রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যের সামঞ্জস্য বিধানের অনিবার্যতা ঘোষণা করেন।

এ ছাড়া, মহিলাদের উন্নয়নের জন্য তিনি 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সংহতি' নামে একটি সংগঠনও গঠন করেন। ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত লীলা রায় পশ্চিমবঙ্গের যারা উদ্বাস্তু হন তাদের পুনর্বাসন ও ত্রাণকাজের সাথে জড়িত হন। কলিকাতা, ব্যারাকপুর ও অন্যান্য জেলা জুড়ে ব্যাপকভাবে ক্যাম্প-কলোনির পত্তন ও পুনর্বাসনের কাজ চালিয়ে যান। ব্যারাকপুর মহকুমার ইছাপুরের 'আনন্দমঠ কলোনি' তাঁর সৃষ্টি।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার নৃশংস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে উভয়বঙ্গে সাম্প্রদায়িক হানাহানি শুরু হয়। ফলে পূর্ববঙ্গীয় সংখ্যালঘুরা সীমান্ত অতিক্রম শুরু করেন। লীলা রায় ও তাঁর সহকর্মীরা সীমান্ত এলাকায় পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয় কল্যাণ কমিটির পক্ষ থেকে আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত যাত্রীদের সাথে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানও করেন। সহকর্মী সমর গুহ ছদ্মবেশে দমদম বিমানবন্দরে যান এবং লীলা রায়ও অনিল রায় তাঁকে নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিং-এ মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ডা. রায় তখন ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলকে ঢাকার সর্বশেষ সংবাদ জানানোর জন্য সমর গুহকে দিল্লি পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

পঞ্চাশের হত্যালীলায় নেহেরুর ভূমিকা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে নেহেরু একটি ১৭ মার্চ একটি বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিবৃতিকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবাংলায় চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। ২৩ মার্চ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয় কল্যাণ কমিটি আয়োজিত সভায় লীলা রায় সর্বপ্রথম নেহেরুর পদত্যাগ দাবি করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই কমিটির সদস্যরা সারা পশ্চিম বাংলা ঘুরে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সব রকমের ব্যবস্থা করেন। ১৯৫১ সালে উদ্বাস্তু উচ্ছেদের বিল আনেন সরকার। এই বিলের প্রতিবাদে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে গ্রেফতার হন লীলা রায়ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিলের যথাযথ পরিবর্তন করেন।

১৯৫২ সালে লীলা রায়ের স্বামী অনিল রায় ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেন। জীবন সাথিকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ হন লীলা রায়। শোকের তীব্রতা কমে এলে তিনি আবার সমাজ বিপ্লবের সংগ্রামকে জোরদার করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। গঠনমূলক কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজ বাড়িতেই মেয়েদের জন্য বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই কেন্দ্রে তাঁর সহকর্মী মহিলাদেরও টেনে আনেন।

১৯৫৩ সালে তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণের সমাজবাদী শিবিরে যোগদান করেন। একই সালে আচার্য কৃপালনীর সভাপতিত্বে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সমাজবাদী শিবিরের সর্বভারতীয় সম্মেলনে লীলা রায় যোগ দেন এবং দলের জাতীয় কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ ছাড়া, বহু তরুণ-তরুণীকে নিয়ে একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামোও গড়ে তুলেন। ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে সারা আসামের উপদ্রুত অঞ্চল ঘুরে দ্ব্যর্থহীনভাবে বাঙালি বিদ্বেষের সমালোচনা করেন।

১৯৬৪ সালের ২৫ মার্চ 'পূর্ববাংলা বাঁচাও' কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়ার সময় আইন ভঙ্গ করার অপরাধে কলিকাতায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৬ সাল থেকে তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটতে থাকে। ১৯৬৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সকাল বেলা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে পিজি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। তেইশদিন পর সংজ্ঞা ফিরে এলেও তাঁর বাকশক্তি ফিরে আসে নি। ডানদিক সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়। ৪ আগস্ট শেষ সেরিব্রাল আক্রমণে তার সংজ্ঞা লোপ পায়। আড়াই বছর সংজ্ঞাহীন থাকার পর ১৯৭০ সালের ১১ জুন তিনি মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন।

নারী আন্দোলনে অনেক নারী নেত্রীই যুক্ত হয়েছেন বা হচ্ছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাময়িক দায়িত্ব পালন করে তাঁরা নিঃশেষিত হয়েছেন। কিন্তু লীলা রায় তাঁর কর্মজীবনের বিস্তৃত পরিধিতে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেও নিজ আদর্শে অবিচল থেকেছেন। তাঁর কাছে জীবনের Anchor বলতে ছিল ঈশ্বরে বিশ্বাস, মানবপ্রেম, দেশপ্রেম, শ্রদ্ধাবোধ এবং তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে নিজেকে identify করা। বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান-ডোবা, নালা ও হাজার বঞ্চনা ও দৈন্যে

ভরা। তিনি চেয়েছেন দেশকে উন্নত করতে। আমেরিকা অথবা ইংল্যান্ডের কপি হিসেবে দেশকে গড়তে চান নি তিনি। নিজস্ব চাহিদা, সম্ভাবনা, রুচি ও প্রয়োজনানুসারে দেশের উন্নতি চেয়েছেন। চেয়েছেন নারীর অংশীদারিত্ব। নারীকে তিনি দেখেছেন সম্পদ হিসেবে। নারীর অবসর সময়কে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাজে লাগাতে নারী সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। নারীর তিন ধরনের ভূমিকা যথা উৎপাদন, পুনরুৎপাদন ও কমিউনিটি ভূমিকাকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর কর্ম, চিন্তা, ধ্যান-ধারণায়।

আমাদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের সাথে লীলা রায় নিবিড়ভাবে জড়িত। নারীর ক্ষমতায়নের পথে লীলা রায়ের অনবদ্য অবদানকে স্মরণ করার সাথে সাথে কর্মক্ষেত্রে উন্নয়নের মূলধারায় সকল ধর্ম-বর্ণ গোত্রের নারীর অন্তর্ভুক্তিকরণ, সমঅংশীদারিত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর জন্য সংলাপের সৃষ্টি ও নারীর ভূমিকা মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে সকলকে অগ্রসর হতে হবে।

লীলা রায়ের সৃষ্টিকে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকার ও নাগরিক সমাজকে যুগপৎভাবে এগিয়ে আসতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে তাঁর জীবনী সংযোজনের উদ্যোগ নেয়া উচিত। তাহলে তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে ছড়াবে তাঁর দ্যুতি। তিনি হয়ে থাকবেন সকল কাজের প্রেরণাদাত্রী।

চিরবিপ্লবী : লীলা রায়-অনিল রায়

হে লে না দ ত্ত

আজ জীবনতীর্থ পরিক্রমাশেষে আমি জীবনের উপান্তে উপনীত, জরাগ্রস্ত দেহ, চোখের জ্যোতি স্তিমিত, লেখনী ধারণ করা আমার পক্ষে নিতান্তই কষ্টসাধ্য। তবু আপনাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না, পারলাম না হারাতে এই সুযোগে পরম শ্রদ্ধেয়া দিদি লীলা রায় ও বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায়কে আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ উজাড় করে দেয়ার সুযোগটুকু ছেড়ে দিতে।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর '*পথের দাবী*' উপন্যাসে পরাধীন দেশের রাজ বিদ্রোহীর পদপ্রান্তে যে ভাষায় প্রণাম নিবেদন করেছিলেন সেই অবিস্মরণীয় কথা ক'টি দিয়ে দেশবরেণ্যা মহাবিপ্লবী লীলা নাগ (রায়) ও মহাবিপ্লবী মনস্বী অনিল রায়ের স্মৃতিচারণ ও জীবনকথা শুরু করতে বড় ইচ্ছে করছে। "কোন বিস্মৃত অতীত তোমারই জন্য ত প্রথম শৃংখল রচিত হইয়াছিল। কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই নির্মিত হইয়াছিল, সেই তো তোমার গৌরব, এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার সে ত কেবল তোমারই জন্য, দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে পার বলিয়াই ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন—হে মুক্তিপথের অগ্রদূত, পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী তোমাকে শত কোটি নমস্কার।"

শতাব্দীর এক সন্ধিক্ষণে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর পূর্ববাংলার শ্রীহট্টের এক আদর্শ পরিবারে লীলা নাগের জন্ম হয়। পিতা ছিলেন গিরিশচন্দ্র নাগ, মাতা কুঞ্জলতা দেবী, উদার স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সংস্কৃতিমনা পরিবারের পরিবেষ্টনীতে বড় হয়ে ওঠার সুযোগ পান লীলা নাগ শৈশবে। যদিও তাঁর ছাত্র জীবনের শুরু হয় দেওঘরে এক অখ্যাত বিদ্যালয়ে; কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯০৭ সালে কলকাতায় ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে তিনি ভর্তি হন। ১৯১১ সালে ঢাকা ইডেন স্কুলের আবাসিকায় থেকে পাঠ শুরু করেন এবং ১৯১৭ সালে বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। এরপর তিনি কলকাতায় বেথুন কলেজের আবাসিকায় থেকে আই এ ক্লাসে ভর্তি

হন এবং ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ কৃতিত্বের সঙ্গে বি এ পাস করেন। তাঁর জীবনে আসে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের আহ্বান, কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। কুসুমাস্তীর্ণ জীবনের পথ তাঁর জন্য ছিল না। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জীবন দেবতার পায়ে সঁপে দিয়ে নির্ভীক চিত্তে নিঃশঙ্ক পদক্ষেপে তিনি জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আত্মনিবেদিত তাঁর জীবন নিষ্ঠায়, শুচিতায়-সংগ্রামে তেজে প্রেমে ও অপরূপ মাধুর্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

লীলা নাগের ভাবী নেতৃত্বের পরিচয় তাঁর ছাত্রী জীবনেই ছায়াপাত করেছিল। তিনি ছিলেন স্বভাব নেত্রী। ১৯২১-এর ১ আগস্ট লোকান্তর ঘটে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের। বেথুন কলেজের ছাত্রী প্রতিনিধি হিসেবে লীলা নাগ কলেজ ছুটির জন্য আবেদন জানালেন। অধ্যক্ষা শ্রীমতী রাইট সেই দাবি অগ্রাহ্য করেন ও ছাত্রীদের জাতীয় চেতনার অবমাননা করেন; কিন্তু পরে শ্রীমতী রাইট নতিস্বীকার করেন ও ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বাধ্য হন।

ছাত্রজীবনে কয়েকটি ঘটনা লীলা নাগের দুর্জয় সঙ্কল্পের সাক্ষ্য বহন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার পথ তাঁকে দিয়েই শুরু হয়। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ক্লাসের প্রথম ছাত্রী (১৯২১)। এম এ পাসের পর তিনি নারীর নিজস্ব একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে একটি সংঘ স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হলো দীপালি সংঘ এবং লীলা নাগই হলেন তার প্রথম সম্পাদিকা। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, একমাত্র শিক্ষার আলোকেই নারীরা আবিষ্কার করতে পারবে তাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে। সর্বপ্রকার কুসংস্কারের পাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করে প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে গেলে সর্বপ্রথমে চাই শিক্ষার বিস্তার। সে জন্য তিনি সেই কাজে মনোনিবেশ করে দীপালি স্কুল, নারীশিক্ষা মন্দির, শিক্ষাভবন নামে তিনটি ইংরেজি বিদ্যালয় ছাড়াও ঢাকা শহরে পর পর ৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিপ্লবী সংঘের গঠনমূলক কাজ চলাকালীন তিনি ঢাকার আর একটি বিপ্লবী সংগঠন 'শ্রীসংঘে'র সঙ্গে যুক্ত হন। এই সংঘে যুক্ত হয়ে তিনি দীপালি ছাত্রী সংঘ গড়ে তোলেন। মেয়েদেব লাঠি-ছোরা খেলা শেখা ও বৈপ্লবিক কাজে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে কবিগুরু এক সময় তাঁকে আশীর্বাদ করে লিখেছিলেন, "পশুশক্তির উর্দ্ধে জয়ী হোক তোমার আত্মার শক্তি।" সত্যই তিনি আত্মিকশক্তিতে বলীয়ান হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে বাংলার মহিলা বিপ্লবী কর্মীদের অধিকাংশই লীলা নাগের কাছ থেকে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রাম বিপ্লবে শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, শান্তি ঘোষ (দাস) ও সুনীতি চৌধুরীর (ঘোষ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দীপালি সংঘের কর্মসূচি আরও ব্যাপকভাবে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে লীলা নাগ গণশিক্ষা পরিষদ নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। কুটির শিল্পে ও অন্যান্য কারিগরি কাজের মাধ্যমে মেয়েদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য তিনি একটি বার্ষিক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শ্রীমতী লীলা নাগের কার্যপরিধি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

হঠাৎ ১৯২৭-২৮ সালে পূর্ববঙ্গে নারী নিগ্রহ শুরু হলে তিনি লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, নারীদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ১৯৩০ সালে কলকাতা মহানগরীতে তাঁর কর্মকেন্দ্রের গোড়াপত্তন হয়। এই বছরেই রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য লীলা নাগের 'জয়শ্রী' মাসিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। বৃটিশের কোপানলে পড়ে দু'বার তার প্রকাশ বন্ধ হলেও আজও তা তাঁর বিজয় গৌরব সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। বাংলার নারী সমাজে দেশপ্রেম ও বিপ্লববাদের প্রচারে এই মাসিক পত্রিকাটির অবদান সর্বজনবিদিত। 'জয়শ্রী' জাতীয় ঐতিহ্য ও সংগ্রামের অন্যতম মুখপত্র।

১৯৩০ সালে শ্রীসংঘের দলনেতা বিপ্লবী অনিল রায়ের গ্রেফতারের পর দল পরিচালনার ভার পড়ে লীলা নাগের ওপর। ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর কতিপয় সহকর্মীসহ তিনি গ্রেফতার হন। সেই সময় বহু নারী বিপ্লবী তাঁর সঙ্গে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। এদের মধ্যে রেণু সেন, প্রমীলা গুপ্ত, সুশীলা দাসগুপ্ত, হেলেনা দত্ত প্রমুখ ছিলেন। এই সময় তাঁর অপূর্ব মাধুরী মণ্ডিত চরিত্রটি আমাদের চোখে ধরা দিয়েছিল। কোমলে কঠোরে মেশানো এক অপূর্ব মানবী—একদিকে বিপ্লবী, নির্মম প্রতিবাদী, অন্যদিকে স্নেহ মমতা রসসিক্ত তাঁর হৃদয়খানি—তাই তিনি ছিলেন আমাদের দলের সকলের দিদি।

দিদির সান্নিধ্য এক পরমকাম্যবস্তু, যা মানুষকে অতি কাছে টানে, শুষ্ক প্রাণে আনন্দ নির্ঝর বইয়ে দেয়। দিদির নির্দেশে ঠাসা প্রোগ্রামের মধ্য দিয়ে আমাদের সমস্ত দিন কেটে যেত—ফুরসত নেই অন্য কাজের বা অবান্তর কথা বলার। পরীক্ষার্থীদের এদিক-ওদিক তাকাবার উপায় নেই—পড়াশোনা ঠিকমতো করা চাই-ই। সঙ্গে আবার অন্য প্রোগ্রাম যেমন খেলা, বাগান করা ইত্যাদি। দিদি যে আমাদের শিক্ষাগুরু। দিদি নিজেও কিন্তু মুক্ত নন, তিনিও কর্মযজ্ঞে আবদ্ধ হয়ে আছেন। সকাল থেকে প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমাদের সকলের জন্য রান্নায় ব্যস্ত থাকতেন। দেখেছিলাম গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে উনোনের উত্তপ্ত আগুনে ধনী-কন্যা দিদির সমগ্র মুখখানা কাঁচা-সোনার মতো লাল হয়ে উঠেছে। পাশেই রয়েছে থরে থরে মুখ-রুচিকর সুস্বাদু রান্না করা ব্যঞ্জনাদি। দিনের পর দিন কোর্মা, কালিয়া, কাটলেট, ছানার পায়েস খাইয়ে আমাদের পরিতৃপ্ত করতেন দিদি। সকালে-বিকেলে কে কি খেতে ভালোবাসেন তার তালিকা জেলখানার রান্নাঘরে টাঙিয়ে রাখা হতো। কিন্তু কেন এতো পরিশ্রম? এ হলো সেবার পরিতৃপ্তি। রাঁধুনীদের মধ্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত শশীকে পাকা রাঁধুনী করে ছেড়েছেন দিদি অতি অল্পদিনে। সেবার মধ্যে দেখেছি তাঁর পরম তৃপ্তি। কিন্তু কেন, কেন এ পরিশ্রম। পিতার একমাত্র বিদুষী কন্যা কী করে এতো দৈহিক ক্লেশ সহ্য করছেন আমরা ভেবে পাই নি। আসলে দিদি যে সেবাব্রতী। দিদি ছিলেন আমাদের সর্বক্ষণের সহকর্মী-সাথি। দিদির সান্নিধ্য আমাদের সকলের জীবনে পরম সৌভাগ্য।

জেলখানায়, কেউ এম এ, কেউ বি এ, কেউ আই এ, আবার কেউ ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য পড়তেন। দিদি বনলতাকে অনার্সসহ ইংরেজি পড়াতেন-ইন্দুমতী

সিংহকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে দিলেন। এসব ঘটনা তো লিখে শেষ করা যাবে না। বৃথা সময় নষ্ট করা দিদির জীবনে ছিল না। ফলে জেলজীবন হয়ে উঠতো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন। খেলাধূলা, রান্না-বান্না, পড়াশোনা, গান-বাজনা, বাগান পরিচর্যা, শিল্প-সাহিত্য, আঁকা এবং সেই সঙ্গে আদর্শবাদের পাঠ। আমাদের সৌভাগ্য ত্রিশের দশকে এবং চল্লিশের দশকে দু'বার দিদিকে জেলখানায় ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম।

১৯৩৮ সালে কারামুক্তির পর ১৯৩৯ সালে লীলা নাগ ও বিপ্লব-তাপস অনিল রায় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। লীলা নাগ হলেন লীলা রায়। এই মিলনের ফলে লীলা রায়ের অপূর্ব কর্মদক্ষতা তীব্র গতিবেগ ও অনিল রায়ের আদর্শ ও দর্শনের অপরূপ মেলবন্ধন ঘটলো।

অনিল রায় ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক মানুষ। চরিত্রের দৃঢ়তায়, শৌর্যে-বীর্যে, তেজে মাধুর্যে, বুদ্ধি ও প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে দীপ্যমান এক ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্বের দুর্লভ সম্পদ ছিল তাঁর জন্মগত। ১৯১৪ সালে বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলে তাঁর অন্তর্ভুক্তি হয়। ছাত্র জীবনে তিনি অসাধারণ মেধা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৯১৪ সাল থেকেই ধীরে ধীরে তিনি সংগঠনের কাজে নেমে পড়েন, দলে দলে তরুণ ও কিশোররা বিপ্লবী দলে অন্তর্ভুক্ত হতে লাগলেন। মানুষকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। জেল থেকে এক সময় ছোট ভাইকে তিনি লিখেছিলেন একটি চিঠিতে 'ব্যর্থতা আছে, নিরানন্দ আছে, তবু মনে মনে বিশ্বাস আছে মানুষকে ভালবাসি।'

একসময়ে তাঁর জীবনে এক গভীর আত্মিক সঙ্কট উপস্থিত হয়। একদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে প্রেমানন্দ-ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিবিড় সান্নিধ্যে এসে, অন্যদিকে মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির অমোঘ আহ্বান—শোষিত, লাঞ্ছিত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো। অবশেষে তিনি বিপ্লব সাধনা ও অধ্যাত্ম সাধনার মধ্যে সমন্বয়ের সেতু সুদৃঢ় করে তুলেছিলেন।

তাঁর নির্ভীকতা ও সাহসিকতা ছিল অতুলনীয়। ১৯২৬ সালে ঢাকার এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় দাঙ্গাকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তিনি অমিত বিক্রমে মাত্র তিন-চারজন সহকর্মীকে নিয়ে পাঁচশ' সশস্ত্র দাঙ্গাকারীদের প্রতিরোধ করেন।

পরবর্তীকালে সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণের পর তিনি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার লীগ গঠন করেন। এই সংগঠনটিরই বাংলা নাম হয় 'শ্রীসংঘ'। জনহিতকর কাজের আড়ালে শ্রীসংঘের বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রস্তুতি অব্যাহত ছিল। ১৯৩০-এর এপ্রিলে অনিল রায়ের গ্রেফতারের পর দলের সর্বময় কর্তৃত্ব যে লীলা নাগের ওপর এসে পড়ে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৯৩৯, ১৩ মে উভয়ের মিলনে, দু'জনের সম্মিলিত কর্মোদ্যম বেগবান হয়ে ওঠে। একদিকে আদর্শবাদের লড়াই—মার্কসবাদ না ভারতীয় জীবনবোধ, অন্যদিকে সাংগঠনিক তৎপরতা। ১৯৪২-এর গোড়ায় গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের মিলিত কর্মধারা চলেছিল অবিশ্রান্ত গতিতে।

১৯৫২ সালের ৬ জানুয়ারি মাত্র ৫১ বছর বয়সে এই অতুলনীয় আদর্শ বিপ্লবী, সমাজবাদী নেতা, দুর্ধর্ষ বিপ্লবী সংগঠক শ্রীসংঘের প্রাণপুরুষ অনিল রায় অকালে অমৃত তীর্থে যাত্রা করেন।

মনীষী অনিল রায় ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার সমন্বয়ে এক সম্পূর্ণ মানুষ। একদিকে তাঁর ছিল যেমন বলিষ্ঠ ও সুঠাম দেহ, অন্যদিকে তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। গীত ও নাটক রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। জ্ঞানের সাধনায় তাঁর ছিল নিরলস প্রচেষ্টা, সীমাহীন জ্ঞানের পরিধি, সাহিত্যকাব্য, দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের কুসুমে সাজানো ছিল তাঁর জ্ঞানের মালঞ্চ।

বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় ১৯৬০ সালে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অনুরোধে পশ্চিমবঙ্গ প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

দু'বছর পর তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। যতোদিন তিনি জীবিত ছিলেন দলের বিভিন্ন কাজে কর্মীরা তাঁর অমূল্য পরামর্শ গ্রহণ করাকে অবশ্য কর্তব্য মনে করতেন।

১৯৬৭ সাল ২৩ জানুয়ারি, জাতির জীবনে এটি একটি পুণ্য দিন, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন,—আমরা তিন সতীর্থ দিদির নাকতলার বাড়িতে তাঁকে প্রণাম করতে যাই। দিনি অসুস্থ, পায়ে প্লাস্টার—ঘরে হাজির হওয়ামাত্র দেখি একখানা গানের খাতা দিদির হাতে—শুয়ে আছেন। আমায় একটি গান করতে বলে খাতাখানা এগিয়ে দিলেন—গানটি আজও বড় তাৎপর্যপূর্ণ—

ফিরবে না তা জানি
আহা তবু তোমার পথ চেয়ে জ্বলুক প্রদীপখানি।

এটিই আমার দিদির কাছে গাওয়া শেষ গান। তার ১০ দিন পরেই দিদি মস্তিষ্কে মারাত্মক রক্তক্ষরণে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। ২৯ মাস অজ্ঞান থেকে ১৯৭০-এর ১১ জুন রাত ১২টা ২০ মিনিটে অমৃতলোকে যাত্রা করেন।

আমার লেখনীর এই স্বল্প পরিসরে এই দুই মহান বিপ্লবীর জীবনকথা লেখার প্রয়াস একান্তই দুরূহ, তবু তাঁদের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এটুকু লিখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। তাঁদের সমগ্র জীবনের বহু অমূল্য কথা অলেখাই রয়ে গেল।

মনীষী রোমা রোঁলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে গিয়ে বলেছিলেন, "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জীবনী পর্যালোচনা আত্মার তীর্থযাত্রা।" এই দুই মহান বিপ্লবীর জীবনকথা আলোচনা করতে গিয়ে এই কথাটিই কেন জানি না বারবার মনে হচ্ছে, এও এক তীর্থ পরিক্রমণ, অমৃতময় পথে আত্মার উত্তরণ, তাঁদের এই জীবন ও বাণী বর্তমান হতাশাগ্রস্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত যুবসমাজকে আলোকবর্তিকা প্রদর্শন করুক এই আমার একান্ত কামনা। আজ শতবর্ষ উদ্‌যাপনের আলোকে বারবার প্রণাম জানাই পরম শ্রদ্ধেয় দাদা মহাবিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায়কে—প্রণাম জানাই আমাদের সকলের পরম শ্রদ্ধেয়া দিদি বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়কে—অবিভক্ত বাংলার বুকে এমন অভিন্ন বিপ্লবীসত্তা ইতিহাসে এক বিরল ঘটনা।

লীলা নাগকে যেমন দেখেছি

সুহাসিনী দাস

জীবনের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় আজ অতীতের দিকে চোখ ফিরালে নানা স্মৃতি এসে ভিড় জমায়। ছিয়াশি ছোঁয়া বয়সে দেখতে পাই রাস্তায় মহিলাদের শ্লোগানমুখর মিছিল, স্বদেশপ্রেমের কোনো কৃত্রিমতা ছিল না কারো কাজে-কর্মে ও চিন্তা-ভাবনায়, পরনের কাপড়ও দেশি বস্ত্রালয়ের। স্বদেশকে উপলব্ধি করেছি জন্মধাত্রী মায়ের মতো। আশালতা সেন, সরলা বালা দেব, লীলা নাগ, লাবণ্যলতা চন্দ, জোবেদা খাতুন প্রমুখ ব্যক্তিত্বের আদর্শবাদী কর্ম আমাকে করেছিল ঘরছাড়া। আন্দোলনে যুগিয়েছিল শক্তি। সেকালের কেউ আজ আর ইহজগতে নেই কিন্তু রয়ে গেছে অবিনাশী সব কীতি; কিন্তু দুঃখ লাগে যখন দেখি তাঁরা উপেক্ষিত রয়েছেন সমাজের নানা স্তরে ও কাজে। আমাদের 'লীলাদির' জন্মশতবর্ষ বড় নীরবেই চলে যাচ্ছে। তিনি সেকালে জাতীয় রাজনীতিতে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিলেন। সে অনুপাতে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে সম্মান জানানো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। কিন্তু যখন দেখি দেশের বিদগ্ধজনেরা সে দায়িত্ব পালন করছেন তখন মনে ভরসাই জাগে। আমরা একদিন এই বিপ্লবী নেত্রীর কাছ থেকে দেশপ্রেম শিখেছিলাম বলে এখনও নানাভাবে তাঁকে মনে পড়ে।

তখন ১৯৩৯ সাল। নতুন করে (বৃটিশবিরোধী) আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি নিয়ে নেতা-নেত্রীদের ঘুম নেই। নানা কৌশলে কাজ চলছে। চলমান আন্দোলনে অধিক হারে নারীর অন্তর্ভুক্তি বা অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নারী নেত্রীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নিয়ে 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ' ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারি চারদিন ব্যাপী সুরমা উপত্যকায় মহিলা সম্মেলন করেছিল বিপুল আয়োজনে। লীলা নাগ ছিলেন সেই সম্মেলনের সভানেত্রী। সেই সম্মেলনে তাঁকে প্রথম দেখার সুযোগ ঘটে। লম্বা, উজ্জ্বল,

গোলগাল চেহারার মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু দুটি চশমায় ঢাকা। এক নজর দেখলে কেউ চোখ ফেরাতে পারবে না। তিনি যে তেজী স্বভাবের মহিলা তা দেখেই বুঝেছিলাম। সভানেত্রীর ভাষণটি ছিল সুদীর্ঘ ও জ্বালাময়ী। তা শুনে কোনো নারীর পক্ষে ঘরে থাকা সম্ভব বলে মনে হয় নি। এটা শুধু ভাষণ নয়, যেন সাহিত্য রসে মিশ্রিত কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর বক্তৃতা, সমাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ। সেখানে নারীদের অবস্থান এবং করণীয় রয়েছে। আমাকে তা গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এ যাত্রায় কোনো কথা হয় নি। সম্মেলনের পর বারেবারে তাঁকে কল্পনায় দেখেছি, মনের অলিন্দে বাজতে থাকে সেই কথা, "আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য—মেয়েদের সংঘবদ্ধ হওয়া। এই সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন এই জন্য যে, বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েরা নিজেদের এবং জাতির জন্য যা করেছেন বা করবেন, তাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধি কিছুতেই হবে না। কাজেই জাতির কল্যাণ যাদের কাম্য তাদের উচিত অবিলম্বে সংঘবদ্ধ হওয়া। এই সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আজ সকলেরই মুখে শোনা যায় কিন্তু খুব মুষ্টিমেয় লোকই এই মর্ম গ্রহণ করে থাকেন বলে আমার বিশ্বাস।" পরে সরলাদি (সরলা বালা দেব) ও জোবেদাদির (জোবেদা খাতুন) মুখ থেকে তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জেনেছি। বাইরে কংগ্রেসের ভেতর বা নারী জাগরণের মধ্যে কাজ করলেও আসলে তিনি ছিলেন বিপ্লবী সংগঠন "শ্রীসংঘের" নেত্রী। তারা সিলেটে ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে বিপ্লববাদী কাজ করতেন। আর সে সময় তিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে সুভাষপন্থী। সিলেটে তখন বিপ্লবী ও সুভাষপন্থী বহু মেয়ে সক্রিয় ছিলেন।

১৯৪০ সালের দিকে লীলা নাগ পুনরায় সিলেটে এসে মহিলা সংঘে সারা দিন কাটিয়েছিলেন। সরলা বালা দেব ছিলেন তাঁর আত্মীয় এবং তার সাথে সেখানে গিয়ে সাক্ষাৎ করেছিলাম। সাধারণ সিলেটি ভাষায় অতি আপন জনের মতো বলেছিলেন, "কেমন লাগে কাজকাম।" এর পর দিন ছিল স্থানীয় রসময় স্কুলে এক সভা। লীলা নাগ শেখ ঘাটে অবস্থিত 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘের' অফিস থেকে পায়ে হেঁটে সে স্কুলে যাওয়ার পথে সকালে আমার জামতলার বাসায় ওঠেন এবং জলযোগ করেন। আমার সম্পর্কে সব জেনে বলেছিলেন,—"গান্ধীর শিষ্যনি...।" বিনীত চিত্তে উত্তর দিয়েছিলাম,—"প্রথম গান্ধীর চরকা নিয়ে নামি। হরিজন পত্রিকা পড়ি। তাই ঝুঁকে পড়েছি।" আমি সুতা কেটে খদ্দরের কাপড় পরিধান করায় তিনি খুবই খুশি হয়েছিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সেকালের বিপ্লবী দলের তরুণীরা রসময় স্কুলের মাঠে লাঠি-ছোরা খেলা শিখতেন। আমি কংগ্রেসের সাথে যুক্ত থাকায় এসবে না গেলেও কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি।

লীলা নাগ সব সময় নিজের পল্লীর খোঁজ-খবর নিয়েছেন, যা অন্যদের মধ্যে বিরল। যখন পাঁচগাঁয়ে এসেছেন তখনই 'মহিলা সংঘে' গিয়েছেন। ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময় তিনি ও অরুণা আসফ আলী গোপনে সিলেটে এসে তিনদিন মহিলা সংঘে ছিলেন। ভারত ছাড় আন্দোলনে আমাদের করণীয় সম্পর্কে

সব নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের আলোচনায় মনে হয়েছিল সারা ভারত তারা পরিভ্রমণ করেছেন এবং এবার একটা ফল হবে। লীলা নাগ আমাদেরকে অশেষ সাহস যুগিয়েছিলেন। ফলে সিলেটে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে এক অগ্নিরূপ ধরেছিল। তাতে মহিলাদের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। আমাদের এক কর্মী তো জেলা জজের চেয়ার দখল করে বসেছিলেন। আমরাও সে আন্দোলনে কারাবাসের স্বাদ পেয়েছিলাম।

১৯৪৬ সালে নোয়াখালির ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর মুহূর্তে লীলা নাগ সেখানে "ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট" নামে সেবা প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন। যেখানে পুরুষরা যেতে ভয় করতো, সেখানে ছিল তাঁর অবাধ যাত্রা। আমি দাঙ্গার অনেক পরে কংগ্রেসের কর্মী হিসেবে সেবা কাজে গিয়েছিলাম। আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছার সময় লীলা নাগের ক্যাম্পে বিশ্রাম নিয়েছিলাম। তখন তিনি পল্লী পুনর্গঠন কাজে দূরের কোনো এক গ্রামে কর্মরত ছিলেন। আজ হয়তো ভাবা যাবে না যে, তখন পোড়ামাটিতে কি করা হয়েছিল কিংবা নির্যাতিত মহিলাদের কি করে পুনর্বাসন করা হয়েছিল। সেই কঠিন সময়ে একদিন জগজীবন রাম ফরিদগঞ্জে এসেছিলেন। আমি রামগঞ্জ থেকে সভায় গিয়েছিলাম, তখন সেখানে লীলা নাগ উপস্থিত ছিলেন। নোয়াখালিতে যাঁরা এসেছিলেন সকলেই তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন। তিনি আমার কাজকর্মের খোঁজ নিয়েছিলেন। সে দিন তাঁর চোখে-মুখে দেখেছিলাম ক্লান্তির ছাপ। তিনি যেমন উৎসাহ দিয়েছেন, তেমনি নিজেও কাজ করেছেন। শুনেছি ১৯৪৭ সালে তিনি সাম্প্রদায়িক চেতনায় দেশভাগের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলেছিলেন।

ভারত বিভক্তির পর পাক সরকারের রোষানলে পড়ে তাঁকে প্রিয় মাতৃভূমি ছাড়তে হয়েছিল। এরপর আর দেখা হয় নি। তবে ঢাকায় তার প্রতিষ্ঠান 'নারী শিক্ষা মন্দিরে'র সাথে যোগাযোগ ছিল। লাবণ্যলতা চন্দ তখন অসহায় নারীদের সাহায্য করতেন, যা লীলা নাগ পূর্বেই সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। আজ আরো একটি ঘটনা মনে পড়ছে,—১৯৪৭ সাল থেকে পরবর্তী কয়েক বছর পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। তারা যাতে দেশত্যাগ না করে সেজন্য আমরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বৈঠক করে জনগণকে অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা দিতে চেষ্টা করতাম। একবার শ্রীমঙ্গলের সাতগাঁও অঞ্চলের লক্ষ্মী নামে একটি পিতৃ-মাতৃহীন মেয়ের সন্ধান পাই। মেয়েটি ছিল বড়ই অসহায়। গ্রামবাসীরা তাঁকে ঘৃণা করতো। আমরা গিয়ে ঘটনা শুনলাম যে, মেয়েটার অসহায়ত্বের কারণ ঐ এলাকার এক প্রভাবশালী মুসলিম ছেলে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সেখানে আসা-যাওয়া করতো। ফলশ্রুতিতে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। অনেক চেষ্টার পর গর্ভ নষ্ট না হলে ছেলেটি বিয়ে করতে অস্বীকার করে। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে মেয়েটি মহা মুশকিলে পড়ে যায়। আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসীরা মেয়েটিকে তিরস্কার করতে থাকে। বারবার চেষ্টার পরও ছেলেটি যখন মেয়েটিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে,

তখন আমরা মেয়েটিকে রঙিরকুল আশ্রমে নিয়ে আসি। পরে নারী শিক্ষা মন্দিরে খবর পাঠালে লাবণ্যলতা চন্দ এসে তার সমূহ ব্যয়ভার গ্রহণ করে নিয়ে যান। কিছু দিন পর মেয়েটি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। (কার্তিক মাস থাকায় তার নাম কার্তিক রাখা হয়েছিল)। পরবর্তী সময় সেখান থেকে সুচেতা কৃপালিনী তার শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছিলেন। কয়েক বছর আগেও সেই ছেলেটি খবর পাঠাতো, এখন কোথায় আছে জানি নে।

আমার জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে তাকালে অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি। লীলাদির সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ, সেই বজ্রকণ্ঠ। নারী জাগরণে কিংবা বাংলাদেশের সমাজ উন্নয়নে তাঁর চিন্তা-কর্ম নিয়ে কোনো গবেষণা হয়েছে বলে শুনি নি; শুধু আংশিক জীবনী গ্রন্থ ছাড়া (দীপঙ্কর মোহান্ত প্রণীত, ১৯৭১, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা)। বাংলাদেশে ও বিভিন্ন জায়গায় তার গড়া প্রতিষ্ঠান বেনামে চলছে। তাঁকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন না করলে দেশ ও মাটির উন্নয়ন সার্থক হবে বলে মনে হয় না।

জয়শ্রী : লীলা নাগ, লীলা রায়

উমা দেবী

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে, বৈশাখ ১৩৩৮, ইংরেজি মে, ১৯৩১-এ ঢাকা থেকে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখা গেল। পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার শিক্ষিত, সচেতন মানুষদের মনে সাড়া জেগেছিল। পত্রিকাটির নাম 'জয়শ্রী', প্রচ্ছদপত্রে পত্রপুঞ্জের বিচিত্র রূপ সম্ভারে একটি শঙ্খ। পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী লীলাবতী নাগ। নাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত। প্রচ্ছদপত্র শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত। সম্পাদিকা ঢাকার দীপালি সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী নেত্রী। এইভাবে কবিগুরুর আশীর্বাদ-জয়টিকা শিরোধার্য করে, শিল্পাচার্যের আহ্বান-ইঙ্গিত জয়শঙ্খ ধ্বনির মধ্যে 'জয়শ্রী'র জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। পথচলা তারপর সত্তর বছর হতে চলেছে—চলা নিরঙ্কুশ নয়, নয় নিরবচ্ছিন্নও। বারবার দুর্জয় বাধার সম্মুখীন হয়ে আর তা অতিক্রম করে বাংলার শতবর্ষ অতিক্রমকারী উদ্বোধন মাসিক পত্রটির পরই দ্বিতীয় দীর্ঘায়ু সাময়িক পত্ররূপে 'জয়শ্রী' তার অপরাজেয় প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়ে চলেছে। তার জীবনের অনিবার্য চরম লক্ষ্য, সেই সময়ে কেন কেবল মহিলা মুখপত্র? কেন নয় একটি সর্বজনীন পত্রিকা? এর উত্তর জয়শ্রীর মধ্যেই আছে।

'জয়শ্রী'র প্রথম প্রকাশকাল কিংবা তার কিছুটা আগেই সারা দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসের আইন অমান্যের অহিংস আন্দোলন, অন্যদিকে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের গোপন প্রস্তুতি, সশস্ত্র অভিযান, সাম্রাজ্যবাদী বিদেশি রাজশক্তির ওপরে প্রবল আঘাত হানা। লীলা নাগ তখন এক দুর্ধর্ষ বিপ্লবী দলনেত্রী, সশস্ত্র সংগ্রামের দুর্জয় সঙ্কল্পে অটল। দীপালি সংঘেরও তখন রূপান্তর ঘটেছে। নারীমুক্তি আন্দোলন রূপ নিয়েছে দেশমুক্তি সংগ্রামে। দীপালির অনেক সদস্যই যুক্ত হয়ে পড়েছেন বিপ্লবী শ্রীসংঘ গোষ্ঠীর সঙ্গে। বাংলার বিপ্লবী সংগঠনগুলোর ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে অন্য বিপ্লবী

দলগুলোর থেকে শ্রীসংঘের বিপ্লবী নারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংগ্রামমুখর সেই দিনে বিপ্লবী নেত্রী লীলা নাগের কেবল ঢাকার অথবা দীপালি সংঘের মেয়েদের নয়, সারা দেশের নারীশক্তিতে দেশপ্রেমে, রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ বিপ্লবের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ডাক দিলেন সাহিত্যকে। মেয়েদের "শঙ্কাহীন দেশসেবায়" উদ্বুদ্ধ করতে 'জয়শ্রী'র আবির্ভাব ঘটেছিল।

তাহলে কি 'জয়শ্রী' একটি রাজনৈতিক পত্রিকা? প্রথম পর্যায়ে প্রকাশিত সংখ্যাগুলোতে দেখা যায় সে যুগে দেশের সকল প্রথিতযশা এবং উদীয়মানা, নবীন লেখিকাদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধাদি 'জয়শ্রী'তে প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যের বৃহত্তর প্রাঙ্গনে মেয়েদের প্রবেশ তখন নিষিদ্ধ না হলেও ছিল সঙ্কুচিত। স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরাণী, সীতাদেবী, শান্তা দেবী প্রমুখ লেখিকাবৃন্দ এবং আরও কয়েকজন মহিলা সাহিত্যিক অবশ্যই সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিতা ছিলেন; কিন্তু তাদের সীমিত ব্যতিক্রম বললে বোধহয় ভুল হবে না। সেই সময়ের উদীয়মানা, নবীন লেখিকাদের জন্য দরকার ছিল একটি নিজস্ব ক্ষেত্রের, যেখানে মেয়েদের সৃজনশীল প্রকাশোন্মুখী সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ, বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকবে। "মহিলা মুখপত্র" 'জয়শ্রী' সাহিত্য-পত্ররূপে সেই সুযোগ দিয়েছিল। সেই সঙ্গেই 'জয়শ্রী' মেয়েদের চিন্তা-ভাবনা দেশ ও সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকেও প্রসারিত করে দিতে চেয়েছিল। প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত প্রবন্ধ "সমাজতন্ত্রের অ, আ, ক, খ," তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

'জয়শ্রী'র যাত্রা যে বিরতিহীন নয় সে কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ের প্রকাশকাল সীমা মে, ১৯৩১ থেকে ১৯৩৫-এর গোড়ার দিক পর্যন্ত। পত্রিকা প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পাদিকা লীলা নাগ সারা বাংলায় প্রথম মহিলা রাজবন্দি রূপে কারারুদ্ধ হয়েছেন। রাজবন্দি হয়েছেন এর সহ-সম্পাদিকা রেণু সেন এবং আরো কয়েকজন। 'জয়শ্রী'র সেই পরম দুর্যোগের দিনে এসে পৌঁছেছিল কবিগুরুর বরাভয় বাণী। ১৩০৮-এর ফাল্গুন সংখ্যার 'জয়শ্রী'তে দেখা গেল কবির আশীর্বচন,—

বিজয়িনী নাই তব ভয়
দুঃখে ও বাধায় তব জয়।
অন্যায়ের অপমান
সম্মান করিবে দান
জয়শ্রীর এই পরিচয়।

কবির আশীর্বাদে কারান্তরালবর্তিনী সম্পাদিকা লীলা নাগ ও 'জয়শ্রী', বিজয়িনীরূপে এক অভিন্ন সত্তায় চিরতরে পরিণত হয়ে গেল।

সম্পাদিকা, সহ-সম্পাদিকা, সহকর্মীরাও অনেকে বন্দি হয়েছেন। 'জয়শ্রী'র প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ছে মাঝে মাঝেই, তবুও অন্যতম সহ সম্পাদিকা শকুন্তলা চৌধুরী ও সহকর্মীরা তার গতি স্তব্ধ হতে দেন নি। অবশেষে ১৯৩৫-এর

প্রথম দিকে নেমে এলো সরকারি নিষেধাজ্ঞা। 'জয়শ্রী' প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

১৯৩৭-এর শেষের দিকে লীলা নাগ ও সহকর্মীরা কারামুক্ত হয়ে আবার 'জয়শ্রী' প্রকাশের উদ্যোগ নিলেন। আষাঢ়, ১৩৪৫ (জুলাই ১৯৩৮) দ্বিতীয় পর্যায়ের 'জয়শ্রী'র প্রথম প্রকাশ ঘটলো কলকাতা থেকে। সম্পাদকীয় দপ্তর এখন স্থানান্তরিত হয়েছে কলকাতাতে। সম্পাদিকার কারামুক্তিতে স্বস্তি প্রকাশ করে এলো—কবিগুরুর অভিনন্দন লিপি এবং সেই সঙ্গে আশীর্বাদ—

মান অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও,
কণ্টক পথ অকুণ্ঠ পদে মাড়াও,
ছিন্ন পতাকা ধূলি হতে লও তুলি
রুদ্রের তাতে লাভ করো শেষ বর
আনন্দ হোক দুঃখের সহচর
নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি।

নন্দলাল বসু এবার পাঠালেন সচিত্র শুভেচ্ছা বাণী "জয়শ্রী জয়যুক্ত হউক।" দেশের সর্বস্তরের নেতা ও মনীষীবৃন্দের কাছ থেকে এসেছিল অজস্র শুভেচ্ছা, অভিনন্দন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকাশকালে 'জয়শ্রী'র ঘোষণা "বিশ্বমানবের অবিচ্ছিন্ন প্রগতিতে আমরা বিশ্বাসী।" 'জয়শ্রী' বিশ্বমানবের প্রগতির সমর্থক শক্তিনিচয়ের অগ্রগতির সমর্থন এবং অন্তরায়গুলোর বিরুদ্ধতা করবে। প্রথম পর্যায়ের উদ্দেশ্য দেশাত্মবোধ এবং শঙ্কাহীন দেশ সেবার সঙ্গে এবার যুক্ত হলো বিশ্বমানবের প্রগতি। এই পর্যায়ে 'জয়শ্রী' আর মহিলা মুখপত্র নয়, একটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রগতিশীল, আদর্শনৈতিক সর্বজনীন সাহিত্যপত্ররূপে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

'জয়শ্রী'র পুনর্প্রকাশের অল্পদিনের মধ্যে শ্রীসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নেতা বিপ্লবী অনিল রায় কারামুক্ত হয়ে এসে সমআদর্শ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে 'জয়শ্রী'র সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে অচিরে 'জয়শ্রী'র প্রাণপুরুষরূপে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন।

ইতোমধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের কর্মধারা, কর্মপন্থার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। খণ্ড খণ্ড বৈপ্লবিক অভিযানের পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা-সমন্বিত স্বাধীনতার লক্ষ্যে বৈপ্লবিক গণসংগ্রাম। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবা, নারী, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মিলিত মুক্তিসংগ্রাম। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের আদর্শের পরিণতি ঘটবে সমাজ বিপ্লবে। স্বাধীন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হবে বহুবাদী জীবনদর্শন সমন্বিত সমাজতন্ত্র। লীলা রায়, অনিল রায়ের এই চিন্তাদর্শের, এই আদর্শভিত্তিক মতবাদ প্রচারে 'জয়শ্রী' একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 'জয়শ্রী'র পাতায়-পাতায় তখন গণসংগ্রামের আহ্বান। সেই সঙ্গে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে সমন্বয়বাদী জীবনদর্শনের নব রূপকার অনিল রায়ের রাজনৈতিক, আদর্শনৈতিক, সমাজতাত্ত্বিক রচনাগুলো। কিন্তু সেই রাজনৈতিক ঘনঘটার যুগেও 'জয়শ্রী'র সাহিত্য-সাধনায় লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে নি। দেশের প্রথম সারির কবি,

কথাসাহিত্যিক, প্রবন্ধকারদের রচনা সম্ভারে 'জয়শ্রী' একটি শীর্ষস্থানীয় সাহিত্য পত্রিকার মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। লীলা রায় সম্পাদিত 'জয়শ্রী' সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রবল বিরোধীর ভূমিকায় সংগ্রামরত। ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে গ্রেফতার হলেন বিপ্লবী অনিল রায়, বিপ্লবী লীলা রায় এবং জুন মাসেই 'জয়শ্রী'কে বেআইনি ঘোষণা করে নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। দ্বিতীয়বার কণ্ঠরোধ করা হলো 'জয়শ্রী'র।

১৯৪৬-এর জুনে লীলা রায়, আগস্টে অনিল রায় মুক্তিলাভ করলেন। তৃতীয় পর্যায়ের 'জয়শ্রী' প্রকাশিত হলো মার্চ, ১৯৪৭-এ। এবারেও যাত্রা শুরুতে এসেছিল সারাদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অজস্র শুভেচ্ছা বাণী। সরোজিনী নাইডু লিখেছিলেন—"The Jayaasree, like the Phoenix, has died may times and re-arisen on its own ashes." রাজরোষের বহ্নি বারবার 'জয়শ্রী'কে ভস্মীভূত করেছে আর তার অবিনশ্বর প্রাণ বারবার বেঁচে উঠেছে ভস্মরাশি থেকে অপরাজেয় শক্তিতে।

তৃতীয় পর্যায়ের 'জয়শ্রী' অচিরেই সাময়িক পত্র হিসাব সাহিত্যের জগতে তার স্থান প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পত্রিকাটি শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন—সর্বক্ষেত্রে সমসাময়িককালের লেখকবর্গের চিন্তার শ্রেষ্ঠ ফসলগুলোতে পুষ্ট। একটি সাময়িক পত্রিকায় এমন বহুমুখী সৃষ্টির পরিচয় একান্তই দুর্লভ। সেইসঙ্গে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে দিক্-দিশারী সম্পাদকীয়, বিশ্ববার্তা।

নবপর্যায়ে 'জয়শ্রী'র প্রকাশকালে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে 'জয়শ্রী'র পরবর্তী সম্পাদক বিপ্লবী সুনীল দাস লিখেছেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে একটা অবক্ষয়ের ঢল বয়ে যায়। সে সময়ে দেশে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা চরমে উঠে দেশবিভাগে পরিণতি পায়। 'জয়শ্রী' তৃতীয় পর্যায়ের গোড়ার দিকে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, সমাজ পরিবর্তনের এবং লুপ্তপ্রায় মূল্যবোধের পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে, 'জয়শ্রী'র সম্পাদকীয় রচনা এবং প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধগুলো যুক্তির স্বচ্ছতায়, আবেদনের গভীরতায়, দুঃসহ বেদনায়, ভাষার শাণিত দীপ্তিতে যেমন ভাস্বর হয়ে উঠেছে, তেমনি ভারতীয় জীবনবোধে সমন্বয়ের স্থান নির্দেশনে, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শনৈতিক মতবাদের—যা সুভাষবাদ বলে পরিচিত—বিশ্লেষণে ও বিন্যাসে 'জয়শ্রী'র গৌরবময় ভূমিকা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায় রচনা করেছে।"

তৃতীয় পর্যায়ের 'জয়শ্রী'র সম্পাদকীয়তে ঘোষণা করা হয়েছিল এই পর্যায়ের 'জয়শ্রী'র উদ্দেশ্য ও মতাদর্শ। এই সম্পর্কে সম্পাদিকা সুস্পষ্টভাবে বলছেন, "আমরা আহ্বান করছি সুভাষচন্দ্রের পথে, সুভাষ যুগের রচনায় যেতে।" 'জয়শ্রী' এই পর্যায়ে নেতাজীর জীবনবাদের-বিষয়ে বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৩৭১-এর শ্রাবণ সংখ্যা (আগস্ট

১৯৬৬) সম্পাদিকা লিখছেন, "সারা বিশ্বে আমেরিকান 'সেঞ্চুরী' অথবা রুশ-চীনের প্রভাব বিস্তার নয়। স্ব-স্ব প্রয়োজন, প্রতিভা, ঐতিহ্য, বিচার ও রুচি অনুযায়ী বিচিত্র পথে সভ্যতার প্রগতি ও ক্রমবিকাশে আমরা বিশ্বাসী। আমাদের নীতি আমরা নির্ভেজাল ভারতপন্থী।"

সুভাষবাদের প্রবক্তা বিপ্লবী অনিল রায় লোকান্তরিত হয়েছেন, লোকান্তরিত হয়েছেন সুভাষ যুগের আহ্বানকারী বিপ্লবী লীলা নাগ, পরবর্তী 'জয়শ্রী' সম্পাদক একনিষ্ঠ সুভাষ অনুগামী বিপ্লবী সুনীল দাস। সুভাষবাদের দৃঢ় প্রত্যয়ী 'জয়শ্রী' সুভাষবাদ, ভারতপন্থার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে তার জয়-যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

শেষ করার আগে আরও দু' একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। দেশের পরাধীনতার বন্ধন মুক্তি এবং বন্ধন জর্জর বঞ্চিত সমাজের পরিবর্তনকল্পে লীলা রায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলে যোগদান, রাজনৈতিক দল গঠন করেছিলেন। কিন্তু 'জয়শ্রী'কে কখনই কোনও রাজনৈতিক দলের দলীয় মুখপত্রে পর্যবসিত করেন নি। 'জয়শ্রী' আজও দলমত নির্বিশেষে তার স্বাধীন চিন্তা ও মতামত নির্ভীকভাবে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করে চলেছে।

দ্বিতীয় কথা, বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায় ছিলেন একান্তভাবে আত্মপ্রচারবিমুখ। সহকর্মীদের একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও আত্মজীবনী রচনা করতে রাজি হন নি। এখন পর্যন্ত বিপ্লবী দেশনেত্রীর কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হয় নি। একান্ত ব্যক্তিগত কয়েকটি চিঠিপত্র এবং দিনলিপির কয়েকটি পৃষ্ঠা ছাড়া এই মহান নেত্রীর জীবনগ্রন্থ রচনার উপাদানের ক্ষেত্রে 'জয়শ্রী'র মূল্য অপরিসীম। তাঁর জীবনাদর্শ, মত ও পথ, চিন্তা ও কর্মের বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তির অজস্র ধারা ধরা আছে 'জয়শ্রী'র পৃষ্ঠায়। লীলা রায়ের জীবন গবেষণায়, 'জয়শ্রী' এক অমূল্য ঐশ্বর্য কোষ।

লীলা নাগের যাত্রা শুরু হয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি ঢাকা থেকে নারী আন্দোলনের নেত্রীরূপে। সহজাত নেতৃত্বে, সর্বতোমুখী কর্মপ্রতিভায় অপরাজেয় বীর্যে, প্রগাঢ় প্রজ্ঞায়, চরিত্রের তেজস্বিতায়, নিঃস্বার্থ ত্যাগে, শঙ্কাহীন দেশপ্রেমে, মানুষের প্রতি অন্তহীন ভালোবাসায় সমর্পিত প্রাণ, আত্মনিবেদিত সেই অ-লোকসামান্য মহীয়সী নারী বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়রূপে সার্বিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

লীলা নাগ স্মরণে

হেনা দাস

লীলা নাগের সাথে আমার বয়সের ব্যবধান হচ্ছে চব্বিশ বছর। আমার যখন জন্ম হয় তখন লীলা নাগের ভরা যৌবন। বিশ দশকের বৃটিশবিরোধী উত্তাল স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ভারতীয় নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের অভিন্ন ধারায় লীলা নাগ তখন বাংলার নারীসমাজ ও দেশপ্রেমিক জনগণের কাছে একটি উজ্জ্বল ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বৃহত্তর সিলেটের মৌলভীবাজারের মেয়ে হিসেবে গোটা সিলেটের মানুষের কাছে তিনি সে সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯২১ সালটি এক গুরুত্বপূর্ণ স্মরণীয় বছর। একদিকে চলছে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন, অন্যদিকে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন এবং মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে চরকা-খদ্দরের কুটিরশিল্পে মেয়েদের ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ। লীলা নাগ স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলধারা অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি নারীর ভোটাধিকার আন্দোলন ও কুটির শিল্প আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯২১-এ গঠিত 'নিখিল বঙ্গ ভোটাধিকার কমিটি'র সহ-সম্পাদিকা পদে লীলা নাগ নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিভিন্ন নারী সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রেখে নারী জাগরণমূলক কর্মকাণ্ডে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। ১৯২১-এ তিনি তাঁর দৃঢ়চিত্ততার গুণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষায় নারীর প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজি বিভাগে প্রথম ছাত্রী হিসেবে ভর্তির সুযোগ করে নেন। এভাবেই তিনি মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ক্রমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের মাঝে নারী মুক্তি ও দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে তোলেন। এ সময় তাঁর সহপাঠী অনিল রায়ের সাথে লীলা নাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং সশস্ত্র বিপ্লবী দল অনুশীলন দলের নেতা অনিল রায়ের কাছ থেকে বিপ্লববাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। লীলা নাগের

সহযোগিতায় অনিল রায় 'শ্রীসংঘ' নামে একটি জনকল্যাণ সমিতি গঠন করেন, যদিও মূলত এই সংগঠন ছিল একটি গোপন বিপ্লবী দল। লীলা নাগ নিজেও এই সময় 'দীপালি সংঘ' নামে একটি নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীসংঘ ও দীপালি সংঘ উভয়েরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি হল ঢাকা হল ও জগন্নাথ হলে সক্রিয় অনুশীলন ও যুগান্তর নামক দুটি বিপ্লবী দলের সাথে। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে রাজনৈতিক অঙ্গনে মহিলাদের ব্যাপকভাবে সম্পৃক্তি ঘটলেও গোপন বিপ্লবী দলে কোনো মহিলা সদস্য হতে পারতেন না। যেহেতু বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে বিজয়ের পূর্বশর্ত ছিল মৃত্যু সেই হেতু মৃত্যুকে চিরসাথি করে এসব দুঃসাহসী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ অসম্ভব এবং অনুচিত—এটাই ছিল তখনকার পুরুষ বিপ্লবীদের ধারণা। তাছাড়া, মেয়েদের সদস্য করলে পুরুষ-বিপ্লবীদের সাধনায় বিঘ্ন ঘটতে পারে এই আশঙ্কা ও ধারণা পোষণ করায় বিপ্লবী দলে মেয়েদের সদস্য করার ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞা ছিল। তবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রথমদিকে ২/৪ জন মহিলার নাম পাওয়া যায়, যাঁরা বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার কাজে সহায়তা করেন। এদিক থেকে লীলা নাগের পূর্বসূরি হিসেবে ননীবালা দেবীর নাম পাওয়া যায়, যিনি অস্ত্র লুকিয়ে রাখার অপরাধে আড়াই বছর কারাগারে বন্দি ছিলেন। এছাড়া, বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সহায়তা করার কাজে দুকড়িবালা দেবী ও চারুশীলা দেবীর নামও পাওয়া যায়। কিন্তু লীলা নাগই হচ্ছেন প্রথম নারী, যিনি গোপন বিপ্লবী দল শ্রীসংঘের সদস্য হয়েছিলেন। অন্যান্য গোপন বিপ্লবী দলের মতো শ্রীসংঘেও নারী সদস্য করার ব্যাপারে কঠোর বিধিনিষেধ ছিল। তবে অন্যতম শীর্ষনেতা অনিল রায় নারী সদস্য করার পক্ষে জোরালো যুক্তি উত্থাপন করেন। তাঁর আনুকূল্যে ও লীলা নাগের আগ্রহে অধিকাংশের নেতিবাচক মনোভাব সত্ত্বেও লীলা নাগ শ্রীসংঘের সদস্য হয়েছিলেন। দলের মধ্যে প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধের পরই কেবল এটা সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য লীলা নাগের দক্ষতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে অচিরেই দলের মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব ও সকল সন্দেহ-সংশয় বিদূরিত হয়। বিপ্লবী আন্দোলনে লীলা নাগের অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা-যে ঘটনা শিক্ষিত নারীদের মাঝে নতুন এক প্রেরণা সঞ্চার করে। গোপন বিপ্লবী দলে ব্যতিক্রমী ধরনের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রকাশ্যে তিনি বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন এবং কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন। এতে বিপ্লবী দলের গোপন সাংগঠনিক পরিচয়টা গোপন রাখা সহজতর হয়েছিল।

শ্রীসংঘের শাখা গঠনের জন্য লীলা নাগ ও অনিল রায় সিলেট, শিলং, শিলচরসহ বাংলার বহু জেলায় ও শহরে গিয়েছিলেন। সিলেটে যারা ছিলেন শ্রীসংঘের মূল নেতা তাঁদের মধ্যে আমার দাদা সত্যব্রত দত্তও ছিলেন। সিলেটের রাজনগর অঞ্চলের বহু তরুণ লীলা নাগের প্রভাবে সশস্ত্র বিপ্লববাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। এদের মধ্যে খলাগ্রামের শশাঙ্ক শেখর ঘোষও ছিলেন। সত্যব্রত দত্ত

ও শশাঙ্ক শেখর ঘোষ উভয়েই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। এ দুজনকেই আমি আমার রাজনৈতিক জীবনে নেতা হিসেবে পেয়েছিলাম। আমার দাদা সত্যব্রত দত্ত প্রকৃত অর্থে আমার রাজনৈতিক শিক্ষাগুরুও ছিলেন। যতোদূর মনে পড়ে আমার এই দাদার মুখ থেকে লীলা নাগের সাহসিকতা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বহু কাহিনী শুনেছিলাম। শিশু বয়সে ওর কাহিনী শুনেছি রূপকথার গল্পের মতো। তারপর যখন কৈশোরে পদার্পণ করেছি তখন ঠিক কোন্ শুভলগ্নে যে তিনি আমার প্রেরণার অন্যতম উৎস হয়ে উঠেছিলেন তা এখন আর মনে করতে পারছি না।

১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনায় বৃটিশ সরকার শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এ সময় বহু বিপ্লবীকে গ্রেফতার করা হয়। অনিল রায়ও গ্রেফতার হন। তাঁর অনুপস্থিতিতে লীলা নাগই দলকে পরিচালনা করছিলেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে স্বীয় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করছিলেন। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের সাথে তিনি একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন এবং ঐ মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে বিপ্লবী অনন্ত সিংহের বোন ইন্দুমতীর মাধ্যমে চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন। বিদ্রোহের পরিণতিতে বিপ্লবী সূর্য সেনের ফাঁসি, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের আত্মাহুতি, কিশোরী কল্পনা দত্তের সাজা ইত্যাদি ঘটনার পাশাপাশি লীলা রায়ের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, সারা দেশে ছুটে বেরিয়ে অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ, শ্রীসংঘের বিপ্লবীদের বিভিন্ন অপারেশন ইত্যাদি ঘটনার খবর দেশবাসীকে, বিশেষভাবে সিলেটবাসীকে তখন প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করেছিল। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্তের সাথে সিলেটের গৌরব লীলা নাগের নামও গভীর শ্রদ্ধাভরে নারীসমাজ কর্তৃক উচ্চারিত হতো। আমার কিশোর মনে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের পরেই লীলা নাগের বিপ্লবী পরিচয়টি বিশেষভাবে দাগ কেটেছিল। তাকে স্বচক্ষে দেখার আগেই তিনি আমার কল্পনার জগতে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন একজন পরম পূজ্য দুঃসাহসী নারী বিপ্লবী হিসেবে, যিনি সিলেটের সেরা সন্তানদের অন্যতম।

লীলা নাগের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড মূলত ঢাকা ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও তিনি নানা উপলক্ষে সিলেটে আসতেন। '৩০ ও '৩১-এর উত্তাল আইন অমান্য আন্দোলন ও গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের তীব্রতার মুখে লীলা নাগ এসেছিলেন সিলেটে। উপলক্ষ ছিল শ্রীহট্ট মহিলা সংঘের (জাতীয় কংগ্রেসের মহিলা শাখা) সুরমা উপত্যকা সম্মেলনে যোগদান। উল্লেখ্য, সে সময় লীলা নাগ গোপন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রকাশ্যে কংগ্রেসের কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন। সে সময় আমি পাঁচ বছরের শিশু। কাজেই ঐ সময়ের কোনো স্মৃতি আমার নেই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন মহিলা সংঘের কাজের সাথে যুক্ত হই তখন সে সময়কার কাহিনী বহু মহিলার মুখে মুখে শুনেছি এবং তার উদ্দীপনাময়ী ভাষণের প্রশংসা শুনে তাঁকে দেখার ও তাঁর ভাষণ শোনার গভীর আগ্রহ অনুভব করেছি।

১৯৩০—'৩১-এ বাংলায় ইংরেজ প্রশাসক হত্যা, অস্ত্র লুট, ব্যাংক-ট্রেন ডাকাতি প্রভৃতি যতো বিপ্লবাত্মক ঘটনা ঘটেছিল তার অনেকগুলিই ঘটিয়েছিল শ্রীসংঘের তরুণ বিপ্লবীরা এবং এদের নেপথ্যে ছিলেন লীলা নাগ। কাজেই ইংরেজের বশংবদ পুলিশের দৃষ্টি পড়লো তাঁর ওপর। তিনি ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে গ্রেফতার হয়ে গেলেন। ভারতবর্ষে তখন তিনিই ছিলেন বিনাবিচারে আটক প্রথম মহিলা। এ সময় বহু বিপ্লবী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। জেলখানায় বন্দিদের শারীরিক নির্যাতন বন্ধ, রাজবন্দিদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদি দাবিতে যেমন একাধিকবার অনশন ধর্মঘট হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি পড়াশোনা, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনীতি বিষয়ে বিপ্লবীদের চিন্তাধারার মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমাজ পরিবর্তনের ভাবনার সূত্র থেকে মার্কসীয় দর্শন ও চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন বিপ্লবীরা। লীলা নাগও সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকলেন, তবে তাঁর চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণ মার্কসীয় চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণ থেকে কিছুটা ভিন্ন ছিল। এ সময় তিনি সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক পড়াশোনার চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। দীর্ঘ দু'বছর বন্দি থাকার পর ১৯৩৭-এর ৮ অক্টোবর লীলা নাগ মুক্তি পান। তখন তিনি সারা বাংলায় সকল বিপ্লবী ও দেশপ্রেমিক নারীপুরুষ জনতার কাছে 'কল্পলোকের রানী' হিসেবে বন্দিত। মুক্তি লাভের পরপরই ১৯৩৭-এর ডিসেম্বরে সিলেটে অনুষ্ঠিত সুরমা উপত্যকা ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম অধিবেশন উদ্বোধন করার জন্য লীলা নাগ আমন্ত্রিত হন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সিলেটের অধিকাংশ বিপ্লবী কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৬-এ সিলেট জেলা কমিউনিস্ট পার্টি জন্মগ্রহণ করে। কমিউনিস্টদের উদ্যোগেই অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন' গড়ে তোলা হয়। সিলেট ও সুরমা উপত্যকায় এর শাখা গঠনে যাঁরা প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন শ্রীসংঘের সাবেক নেতা, লীলা নাগের খুবই ঘনিষ্ঠ আমার দাদা সত্যব্রত দত্ত। আমি তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী এবং ততোদিনে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ছাত্র সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলাম। ছাত্র ফেডারেশনের প্রথম সম্মেলন উপলক্ষে উদ্বোধক হিসেবে সিলেটে লীলা নাগের আগমন বার্তা আমাদের দারুণভাবে উৎফুল্ল করে তুলেছিল। কল্পলোকের রানীকে স্বচক্ষে দেখবো, তাঁর ভাষণ শুনবো এটাই ছিল আমাদের আনন্দের বিষয়। উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে আমরা পরিচিত হয়েছিলাম তাঁর চমৎকার সুললিত দরাজ কণ্ঠ, প্রাঞ্জল ভাষা, রেডিক্যাল জোরালো বক্তব্য, বাগ্মী হিসেবে অসাধারণ দক্ষতা ও শ্রোতাদের মনকে উজ্জীবিতও আকৃষ্ট করার ক্ষমতার সাথে। প্রথম দর্শনে মানুষটিকে দেখেও আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। যেমন মিষ্টি চেহারা তেমনি সুঠাম সুগঠিত দেহ, উজ্জ্বল গায়ের রঙ, ঝক্‌ঝকে হাসি, রুচি সম্পন্ন সাদাসিধে পোশাক সবকিছু মিলিয়ে মনে হতো তাঁর বিপ্লবী সত্তা, তেজ, সাহস ও দৃঢ়তা তাঁর

চেহারাতেই প্রতিফলিত হচ্ছে। আমাদের সৌভাগ্যও এই যে অল্পদিনের ব্যবধানেই ১৯৩৮-এ তিনি আবার এসেছিলেন সিলেটে। সিলেটের নারী সমাজের পক্ষ থেকে শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ লীলা নাগকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য বিরাট আয়োজন করেছিল। এই সংবর্ধনা সভা উপলক্ষে আমাদের মতো ছাত্রীদের নিয়ে একটি বড় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। আমিও ছিলাম অন্যতম স্বেচ্ছাসেবক। মনে আছে মহিলাদের বিশাল জমায়েত হয়েছিল সেদিন। সিলেটের গৌরব নারী নেত্রী লীলা নাগকে এক নজর দেখতে ও তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ শুনতে দলে দলে মেয়েরা সেই সংবর্ধনা সভায় এসেছিলেন। তাঁর ভাষণে ছিল নারী জাগরণের উদাত্ত আহ্বান, স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী সমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণের আকুল আবেদন। নারী সমাজ তাঁর সেই ভাষণের উজ্জীবন-মন্ত্রে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আমরা যারা স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী ছিলাম আমরাও মুগ্ধ হয়ে সেই ভাষণ শুনেছিলাম এবং নতুনভাবে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলাম। সেদিনের সেই সংবর্ধনা সভায় যে লীলা নাগ এসেছিলেন তার একটা দুর্লভ ছবি এখনও আমার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। ক্যামেরায় বন্দি সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে লীলা নাগকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন কংগ্রেস মহিলা সংঘের অন্যতম নেত্রী হীরাপ্রভা চৌধুরী ও আরও অনেকে। একটি দুর্লভ সংগ্রহ আমার।

নেতাজী সুভাষ বসুর চিন্তাধারার মাঝে লীলা নাগ ও অনিল রায় তাঁদের চিন্তাভাবনার মিল খুঁজে পান এবং তাঁরই মাধ্যমে কংগ্রেসকে ডানপন্থী নেতৃত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা সংগ্রামকে বৈপ্লবিক ধারায় পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সুভাষ বসুকে তাই কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করার জন্য লীলা নাগ ও অন্য বামপন্থীরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ পরপর দু'বছরেই কংগ্রেসের সর্বভারতীয় অধিবেশনে সুভাষ বসু সভাপতি নির্বাচিত হন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তখন সংগ্রামের কর্মসূচি নিয়ে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে তীব্র সংঘাত ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এরকম একটি পরিস্থিতিতেই ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারিতে সুরমা উপত্যকা মহিলা সম্মেলনে সভানেত্রী হয়ে লীলা নাগ সিলেটে এসেছিলেন। এই সম্মেলনে লীলা নাগের ভাষণে উপস্থিত সংগ্রামী নারী সমাজ দারুণভাবে অনুপ্রাণিত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই ভাষণে স্বাধীনতার পাশাপাশি সমাজ বদলের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। তিনি তার ভাষণে বলেছিলেন— "... আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করবার পথে দুইটি বাধা-অধীনতা ও ধন বৈষম্যপুষ্ট সমাজ ব্যবস্থা... ।"

১৯৩৯ সালে লীলা নাগ ও অনিল রায়ের বিয়ে হয় এবং সে বছরই সুভাষ বসু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। লীলা নাগ ও অনিল রায় সুভাষ বসুর এই কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে থাকেন। ১৯৩৮-৩৯ থেকে আমরা ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি কংগ্রেস মহিলা সংঘের কাজে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কাজে অংশগ্রহণ ও মার্কসীয় তত্ত্ব শিক্ষার জন্য

পাঠচক্রে নিয়মিত যোগদান করছিলাম। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্যের সাথে কংগ্রেস এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের পার্থক্যটা স্পষ্ট বুঝতে আরম্ভ করেছিলাম। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে লীলা নাগের সঙ্গে আমাদের ধীরে ধীরে বাহ্যিক একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তবে নারী জাগরণে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের কারণে তিনি আমাদের অন্তরে যে শ্রদ্ধার আসনটিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেখানে আজও অধিষ্ঠিত আছেন এবং ভবিষ্যতেও বাঙালি দেশপ্রেমিক নারী-পুরুষের হৃদয়ে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন।

নারী সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করতে লীলা নাগ অত্যন্ত শক্তিশালী একটি হাতিয়ার সৃষ্টি করেছিলেন। সেটি হচ্ছে তাঁর পত্রিকা 'জয়শ্রী'। যখন তিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে খুবই ব্যস্ত তখনই তিনি নারী সমাজকে রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করতে একাই নিজস্ব উদ্যোগে 'জয়শ্রী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলা সন ১৩৩৮-এর বৈশাখ মাসে ঢাকা থেকে 'জয়শ্রী' প্রকাশিত হয়। 'জয়শ্রী'র প্রথম সংখ্যাতেই এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়—"মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও শঙ্কাহীন দেশসেবার ভাব জাগ্রত করার উদ্দেশ্য নিয়েই 'জয়শ্রী'র আত্মপ্রকাশ করলো।" উল্লেখ্য, বাংলার নারী সমাজের মুখপত্র হিসেবে 'জয়শ্রী'র আগে আর কোনো পত্রিকা ছিল না। প্রকাশের এক মাসের মধ্যেই পত্রিকাটি পাঠকের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পায়। পরবর্তী সংখ্যাতেই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আবারও লেখা হয়, "বর্তমান যুগের মেয়েদের চিন্তা ও কর্মের গতি নির্দেশ এবং ভাবীসমাজ ও রাষ্ট্র গঠন কার্যে স্থান গ্রহণে সহায়তা করা"। 'জয়শ্রী' পত্রিকার সম্পাদকীয়গুলো লীলা নাগ নিজেই লিখতেন। অবশ্য তিনি জেলে যাওয়ার পর অন্যরাও লিখেছেন। তবে তার রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার ধারায় তাঁরা লিখতেন। এসব সম্পাদকীয় ইংরেজ সরকারকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে। কাজেই জন্মলগ্ন থেকেই এর প্রকাশের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে নানা ধরনের বাধা সৃষ্টি করা হয়। ১৯৩৫-এ জয়শ্রী নিষিদ্ধ হয়ে যায় এবং ১৯৩৮-এর পর এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। 'জয়শ্রী'তে ঘোষিত পত্রিকাটির উদ্দেশ্য যে সফল হয়েছিল তার প্রমাণ আমরা ও আমি নিজে। ১৯৩৬-৩৭-এ যখন প্রথম রাজনৈতিক বইপত্র, ম্যাগাজিন পড়তে শুরু করি তখন পুরনো 'জয়শ্রী' পত্রিকাও পাঠ করার সুযোগ আমার হয়। ১৯৩৮-এ নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর 'জয়শ্রী'র নিয়মিত পাঠক ছিলাম আমি। পত্রিকাটির প্রতি আমি এবং আমার সহযোদ্ধা ছাত্রী বোনেরা দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম। 'জয়শ্রী' হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমাদের রাজনৈতিক অনুপ্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস। পত্রিকাটির সাহিত্যমূল্য, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংবাদিকতার মান নিয়ে অনেক কথাই বলা চলে; কিন্তু সে সব কথা বলা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে কিছু কথা এ প্রসঙ্গে বলতেই হয়। প্রথমত, সম্পাদক হিসেবে লীলা নাগ অসাধারণ কৃতিত্ব, গৌরব ও সাফল্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। দ্বিতীয়ত, লীলা নাগ এমনভাবে লেখা নির্বাচিত করতেন যে

এমন কিছু ছাপতেন না, যা তাঁর রাজনৈতিক-সামাজিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তৃতীয়ত, সে সময়ে সাহিত্য-রাজনীতি ও সমাজ বিষয়ে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি চিন্ত াভাবনা করতেন ও লিখতেন এমন সাহিত্যিক, লেখক, চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক প্রমুখের স্বদেশ-ভাবনামূলক লেখা 'জয়শ্রী'তে ছাপা হতো। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ, মৈত্রেয়ী দেবী, ড. মেঘনাদ সাহা, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। চতুর্থত, এই পত্রিকার লেখক ও পরিচালকের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নারী ও তাঁরা তাঁদের দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রশংসনীয় পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। পঞ্চমত, সে সময়কার নারী সমাজের প্রথম একমাত্র মুখপত্র হিসেবে জয়শ্রী অত্যন্ত উচ্চমান অর্জন করতে পেরেছিল।

একজন প্রগতিশীল নারী রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী হিসেবে লীলা নাগ তার বহুমাত্রিক কাজের ধারায় অনেক ক্ষেত্রে অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন। সে কারণে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন এবং ভবিষ্যতেও এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী জাগরণের ইতিহাসে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

যে সব ক্ষেত্রে লীলা নাগ অসাধারণত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন সেগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করছি :

১. সে সময় রাজনীতি করতে গিয়ে অনেকেই মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছেন। লীলা নাগ এ ধরনের চিন্তার বিরুদ্ধে ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি একটার পর একটা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করেছেন। আবার ছাত্রীদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের মাঝে দেশাত্মবোধ ও জাগরণ সৃষ্টি করে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালনে সংগঠিত করেছেন।
২. তিনিই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজে প্রথম ছাত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন।
৩. একই সাথে তিনি ঢাকা ও কলকাতায় দীপালি সংঘ গঠন করে নারী আন্দোলন ও নারী জাগরণের বিকাশ ঘটান এবং দীপালি সংঘের মাধ্যমে ও সহযোগিতায় নারীশিক্ষা বিস্তার, স্কুল ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, কুটির শিল্প কেন্দ্র স্থাপন করে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, নির্যাতিত নারীদের সাহায্যার্থে "নারীরক্ষা তহবিল" গঠন, ছাত্রীনিবাস ও কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল প্রতিষ্ঠা, পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি নানা ধরনের সেবামূলক কাজ পরিচালনা করেন এবং নানা সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেন। 'দীপালি ছাত্রীসংঘ' গঠন করে তিনি ছাত্রীদেরও গঠনমূলক ও সেবাধর্মী কাজের মাধ্যমে নারী আন্দোলনের শক্তি হিসেবে গড়ে তোলেন এবং ছাত্রীদের দাবি-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে তাদেরকে সংগঠিত করেন। উল্লেখ্য, এটাই ছিল 'ভারতে প্রথম ছাত্রী সংগঠন।'

৪. দীপালি সংঘের সহযোগিতায় লীলা নাগ ঢাকা শহরে অনেকগুলো স্কুল স্থাপন করেন। এরকম একজনের নেতৃত্বে এতোগুলো স্কুল স্থাপনের নজির আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি ঢাকায় ১২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজে বিনা বেতনে কাজ করে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এর নাম ছিল দীপালি হাই স্কুল। পরে এর নাম হয়েছে কামরুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। আরও যে সব স্কুল তিনি স্থাপন করেছিলেন, সেগুলোর নাম হচ্ছে—নারী শিক্ষা মন্দির, শিক্ষাভবন, শিক্ষায়তন, শিক্ষালয়, বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয়। তিনি নিজের গ্রামেও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন যা এখনও টিকে আছে। নারী শিক্ষা মন্দির ও বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয় এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। তবে পাকিস্তান আমলে নারী শিক্ষা মন্দিরের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখা হয়েছে 'শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়।'

৫. লীলা নাগই হচ্ছেন প্রথম মহিলা, যিনি তৎকালীন অধিকাংশ পুরুষ বিপ্লবীর নারীর প্রতি হেয় ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে অগ্রাহ্য করে গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী দল 'শ্রীসংঘে'র সদস্য হয়েছিলেন। এটি ছিল একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। এর আগে কোনো বিপ্লবী দলেই কোনো নারী সদস্য গ্রহণ করা হয় নি। লীলা নাগের ব্যতিক্রমী চরিত্র ও যোগ্যতার আরও প্রমাণ পাওয়া যায় যখন অনিল রায়ের গ্রেফতারের পর তিনি নিজেই শ্রীসংঘ দলটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং পুরুষ সদস্যরা তাঁর সফল নেতৃত্বকে মনেপ্রাণে মেনে নেন।

৬. লীলা নাগই সর্বপ্রথম মহিলাদের মুখপত্র ('জয়শ্রী') প্রকাশ ও সম্পাদনার একক কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। এর আগে বাংলায় মহিলাদের কোনো মুখপত্র প্রকাশিত হয় নি। পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে লীলা নাগ একটি উচ্চমানের পত্রিকা সম্পাদনা করে নিজে একজন সফল সম্পাদক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। 'জয়শ্রী' লীলা নাগের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা, লক্ষ্য ও আদর্শ প্রচারের একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। জয়শ্রীর মাধ্যমে লীলা নাগ বাংলার হাজার হাজার নারীকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে নারী সমাজকে আকৃষ্ট করেছেন।

৭. ভারতবর্ষে লীলা নাগই ছিলেন প্রথম বিনাবিচারের আটক মহিলা রাজবন্দি।

৮. বাগ্মী হিসেবে লীলা নাগ ছিলেন অসাধারণ। শ্রোতারা তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট না হয়ে পারতেন না। উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিতে তাঁর ভাষণের প্রভাব ছিল অনন্যসাধারণ।

৯. বিশের দশকে লীলা নাগ নারী জাগরণের ক্ষেত্রে অনন্য পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাংলার নারী জাগরণের ইতিহাসে লীলা নাগ হয়ে আছেন একটি মাইল ফলক।

১০. লীলা নাগের কর্মক্ষেত্র ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। মূলত ঢাকাকেন্দ্রিক কাজ করলেও একই সাথে তিনি কলকাতায়ও কাজ চালিয়ে গেছেন। বিপ্লবী সংগঠন গড়তে গিয়ে তিনি ঘুরেছেন সারা বাংলা, সিলেটসহ গোটা সুরমা উপত্যকা, কখনও-বা আসাম। ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠিত করতে তিনি চষে বেড়িয়েছেন গোটা ভারতবর্ষ। তাঁর কর্মক্ষেত্র যেমন বিস্তৃত ছিল বহুদূর পর্যন্ত তেমনি একই সাথে তিনি বহু বিচিত্র ধরনের কাজ চালিয়ে আমাদেরকে বিস্ময়াভিভূত করেছেন। তিনি তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য-আদর্শকে কেন্দ্র করে চালিয়ে গেছেন তাঁর বহুমাত্রিক কাজ। কখনও তিনি খাঁটি রাজনীতিবিদ, আবার পরক্ষণেই তিনি সমাজসেবী ও সমাজসংস্কারক, কখনও তিনি কেবলই শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। আবার তিনি নারী সংগঠনের নেত্রী, কখনও নারী-পুরুষ উভয়েরই নেত্রী। কখনও তিনি গোপন বিপ্লবী সংগঠনের সশস্ত্র বিপ্লবী, আবার তিনি কংগ্রেসের প্রকাশ্য নেত্রী। দূর-দূরান্তে, মাঠে-ময়দানে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, আবার ঘরে বসে কলম দিয়ে লিখছেন, পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। একাধারে তিনি রাজনীতিবিদ, লেখক, পত্রিকা সম্পাদক ও প্রকাশক।

লীলা নাগ তাঁর সমগ্র কর্মকাণ্ড, জীবনাচরণ ও গুণাবলি দ্বারা ইংরেজ আমলে যে হাজার হাজার নারীকে প্রেরণা যুগিয়েছেন, নারী আন্দোলনে ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়েছেন আমি তার অন্যতম। তাই আজ তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গভীর শ্রদ্ধার সাথে এই মহীয়সী নারীকে স্মরণ করছি এবং সংক্ষেপে তাঁর সম্পর্কে দু'চারটি কথা নিবেদন করছি। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী জাগরণের ইতিহাসে লীলা নাগের নাম লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। লীলা নাগ অমর।

লীলা রায়-অনিল রায় : শতবর্ষের আলোয়

ভূদেব চৌধুরী

'মানুষের ধর্ম'র কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বুঝিয়েছিলেন, 'মানুষের একটা দিক আছে যেখানে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেইখানে আপন ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নির্বাহে তার জ্ঞান, তার কর্ম, তার রচনাশক্তি একান্ত ব্যাপৃত। সেখানে সে জীবনরূপে বাঁচতে চায়।

'কিন্তু মানুষের আর একটা দিক আছে, যা ব্যক্তিগত বৈষয়িকতার বাইরে। সেখানে জীবনযাত্রার আদর্শে যাকে বলি ক্ষতি তাই লাভ। যাকে বলি মৃত্যু সেই অমরতা। সেখানে বর্তমানকালের জন্য বস্তু সংগ্রহ করার চেয়ে অনিশ্চিতকালের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ করার মূল্য বেশি।...

'স্বার্থ আমাদের যে-সব প্রয়াসের দিকে ঠেলে নিয়ে যায় তার মূল প্রেরণা দেখি জীবন প্রকৃতিতেও। যা আমাদের ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে নিয়ে যায় তাকেই বলি মনুষ্যত্ব, মানুষের ধর্ম।'

লীলা রায়ের কথা মনে আসে। লীলা নাগের তখন 'জীবনযাত্রা' শুরু হয়েছিল ব্যক্তিগত 'বিষয়বুদ্ধি'র তাগিদে নয়, সমাজ-সেবায় আত্মত্যাগের প্রেরণা-ভরে। 'তার' বাঁধা হয়ে গিয়েছিল শুরুতেই। সতেরো বছর পূর্তির জন্মদিনে বাবাকে লিখেছিলেন, 'আমার ক্ষুদ্র শক্তি যদি একটি লোকের উপকার করতে পারতো তবে নিজেকে ধন্য মনে করতুম!' সেই বাসনাই প্রথম রূপ ধরলো নারী-উজ্জীবন, নারীশিক্ষার প্রয়াসে। সেই উপলক্ষে বলেছিলেন, 'কী-নারী কী পুরুষ—মনুষ্যত্ব যাহার মধ্যে বিকাশ লাভ করিয়াছে'—সে সকল অবস্থায় জীবনের সকল স্তরেই গৌরবের সহিত বিরাজ করিবে।' চোখের ওপরে দেখতে পাই, লীলা রায়-অনিল রায়ের যুগল-জীবন এই সিদ্ধান্তেরই বিমূর্ত প্রকাশ।

বিচিত্র সামর্থ্যের অধিকারী ছিলেন অনিল রায়; অনেক সময়ে, বুঝি-বা পরস্পর-বিপরীতও। যে-দুটি হাতে, সমস্ত শরীর দিয়ে কুস্তি কসরত লড়েছেন, সেই দুটি হাতেই প্রাণের আকুতি জড়িয়ে সুরের অমৃত ঝরিয়েছেন তারের যন্ত্রে। কণ্ঠেও ছিল সুরের ঝর্ণা। গাইতেন রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্তের গানের সমান্তরাল ধারায় বিভিন্ন ভাষার মার্গ সঙ্গীতও। তার সঙ্গে মিলে যেত আপন মনের রচনা, আপন সুরের ধারায়। স্রষ্টা ছিলেন অনিল রায়—গদ্যে-পদ্যে। এবং মনস্বী দার্শনিকও। মেধাবী ছাত্র ছিলেন; সংস্কৃতে অমেয় পারঙ্গমতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি পেয়ে, স্নাতকোত্তর পরীক্ষার মাস কয়েক আগে বিষয় পাল্টে নিলেন—বিপরীত মেরুতে; সংস্কৃত ছেড়ে ইংরেজিতে। ভালোই হয়েছিল। ওই সূত্রেই একই বছরের ইংরেজি এম এ পরীক্ষার্থিনী লীলা নাগের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গেল বই যোগাড় করতে গিয়ে। জীবন-বিধাতার আপন হাতে বাঁধা জীবন-গ্রন্থি—ইতিহাসের পৃষ্ঠপটে। স্বল্প-পঠিত বিষয়ের পরীক্ষাতেও অনিল রায়ের সাফল্য ছিল বিস্ময়কর।

এমন যে প্রতিভা, তার সহজ সার্থক অভিব্যক্তি ঘটতে পারতো বিদ্যার সাধনে, সুরশিল্পের সৃজনে। কিন্তু তার বদলে ছিটকে গেলেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের অগ্নিবর্ষী স্বতন্ত্র পথে। তার মূলে ছিল 'ত্যাগের দিকে, তপস্যার দিকে' আন্তরিক টান। মানুষের প্রয়োজনে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ। 'তপস্যা' ছিল যথা-অর্থেই! শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রেরণায় উদ্বোধিত মন সংসারবিমুখ বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকেছিল; তারই সঙ্গে অভিন্ন তন্ত্রীতে বাজছিল পরাধীনতাতে মানুষের যাতনার অনুভব। অনেক টানপোড়েনের শেষে বৈরাগ্য সাধনের চেয়ে মানব-সেবাতেই খুঁজে মিললো অন্তরের চরিতার্থতা। চরিতার্থতার এ-বোধ জীবন-তপস্যার পরিণাম।

লীলা নাগের কথায় ফিরি যদি! মনুষ্যত্ব বিকাশের সাধন ছিল মজ্জাগত। তারই টানে নারীমুক্তির বিধানে সমর্পিত হয়েছিলেন প্রথমাবধি। ফলে নারী-শিক্ষার অভাবিত আয়োজন, সেই সূত্র ধরে বিদুষী জ্ঞানাগ্রহী 'rational' প্রতিভা শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-কর্ণধার, সেই সঙ্গে দিগ্‌দর্শিকা সাহিত্য-সাংবাদিকতার ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা পেতে পারতো অবিসংবাদী মাত্রায়। তারই মাঝে, অভিজ্ঞতা বশেই বোঝা হয়ে গেল—'একমাত্র সমাজের পরিবর্তনই নারী-মুক্তি ঘটাতে পারে না। তার জন্য চাই রাজনৈতিক মুক্তি। পরাধীন দেশে কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার আন্দোলন 'পৃথকভাবে' সফল হতে পারে না।' ফলে বিকাশের সহজ স্বক্ষেত্র হতে ঝাঁপ দিলেন বিপ্লব-পন্থায়।

এইখানে লীলা নাগ-অনিল রায়ের জীবনধারা সগোত্র—সহজে সমব্রতী। প্রতিষ্ঠা ও 'সিদ্ধি'র স্বাভাবিক পন্থা ছেড়ে, অভাব্য-অসাধ্য সাধনে নিমজ্জন! শ্রীসংঘের প্রতিষ্ঠাতার বিপ্লব সাধনের প্রেরণায় উজ্জীবিত—সংযোজিত হলেন দীপালি সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী।

এ-ও, আসলে, 'মানুষের ধর্ম'-সাধনের দিশা–নিহিত বিপ্লবের অন্তঃপ্রেরণায়। আপাত-'মৃত্যু'র গহনে 'অমরতা' লাভের সাধনা; 'আত্মত্যাগের' অমূল্য মূল্য

সন্ধানের নিশানা। অস্ত্রের স্বল্প সম্বল নিয়ে মারণাস্ত্রাধিপতিদের প্রতিরোধের দুটো পথ : এক সন্ত্রাস, আর এক বিপ্লব। প্রথমটার একমাত্র প্রেরণা পর-নিধন—প্রতিপক্ষের নিঃশেষণ; এবং এরই সঙ্গে সন্ত্রস্ত আত্মসংরক্ষণ। সন্ত্রাস স্বভাবে ভীরু—পরকে মেরে নিজেকে বাঁচাতে পালিয়ে বেড়ায়—আতঙ্কে, আশঙ্কায়। একটাই তার উদ্দেশ্য—পরনাশন-ধ্বংস। বিপ্লবের প্রেরণা পুনঃসৃষ্টির। যা-কিছু জীর্ণ, যা-কিছু জীবন-ধর্মের প্রতিরোধী—বিনাশক, তাকে ধ্বংস করে, মানুষের পুনরুজ্জীবনের 'তপস্যা'। প্রতিহিংসায় তার উৎস নয়, আত্মসমর্পণে—আত্মত্যাগের আমূল আকুতিতে তার উদ্ভব! বিপ্লবীর প্রথম শিক্ষা—তাঁর প্রথম দীক্ষাও—আপন প্রাণ দানের। প্রাণ দিতে পারার অন্তর্গর্ভ সাহসে এবং সামর্থ্যে। মহত্তম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মহত্তম বলি দান! সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রাণপণে সকল প্রতিকূলতার উৎপাটন! তখন সে আর হিংসা-প্রণোদিত পর-নিধন নয়, পুনর্সৃষ্টির ব্রত-সাধনে পরিপন্থী বাধার নির্মূলন। 'শ্রীসংঘে'র সাংগঠনিক বিবরণে দেখি, নানা কসরতের ভেতর দিয়ে শরীর গঠন এবং উপনিষদাদির শিক্ষায় মানস উজ্জীবন সেই ত্যাগব্রতের, আপন প্রাণ দিয়েও নতুনতম, সজীবতম প্রাণপ্রতিষ্ঠা-ব্রতের প্রস্তুতি।

এই অভাবিত উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে অনিল রায়-লীলা নাগ যুগল-বন্দি গড়েছিলেন বিপ্লব-সাধনের নতুন যাত্রা রচনায়। স্বভাবে এবং আদর্শেও, তাঁরা 'রাজনৈতিক' ছিলেন না। রাজনীতির চরিত্র একমাত্র উদরায়ণের। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'বিষয়বুদ্ধি নিয়ে সে আপন সিদ্ধি খোঁজে। ... সে জীবরূপে বাঁচতে চায়।' তার প্রকাশ কেবল পরাধীন ভারতে একমাত্র প্রতিপক্ষ পরদেশী প্রচণ্ড প্রশাসনের বিরোধিতায় নয়। তখনকার সংগ্রামীদের মধ্যেও 'আপন সিদ্ধি' খোঁজার খেয়োখেয়িতে হঠাৎ সেই জৈব বিভীষিকার প্রথম আবিষ্কার ঘটে যেতেই, অনিল রায়কে ছুটতে হয়েছিল বদরিকাশ্রমের পথে—আত্মমুক্তির—নিজের ভেতরকার 'অমর মানুষ' সত্তাটির মুক্তির নিশানা ধরতে। রহস্যকর সেই অনির্বচনীয় অন্তঃসত্তাটির সন্ধানেই তাঁরা মনেপ্রাণে যুগলবন্দি হয়েছিলেন। কালে কালে লীলা নাগও ঘর গড়েছিলেন লীলা রায় হয়ে। সে ঘর বরাবর—শেষ পর্যন্তই—তাঁদের মিলিত জীবনে এবং অবশেষে লীলা রায়ের দীর্ঘ একক জীবনেও ছিল একান্তই 'বিপ্লবী'র ঘর। প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেবার নয়। প্রাণান্ত করেও নতুন প্রাণ জাগাবার অবিরল তপস্যা।

সে ফাঁদে সকল অকিঞ্চিৎকরতা নিয়ে আমিও জড়িয়ে পড়েছিলাম। সারা দেশটা-সারা পৃথিবী যখন আজ তার অঢেল 'বৈজ্ঞানিক' (?) 'বিষয়বুদ্ধি নিয়ে 'আপন সিদ্ধি' খোঁজার জৈবতায় আপ্লুত, তখন, যাবার আগে, জীর্ণ শরীর-মনে স্বপ্ন দেখি, 'মানুষের ধর্ম'-সাধনের মিলিত সেই মহিমা দ্যুতির অনুভব কৃতার্থ করবে আমার অন্তিম নিশ্বাসকে। সে পরমানুভবের কণামাত্র নিবেদন করে শেষ করবো আমার নম্র শতবর্ষ-স্মরণাঞ্জলি।

১. ১৯৪৭-এর প্রথম দু-তিন মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৬—এম এ পরীক্ষায় ফল প্রকাশিত হতে, অনিল রায়ের কাছে গিয়েছিলাম। ১৯৪৬-এর ভয়ানক দাঙ্গার উতাল-পাতাল ঠেলে সে বছর পরীক্ষা হয়েছিল ডিসেম্বর মাসে। পড়াশোনার নিয়মিত কার্যক্রম শেষ হতে মনে হয়েছিল,—অনেকদিন ধরেই মনে ছিল—সুভাষবাদের সেবায় সর্বক্ষণের জন্য নিবেদিত হবো। 'নেতাজি'র মহাসংগ্রামের দীপ্তি তখন গোটা দেশের, পৃথিবীরও, মনোমন্থন করে ফিরছে।

দরোজা বন্ধ করে তখন তারের যন্ত্রের সুর ঝঙ্কার করছে। সুনীলদার, প্রয়াত সুনীল দাসের, নিবিড় সান্নিধ্যে ওই অবকাশে পাঠ চলেছিল সমাজবাদ-সুভাষবাদের স্বরূপ ঘিরে। একই সঙ্গে কালের পথে মন ভরছিল সুরের স্পন্দনে। ঘণ্টাটাক বাদে মুক্ত-দ্বার কক্ষে প্রবেশ যখন মিলল, প্রণাম করে নিজেকে সমর্পণ করতে চাইলাম। স্বীকৃতি মিলবে, সে বিষয়ে সংশয় ছিল না। কিন্তু জবাব এলো স্তম্ভিত—অভিভূত করে।

ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে তখন রাজনৈতিক ডামাডোলের শেষ নেই। 'কেবিনেট মিশন' আসবার মুখে। মনে আছে, স্নিগ্ধ-প্রশান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন : রাজনীতির ক্ষেত্রে দল বাড়াবার অনিবার্যতা আর নেই। নেতাজি শুরু থেকেই রাজনীতির সংগ্রামকে জীবনের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে চেয়েছিলেন। শুনে আমার মনে হয়েছিল, আই. সি. এস-এর বাঁধন কাটিয়ে দেশ-সেবায় সমর্পিত হওয়ার মুখে দেশবন্ধুকে লেখা ঐতিহাসিক চিঠির কথা। অনিল রায় বোঝালেন, সে সময়ে সবটা ঝোঁক পড়ে গিয়েছিল রাজনৈতিক সংঘর্ষের ওপরে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের প্রত্যয় ছিল অটুট। হরিপুরায় 'রাষ্ট্রপতি' হবার পরে 'নেশনাল প্ল্যানিং কমিটি' গড়েছিলেন অর্থনৈতিক উজ্জীবনের পরিকল্পনায়। আরো উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষা, সমাজগঠনাদি বিষয়ে সমিতি গঠনের। সে আর হয়ে ওঠে নি।

সব বুঝিয়ে, আপন শান্ত ভঙ্গিতে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বাত্মক 'রেজিমেন্টেশান'-এর প্রয়োজন আর নেই। কেবিনেট মিশন আসছে; দেশ ভাগ হলে স্বাধীনতা আসবে ওই বছরেই; আর অখণ্ড ভারত রক্ষা করা সম্ভব হলে, তিন বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবেই। কিন্তু লোভ ওরা, সেদিনের নেতারা, সামলাতে পারবেন না। ওই বছরেই ভাঙা দেশ রাজনৈতিক বাঁধন-মুক্ত হবে। কিন্তু তারপরে তো চারদিকে সব সুনসান! বলেছিলেন, কী-অথৈ অন্ধকারে যে আমরা ডুববো!

তারপরে বলেছিলেন, পরীক্ষার ফলে ভালো ছাত্র আমি, ভালো বলতে পারার কথাও তাঁর কানে গিয়েছিল। তারপরে প্রশান্ত নির্দেশের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'তুমি পড়াতে যাও। নেতাজির নামে আমি তোমায় স্বাধীন ভারতে শিক্ষকের ভূমিকায় নিয়োগ করছি।'

বিমূঢ় হতে হয়েছিল, হতাশও—কিছুটা বুঝিবা আত্মাবনমিতও। আমাকে কী অযোগ্য বিবেচনা করলেন! পরে সারা জীবন দিয়ে বুঝেছি, অব্যবহিত 'বর্তমানের' টানে 'বস্তু'-সংগ্রহ না করে, ভাবীকালের—চিরকালের দেশ গড়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মজ্জায়।

ওইখানে আপন জীবন-মূল্য দিয়ে বুঝি, অনিলচন্দ্র নিছক রাজনীতিজীবী ছিলেন না। ছিলেন যথার্থ বিপ্লবী। বিভগ্ন জীবনের বিধ্বস্ত স্তূপ হতে পুনর্জীবন রচনার সৃজনশীল যাদুকর! যাবার আগে সভয়ে ভাবি, আমায় যদি বিধান-সভা-সংসদ-ঘেরা সংঘর্ষে জীবনপাত করতে হতো!

মনে পড়ে, অগ্নিযুগের সহযোগী বলেছিলেন, বিপ্লবীদের সংগঠনেও মানুষের আবহাওয়া বইয়ে দিয়েছিলেন অনিল রায়। জেল থেকে ছোটো ভাইকে লিখেছিলেন, 'ব্যর্থতা আছে, নিরানন্দ আছে, তবু মনে মনে বিশ্বাস আছে, মানুষকে ভালোবাসি। এইখানেই মন তৃপ্তিতে ভরিয়া যায়।' যখন যাই করুন, 'এইখানেই' অন্তরের অন্তরে 'মানুষের ধর্ম'র তপস্বী ছিলেন তিনি।

২. কুনো মানুষ আমি বরাবর। আগ বাড়িয়ে কখনো কোথাও পৌঁছতে পারি নি। দূর হতে দেখতে পেতাম, ১৯৪৭-এ, রাসবিহারী এভিন্যুতে 'জয়শ্রী' পুনঃসংগঠনের আয়োজন। হয়তো তখন ১৯৪৮। অনিল রায় তখনো লীলা রায়ের পাশে। কাছে যাওয়া হয় নি। তারপরে সরকারি চাকরির দৌলতে ছিটকে যেতে হলো কলকাতার বাইরে। ফিরে আসি অনিল চন্দ্রের তিরোধানের মুখোমুখি সময়ে। মেডিকেল কলেজ থেকে তাঁর অন্তিম যাত্রার অনুসারী হতে পেরেছিলাম—পেছনের সারিতে। নিজের মতো 'ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নির্বাহে'র কঠোর জটিলতায় বিব্রত। ১৯৫৩ সাল তখন। হঠাৎই উত্তর কলকতার প্রান্তিক আবাসে দেখি এক 'পোস্টকার্ড'। 'আশা করি ভালো আছো। আমার সঙ্গে একবার দেখা করো। পিসী।'

হাতের লেখা পুরো অচেনা–অথচ 'পিসী'! মুশকিল আসান হয়ে গেল চিঠির ওপরে ঠিকানা দেখে—'৪৭-এ, রাসবিহারী এভিন্যু'!

লীলা রায়ের ভাইপো একজনের সহপাঠী ছিলাম। বন্ধুত্বের বাঁধন গড়েছিল। সেই সুবাদে কাছে ডাকতে মনের গহনেও আরো কাছে টেনে নিলেন। এ তাগিদ প্রয়োজনের ছিল না—সারাজীবন আমার ধন্য হয়েছে অকারণ স্নেহের সেই আনন্দ-বর্ষণে। ডাকতাম 'পিসী', জানতাম মা! অথচ, তিনিই ছিলেন 'শিখাময়ী' বিপ্লব-নেত্রী।

রবীন্দ্রনাথের কথা আবার মনে আসে; বলেছিলেন 'মানুষের ধর্ম' বোঝাতেই—'দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র; পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল। মিল চায়। মিল না পেলে হয় অকৃতার্থ। তার সফলতা সযোগিতায়।' মন পাওয়ার সাধনে, মন চাওয়ার ব্যাকুলতায়—মানুষে–মানুষে অমোঘ 'সহযোগিতা'র মেল বন্ধনে লীলা রায় অন্তর হতে ছিলেন 'মানুষের ধর্ম'-'তপস্যা'য় সমর্পিতা।

আসলে, সকল কালের, সকল মানুষের উজ্জীবনে মন-চাওয়া-পাওয়ার আন্তর সাধনায় নিয়োজিত—নিমগ্ন হয়েছিল দু'টি স্বতন্ত্র মহা জীবন—পরিণামে যুগলবন্দি হয়ে। লীলা রায়-অনিল রায়ের 'মানুষের ধর্ম'-সাধনের সেই ঐতিহাসিক পাদপীঠে বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি আজ--শতবর্ষ-স্মরণের আলোর তলায়।

বাংলার উজ্জ্বলতম অগ্নিকন্যা : লীলা নাগ

সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন

চল্লিশ দশকে আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন যে স্বল্পসংখ্যক মুসলমান ছাত্রী আমাদের সহপাঠিনী কিংবা সমকালীন ছাত্রী ছিলেন তাঁদের কেউ-ই রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন না। এমন কি মুসলমান ছাত্রদেরও যে ক্ষুদ্রাংশটি রাজনীতি করতেন তা ছিল প্রধানত মুসলিম লীগের অনুসারী। অবশ্য মুসলমান ছাত্রদের কয়েকজন প্রগতিশীল এবং সমাজতন্ত্রী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মুসলমান ছাত্রীদের কেউ কেউ হয়তো তাঁদের চিন্তাচেতনার মধ্যে রাজনীতি সম্পর্কিত ধ্যানধারণা লালন করতেন—কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে আসতেন না। সামাজিক পরিবেশও মুসলমান ছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অনুকূলে ছিল না। মুসলিম সমাজ সবেমাত্র গোঁড়ামির বিভিন্ন ধরনের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করছে। অন্যদিকে, দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষায়, ব্যবসায়, পেশায়, চাকরিতে পিছিয়ে থাকা মুসলিম সমাজ থেকে মধ্যবিত্ত সমাজের স্ফুরণ ঘটছে। পেশায়, ব্যবসায়, চাকরিতে তাদের প্রাপ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে। সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের 'শতকরা ষাটের' সুযোগ নিতে তারা নিজেদের প্রস্তুত করছে। এমতাবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলন ও তৎপরতায় সম্পৃক্ত হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার মতো বিলাসিতা উঠতি মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সবচেয়ে বড়কথা, মুসলমান রাজনীতি তথা মুসলিম লীগ রাজনীতি তখন বন্দি ছিল ঢাকার নবাব এবং তার বাসভবন আহসান মঞ্জিলে। এই মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল সামন্ত নেতৃত্বের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্র সমাজের সমর্থন-সহযোগিতা খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হতো না। তাঁদের রাজনীতির হাতিয়ার ছিল সাম্প্রদায়িকতায় পুষ্ট ঢাকা শহরের মহল্লার সর্দারবৃন্দ। সুতরাং এমতাবস্থায় ঢাকার সেই সামন্তবাদী রক্ষণশীল মুসলিম রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুসলমান ছাত্রীদের

রাজনীতিতে আনবেন, কিংবা তাদের রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠা পছন্দ করবেন—এমন ভাবাও 'গুনাহ' বলে গণ্য হতো। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, হিন্দু ছাত্রীরা তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যার প্রায় শতকরা নব্বইজন হলেও তাদের কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পরিলক্ষিত হয় নি। তাদের কেউ কেউ হয়তো নিজ পরিসীমায় গোপনে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, রাজনৈতিক বিশ্বাস পোষণ করতেন—কিন্তু ছাত্রী হিসেবে প্রকাশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজনীতি করতেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও ছাত্রী রাজনীতিক বা নেত্রী হিসেবে প্রকাশ্যে তাদের দেখা যায় নি। এর কারণ হয়তো এই যে ঢাকা শহর ছিল মূলত 'ইউনিভার্সিটি টাউন'; নামে বিভাগীয় শহর হলেও সুযোগ-সুবিধা, জীবনধারা সবদিক দিয়েই মফস্বলের একটি ছোট শহর মাত্র। হিন্দু সমাজও তখন পর্যন্ত খুব একটা উদার এবং অগ্রসরমান হয়ে উঠতে পারে নি।

এই অবস্থার পরিবর্তন, যথার্থভাবে বলতে গেলে, লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটলো সাতচল্লিশের পরে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের, বিশেষ করে মুসলমান মেয়েদের আগ্রহ-উৎসাহ পরিলক্ষিত হলো। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রী সংখ্যা অকস্মাৎ আশান্বিতভাবে বৃদ্ধি পেলো। একই সঙ্গে রাজনীতি এবং বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তাঁদের অংশগ্রহণও বেড়ে গেল। এক কথায় সাতচল্লিশের পর থেকে পূর্ববাংলায় ছাত্রীরা সমাজ ও রাজনীতিতে তাঁদের অবস্থান, অধিকার এবং ভূমিকা সম্পর্কে ক্রমশ আরও সচেতন হয়ে উঠতে লাগলো। এর মূলে ছিল আটচল্লিশ থেকে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, যা মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যে যে এক ধরনের আরব-ইরান তথা পশ্চিমমুখিতা, উর্দু ভাষা ও সংস্কৃতি মোহাচ্ছন্নতা ছিল তা ছিন্ন করে দিলো। এবং তাঁদের চেতনার গভীরে যে বাঙালিত্ববোধ ছিল তার উন্মেষ ঘটালো। বাঙালি মুসলমান রূপান্তরিত হতে শুরু করলো মুসলমান বাঙালিতে। সবচেয়ে বড় কথা, ভাষা আন্দোলন পূর্ববাংলায় মুসলিম ছাত্র-যুব সমাজকে করে তুললো আন্দোলনমুখী, সংগ্রামী। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষায় রক্তদানের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার ছাত্ররা সংগ্রামী রাজনীতির স্বাদ গ্রহণ করলো প্রথমবারের মতো। মুসলমান ছাত্রীরাও পিছিয়ে থাকলো না। তাঁরাও সব ধরনের সংস্কার বর্জন করে, বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে প্রগতিশীল ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো ছাত্রদের সঙ্গে। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারা চললো পঞ্চাশ এবং ষাট দশক ধরে। সে সময়ের সংগ্রাম-আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকায় এবং নেতৃত্বে যেসব ছাত্রীকে দেখেছি তাঁদের অনেকের কথাই মনে পড়ছে। প্রসঙ্গত সংগ্রামী ছাত্রী নেত্রী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রীর নাম উল্লেখ করছি। তাঁরা হলেন—নাদিরা বেগম, মতিয়া চৌধুরী, মালেকা বেগম, মাহফুজা খানম, রাফিয়া আক্তার ডলি। পূর্ববাংলার ছাত্র-যুব রাজনীতিতে এরা নারী নেতৃত্বের সূচনা করেছিলেন। পশ্চিমা উর্দু ভাষী পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নেত্রীরা তৎকালীন আন্দোলন-

সংগ্রামে ছাত্র রাজনীতি কর্মী-নেতাদের সমতুল্য ভূমিকা রেখেছিলেন।

এখানে এই লেখায় আমি ব্রিটিশ যুগের একজন সংগ্রামী নারী বিপ্লবীর কথা বলতে চাইছি, যিনি এঁদের অনেক আগে বিশ দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী। তাঁর নাম লীলা নাগ (১৯০০-১৯৭০)। বাংলার অগ্নিযুগের তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্নিকন্যা, আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অগ্নিকন্যা এবং সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগদানকারী নারী বিপ্লবী। ১৯২২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগীয় ভিত্তিতে ইংরেজি সাহিত্যে যে প্রিলিমিনারি বা প্রথম পর্ব এম এ পরীক্ষা হয় তাতে কৃত কার্যদের তলিকায় তার নাম আমরা দেখতে পাই। পরের বছর ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিত এম এ ফাইনাল বা শেষ পর্ব ইংরেজি সাহিত্য পরীক্ষায় তিনি অংশগ্রহণ করে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে এককালের খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ এবং 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক আলতাফ হোসেনের নাম উল্লেখ্য, যিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন (সূত্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার ১৯২১-২২, ১৯২২-২৩, ১৯২৩-২৪)। লীলা নাগের অন্যতম সহপাঠী ছিলেন ত্রিশ দশকের বিপ্লবী সংস্থা 'শ্রীসংঘে'র নেতা অনিল রায়। পরবর্তীকালে লীলা নাগ তাঁর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং লীলা রায় নাম পরিগ্রহণ করেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, লীলা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকাকালে অনিল রায়ের নেতৃত্বে গঠিত Social Welfare League নামে সমাজসেবামূলক সংগঠনের হয়ে কাজ করতেন। তাঁদের দু'জনের কেউই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতায় অংশ নিতেন না। প্রকৃত পক্ষে Social Welfare League ছিল তাঁদের অপ্রকাশ্য রাজনীতির ঢাল এবং ভবিষ্যতে শ্রীসংঘ নামে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তুতি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের এম এ প্রথম পর্ব ও শেষ পর্বের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষে তদানীন্তন অখণ্ড বাংলার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং নারী রাজনীতিক কর্মী-নেত্রী হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তাই, এখানে তৎকালীন তথা বিশ-ত্রিশ এবং চল্লিশ দশকের অখণ্ড বাংলার রাজনীতি সম্পর্কিত আলোচনা এসে পড়ে।

না, উপরোক্ত তিন দশকের অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তর পরিধির রাজনীতির বিস্তারিত আলোচনায় আমি যাবো না, এদেশে বৃটিশ শাসন বিরোধী Constitutional এবং Agitational, নিয়মতান্ত্রিক এবং আন্দোলনমুখী মূল রাজনীতির ধারার সমান্তরালে, তার-ই অন্তস্রোত হিসেবে যে Politics of violence, তথাকথিত সন্ত্রাসী বা বিপ্লবী রাজনীতি, শুরু হয়েছিল বিশেষ করে, সেই 'বিপ্লবী পলিটিক্স অব ভায়োল্যান্সে' নারীবিপ্লবীদের ভূমিকা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকবো। অবশ্য, এই সন্ত্রাসী বিপ্লবী রাজনীতি এক পর্যায়ে এসে আর মূল রাজনীতির অন্তস্রোত কিংবা তার সমান্তরালে থাকে নি, একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপরীত রাজনীতির ধারায় পরিণত হয়েছিল বিশ দশক থেকে

ত্রিশ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো—সেদিনের ভায়োলেন্ট বা সন্ত্রাসী রাজনীতি এবং আজকের রাজনৈতিক সন্ত্রাস এক নয়। আজকের সন্ত্রাসীরা আদর্শহীন, দুর্বৃত্ত, সমাজের কলঙ্ক। ছিনতাই, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, অর্থ-লিপ্সায় বোমাবাজি, বন্দুকবাজি, মস্তানীর অপর নাম সন্ত্রাস। অতীতের অবিভক্ত বাংলার যাঁরা বিপ্লবী সন্ত্রাসী ছিলেন তাঁরা উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত ছিলেন দেশপ্রেম এবং দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের মহান আদর্শে। তাঁদের আজও বাঙালি শ্রদ্ধা-আপ্লুত চিত্তে স্মরণ করে। তাঁদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ হয়, রাজপথের, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসের নামকরণ হয়। বাঙালির অন্তরে তাঁরা অমর হয়ে আছেন। অনুরূপ স্মরণীয় বরণীয় একজন নারী বিপ্লবী ছিলেন লীলা নাগ। শুধু তিনি নন, আরও বাঙালি ললনা ছিলেন। সে আলোচনায় পরে আসছি। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বাংলার বিপ্লবীরা তাঁদেরকে সন্ত্রাসী বা 'টেররিস্ট' এবং 'এনার্কিস্ট' অভিহিত করা পছন্দ করতেন না। তাঁরা গোপন প্রচারপত্রের মাধ্যমে এর প্রতিবাদ করতেন। ১৯২৪ সালে 'দেশের প্রতি নিবেদন' নামক একটি গোপন বিলিকৃত লিফ্‌লেটে এ ধরনের প্রতিবাদ ছিল (সূত্র : বজলুর রহমান খান : *পলিটিক্‌স্ ইন বেঙ্গল*, পৃ. ১৬৫)। কারাগারে বন্দি অবস্থা থেকেও বিপ্লবীরা প্রাদেশিক বঙ্গীয় সরকারের নিকট প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে পত্র পাঠিয়েছেন। মাতৃভূমিকে বিদেশি শাসনমুক্ত করার কঠিন ব্রত নিয়ে চরম বা সশস্ত্র পন্থা গ্রহণ করাকে তাঁরা কোনো মতেই 'টেররিজম্' বা 'এনার্কিজ্‌ম' বলে মনে করতেন না। 'বিপ্লবী' অভিধাটি-ই তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। বিপ্লবীরা যুক্তি দিতেন ভারতে বৃটিশ সরকারের নিপীড়ন-নির্যাতন ছিল এক ধরনের সন্ত্রাস, যাকে মোকাবিলা করতে হবে 'ভায়োলেন্স' দিয়ে বা উগ্র পন্থায়, গান্ধীজীর অহিংসা নীতি দিয়ে নয়, কিংবা অসহযোগ আন্দোলন এবং আইন-অমান্য আন্দোলনের মতো নরম-ঠাণ্ডা পন্থায় নয়। জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে বিপ্লবীদের এই যুক্তির সঙ্গে একমত পোষণ করে এই উগ্রপন্থী তৎপরতাকে বলেছেন 'ন্যাশন্যালিস্ট ফ্যাসিজিম' এবং যাকে ইম্‌পিরিল ফ্যাসিজিমের মুখোমুখি বলে অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথও এই ধরনের রাজনৈতিক ভায়োল্যান্স বা উগ্রপন্থী তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দায়ী করেছেন ইংরেজ সরকারের সীমাহীন নিপীড়ন নির্যাতনকে। (সূত্র : প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৬৫)।

বৃটিশ শাসনের শেষ কয়েকটি দশকে বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের রাজনীতির পাশাপাশি যে চরমপন্থী বিপ্লবী ধারার সূত্রপাত ঘটে, তা তদানীন্তন বৃটিশ সরকারকে তিন দশক ধরে উদ্বিগ্ন, শঙ্কিত, বিপর্যদস্ত ও ব্যতিব্যস্ত রাখে। এক পর্যায়ে এসে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা বৃটিশ সরকারের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়ে। সারা বৃটিশ-ভারতের মধ্যে বঙ্গপ্রদেশ-ই ছিল বিপ্লবী তৎপরতার মূল কেন্দ্র। ১৯৩৩ সালের নভেম্বরে সেক্রেটারি অফ স্টেট্ ফর্ ইন্ডিয়া,

লর্ড বার্কেনহেড্ মত প্রকাশ করেন যে, বাংলায় এই ধরনের বিপ্লবী সন্ত্রাসী অভিযান চলেছিল "On a scale unparalleled in any other Province" এবং অন্যান্য প্রদেশে এসব তৎপরতা যতটুকু চলতো তাও বাংলার প্রভাবেই—"almost in variably be traced to Bengal influence." (সূত্র : প্রাগুপ্ত, পৃ. ১২৮)। তিনি আরও বলেন যে পেনাল কোডের এতদ্‌সম্পর্কিত ধারা প্রয়োগে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিপ্লবী সন্ত্রাস উদ্ভূত পরিস্থিতি হয়তো নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতো; কিন্তু বাংলায় উক্ত ধারাসমূহ অপর্যাপ্ত প্রতিপন্ন হয়েছিল। তাই বাংলার পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে Extra-ordinary অর্ডিন্যান্স এবং বিশেষ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ১৯০৫-১১ সাল পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনই বাংলায় বিপ্লবী সন্ত্রাসের জন্ম দেয়। শুরুতে তা ধর্মীয়তন্ত্র তথা শান্তিতন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ হিসেবে বাংলার যুবগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করে। শক্তি সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁরা মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচনের শপথ নেন। সেদিনের বিপ্লবী সন্ত্রাসীরা প্রধানত দুটি সংগঠনে বিভক্ত ছিলেন : যুগান্তর এবং অনুশীলন। এক তথ্য অনুসারে জানা যায় যে, ১৯০৭ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত বিপ্লবী সন্ত্রাসী আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে কমপক্ষে, ২১০টি সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। তাতে সরকারি পক্ষের ৭০ জন এবং বিপ্লবীপক্ষের ২৪ জনের প্রাণহানি ঘটে, ২০৫ জনকে অভিযুক্ত করা হয়, তাঁদের মধ্যে অনেককেই আন্দামানে নির্বাসিত করা হয়। এছাড়া প্রায় ১,২৬২ জনকে 'ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে' কারারুদ্ধ করা হয়। এবম্বিধ দমনপীড়ন ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ১৯১৯ সালের দিকে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯১৯ সালের ভারতীয় আইনের মাধ্যমে ভারতে বৃটিশ শাসন-সংবিধানের সংস্কার সাধনের মধ্য দিয়ে দেশ শাসনে ভারতীয়দের অধিকতর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। এই আইনের অনুকূলে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃটিশ ভারতীয় সরকারও তাদের নীতিতে কিছুটা নরমপন্থী হয়ে উঠলো। ১৯১৯-এ ঘোষিত এক রাজকীয়-ক্ষমার আওতায় ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইন বলে সব রাজবন্দির মুক্তি দেয়া হলো। পরবর্তীকালে এই ক্ষমা নির্দিষ্ট অভিযোগে অভিযুক্ত এবং আন্দামানে নির্বাসিত বিপ্লবী সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা হলো। মুক্তি পেয়ে বিপ্লবীরা বিশেষ করে, 'যুগান্তর' বিপ্লবীরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলো। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংসবাদ কিংবা অসহযোগ-আন্দোলনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, দীর্ঘকালের বন্দিত্বের কারণে তাদের মধ্যে যে স্থবিরতা দেখা দিয়েছিল তা কাটিয়ে ওঠার জন্য। তাঁরা কংগ্রেসে অনুপ্রবেশ করলেন পুরনো বিপ্লবী সঙ্গী-সাথীদের নতুনভাবে সংগঠিত এবং বিপ্লবের মন্ত্রে নতুন করে নিজেদের উদ্দীপ্ত করার লক্ষ্য নিয়ে। জেলা কংগ্রেস, প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটিতে যুগান্তর বিপ্লবীরা নির্বাচিত কিংবা মনোনীত হলেন। ১৯২২ সালে, দু'জন বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা ভূপতি মজুমদার এবং মনোরঞ্জন গুপ্তকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির যথাক্রমে সম্পাদক এবং সহকারী পদে অধিষ্ঠিত

দেখা গেল। অমরেন্দ্র চ্যাটার্জি, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী এবং সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন (সূত্র : প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৩১)। অসহযোগ আন্দোলনকালে যে ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার কোর গঠিত হয়েছিল তাও বিপ্লবীদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিল এবং এই ভলান্টিয়াররা খুব সহজেই বিপ্লববাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে, অন্যতম প্রধান বিপ্লব দল 'অনুশীলনে'র নেতারা অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে সংশয়-অবিশ্বাস পোষণ করতেন। পুলিন দাসের নেতৃত্বে 'অনুশীলন'-এর একটা অংশ অসহযোগ আন্দোলনের সরাসরি বিরোধিতা করেছিলেন। অন্য অংশ কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে একত্রে কাজ করার সম্পর্ক রেখেছিলেন কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন নি।

এখানে তৎকালীন বাংলার সাধারণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বিশেষ করে কংগ্রেস-রাজনীতির অবস্থা সম্পর্কিত দু'একটি কথা বলা দরকার। কারণ সে সময়কার বঙ্গীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ মতভেদ, মতবিরোধ, দলাদলি উক্ত সংগঠনে অনুপ্রবেশকারী বিপ্লবী-সন্ত্রাসীদের সুযোগ করে দিয়েছিল কংগ্রেসের রাজনৈতিক আবরণে তাঁদের বিপ্লবী ধারা পুনরুজ্জীবিত করে নতুন উৎসাহ-উদ্যমে প্রবাহিত করতে। ১৯১৮ থেকে পুরো বিশ দশক, ত্রিশ দশক এবং চল্লিশ দশকের ১৯৪৭ পর্যন্ত অখণ্ড বাংলার রাজনীতি তথা কংগ্রেস রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ মধ্যপন্থীদের (Moderates) হাত থেকে চরমপন্থীদের (Extremists) হাতে চলে গিয়েছিল। বাংলার কংগ্রেস রাজনীতিতে এই পরিবর্তন বা বৈশিষ্ট্যের জন্ম দিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। এর ফলে গান্ধীজীর অহিংসবাদ বঙ্গীয় কংগ্রেস রাজনীতির ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারলো না। মধ্যপন্থী আন্দোলন-তথা অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিও বঙ্গীয় কংগ্রেস মোটামুটিভাবে উদাসীন রইলো। গান্ধীজীর অহিংসবাদের বিরোধিতা এবং তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি উদাসীনতা এবং অনাগ্রহের ক্ষেত্রে মূল নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি ১৯১৬ সালে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে কলকাতা অনুশীলন সমিতির কো-ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯১৭ সালে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হন। ভারতীয় কংগ্রেসের তথা গান্ধীজীর মধ্যপন্থী রাজনীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে ১৯২৩ সালে স্বরাজ পার্টি গঠন করেন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উত্তরসূরি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। তিনি গান্ধীজী প্রভাবান্বিত কংগ্রেস, তথা অফিসিয়াল কংগ্রেসের নীতির বিরোধিতা করতেন। অফিসিয়াল কংগ্রেসের দাবি ছিল 'ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস', অন্যদিকে সুভাষ বোস 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর দাবিতে আপোসহীন যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বঙ্গীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের এই লড়াকু মনোভাব এবং নীতি বাংলার বিপ্লবী সন্ত্রাসীদের সহায়ক হয়েছিল নিজেদের পুনর্গঠিত করতে। এ সময়ে নতুন কিছু বিপ্লবী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গঠিত হয়। এদের মধ্যে একটি গড়ে ওঠে চট্টগ্রামে মাস্টারদা

সূর্য সেনের নেতৃত্বে, অপরটি ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে। দুটি-ই 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের অনুসারী এবং সহযোগী ছিল। ঢাকার বিপ্লবী গোষ্ঠী দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে–শ্রীসংঘ এবং বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স। এই শ্রীসংঘের সদস্যা হিসেবেই লীলা রায়ের বিপ্লবী-সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত ঘটে।

যুগান্তর এবং অনুশীলন—এই দুই দলের বিপ্লবীরা তাঁদের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর দু'দলের সম্মিলিত 'নিখিল বঙ্গ বিপ্লবী দল' গঠনের উদ্যোগ নেন এবং তদনুযায়ী অনুশীলনের নরেন্দ্র মোহন সেন এবং যুগান্তরের যদুগোপাল মুখার্জির যৌথ নেতৃত্বে ভারত 'সম্পূর্ণ স্বাধীন' করার কর্মসূচি নিয়ে সম্মিলিত বিপ্লবী দল গঠিত হয়। তাঁরা 'আইরিশ ভলান্টিয়ার কোর'কে মডেল হিসেবে সামনে রেখে 'নিখিল বঙ্গ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' (All Bengal Volunteer Corps) গঠন করেন। ১৯২৮ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে এই ভলান্টিয়ার কোর মার্চ পাস্ট করে এবং সুভাষচন্দ্র বসু জিওসি হিসেবে তাতে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু অনুশীলন-যুগান্তর একত্রীকরণ যুব বিপ্লবীদের মধ্যে উদ্দীপনা ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। কারণ একদিকে দুই দলের নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ঈর্ষা সম্মিলিত দলকে তৎপর এবং প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে নি, অন্যদিকে বঙ্গীয় রাজনীতিতে সুভাষ বোস এবং জে এম সেনগুপ্তের মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা 'যুগান্তর' এবং 'অনুশীলন' বিপ্লবী গোষ্ঠীর মধ্যেও সংক্রমিত হয়। অবশ্য এসব বিভেদ-বিরোধের উর্ধ্বে গিয়ে যুব বিপ্লবীদের একটি অংশ বরিশালের 'অনুশীলনে'র নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, ঢাকা 'অনুশীলনে'র সতীশচন্দ্র পাকড়াশী, দক্ষিণ কলকাতা 'অনুশীলনে'র যতীন দাস, চট্টগ্রাম 'যুগান্তর'-এর সূর্য সেন, গণেশ ঘোষের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে সম্মিলিতভাবে বিপ্লবী সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু হয়। তবে এই তৎপরতা বরিশাল, চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহ জেলায় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ওপর আক্রমণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস না পূর্ণ স্বাধীনতা এই প্রশ্নে 'অনুশীলন এবং যুগান্তর'-এর মধ্যে যে মতবিরোধের সৃষ্টি হয় তা ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে তুঙ্গে ওঠে এবং ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে শেষ পর্যন্ত এই দুই বিপ্লবী গোষ্ঠী একে অপর থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সালে যুব বিপ্লবীরা যে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার ফলে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ছোটখাটো সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে।

১৯৩০ সালে বিপ্লবী সন্ত্রাসী তৎপরতার যে পুনরুজ্জীবন ঘটে তা ছিল বাংলার অগ্নিযুগের প্রচণ্ডতম সন্ত্রাসী তৎপরতা। এর মূলে ছিল ১৯২৭-এর সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর লক্ষ্যে কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন। বিভিন্নভাবে ভারতে বৃটিশ রাজের কর্তৃত্ব এবং বৃটিশরাজ প্রণীত আইন অমান্য করার কর্মসূচির কারণে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো, যা নতুন উদ্যমে বিপ্লবী সন্ত্রাসী তৎপরতাকে উৎসাহিত করলো। পুনরুজ্জীবিত এই তৎপরতা শীর্ষে পৌঁছুলো ১৯৩০-এর এপ্রিলে মাস্টারদা সূর্য

সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম 'যুগান্তর' গ্রুপের সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে। এই অভিযান আজ পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় হয়ে রয়েছে উপমহাদেশের জনগণের কাছে। এছাড়া, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত বাংলায় ২৬৯টির মতো সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯৩০-এর আগস্টে পুলিশ ইনসপেক্টর খান বাহাদুর আহসানউল্লাহ হত্যা, ১৯৩২-এর জুনে গুর্খা বাহিনীর ক্যাপ্টেন ক্যামেরন হত্যা, ১৯০২-এর সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রাম পাহাড়তলী রেলওয়ে ক্লাব আক্রমণ, ১৯৩০-এর আগস্টে কলকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টের ওপর আক্রমণ, ১৯৩০-এর ডিসেম্বরে বেঙ্গল ভলান্টিয়ারের সদস্য বিনয় বোস, দীনেশ গুপ্ত এবং সুধীর গুপ্ত কর্তৃক প্রাদেশিক সচিবালয় রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ, কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা। এ সময়ে বাংলার বৃটিশ গভর্নরও রেহাই পান নি বিপ্লবী সন্ত্রাসী আক্রমণ থেকে। ১৯৩২-এর ফেব্রুয়ারিতে গভর্নর স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করা হয়। তবে তিনি কোনোমতে প্রাণে বেঁচে যান। ১৯৩৪-এর মে মাসে পরবর্তী গভর্নর স্যার জন এন্ডারসনের ওপর বন্দুকের গুলি চলে। তিনিও বেঁচে যান। স্যার জন এন্ডারসনের ওপর গুলি চালানোই বোধ করি বাংলার বিপ্লবী সন্ত্রাসীদের সর্বশেষ বড় ধরনের তৎপরতা।

১৯৩৬ থেকে বিপ্লবী সন্ত্রাসী ধারায় ভাটা পড়ে, স্থবিরতা দেখা দেয়। রাজনীতিতে নেতৃত্বদানকারী মধ্যবিত্ত সমাজে একটি ধারণার জন্ম হয় এবং প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে যে জনবিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী তৎপরতা দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। অন্যদিকে বৃটিশ রাজনীতিও নমনীয় হয়ে ওঠে এবং বিবিধ রাজনৈতিক-সামাজিক সংস্কারমূলক ব্যবস্থা নেয়, যা মধ্যবিত্তের, মানসিক পরিবর্তনের সহায়ক হয়। ১৯৩৮ সালে বিবৃতি দিয়ে 'যুগান্তরে'র বিলুপ্তি ঘোষিত হয়। 'অনুশীলন' অঘোষিতভাবেই বিলুপ্ত হয়। বিপ্লবীদের অনেকেই রাজনীতি ছেড়ে দেন, কেউ কংগ্রেসের একটা বড় অংশ সুভাষ বোসেব ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। ইতোমধ্যে কমিউনিজম বাংলার মধ্যবিত্তের ওপর ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। ফলে অতীতের অনেক বিপ্লবী সন্ত্রাসীর ইংরেজিতে যাকে বলে 'চেঞ্জ অব হার্ট' ঘটেছে এবং তারা ঝুঁকে পড়েছেন কমিউনিজমের দিকে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন 'অনুশীলনে'র প্রমোদ দাশগুপ্ত, সতীশ পাক্‌ড়াশী এবং চট্টগ্রাম 'যুগান্তরে'র অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, কল্পনা দত্ত (পরে যোশী)। এরা সবাই সি.পি.আই অর্থাৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এমনি এক অতীতের বিপ্লবী সন্ত্রাসী এবং পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য কালী চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার দেখা হয় ময়মনসিংহ জেলে ১৯৫২-তে, যখন আমি ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতার হয়ে জেলে যাই। মনে পড়ে, গভীর রাত পর্যন্ত তিনি পলিটিক্যাল ওয়ার্ডের এক কামরায় বসে আমাকে অতীতের তাঁদের সন্ত্রাসী তৎপরতার গৌরবময় কাহিনী শুনিয়েছিলেন। একই সঙ্গে কেন

তাঁরা অনেকেই সি.পি.আইতে এলেন, কমিউনিজম গ্রহণ করলেন তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে তারও ব্যাখ্যা করেছিলেন।

যে অগ্নিযুগের কিছু কথা বললাম সে অগ্নিযুগে নারী বিপ্লবীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। সে যুগের বহু অগ্নিকন্যাদের কথা এখানে বলবো। প্রথমেই মনে পড়ে, চট্টগ্রামের দুই অগ্নিকন্যার কথা–কল্পনা দত্ত (যোশী) এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। কল্পনা দত্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন অভিযানে মাস্টারদা সূর্য সেনের সহযোগী ছিলেন। তিনি গোপন আশ্রয় থেকে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধ করে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারসহ ধরা পড়েন এবং আন্দামানে নির্বাসিত হন ও মুক্তি লাভের পর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। তিনি পরে বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা পিসি যোশীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ঢাকা ইডেন কলেজের ছাত্রী হিসেবে দীপালি সংঘে, কলকাতায় বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর ছাত্রীসংঘে, এবং চট্টগ্রামে নন্দন কানন অপর্ণাচরণ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা থাকাকালে 'যুগান্তরে' যোগ দেন। চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর ইউরোপিয়ান ক্লাবের ওপর সন্ত্রাসী অভিযানে তিনিই নেতৃত্ব দেন। কিন্তু অভিযান চলাকালে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। বৃটিশ বঙ্গে গভর্নরের ওপর যিনি প্রথম আঘাত হানেন তিনি ছিলেন একজন নারী বিপ্লবী—নাম বীণা দাস। তিনি কলকাতায় ছাত্রীসংঘের সদস্যা ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে আগত তদানীন্তন বাংলার বৃটিশ গভর্নরের ওপর খুব কাছে থেকে তিনি বিভিন্ন দিক দিয়ে তিনবার গুলি চালান। তা সত্ত্বেও গভর্নর স্যার স্টেনলি জ্যাকসন বেঁচে যান। ২০ বছর কারাদণ্ড ভোগের পর তিনি ১৯৩৮ সালে মুক্তি লাভ করে কংগ্রেসে যোগ দেন। পরবর্তীকালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হন। অগ্নিযুগের কুমিল্লার দুই বিপ্লবী বঙ্গকন্যার কথা আমরা জানি। তাঁরা হলেন শান্তি এবং সুনীতি। দু'জনেই 'যুগান্তরে'র সদস্যা ছিলেন। কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স হত্যার দায়ে তাঁরা কারাদণ্ডিত হন। ১৯৩৮ সালে মুক্তি লাভের পর শান্তি কংগ্রেসে যোগদান করেন। সুনীতি এম. বি. বি. এস পাস করে ডাক্তারি পেশা গ্রহণ করেন।

বাংলার অগ্নিযুগে যে বঙ্গকন্যা প্রথম বিপ্লবী সন্ত্রাসী রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হন এবং বিপ্লবী দলের সদস্যা হওয়ার সুযোগ লাভ করেন তিনি হলেন লীলা নাগ (পরে রায়)। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে অবশ্য বাংলার নারী সমাজের তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল; কিন্তু কোনো গোপন বিপ্লবী দলের সদস্যপদ লাভ তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কারণ তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, যে-ধরনের দুঃসাহসিক তৎপরতা বিপ্লবী দলকে চালাতে হতো তাতে নারীর অংশগ্রহণের কথা ভাবাই যেতো না। তাছাড়া, "পুরুষের বিপ্লবী সাধনা ও ধ্যানে বিঘ্ন ঘটাবে মনে করে দলে মেয়েদের রিক্রুট করার নিয়ম ছিল না" *(লীলা নাগ ও বাংলার নারী জাগরণ :* দীপঙ্কর

মোহান্ত)। "সেদিনের বিপ্লবীরা নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী হলেও দলের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বিরোধী ছিলেন। তবে সে যুগের দু'-একজন মহিলা বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও অস্ত্র লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছিলেন, সহযোদ্ধা হিসেবে নয়।"(প্রাগুপ্ত)। এমন তিনজন মহিলার নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। একজন হলেন ননীবালা দেবী, যিনি বিপ্লববাদীদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখার অপরাধে ১৯১৫ সালে গ্রেফতার হন এবং আড়াই বছর জেল খাটেন। তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম রাজবন্দিনী। অন্য দু'জন হলেন দুকড়ি বালা দেবী এবং চারুশীলা দেবী। পরবর্তীকালে সশস্ত্র কর্মপন্থায় বিপ্লবী পথে আমরা দেখতে পাই লীলা নাগকে। "ত্রিশের দশকে বিপ্লবী দলের শীর্ষ নেত্রী হিসেবে তাঁর নির্দেশনা, পরিকল্পনা ও সহযোগিতায় ঘটেছে বৃটিশ শাসনের ভিত কাঁপানো বহু বিপ্লবী কর্মকাণ্ড" (প্রাগুপ্ত)।

বিশ দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী থাকাকালেই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কর্মপন্থার বিপ্লবী আদর্শের প্রভাব বলয়ে তাঁকে নিয়ে আসেন সহপাঠী বিপ্লবী অনিল রায়। তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে, বৃটিশ শাসনের রক্তচক্ষুকে এড়িয়ে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বৃটিশ বিরোধী কোনো রাজনৈতিক তৎপরতা প্রকাশ্যে চালানো সহজ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন জনসেবামূলক কর্মতৎপরতার আবরণে বিপ্লববাদী তৎপরতা চলতো। তাই সে তৎপরতা চোখে পড়তো না কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম এবং জ্ঞানচর্চাকে কোনোভাবেই ব্যাহত করতো না। অমূল্যভূষণ সেন রচিত "*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলার বিপ্লব সাধনা*", শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে অধ্যাপক এম. আবদুর রহিম তাঁর রচিত *The History of the University of Dacca* নামক গ্রন্থে আমাদের জানিয়েছেন :

"The Hindu students of the Dacca University tool a notable share in the formation Revolutionary societies which believed in the use of violent methods of liberating the country from the foreign yoke and carried on their activities in secret." (p. 177)

এ-ক্ষেত্রে তিনি দু'জনের নাম উল্লেখ করেছেন, একজন ছাত্র অনিল রায়, আরেকজন ছাত্রী লীলা নাগ। কিন্তু দু'জনের কেউই প্রকাশ্যে কোনো তৎপরতা চালান নি। জনকল্যাণ সমিতির আবরণে তাঁরা কাজ করে গেছেন। অনিল রায় Sociel Welfare League গঠন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ছিলেন সংস্থার প্রথম সভাপতি এবং অনিল রায় সম্পাদক। গোপনে অনিল রায় অনুশীলন দলের নেতা ছিলেন। বস্তুত তাঁর সেই পরিচয়কে আড়ালে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার জন্যই অনিল রায় এই সমাজকল্যাণ সমিতি গঠন করেন এবং এই সংগঠনের মাধ্যমেই লীলা নাগ বিপ্লববাদের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে এই সংগঠনই 'শ্রীসংঘ' নামে রূপান্তরিত হয়। ১৯২৫ সালে লীলা নাগ শ্রীসংঘে যোগদান করেন। ১৯২৬ সালে তিনি নিজেও 'দীপালি সংঘ'

নামে একটি নারী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। নিচের উক্তিটিতে এর প্রমাণ মিলে :

"Many students of the University including women joined the societies of Anil Roy and Lila Nag. Under the cover of Social Welfare Services, they secretly conducted their programme of revolutionary activities." (A. Rahim, opcit,p. 177)। তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ্যে বিপ্লবী তৎপরতার সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ ছিল বিধায় "ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার আবরণরূপে এবং বিপ্লব কর্মের সঙ্গে জনসেবার সংযোগ সাধনের" লক্ষ্যেই সেদিনের সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল।

লীলা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে এম এ পাস করেন। তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একজন ইংরেজিতে এম. এ পাস করা মহিলার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল ছিল, লোভনীয় পদে চাকরি পাওয়া তাঁর জন্য সহজ ছিল। কিন্তু এ ধরনের কোনো উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কিংবা লোভনীয় পদে চাকরি পাওয়ার সুযোগ-সম্ভাবনা কোনোটাই লীলা নাগের কাছে আকর্ষণীয় ছিল না, তাঁকে মোহগ্রস্ত করতে পারে নি। তাঁর মন ও মানসিকতা মধ্যবিত্তের গতানুগতিক ধারায় জীবনযাপনের উপযোগী ছিল না। তা ছিল ভিন্ন ধরনের। তিনি চেয়েছিলেন এমন ব্যবস্থা, এমন নতুন সমাজ যেখানে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব। তাঁর "এ জন্মের স্বাদ" নারী জাগরণ এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা, কিন্তু নিজের জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলে, লোভনীয় পদে চাকরি করে, সেই 'স্বাদ', সেই মহান লক্ষ্য, সেই সাধনা ও সংগ্রাম সম্ভব নয়। তাই "সম্পন্ন ও অভিজাত পরিবারের উচ্চ শিক্ষিতা , প্রতিভাময়ী, সুদর্শনা কন্যা সাংসারিক জীবনে সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠার মসৃণ পথ বর্জন করে ত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্মনিবেদনের দুর্গম যাত্রায় প্রবৃত্ত হলেন" (সুনীল দাস : জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৭৫)। বস্তুত বিপ্লবী রাজনীতিকে এবং তার আবরণ হিসেবে সামাজিক সেবাধর্মী কর্মকাণ্ডকেই তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বিশ দশকে বাংলার মুসলমান সমাজে তো নয়ই, তুলনায় অনেক বেশি অগ্রসরমান হিন্দু সমাজেও অভিজাত পরিবারের উচ্চশিক্ষিত কোনো নারীর পক্ষে এমন অনিশ্চিত বিপদসঙ্কুল জীবন বেছে নেয়ার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। আসলে সব লোভ, সুখ-স্বার্থ উপেক্ষা করে এমনভাবে নিজেকে দেশ ও সমাজের জন্য নিবেদিন করার কারণেই লীলা রায় আজ আমাদের কাছে বাংলার অন্যতম অগ্নিকন্যা ও প্রজ্বোলতম অগ্নিকন্যা।

প্রশ্ন উঠতে পারে মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে তৎকালীন ভারতের, বিশেষ করে বাংলার অনেক বিদুষী উচ্চবংশীয় নারীই অংশগ্রহণ করেছিলেন, লীলা নাগও সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী বাংলার দুহিতাদের একজন, কিন্তু তিনি অন্য অনেকের মতো বৃটিশবিরোধী সাংবিধানিক রাজনৈতিক আন্দোলনের পথে না গিয়ে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য কেন রাজনৈতিক বিপ্লবের পথ বেছে নিলেন। তিনি কেন বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণ করলেন? বৃটিশ শাসন ও শাসককে পরাভূত এবং বিতাড়ন

করার জন্য? তিনি দীর্ঘকালের বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের ধারা লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছিলেন "কেবল অহিংস আন্দোলন দ্বারা বৃটিশ শাসন শক্তিকে পরাভূত করা অসম্ভব।" একথা ঠিক যে এই সশস্ত্র বিপ্লবের পথ গ্রহণের পূর্বে লীলা নাগ মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগেছেন। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের যৌক্তিকতা খুঁজেছেন। অবশেষে সহপাঠী অনিল রায়ের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে তাঁর যুক্তি ও বিশ্লেষণ শুনে সশস্ত্র বিপ্লবী দল শ্রীসংঘে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, "কতবার ধাক্কা খেয়েছি, মন গ্রহণ করতে পারে নি। বুদ্ধি-বিচার বিচলিত হয়েছে। কিন্তু এমন কিছু কিছু পেলাম তাঁর (অনিল রায়) নিকট, যা আমার পূর্ব পুরুষের হাজার বছর ধরে রক্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে।" "লীলা রায় : আত্ম-পরিচয়", জয়শ্রী, ভাদ্র, ১৩৭৫)। তখনকার দিনে 'শ্রীসংঘের' মতো একটি সশস্ত্র বিপ্লবী দলে নারী সদস্যা অন্তর্ভুক্তির বিপক্ষে অনেকে থাকলেও প্রচণ্ড বাদানুবাদের পরে শীর্ষস্থানীয় নেতা অনিল রায়ের যুক্তি-তর্কের মুখে সব বিরোধিতা ভেসে যায়। লীলা নাগ শ্রীসংঘের সদস্য পদ লাভ করেন এবং অল্পকালের মধ্যে তাঁর কর্মদক্ষতা করে। বিপ্লবী দলে নারী সদস্যা গ্রহণ সম্পর্কিত সব সংশয় অমূলক প্রমাণত করে। তবে লীলা নাগ নিজেকে প্রকাশ্যভাবে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে এমনভাবে জড়িত রাখেন যে তার প্রকৃত রাজনৈতিক আদর্শ ও পরিচয় আড়ালে থাকে। আসলে ১৯২০ সালে কলিকাতা বেথুন কলেজে পড়ার সময়েই লীলা নাগ রাজনীতি তথা বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রভাবে আসেন, তার চিন্তা ও চেতনা প্রবলভাবে আলোড়িত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নি। তিনি মনে করতেন, পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপ দিলেই স্বাধীনতা অর্জিত হবে না, তার জন্য পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন, তাই তিনি বেথুন কলেজ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ পর্যন্ত পড়াশোনা শেষ করে বিপ্লবী দলের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। এখানে উল্লেখ্য, বেথুন কলেজ থেকে তিনি ১৯২১ সালে ইংরেজি অনার্সে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে বি. এ পাস করেন এবং পদ্মাবতী স্বর্ণপদক ও নগদ একশ টাকা পুরস্কার পান। সরাসরি বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদান না করলেও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা তাকে উদ্দীপ্ত করতো। বেথুন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি "চারদিকে প্রত্যক্ষ করেছেন দ্রোহের আগুন, আত্মীয়-পরিজনরা দেশ ও সমাজসেবার কাজে লিপ্ত।" (দীপঙ্কর মোহন্ত, পূর্বোক্ত পৃ. ২১)। প্রকৃতপক্ষে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী থাকাকালে দেশসেবা ও পরাধীন মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তিনি নিজেকে তৈরি করেছেন, মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে সশস্ত্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যোগদানের কারণেই লীলা নাগ তাঁর বিপ্লবী পুরুষ সহযোদ্ধাদের সংশয় আর সঙ্কীর্ণতার আবর্তে ঘুরপাক খেয়েও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছেন, নিজেকে নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। তাঁর পুরুষ সহযোদ্ধারা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। এমনি

একজন বিপ্লবী সহযোদ্ধা ভবেশ নন্দী পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন। "একথা অকুণ্ঠচিত্তে আজ আমি স্বীকার করবো অনিলদার (অনিল রায়) ভুল-ভ্রান্তি ছিল এবং আমরা দলের কিছু Senior সদস্য তাঁর প্রতি কিছুটা uncharitable হয়েছিলাম। আজ একথা অবিসংবাদিত সত্য যে অনিলদার দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাহায্য-সহযোগিতা ও পরামর্শের ফলেই লীলা দেবী যে সংগঠন গড়ে তোলেন তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। লীলা দেবী শুধু আমাদের গৌরব নন। তিনি ভারতীয় সমস্ত বিপ্লবী গোষ্ঠীর গৌবর।" (দীপঙ্কর মোহান্ত, পূর্বোক্ত)। এক পর্যায়ে বিপ্লবী দলে আত্মকলহের কারণে ভাঙন আসে। দলের একাংশ নিয়ে পুনর্গঠনে হাত দিয়েছিলেন অনিল রায়। কিন্তু তাঁর গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার ফলে দল চরম সঙ্কটে পড়ে। এই সঙ্কটকালে লীলা নাগ দল পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দলকে গড়ে তোলেন। বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় দলের শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে ওঠে। এক আপোসহীন সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন ছিল তার একক লক্ষ্য। লীলা নাগ সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যান এবং সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি নেন। পর্বতপ্রমাণ বাধা সত্ত্বেও তাঁর লক্ষ্য থেকে কখনো বিচ্যুত হন নি। ত্রিশ দশকের শুরুতে যে সব বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড চলে তার অধিকাংশেরই নেপথ্যে ছিলেন লীলা নাগ। ১৯৩০ সালে ২০ ডিসেম্বর পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। বিনা বিচারে আটক প্রথম মহিলা সংগ্রামী ছিলেন লীলা নাগ। একটানা ছয় বছর কারাবন্দিত্বের পর ১৯৩৭ সালে ৮ অক্টোবরে তিনি মুক্তি লাভ করেন। তার কারামুক্তির সংবাদ পেয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে আশীর্বাদ দিয়ে যে পত্র লেখেন তাতে বলেছিলেন, "মানুষের হিংস্র-বর্বরতার অভিজ্ঞতা তুমি পেয়েছো—আশা করি, একটা মূল্য আছে, এতে তোমার কল্যাণ সাধনাকে আরও বল দেবে। পশু শক্তির উর্ধ্বে জয়ী হোক তোমার আমার শক্তি।" ত্রিশ দশকের দিকে লীলা নাগ এবং অনিল রায় সুভাষ চন্দ্র বসুর সংগ্রামী নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন, তাঁর সংগ্রামশীল আদর্শের অনুসারী হয়ে পড়েন এবং ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। ১৩ মে, ১৯৩৯ তারিখে এই দুই বিপ্লবী সত্তা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু দাম্পত্য ও সংসার জীবনের সুযোগ পেলেন না বেশি দিন। ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো রাজনৈতিক সংগ্রামে, ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে এবং সেই উদ্দেশ্য ও আদর্শ হলো "পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপোসহীন সাম্রাজ্য বিরোধী সংগ্রাম।" এরপর থেকে লীলা রায়কে আমরা সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় সক্রিয় ভূমিকায় দেখতে পাই। সুভাষচন্দ্র বসু বিভিন্ন জায়গায় আদর্শ প্রচারে জনসভা করেছেন, লীলা রায় ও অনিল রায় তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। ১৯৪০ সালে নাগপুরে সর্বভারতীয় 'ফরওয়ার্ড ব্লক' সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সুভাষচন্দ্র বসু, মূল প্রস্তাব উত্থাপন ও তার ব্যাখ্যা দান করেন লীলা রায়। নেতাজীর অনুরোধক্রমে ১৯৪০-এর ৬ জুলাই তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কয়েকদিন পরেই

"হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন ও ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন সমগতিতে একই লক্ষ্যে ধাবিত হলো"। অনিল রায় ও লীলা রায় গ্রেফতার হন। লীলা রায় মুক্তি পান ২৯ আগস্ট, ১৯৪০। প্রকৃতপক্ষে এই বিপ্লবী নব দম্পতি নিজেদের ফরওয়ার্ড ব্লক আদর্শে এমনভাবে সমর্পিত করেছিলেন যে "কর্মীদের চোখের সামনে আদর্শের মূর্ত প্রতীক হয়েছিলেন অনিল রায় ও লীলা রায়।" অল্পকালের মধ্যে লীলা রায় সুভাষচন্দ্র বসুর এমন আস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন যে ১৯৪০-এর জানুয়ারিতে অন্তর্ধানের পূর্বে এক পত্রে লীলা রায়কে নেতাজী ফরওয়ার্ড ব্লকের সাংগঠনিক কার্যক্রম, তাঁর হয়ে তদারকির দায়িত্ব তাঁকে দিয়ে যান এবং এ লক্ষ্যে সারা ভারত সফরের নির্দেশও দেন। দুরূহ ও দুর্গম হলেও লীলা রায় স্বামীসহ দলকে সংগঠিত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক কর্মযাত্রাপথে এগিয়ে চলেন। তাঁরা জানতেন বৃটিশ সরকারের গোয়েন্দারা পেছনে পেছনে আছে। আসাম, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, দিল্লি যেখানেই তাঁরা গেছেন। তবুও এতোটুকু ভয় পান নি, ভারত পরিক্রমা থেকে বিরত থাকেন নি। সারা ভারত জুড়ে তাঁদের এই সাংগঠনিক তৎপরতা বন্ধ করার জন্য বৃটিশ সরকার তাঁদের ওপর বাংলার বাইরে যাওয়া, বক্তৃতা-বিবৃতি-জনসভা এবং সরকারের বিরুদ্ধে কোনো প্রচারাভিযানে অংশ নেয়া নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করে। এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করার জন্য অনিল রায়কে ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে এবং লীলা রায়কে এপ্রিলে কারাবন্দি করা হয়। কারাবন্দিত্বের সীমাবদ্ধতার মধ্যেও লীলা রায় ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীদের নির্দেশ পাঠাতেন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য। স্বামী-স্ত্রীর এই কারাবন্দিত্ব চলে প্রায় চার বছর। ১৯৪৬-এ তাঁরা মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু মুক্তি লাভ করেও স্বস্তি পেলেন না। কারণ বাংলায় তখন সাম্প্রদায়িক দানবের তাণ্ডব লীলা শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে কলকাতায়, পরে নোয়াখালিতে দাঙ্গায় রক্তসিক্ত হলো বাংলার মাটি। সাম্প্রদায়িকতার আগুন থেকে বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে নেমে গেলেন লীলা রায়। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঢাকা শহরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, তা প্রশমনে ঢাকায় অবস্থানরত লীলা রায় যে ভূমিকা রাখেন সে সম্পর্কে লিখেছেন তৎকালীন সোহরাওয়ার্দি-হাশেমপন্থী তরুণ প্রগতিশীল রাজনীতিক কমরুদ্দিন আহমদ তাঁর রচিত '*বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*' বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ১৮ আগস্ট, ১৯৪৬ তারিখে ফরওয়ার্ড ব্লকের অফিসে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের ঢাকাস্থ নেতাদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে লীলা রায় উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠকের আলোচনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেলে নেতাদের এ ধরনের বৈঠক কোথায় হতে পারে তা নিয়ে কথা ওঠে। লীলা রায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেল সাহেবের অফিসকক্ষে বৈঠকের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেন। সে কথামত ২০ আগস্ট তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেল সাহেবের অফিসকক্ষে সর্বদলীয় সভা হয় এবং

সেখানে একটি শান্তি কমিটি গঠিত হয়, যার অন্যতম সদস্যা ছিলেন লীলা রায়। "শান্তি কমিটি নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হতে লাগলো। আমাদের জন্য দুটো বন্দুকধারী পাঠান পুলিশ দেয়া হলো, তা সত্ত্বেও উর্দু রোডে আমরা গুণ্ডা দ্বারা আক্রান্ত হলাম। ভাগ্য ভালো, ঠিক তখনই অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খবর পেয়ে পুলিশ পাঠিয়ে আমাদের উদ্ধার করলো। আর একদিন জগন্নাথ সাহা রোডে আমরা সভা করছি এমন সময় একজন হিন্দু ভদ্রলোক দা নিয়ে হঠাৎ ঢুকে পড়লো আমাকে খুন করার জন্য। সমর গুহ (ফরওয়ার্ড ব্লক সদস্য) তাকে ধরার চেষ্টা করে আহত হলো এবং শেষ পর্যন্ত লীলা রায় অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দা'খানা ধরে ফেললো। পরে বুঝলাম যে কিছুক্ষণ আগেই সে খবর পেয়েছে যে, তার ছেলেকে মুসলমানরা মেরে ফেলেছে; তাই আমার ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এসেছে। আমার মনে হয়, লীলা রায়ের সাহস এবং সুবুদ্ধির জন্যই সে যাত্রা রক্ষা পেলাম" (কামরুদ্দিন আহমেদ, পূর্বোক্ত পৃ.৭৫)।

লীলা রায় সাম্প্রদায়িক চিন্তার ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টাকে নির্ভীক চিত্তে প্রত্যাখ্যান করেছেন। দেশ বিভাগকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি কংগ্রেস, মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার তৎকালীন সাম্প্রদায়িকতা-প্রভাবান্বিত স্বাধীনতার রাজনীতিকে জনগণের ভাগ্য নিয়ে জুয়াখেলা মনে করতেন, নেতৃত্বের দায়িত্বহীনতা বলে আখ্যায়িত করতেন। তিনি ভারতবিভক্তিভিত্তিক সর্বনাশা স্বাধীনতা রোধে গান্ধীজী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। মাউন্টব্যাটন প্ল্যান প্রত্যাখ্যান করতে তিনি তাঁদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এতো করেও নেতাদের রাজি করাতে পারলেন না, দেশভাগ ঠেকাতে পারলেন না। ব্যর্থ হয়ে অনিল রায় ও লীলা রায় কলকাতা ছেড়ে নিজ দেশ পূর্ববাংলায় থাকার জন্য ঢাকায় চলে এসেছিলেন। সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন লীলা রায়। এ সময় কবি সুফিয়া কামাল ও তাঁর মতো আরও কয়েকজন অসাম্প্রদায়িক উদারচিত্তের মহিলা লীলা রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর 'সমাজসেবা-আদর্শে' উদ্বুদ্ধ হন। পরবর্তীকালে কবি সুফিয়া-কামাল লেখেন "কান্নায় কান্না মিশিয়ে, হাসিতে হাসি মিশিয়ে দুঃখের কাহিনী শুনে শুনে কতো প্রহর, কতো গভীর রাত হয়ে গেছে। অসীম ধৈর্য ছিল লীলাদির। বলতেন ওদের (স্বজনহারা ছিন্নমূলদের) সাথে না মিশলে সমব্যথী না হলে ওরা আমাদের কথা শুনবে কেন? এই একটি শিক্ষা তাঁর কাছে পেয়েছি এবং আজো সেই শিক্ষার জন্যই আমি আন্তরিক—যতোটুকু পারি সমাজসেবায় অংশ নিয়ে দুঃখীদের সাথে, দরিদ্রের সাথে মিশতে পারি।"

শুধু মাতৃভূমি নয়, মাতৃভাষা বাংলার প্রতি ছিল লীলা রায়ের গভীর অনুরাগ। তাই রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণার প্রতিবাদ তিনি করেন। জিন্নাহর মতামতকে 'একনায়কত্ব' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। একই সঙ্গে ভারত সরকারের বাংলা-বিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার ছিলেন।

একদিকে বাংলা ভাষার 'ইসলামিকরণ', অন্যদিকে 'হিন্দিকরণ' উভয় অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করেন। কিন্তু মাতৃভাষা অনুরাগী এই বিপ্লবী নারী তার মাতৃভূমিতে বেশি দিন থাকতে পারেন নি। রাষ্ট্ররোষে পড়ে, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ মাথায় নিয়ে অনিল রায় এবং লীলা রায়কে চিরতরে প্রিয় স্বদেশ-জন্মভূমি অর্থাৎ তখনকার পূর্ব বাংলা ত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁরা পশ্চিমবাংলায় চলে যান। ১৯৫২ সালে অনিল রায় মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৭০-এর ১১ জুন বাংলার বীর অগ্নিকন্যা লীলা রায় ইহলোক ত্যাগ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ভাষায় "বিংশ শতকের স্বদেশী আন্দোলনে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের পথ প্রদর্শক হয়ে উঠেছিল, সারা দেশকে মাতিয়ে তুলেছিল। সেই আন্দোলনে বাংলার মা ও বোনেরা তাঁদের যোগ্যস্থান নিয়েছেন। সেবা-কর্মে, সশস্ত্র সংগ্রামে, শিক্ষা বিস্তারে, মিছিল-মিটিংয়ে, কারাবরণে, গুলির সামনে প্রাণ বিসর্জনে এরা পুরুষের মতোই ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের এই সংগ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত নারী সমাজেরই একজন শ্রীমতী লীলা রায়।" (দীপঙ্কর মোহান্ত, পূর্বোক্ত)।

লীলা রায়ের যুগে নারীমুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

ঈশানী মুখোপাধ্যায়

যুগ ও ব্যক্তিত্ব

অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে প্রতিটি ব্যক্তি এবং ঘটনার প্রতিক্রিয়া অনন্য, কারণ তা বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে প্রসূত। মানব চরিত্র এবং পারিপার্শ্বিক মিলিতভাবে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। সভ্যতার বিকাশে যুগ বিভাজন পরীক্ষিত সত্য না হলেও একটি বিশেষ সময়ের ঘটনাপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিমানসের বৈচিত্র্য বুঝতে সাহায্য করে। একদিকে মানুষ যুগকে নির্ধারণ করে, অন্যদিকে যুগ বা পরিবেশ তাকে প্রভাবিত করে। প্রত্যেক যুগ শুধু পূর্ব যুগের উপসংহার নয়, ভাবী যুগের আদিপর্ব সৃষ্টি করে এবং তারা নানা শৃঙ্খলে বাঁধা। ভারতের ইতিহাসে যুগ সন্ধিক্ষণে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ঊষার আলোয় সূচিত হয়েছিল বিংশ শতাব্দী। বিগত শতকের শেষার্ধ থেকে জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ প্রসার লাভ করেছিল। পরাধীন ভারতে বৃটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে সঞ্চারিত স্বদেশপ্রেম বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। প্রাথমিক স্তরে ঔপনিবেশিক শোষণের উচ্ছেদ ঘটিয়ে স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও মূল প্রবাহের সঙ্গে সমান্তরালে বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক, আর্থ-সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত চলেছিল। বিবর্তনের আবর্তে পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে আদর্শ মানুষ সৃষ্টি হয়েছিল। বাদানুবাদের প্রবর্তন করে তাঁরা বোধশক্তি, মানবিকতা ও দেশপ্রীতি দিয়ে মনুষ্য চরিত্র গঠনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এঁরাই ছিলেন একাধারে নবভারতের স্রষ্টা, এই উত্তাল যুগের শ্রেষ্ঠ অবদান।

শতক সূচনায় বাংলার নারীআন্দোলনের অবিসংবাদী নেত্রী ও ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিপ্লবী লীলাবতী নাগ—লীলা রায়। সম পরিমাণে তিনি তাঁর যুগের প্রতিবিম্ব ও প্রতীক। যুগসন্ধিতে তাঁর জন্ম (১৯০০), সুদীর্ঘ তাঁর কর্মজীবনের ব্যাপ্তি (১৯৭০)। নতুন ভাবধারা ও মূল্যবোধের পটচিত্রে

তাঁর অনমনীয় চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, কর্মে একমুখিনতা, লক্ষ্যাভিযাত্রা। তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা ছিল নারী মুক্তি ও পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচন। কার্যক্রমে অন্য মাত্রা সংযোজন যথা সাংবাদিকতা, সাহিত্যভাবনা ছিল মূল উদ্দেশ্যসাধনের আঙ্গিক। এই দ্বিমাত্রিক চিন্তাধারা ও ক্রিয়াকলাপের বিচার-বিশ্লেষণ এবং তুলনামূলক আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে তাঁর চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল বলে এই নিবন্ধের সময়সীমা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে ভারত বিভাগ অবধি নিবদ্ধ (১৯০৫-১৯৪৭)।

প্রস্তর ভিত্তি

লীলাবতী নাগের চরিত্র গঠনের বুনিয়াদ বংশগত ও পরিবেশগত উপাদানে রচিত হয়েছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর ওপর পিতামাতা ও পরিবারের বিশেষ প্রভাব ছিল। শিক্ষিত, সংস্কারমুক্ত, স্বদেশহিতৈষী পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তাঁর জন্ম ও প্রতিপালন। পিতা গিরীশচন্দ্র নাগ সৎ, আদর্শবাদী, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। মাতা কুঞ্জলতা ছিলেন আলোকপ্রাপ্তা ব্রাহ্মিকা, সেবাপরায়ণা ও সংবেদনশীলা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও অগ্নিযুগের প্রবল তরঙ্গ এই পরিবারকে প্লাবিত করেছিল। গৃহের অভ্যন্তরে নিয়মিতভাবে বিলাতিবর্জন ও অরন্ধন পালিত হতো। পরিবার ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব শৈশবেই লীলাবতীর ব্যক্তিত্বে আদর্শবাদ, স্বদেশপ্রীতি, সংযম, সৎ সাহস এবং বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতা মুদ্রিত করেছিল। কিশোরী লীলা তাঁর পিতাকে লিখেছিলেন :

> আমার ক্ষুদ্রশক্তি যদি একটি লোকেরও উপকার করতে পারতো তবে নিজেকে ধন্য মনে করতুম।...তুমি আশীর্বাদ কোরো যদি এ জন্মে কিছু না কোরতে পারি যেন এই আমার প্রিয় ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করি, একে সেবা করে এ জন্মের আশা মিটাবে (লীলাবতী নাগ গিরীশচন্দ্র নাগকে, বকশীবাজার, ঢাকা, ২ অক্টোবর, ১৯১৭)।

পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাইরে শিক্ষাক্ষেত্রে লীলাবতীর বাস্তবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ হয়েছিল। তাঁর অসামান্য মেধা ছাত্র জীবনে তাঁকে বিশেষ সাফল্য দিয়েছিল। কলকাতার ব্রাহ্ম গার্লস্ স্কুল ও ঢাকার ইডেন হাই স্কুলে শিক্ষান্তে তিনি ১৯১৭ সালে বেথুন কলেজে ভর্তি হন। কলেজ জীবনে তাঁর প্রতিবাদী মানসিকতা, সংগঠনী শক্তি ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। কলেজের 'প্রধানা ছাত্রী' নির্বাচিত হয়ে তিনি প্রথম ছাত্রী পুনর্মিলনের প্রবর্তন করেন। সহপাঠিনীদের সংঘবদ্ধ করার সাথে ঘটলো ঔপনিবেশিক সংঘাত। লোকমান্য তিলকের মৃত্যুদিবস পালনের প্রশ্নে অধ্যক্ষা Mrs Wright-এর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে সার্থক ছাত্রী ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। বি এ পরীক্ষায় পদ্মাবতী স্বর্ণপদকসহ উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর পুনর্বার দ্বন্দ্ব বেধেছিল শ্বেতাঙ্গ শাসককুলের বিপক্ষে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী-উচ্চশিক্ষার রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করে লীলাবতী প্রথম স্নাতকোত্তর ছাত্রী হিসেবে সসম্মানে এম এ পরীক্ষায় সফল হলেন। নারী সমস্যা ও সমাজসেবায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি বঙ্গীয় নারী ভোটাধিকার সমিতিতে যোগ দিয়েছিলেন সহ-সম্পাদিকারূপে। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ঢাকা মহিলা সমিতির পক্ষে উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণে সহায়তা করেছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় প্রতিরোধ স্পৃহায় লীলাবতীর যোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা তিনি বাস্তবকে উপলব্ধি করেছিলেন। প্রান্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজস্ব ভাবনাচিন্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন। প্রবল টানপোড়েনের ভিতর দিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর দ্বৈত কার্যধারা, নারীমুক্তি ও দেশমুক্তির চরিত্র বোধগম্য হলো। তিনি বাংলার তমসাচ্ছন্ন নারী সমাজকে সচেতন, সংঘবদ্ধ ও সক্রিয় করতে চাইলেন। কর্মসূত্রে নারীপ্রশ্ন ও ঔপনিবেশিক অবস্থানের অঙ্গাঙ্গি যোগ অনুধাবন করতে বিলম্ব হয় নি। এই তত্ত্ব সমর্থন করে সম্প্রতি Joanna Liddle ও Rama Joshi মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় পুরুষেরা রাষ্ট্রশাসনে অযোগ্য এবং ঔপনিবেশিক উপস্থিতি অত্যাবশ্যকীয় প্রমাণ করার জন্য বৃটিশরাজ নারীদের অবদমিত করে রেখেছিলেন। নারী আন্দোলনের গভীরতা নিরূপণ করতে গিয়ে লীলাবতী অবশ্যম্ভাবী রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন।

নারী ভাবনা

লীলাবতী নাগের নারী চিন্তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন। সমাজবিজ্ঞানীরা নরনারী সম্পর্কের তিনটি বিভাজন করেছেন। প্রথমত, 'সমবায়িক তত্ত্ব', যা স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধের পরিপূরক। এ ক্ষেত্রে সমাজ ও দেশ গঠনে পারস্পরিক সহযোগিতায় পুরুষের সঙ্গে নারীর সমানাধিকার স্বীকৃত। দ্বিতীয়ত, 'প্রতিরোধ তত্ত্ব', প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে পুরুষের অধিকার খর্ব করে নারীর নিজ স্থান দখল। তৃতীয়ত, 'উগ্র চরমপন্থী তত্ত্ব', যার বলে নারীবাদীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে নতুন রাষ্ট্র গঠনের সঙ্কল্প করেন। বাস্তববুদ্ধি সম্পন্না লীলাবতী প্রচলিত সমাজের পরিকাঠামোর মধ্যে স্ত্রীপুরুষের সহাবস্থান ও পুরুষের সহায়তায় নারী-স্বাধিকার চেয়েছিলেন। নারীদের স্বীয় প্রয়াসে শক্তি সঞ্চয় করার জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার দিতে হবে। পুরুষের সমকক্ষরূপে তাঁরা হবেন পরিবর্তনের যোগসূত্র। তাঁর এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি মানবিক চেতনার সঙ্গে বাস্তববোধের পরিচায়ক ছিল।

লীলাবতী নারীবাদী ছিলেন না। পুরুষকে সর্বস্তরে বঞ্চিত করে নারীকে প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনার উৎকট অসঙ্গতিকে সমর্থন করা অসম্ভব ছিল। তিনি পুরুষতন্ত্রের পরিবর্তে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন নি। প্রগতিবাদী হলেও তিনি উগ্র আধুনিকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। ভারতের সনাতন

জীবনবোধ ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সেই ঐতিহ্যের ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান ও শক্তি সংগ্রহ করে সামাজিক উন্নয়নের পক্ষে ছিলেন। তদ্ব্যতীত বাংলার অনগ্রসর নারী সম্প্রদায় আমূল পরিশোধনে অক্ষম। ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংগঠিত করে তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। লীলার নারী ভাবনায় নারীবাদীদের রুষ্ট ধ্বংসাত্মক মতবাদ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বিনাশধর্মী, নেতিবাচক নারীবাদকে পরিহার করে তিনি ইতিবাচক, সৃজনশীল নারীচিন্তার প্রবর্তন করেছিলেন। নারীদের সুশিক্ষিত ও স্বনির্ভর করে সংযতভাবে গড়ে তোলা ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর ভাবাদর্শ অতি সুস্থ, স্বচ্ছ ও সরল ছিল। লিঙ্গ নির্মাণ বা মানবী চর্চাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থোপার্জনের পথ উন্মুক্ত করে সমাজ ও দেশসেবায় নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল নারী অবস্থানের সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারণে উন্নত জীবনের উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি।

লীলাবতী নাগের কাছে স্ত্রীপুরুষের কর্তব্য ও কার্যক্রমের কোনো বিভেদ ছিল না। নারীদের জন্য গৃহকর্ম ও পুরুষদের জন্য রাষ্ট্র পরিচালন, সমাজ গঠন আর্থিক সঙ্গতির বৈধতায় তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল। অন্তঃপুর ও বহির্মহলে কৃত্রিম বিভাজন অগ্রাহ্য করে স্ত্রীপুরুষ সমপর্যায়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করলে দেশের মঙ্গল। অন্তরালবর্তিনী নারীদের অবদানের স্বীকৃতি না দিয়ে তাঁদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ অবরুদ্ধ করা হয়েছে। লীলা 'মেয়েদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র কি?' নামক প্রবন্ধে গান্ধীজির নরনারীর দ্বৈধতার তত্ত্ব খণ্ডন করেছেন। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন অন্দর মহলে কূপমণ্ডুকের জীবনযাপন নারীশক্তির অপচয়। শিক্ষার দ্বারা সচেতন, তাঁদের বৃহত্তর পটভূমিকায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। তিনি স্ত্রী পুরুষের দৈহিক, মানসিক, মস্তিষ্কগত পার্থক্যের অসারতা প্রমাণ করেছেন। প্রকৃতির নিয়মে নারীদের সন্তান ধারণ ও পালন অবশ্য করণীয়; কিন্তু তার জন্য গৃহান্তরীণ সাময়িক প্রয়োজন, চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। বহির্জগতে বিবিধ কার্যক্রম মেয়েদের মানসিক ক্ষতি বা সন্তানের স্বাস্থ্যহানি করে না। অনুভূতির স্বাতন্ত্র্যে কর্মবিভাজনের বিশ্লেষণ ভ্রান্ত।

> বাইরের উত্থানশীল, গতিমুখর বিপুল জগৎ থেকে বঞ্চিত করে বাস্তব জগতের সম্পর্কশূন্য কৃত্রিম স্বস্তি ও শান্তির মধ্যে বাস করে ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে, জাতির দিক দিয়ে নারী যা হারাবে তার জন্য কেবল নারী নয়, সমস্ত সমাজ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেই পঙ্গুত্ব থেকে নারীর নিজেকে ও জাতিকে বাঁচাতেই হবে। (লীলাবতী রায় 'মেয়েদের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র কি?' জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৪৭)

দীপালি সংঘ

লীলাবতী নাগের নারী ভাবনা মূর্তরূপ পরিগ্রহণ করে ১৯২৩ সালে ১২টি সহযোগিনীর সাহচর্যে দীপালি সংঘ জন্মগ্রহণ করেছিল। তাঁর নিজের অভিমতে, বাংলার অন্ধকারময় গৃহকোণের প্রদীপ শিখাকে উজ্জ্বলতর করতে দীপালি সর্বসাধারণ মহিলাদের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও মুক্তির বার্তা বহন করার ব্রত নিল। এই সংঘের গঠনতন্ত্র প্রাথমিকভাবে অভিজাত হলেও মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের শিখর থেকে সর্বনিম্ন স্তরে পরিশ্রুত হয়ে আদর্শ প্রচার ও কর্মক্ষেত্র বিস্তার। তৃণমূলে প্রসারণ করে বঞ্চিত নারী সমাজকে সার্বিক উন্নতির মাধ্যমে যোগ্য করে তুলে স্বাধিকারের প্রতিষ্ঠা করা। সম্ভ্রান্ত, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দীন-দরিদ্র, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সমাজের সকল রমণীর মনের তমসা দূর করে দীপ জ্বালাতে চেয়েছিল দীপালি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, সাহিত্যচর্চা, আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে নারীদের আত্মপ্রত্যয় জাগানোর সঙ্কল্প ছিল লীলাবতীর।

নারী সম্প্রদায়ের চরিত্র গঠন, মূল্যবোধ ও আত্মবিশ্বাস জাগাতে দীপালির কার্যক্রমে প্রথম ছিল শিক্ষাদান। বারোটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র, কারিগরি এবং প্রযুক্তি বিদালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নারী শিক্ষা মন্দিরের বার্ষিক ভাষণে লীলাবতীর শিক্ষানীতির বৈচিত্র্য ও বিস্তার লক্ষণীয়। এই প্রতিষ্ঠানটির বিশেষত্ব ছিল বয়স্কা, বিবাহিতা এবং বিধবা নারীদের শিক্ষণ ব্যবস্থা। শিক্ষাভবন, শিক্ষানিকেতন এবং The New High School নামক আরও তিনটি মুখ্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। শিক্ষাসূচির অন্তর্গত ছিল নিয়মিত পঠন-পাঠনের সঙ্গে মানসিক ও দৈহিক উৎকর্ষ সাধন, অর্থকরী প্রযুক্তি ও শিল্পকলা। দরিদ্রদের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় গঠিত হয়েছিল। ছাত্রীদের স্বার্থরক্ষায় গড়ে উঠেছিল পাঠচক্র গ্রন্থাগার এবং ছাত্রীনিবাস। ১৯২৬ সালে তাদের মধ্যে জনসেবা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করার জন্য সংগঠিত হলো দীপালি ছাত্রী সংঘ। গণশিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল গণশিক্ষার বাহন হিসেবে। দেহ-মনের বিকাশ পরস্পরের পরিপূরক উপলব্ধি করেছিলেন লীলাবতী। শরীরচর্চার জন্য সৃষ্ট হয়েছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি। এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন স্বনামধন্য বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস। দীপালি কন্যারা শিক্ষায়, সাহসে, শৃঙ্খলাবোধে আদর্শ হয়ে উঠেছিলেন। নারীদের আত্মোন্নতির প্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁরা।

লীলাবতী অনুগামিনীদের সেবাব্রতে দীক্ষিত করতে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তাদের সহজাত সেবা প্রবৃত্তিকে সুসংহত রূপ দিতে শিশুপালন, গৃহ শুশ্রূষা, স্বাস্থ্যবোধ সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হতো। অন্দরে ও বাইরে সেবাকর্মে মেয়েদের ব্যবহারিক উৎকর্ষের জন্য Red Cross-এর সহায়তায় First Aid শেখানো হতো। লীলাবতীর কার্যক্রমে নারী সমাজের আর্থিক সঙ্কট মোচন গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে স্বল্পব্যয়ে সূচিশিল্প, বস্ত্রবয়ন, চিত্রাঙ্কন, কারুশিল্প পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দীপালির বার্ষিক প্রদর্শনীতে নারীদের প্রস্তুত

শিল্পসম্ভার, মুখরোচক খাদ্য সাফল্যের সঙ্গে বিক্রি হতো। এখানে সর্বস্তরের নারীরা, বিশেষত নিম্নবিত্ত শ্রেণী সানন্দে যোগদান করে আর্থিক ক্ষেত্রে উপকৃত হতেন। স্বদেশী দ্রব্য ও স্বদেশপ্রেম একই মঞ্চে প্রচারিত হতো। নারীদের প্রস্তুত সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার জন্য দীপালি ভাণ্ডার তৈরি হয়েছিল। এই অর্থভাণ্ডার বৃদ্ধি করতে অর্থ সংগ্রহ দীপালির কর্তব্য ছিল। লীলাবতী মেয়েদের গৃহকোণ থেকে বহির্জগতে এনে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের প্রতিভা বিকাশ ও মেলামেশার সুযোগ দিতে সঙ্গীত সম্মেলন, শিল্প প্রদর্শন ও নাটকাভিনয় হতো। আলোকপ্রাপ্ত চিত্তবিনোদনের লক্ষ্য নিয়ে পত্রিকা পাঠ, প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা ও বক্তৃতাদান নারীদের বৌদ্ধিক উন্মেষের সহায়তা করতো। ঢাকা ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাংলাদেশে বিস্তারিত দীপালির শাখা-প্রশাখা নারীসমাজের মর্মস্থলে পৌঁছে দিয়েছিল নবচেতনার আলোড়ন।

দীপালির বহুমুখী ক্রিয়াকলাপ পূর্ণতা লাভ করেছিল লীলাবতীর মানসকন্যা *জয়শ্রী* পত্রিকার প্রকাশনে। ১৯৩১-এর মে মাসে তাঁর সম্পাদনায় ভূমিষ্ঠ হলো *জয়শ্রী*। 'নারীমুক্তি সংগ্রামের বৈপ্লবিক রূপান্তরে সাহিত্যের ডাক পড়লো।' নামকরণ করে সদ্যোজাতাকে 'আশীর্বাণী' পাঠিয়েছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ :

বিজয়িনী নাই তব ভয়,
দুঃখে ও বাধায় তব জয়।
অন্যায়ের অপমান
সম্মান করিবে দান,
জয়শ্রীর এই পরিচয়॥ (*জয়শ্রী*, বৈশাখ, ১৩৩৯)

'মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও শঙ্কাহীন দেশসেবার ভাব জাগ্রত' করতে *জয়শ্রী* উদিত হলো। সমাজ পরিবর্তন ও পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের আদর্শ নিয়ে তার জয়যাত্রা। মহিলা পত্রিকা হলেও *জয়শ্রী* লিঙ্গভিত্তিক ছিল না এবং কেবলমাত্র নারী পাঠিকাদের জন্য প্রকাশিত হয় নি। নরনারী নির্বিশেষে বিদগ্ধ লেখক-লেখিকারা রচনা পাঠিয়ে একে সমৃদ্ধ করেছেন ও সমগ্র পাঠক সমাজের মধ্যে এর সমাদর ছিল। রাজশক্তির প্রবল বিরুদ্ধতায় বারংবার বাজেয়াপ্ত হয়েও *জয়শ্রী* ভস্ম থেকে উত্থিত হয়ে নবজীবন লাভ করেছে।

বাংলাদেশে অদ্বিতীয় দীপালি সংঘের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে লীলাবতীর নতুন ভাবাদর্শের অভিনব পরীক্ষার সামগ্রিক সফলতা দেখা যায়। সুপরিকল্পিতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা প্রসূত হয়েছিল সুসংগঠিত দীপালি। নারীদের জীবনের সর্বস্তরে প্রবেশ করেছিল এর সোনার কাঠির স্পর্শ। নারী-পুরুষের সমাধিকার ছিল এই সংঘের সুদূরপ্রসারী ভিত্তি। লীলাবতীর বিচক্ষণতা তাঁকে দিয়েছিল যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের অসাধারণ ক্ষমতা। সুদক্ষ তত্ত্বাবধায়ক ও কর্মীদের সহায়তায় অতি সুপরিচালিত ছিল দীপালি। তার সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ছাত্রী সংঘের মতো সমসাময়িক সংস্থাগুলোর সীমিত রাজনৈতিক লক্ষ্য থেকে পৃথক

ছিল। নারীদের সার্বিক মানসিক, কায়িক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক উন্নয়ন পূর্ণাঙ্গ মাত্রা পেয়েছিল। জাতি গঠন ও দেশমুক্তির জন্য নারী গণোত্থানের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন প্রজ্ঞাবতী। তাঁর নেতৃত্বে দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠান থেকে আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

রাজনৈতিক ভাবাদর্শ

ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিকে উপলব্ধি করেও প্রাথমিক স্তরে লীলাবতী রাজনীতি অপেক্ষা নারী আন্দোলনকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। নারীভাবনার প্রত্যুষে, ছাত্রীজীবনে তাঁকে বিদেশি শাসনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর বেথুন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা ছাত্রী আন্দোলনকে রাজনৈতিক মাত্রা দিয়েছিল। দীপালি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তিনি অনুভব করেন যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা ব্যতীত নারীমুক্তি সম্ভব নয়। পাঠ্যসূচিতে স্বাদেশিকতা, দেশসেবা ও রাজনৈতিক শিক্ষা অন্তর্গত ছিল। ছাত্রীদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে দীপালি ছাত্রী সংঘ গঠিত হলো পথিকৃৎ হিসেবে। ১৯৩০-এ দেশব্যাপী ছাত্রী জাগরণের পটভূমিকায় ছাত্রীভবন নির্মিত হলো কলকাতায়। রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন নারীদের যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল গড়ে উঠলো। রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের দাবিতে লীলা নারী ভোটাধিকারের সমর্থক ছিলেন। জন্মলগ্ন থেকে *জয়শ্রী* পত্রিকা সমাজসেবার সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবধারা প্রচার করতো। অনিবার্যভাবে তাঁর নারীভাবনায় রাজনৈতিক সংযোজন হলো।

লীলাবতীর পক্ষে নারী আন্দোলন থেকে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না। নারীমুক্তির অবিসংবাদী নেত্রীর মনে রাজনৈতিক সংযোগ সংশয় জাগিয়েছিল। এই পরিবর্তনে সফল নারী আন্দোলন সঙ্কুচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। দুই ধারা সমান্তরাল অথবা পরস্পর বিরোধী হবে এ প্রশ্ন তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছিল। স্বল্প রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে বৃহত্তর দেশমুক্তি সংগ্রামে যোগদান বিপজ্জনক ছিল। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ নির্বাচন। ভারতের প্রেক্ষাপটে গান্ধীজির অহিংস পন্থা তখন গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। অপরদিকে বাংলার সজীব বিপ্লববাদকে উপেক্ষা করা কঠিন ছিল। অহিংসার প্রসার নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, গুপ্ত বিপ্লবে রক্তাক্ত ক্ষুরধার পথে যাত্রা। নীতিবোধের প্রশ্ন ছাড়াও দুই তত্ত্ব ব্যক্তিপূজা কিংবা দলপ্রাধান্যে বিশ্বাসী, স্ববিকাশের অন্তরায়। লীলাবতীর নারীভাবনা মুক্ত ও সৃষ্টিশীল। রাজনৈতিক আবর্তে তাঁর স্বকীয়তা বিনষ্ট হতে পারতো।

লীলাবতী স্বয়ং, নারী ও রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তর্দ্বন্দ্বের সমাধান করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ঔপনিবেশিক পরিকাঠামোয় নারীমুক্তি আসবে না। বহিরাগত শত্রু নির্মূল করে তবেই দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান। সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে লীলা তাঁর সযত্নে সৃষ্ট নারী

আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে চাইলেন। সুযোগ্য সহকর্মিণীদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে তিনি রাজনীতিকে মুখ্য স্থান দিলেন। নারী উত্থানকে রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিপূরক হিসেবে গণ্য করলেন। সঞ্জীবিত নারী সমাজকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহযোগী করে দেশমুক্তির কাজে লাগাতে চাইলেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে নারী আন্দোলন গৌণ হয়ে গেল। সংগঠিত নারীদের রাজনৈতিক প্রবাহে আনয়ন হলো মূল লক্ষ্য।

রাজনৈতিক পথ নির্ণয়ের নির্দেশক লীলাবতীর লিখিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে নিহিত। মহাত্মা গান্ধীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করলেও, তাঁর অহিংসা নীতিতে আস্থা ছিল না। বিনা প্রতিরোধে বৃটিশরাজের মতো পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে প্রতিহত করার তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। নৈতিক চেতনা জাগিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে শত্রুর হৃদয় পরিবর্তন চিন্তা অবাস্তব। গান্ধী পরিচালিত বিশাল রাজনৈতিক সংগঠনকে বিশ্বশান্তি মঞ্চরূপে কল্পনা করতে পারেন নি লীলাবতী। তাঁর ঋষিভাবের সঙ্গে কূট রাজনৈতিক কৌশলেরও সমন্বয় আপাত বিরুদ্ধ ও বিভ্রান্তিকর ছিল। ঔপনিবেশিক সংঘর্ষে আপোসনীতি এবং মহাত্মার একনায়কসুলভ আচরণে তাঁর সমর্থন ছিল না। সর্বোপরি গণ-আন্দোলনকে তুঙ্গে তুলে চৌরিচৌরার ঘটনার মতো তুচ্ছ কারণে প্রত্যাহার করার প্রবণতাকে লীলা গ্রহণ করেন নি। তাঁর কাছে গান্ধীবাদের বৈপরীত্য অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য ছিল।

লীলাবতীর সশস্ত্র সংগ্রামে সংযুক্তির কারণ তাঁর চরম প্রতিবাদী চরিত্রে উপ্ত ছিল। বিপ্লবীদের মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মবলিদান এবং প্রচণ্ড আঘাতের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তির অপরাজেয়তার ভাবমূর্তি বিনাশের দুরন্ত প্রয়াস তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিপ্লব কেবল ধ্বংসাত্মক নয় সৃজনশীলও বটে; লীলাবতীর মতো বিপ্লবীরাও আদর্শ সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন। বাংলাদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রখরতা এবং সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের পিছনে জনসমর্থন ছিল। কার্যোপলক্ষে তৃণমূল স্তরে লীলার সংযোগ তাঁকে বিপ্লবের উত্তাপ অনুভব করতে সাহায্য করেছিল। ১৯২৮ সালে ঐতিহাসিক কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয়েছিল। এই মঞ্চে তিনি নারী আন্দোলনের ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ১৯২৯-এ অনশনে বিপ্লবী যতীন দাসের মৃত্যুতে ঢাকায় মহিলাদের শোক মিছিলের নেত্রী ছিলেন তিনি। ১৯৩০-এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বৈদ্যুতিক প্রভাব পড়েছিল সমগ্র বাংলার নারীসমাজের ওপর। বিপ্লববাদে আস্থা এবং বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর ধারণাকে দৃঢ় করে বিপ্লবোত্তরণে উৎসাহিত করেছিল।

লীলাবতীর বিপ্লবের সপক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর প্রতিবেশী ও সহপাঠী অনিল রায়ের বিরাট ভূমিকা ছিল। তিনি ঢাকার সমাজকল্যাণ সমিতির পরিচালক ছিলেন এবং দীপালির নেত্রীর সঙ্গে সমাজসেবার যোগসূত্র ছিল। সমাজ সংস্কারের অন্তরালে অনিল রায় বিপ্লবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিপ্লব সাধক যুক্তি, তর্ক,

আলোচনার দ্বারা তাঁর সহপাঠিনীর সংশয় দূর করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবের স্থান পূর্ব নির্ধারিত, কারণ অহিংস আন্দোলনে দেশের শৃঙ্খল মোচন অসম্ভব। স্বমুক্তির ঊর্ধ্বে দেশমুক্তি বলে বিপ্লবের প্রয়োজনে আত্মাহুতি অবশ্যম্ভাবী। তাঁর অকাট্য যুক্তিতে দ্বিধামুক্ত লীলাবতী তাঁর মর্মকথা ব্যক্ত করেছেন :

> তারপর যোগাযোগ হল যথার্থ হিন্দু সভ্যতা মনন ও জীবনধারা ও mysticism-এর একটি শ্রেষ্ঠ product-এর সঙ্গে। কতবার ধাক্কা খেয়েছি, মন গ্রহণ করতে পারে নি, বুদ্ধি বিচার বিচলিত হয়েছে।... আমার জীবনে অলক্ষ্যে যাঁর স্পর্শ উদ্বুদ্ধ করার জন্যই যেন আমার সেই অপূর্ব জীবন সাথীটিকে পেলাম। পেলাম এমন কিছুর আস্বাদ যার রূপ নেই স্বাদ আছে, যার প্রকৃতি ধরা-ছোঁয়া যায় না অনুভূতিতে যাকে পাওয়া যায়...। (লীলা রায় 'আত্মপরিচয়', *জয়শ্রী শারদীয়*, ১৯৬৮)

লীলাবতী বিচার না করে বিশ্বাস করে, প্রশ্ন না করে প্রশ্নের অতীত মীমাংসায় উপনীত হয়ে বিপ্লবে আত্মসমর্পণ করলেন।

বিপ্লব সাধনা

১৯২৬ সালে দীপালি সংঘসহ লীলাবতী নাগ শ্রীসংঘে যোগ দিলেন। সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে এই প্রথম একটি নারী সংঘ বৈপ্লবিক ভাবমূর্তি নিয়ে পুরুষ পরিচালিত বিপ্লব সংগঠনের সঙ্গে মিলিত হলো। ভ্রাতাভগিনী সমবায়ের অনড় ভিত্তি ছিল বিপ্লবে অংশগ্রহণে স্ত্রীপুরুষের সমানাধিকার। লীলাবতীর নারী ভাবনায় নরনারীর সহাবস্থান স্থিতিশীল হলো। নারী আন্দোলনকে দুর্বল না করে দীপালি বিপ্লব চেতনা নিয়ে বজায় থাকলো। *সহিংস সংঘাতের বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করার জন্য* তিনি একটি অভিনব অনুপ্রবেশ নীতির প্রবর্তন করলেন। একে 'দ্বৈত দলভুক্তি' পদ্ধতি বলা যায়। নিয়মাবলি অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে মেয়েরা দীপালি সংঘে প্রবেশ করতো। দীপালিকে ব্যবহারিক শিক্ষাকেন্দ্র করে তাদের কর্মদক্ষতা পরীক্ষিত হতো। দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষের পরিমাপে মনোনীত প্রার্থীকে শ্রীসংঘে যোগদানের প্রস্তাব দেয়া হতো। বল প্রয়োগের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় রক্তবিপ্লবে দলভুক্তির ব্যবস্থা ছিল। বিপ্লবে নিযুক্ত হতে অনিচ্ছুক নারীদের দীপালির সমাজসেবা শাখায় রাখা হতো। এই সহজ, আধুনিক পদ্ধতি শ্রীসংঘকে সুদক্ষ, সুসংবদ্ধ বিপ্লবগোষ্ঠীতে পরিণত করেছিল।

লীলাবতীর শ্রীসংঘে প্রবেশের অনতিপরে অনিল রায় 'দ্বৈত নেতৃত্ব তত্ত্ব' অনুধাবন করেন। লীলা প্রত্যক্ষভাবে দীপালির অধিনেত্রী থাকলেও নেপথ্যে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন। প্রগতিবাদী অনিল সহযোগিনীর সন্দেহাতীত যোগ্যতা নিরূপণ করে বিপ্লবে নারী নেতৃত্বের ভাবাদর্শকে বাস্তবায়িত করার সঙ্কল্প নিলেন। বিশ্বের বিপ্লব ইতিহাসে এই অভিনব পরীক্ষণের নজীর ছিল না।

পুরুষপ্রধান শ্রীসংঘে নেতৃত্বের প্রস্তাবনা প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করলো। নরনারীর অবাধ মেলামেশায় অনভ্যস্ত রক্ষণশীল সদস্যরা বিপ্লবে লীলাবতীর উপস্থিতি অপছন্দ করেছিলেন। দ্বৈত নেতৃত্বের পরিকল্পনায় তাঁরা ঘোরতর আপত্তি জানালেন। লীলাবতীর উপযোগিতা অগ্রাহ্য করে তাঁকে স্ত্রীলিঙ্গে চিহ্নিত করা হলো—'আমরা কি স্ত্রীলোকের দ্বারা পরিচালিত হবো?' অনিল রায় 'উগ্র মানবপ্রেমী' উপাধি লাভ করলেন। তাঁদের সখ্যতার কলুষময় সমালোচনা করে বহুবিধ কুৎসা রটনা চলেছিল। প্রকৃতপক্ষে, নারীমাত্রিক প্রশ্নের অন্তরালে, শুধু শ্রীসংঘ নয়, বিপ্লব আন্দোলনের অভিশাপ ছিল অন্তর্দলীয় প্রাতিদ্বন্দ্বিতা এবং নেতৃত্বের দুর্দম লালসা। তাছাড়া, নীতিগতভাবে অনিল ও লীলা তাৎক্ষণিক বিপ্লবের পরিবর্তে সংগঠনের মাধ্যমে শক্তি সংহত করে গণোত্থানের পক্ষে ছিলেন। প্রতিপক্ষরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে 'আত্মঘাতী কর্মীদল' গঠন করে সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি শিথিল করতে চাইলেন।

১৯২৯-এর জুলাইয়ে তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে শ্রীসংঘ দ্বিখণ্ডিত হলো। লীলা-অনিলের দুই ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী সত্যভূষণ গুপ্ত এবং ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের নেতৃত্বে নতুন দল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স (বি.ভি.) প্রতিষ্ঠিত হলো। বিপ্লব ইতিবৃত্তে ব্যতিক্রমী না হলেও এই ঘটনায় মর্মাহত হলেন অনিল ও লীলা। অন্তর মথিত বেদনাকে অপ্রকাশিত রেখে অকুতোভয়ে বিপ্লবে নারী নেতৃত্বের সার্থকতা প্রমাণ করতে উদ্যত হলেন। দলের নারীপুরুষ নির্বিশেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জানালেন। শ্রীসংঘে দ্বৈত অধিনায়কত্বের ভাবনা মূর্তরূপ পরিগ্রহ করলো। অবিরত চলমান থাকলো নেতৃদ্বয়ের কর্ম সাধনা। ১৯৩০-এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে অনিল রায় ও তাঁর সহকর্মীদের অনেকেই গ্রেফতার হলে দ্বৈত নেতৃত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী শ্রীসংঘ পরিচালনার একক দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিপ্লব সাধিকা লীলাবতী নাগ।

লীলাবতী শ্রীসংঘের সংহতি রক্ষা ও বৈপ্লবিক কর্মযোগে মনোনিবেশ করলেন। বাংলার বিপ্লবগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সমন্বয় আনতে কলকাতায় অনুশীলন ব্যতীত সর্বদলীয় 'কেন্দ্রীয় সহযোজন সমিতি' স্থাপন করলেন। পূর্ণোদ্যমে শুরু হলো অস্ত্রাগার সংরক্ষণ, যোগাযোগ রক্ষা, আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, অর্থ সংগ্রহ এবং বোমা প্রস্তুতি। নারীদের ওপর অস্ত্রভাণ্ডার রক্ষা, সংযোগ স্থাপন ও আশ্রয় পরিদর্শনের ভার দেয়া হলো। অর্থ এবং অস্ত্র সরবরাহে কলকাতার ছাত্রীভবনের মেয়েরা তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন। বোমা তৈরি ও সম্মুখ সমরে পুরুষদের স্থান নির্দিষ্ট ছিল। শ্রীসংঘ লীলাবতীর সঞ্চালনে অনেকগুলো দুঃসাহসিক ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছিল :

> গোয়েন্দা নোটে শ্রীসংঘ কত এ্যাকশন যা ঘটিয়েছেন তার ২৬টি দৃষ্টান্ত আছে।... সন্দেহের কারণ আছে কোন তালিকাই সম্পূর্ণ নয়। ঘটনার মধ্যে রাহাজানি বা ডাকাতির সংখ্যা ৯টা, হত্যা বা হত্যার প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত আছে ৯টা, রিভলভার বা বন্দুক চুরির ঘটনা আছে ৮টা। (পুলকেশ দে সরকার, 'বিপ্লবী প্রতিমা লীলাবতী', জয়শ্রী, আষাঢ় ১৩৭৭)।

সুবিখ্যাত রাইটার্স অলিন্দ যুদ্ধ (১৯৩০) এবং কুমিল্লার স্টিভেন্স হত্যার (১৯৩১) সঙ্গে এই দলের সংযুক্তি আছে বলে পুলিশ সন্দেহ করেছিল। অবশেষে ২০ ডিসেম্বর ১৯৩১-এ ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার হয়ে বিনা বিচারে প্রথম মহিলা রাজবন্দি হলেন লীলাবতী। কারান্তর থেকে প্রেরিত তাঁর 'সক্রিয় কর্মাবলী'র নির্দেশ পালন করেছিলেন শ্রীসংঘের সদস্যরা।

বৃটিশ সরকারের নথিপত্রে লীলাবতীর নেতৃত্বে শ্রীসংঘ বাংলার সর্বাপেক্ষা 'ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী সংস্থা' রূপে বর্ণিত হয়েছিল। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে, আসামে, পূর্ব ভারতে, উত্তরপূর্ব সীমান্তে এবং ব্রহ্মদেশে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হয়েছিল। সুচিন্তিত 'সঙ্কেত লিপি'র মাধ্যমে বিপ্লব দর্শন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশকে বিপ্লবের মধ্যমণি করে তিনি বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সম্প্রদায়, নারীসমাজ, কৃষককুল, শ্রমিক শ্রেণীকে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। বাস্তববুদ্ধিসম্পন্না নেত্রী স্ত্রী-পুরুষ সমকক্ষতার ভিত্তিতে মানবসম্পদ ব্যবহার করে সংগঠনের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করেছিলেন। আন্তর্দলীয় সমবায়ের চেষ্টা করে বিপ্লবের বৃহত্তর স্বার্থ দেখেছিলেন তিনি। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব ও প্রবল বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে দলীয় সমস্যার সমাধান করে লীলাবতী শ্রীসংঘকে সুসংহত শক্তি কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। যুগোত্তীর্ণ একক স্ত্রী নেতৃত্বের সাফল্যে উদ্‌ঘাটন করেছিলেন নবভারতে নবদিগন্ত।

সুভাষবাদে উত্তরণ

১৯৩৭ সালের শেষে লীলাবতীর মুক্তিলাভের সময়ে ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। কারাগারে জাতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে আদর্শনৈতিক সঙ্কট দেখা দিলো। তাঁরা উপলব্ধি করলেন বিক্ষিপ্ত, অসংহত, আঞ্চলিক সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শাসন উৎখাত হবে না এবং বিকল্পের সন্ধান চাই। বৈপ্লবিক দলগুলোর আনুষ্ঠানিক অবলুপ্তির পর বিপ্লবীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করলেন। চট্টগ্রাম গোষ্ঠীর সঙ্গে একটি বৃহদাংশ কমিউনিস্ট দলে যোগ দিলেন। যুগান্তরের অনেকেই দক্ষিণপন্থী গান্ধীবাদে আকৃষ্ট হয়ে কংগ্রেসে প্রবেশ করলেন। অনুশীলনের একাংশ বৈপ্লবিক সমাজবাদী দলে (আর. এস. পি) যুক্ত হলেন। শ্রীসংঘ, বি. ভি.সহ ঢাকা গোষ্ঠী সুভাষবাদের সমর্থকরূপে দেখা দিলেন। অনিল রায় ও লীলাবতী সুভাষচন্দ্রের আদর্শকে আশ্রয় করে বামপন্থী কংগ্রেসের সদস্য হলেন। জয়শ্রীর সম্পাদকীয়তে লীলা লিখলেন :

> রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণসংগ্রাম... স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পন্থা...শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ছাত্র ও যুব আন্দোলন, কংগ্রেস আন্দোলন, নারী আন্দোলন—এই সকলের সমবেত সংহতিতে যে সংগ্রাম গড়ে উঠবে তাকেই বলা চলে গণসংগ্রাম।... ব্যক্তি-কেন্দ্রিক দল নয়, আদর্শনৈতিক দলই বর্তমান যুগে অপরিহার্য্য প্রয়োজন। (*লীলা রায় 'সম্পাদকীয়', জয়শ্রী*, আষাঢ় ১৩৪৬)।

বাংলাদেশে এই সময়টিকে সুভাষচন্দ্রের যুগ বলা যায়। গণমানসে তাঁর অনমনীয় পৌরুষ ও নায়কোচিত গুণাবলি প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। ভারতের তিনি বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে চেয়েছিলেন। শ্রীসংঘের নেতৃদ্বয় নেতাজীর উগ্র বামপন্থী জাতীয়তাবাদে এবং তোষণনীতির স্থলে চরম প্রতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা যুব নারী শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে বৈপ্লবিক কাজে নিয়োগ করতে আগ্রহী ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজবিপ্লব মিশ্রিত ছিল। তাঁর বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি কালোপযোগী যান্ত্রিক শিল্পায়ন ও আধুনিক সৈন্যদল গঠনের পক্ষপাতী ছিল। তিনি মনে করতেন যে, কেন্দ্রানুগ অর্থনীতি ও সুদৃঢ় রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার মধ্যে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব। সুভাষ শ্রেণীসংগ্রাম অথবা অহিংসার সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করতেন। ভারতবর্ষের মতো বহু যুগব্যাপী পরাধীন, আত্মকর্তৃত্ব বিস্মৃত, সুবিশাল জনবহুল দেশে শক্তিশালী শাসনযন্ত্র অপরিহার্য। লীলাবতী সুভাষবাদের যৌক্তিকতা অনুবেক্ষণ করে সমমতাবলম্বী হলেন।

মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ সুভাষচন্দ্র প্রথমেই লীলাবতীকে সাংগঠনিক কর্মের ভার দিলেন। তাঁর সমর্থনে লীলা দলনির্বিশেষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির মহিলা শাখা স্থাপন করলেন। নারীদের স্থানীয় স্তরে সক্রিয় করার জন্য উপসমিতি প্রতিষ্ঠিত হলো। ১৯৩৮-এ হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি সুভাষ তাঁর 'জাতীয় পরিকল্পনা সংগঠনের' নারী বিভাগে লীলাকে সদস্যপদ দিলেন। ১৯৩৯-এ জলপাইগুড়ি রাজনৈতিক সম্মেলনে লীলাবতী সুভাষচন্দ্রের 'পূর্ণ স্বাধীনতার চরমপত্র' সমর্থন করলেন। ঐ একই বছরে ত্রিপুরী কংগ্রেসে প্রচণ্ড সঙ্কট মুহূর্তে গান্ধী-সুভাষ সংঘাত চূড়ান্ত আকার ধারণ করলো। তত্ত্বগত মতপার্থক্যের অজুহাতে সুভাষের পরিবর্তে গান্ধীজী সীতারামিয়াকে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে ব্যর্থ হলেন। নানা রাজনৈতিক কূটকৌশলে পুনর্নির্বাচিত সুভাষচন্দ্রের অবস্থান দুঃসহ হলে সভাপতি পদ ত্যাগ করলেন। মে ১৯৩৯-এ কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের পর তাঁর নিজস্ব দল ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হলো। প্রতিষ্ঠাত্রী সদস্যা লীলা রায় সর্বতোভাবে সুভাষচন্দ্রের সহগামী ছিলেন। এই সময়ে লীলাবতী তাঁর সহমর্মী বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায়কে 'জীবন সাথী'রূপে বরণ করলেন।

ফরওয়ার্ড ব্লক দল স্থাপনের লীলার আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক চিন্তাধারা সার্থক হয়েছিল। তিনি বিশ্লেষণ করেছেন যে দেশের মানুষের স্বভাবসিদ্ধ জড়তা দূর করতে স্থায়ী সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল। বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে পদদলিত জাতিসমূহের হাতিয়ার হিসেবে এই সংগঠন বিশেষ কার্যকরী ছিল। দলের কর্মোদ্যমী, সত্যাশ্রয়ী, প্রাণোচ্ছল স্বাধীন ভারতের ভূমিকায় প্রবল আকর্ষণ ছিল। জাতির সামগ্রিক মুক্তির দাবি 'cause' অথবা সাধনায় পরিণত হয়েছিল। নিষ্ক্রিয় অর্ধপদক্ষেপ, অনাবশ্যক উদারতা, ব্যক্তিত্ব সংঘাত, আত্মম্ভরিতা ও অন্তর্দলীয় সংঘর্ষের কোনো স্থান ছিল না। অসীম

সাহস ও আত্মত্যাগের সমবায়ে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সম্মুখীন হয়েছিল। মতানৈক্য সত্ত্বেও ইংরেজ বিতাড়নে কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলোর সহযোগিতা কাম্য ছিল। লীলার কাছে ফরওয়ার্ড ব্লক ছিল স্বাধীনতার অগ্রদূত।

সুভাষচন্দ্র বসুর হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ অপসারণ আন্দোলনে লীলাবতীর মুখ্য ভূমিকা ছিল। অষ্টাদশ শতকে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক একটি ক্ষুদ্র কক্ষে বন্দি শতাধিক ইংরেজের মৃত্যুর স্মৃতিরক্ষার্থে বৃটিশরাজ এ স্তম্ভ স্থাপন করে অতিকথনের সৃষ্টি করেন। নেতাজী এই ঐতিহাসিক বিকৃতিকে সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র বলে চিহ্নিত করে দাসত্ব ও লাঞ্ছনার প্রতীককে অপসারণ করার জন্য জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে চান। তিনি অনলবর্ষী ভাষণ ও রচনার মাধ্যমে প্রবল জনমত গড়ে তুললেন এবং ২ জুলাই ১৯৪০-এ ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফতার হলেন। লীলা সুভাষের গ্রেফতার ও হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভের প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন। তিনি ভারত রক্ষা আইনের সমালোচনা করে দুঃসাহসিক অভিমত প্রকাশ করলেন :

> মনে হয় হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ গ্রেফতারের কারণ, যা জনগণের কাছে অতিশয় ঘৃণ্য ও বিতৃষ্ণাজনক। প্রদেশে এখনও একটি জনপ্রিয় সরকার কার্য্যকরী। জাতীয় বন্ধনের নিন্দনীয় প্রতিমূর্ত্তির ধ্বংস বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত দাবী। (লীলা রায় 'The Arrest', ফরওয়ার্ড ব্লক, ৬ জুলাই ১৯৪০)।

এই অগ্নিগর্ভ ব্যাখ্যানের সঙ্গে অনিল রায় ৯ জুলাই এবং লীলা রায় ১০ জুলাই গ্রেফতার হলেন।

সুভাষচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকা তাঁর মানসপুত্র। তিনি এ সংবাদপত্রকে শুধু মতবাদের মুখপাত্র নয়, তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু করতে চেয়েছিলেন। গ্রেফতারের অনতিপরে তিনি লীলা রায়কে এর সম্পাদনার দায়িত্ব দিলেন। রাষ্ট্রনৈতিক বিচক্ষণতা ও সাংবাদিকতায় পেশাগত অভিজ্ঞতা তাঁর সপক্ষে কাজ করেছিল। তিনি এই কর্মভার পবিত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলেন। 'বন্দীশালা' থেকে মুক্ত হয়ে তিনি কংগ্রেস রাজনীতিকে আক্রমণ করলেন 'Disillusioned' (ফ. ব. ৩১ আগস্ট, ১৯৪০), 'A Grave Tragedy' (ফ. ব. ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪০) এবং 'What Next' (ফ. ব. ৫ অক্টোবর, ১৯৪০) শীর্ষক প্রবন্ধে। 'This Saintly Fight' (ফ. ব. ১৯ অক্টোবর, ১৯৪০)-এ গান্ধীজি ও বিনোবাভাবের বৈচিত্র্যহীন নৈতিক উক্তির পরিবর্তে নিরলস সংগ্রামের ডাক দিলেন। 'Follow Nagpur' (ফ. ব. ২৬ অক্টোবর, ১৯৪০)-এ উপমহাদেশে বৃটিশ সরকারের বলপূর্বক যুদ্ধ পরিস্থিতি আরোপণের সঙ্কল্পকে ধিক্কার দিলেন। নাগপুর অধিবেশনে ফরওয়ার্ড ব্লক দল 'জনগণের হাতে সমস্ত ক্ষমতা' দেয়ার দাবি করেছিলেন। লীলা রায়ের সম্পাদকীয়গুলো সহজবোধ্য, নির্ভীক ও পূর্ণমাত্রায় আপোসহীন ছিল। রাজশক্তি কর্তৃক নিষিদ্ধকরণ, আর্থিক প্রতিবন্ধকতা এবং নিয়মিত কারাদণ্ডের বন্দোবস্ত বীর্যবতী সম্পাদিকাকে বিরত করতে পারে নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘটায় সুভাষচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতার পরিকল্পনাকে তীব্রতর

করতে চাইলেন। ১৯৪০-এ তিনি কারাভ্যন্তরে আমরণ অনশন আরম্ভ করলে সরকার তাঁকে মুক্তি দিয়ে গৃহান্তরীণে রাখলেন। ১২ জানুয়ারি ১৯৪১-এ তিনি শেষবারের মতো লীলা ও অনিল রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উত্তর ভারতে ফরওয়ার্ড ব্লকের বার্তা প্রচারের নির্দেশ দিলেন। তাঁর ঐতিহাসিক 'নিষ্ক্রমণের' পর লীলাবতী উত্তরপূর্ব ভারত, আসাম, বিহার, যুক্ত প্রদেশে সফল সংগঠন গড়ে তুলে জনগণকে উদ্দীপিত করলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও জনযুদ্ধের বিরুদ্ধে মুখর প্রতিবাদ করে কমিউনিস্টদের নেতাজীকে ফ্যাসিবাদী প্রমাণ করার হীন চক্রান্ত উদ্‌ঘাটন করলেন। কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা 'তাঁকে হত্যা করো', 'ফ্যাসিবাদীদের হত্যা করো', 'ফরওয়ার্ড ব্লকিস্টদের হত্যা করো'র প্রতিরোধে লীলা হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে অগ্নিবর্ষণ করলেন 'We Shall Not Stand It' (হ. স, ১৯ মার্চ, ১৯৪২)। পুনরায় *জয়শ্রী* এবং ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকা বাজেয়াপ্ত হলো। বিপ্লব নেত্রী গৃহবন্দি এবং অচিরে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

'ভারত ছাড়ো' থেকে ভারত বিভাগ

১৯৪২ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত লীলা-অনিলের সুদীর্ঘ কারাদণ্ড হয়েছিল। তাঁদের মতো কতিপয় নেতার অক্লান্ত পরিশ্রম গান্ধীজির আহ্বানে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে দেশের জনমানসকে প্রস্তুত করেছিল। ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করে নেতৃহীন জনগণ নিজেরা পাশবশক্তির বিরুদ্ধে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র সিদ্ধান্ত নিলেন। শ্রীসংঘের পরিমণ্ডলে ফরওয়ার্ড ব্লকে যুক্ত বিপ্লবীরা অগাস্ট আন্দোলনে গোপন প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। ঢাকা, কলকাতা, আসাম, উত্তরবঙ্গ এবং পূর্বাঞ্চলে কর্মোদ্যম চলেছিল। বারংবার কারাদণ্ড উপেক্ষা করে অনুগামীদের হাতে তুলে দিয়েছেন কর্তব্যের ভার। যুব শক্তি, নারী সম্প্রদায় এবং নিম্নস্তরের মানুষ এ সংগ্রামে একাত্ম হয়েছিলেন। লীলাবতী স্বয়ং ১৯৪২-এর উত্থানের গণচরিত্রের পর্যালোচনা করেছেন। নেতৃবর্গের ওপর জনতার অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও আনুগত্যের প্রাবল্য গণসংগ্রামের পথ প্রশস্ত করেছিল। বিদেশ থেকে সুভাষচন্দ্র 'Allahdin' ছদ্মনামে লীলাবতীর কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। সুদূর প্রাচ্যে 'ঝাঁসির রাণী' বাহিনীতে তাঁর অনুপস্থিতি অনুভব করে অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় নারীদের অধিনেত্রী হিসেবে সাফল্য কামনা করলেন।

লীলা রায় ১৯৪৬-এ কারামুক্ত হয়ে নেতাজীর অপূর্ণ সাধনা এবং 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজের' বীরগাথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে উদ্যোগী হলেন। *জয়শ্রী* এবং *ফরওয়ার্ড ব্লক* পত্রিকা নবপর্যায়ে যুদ্ধোত্তর সমাজবিপ্লবের বার্তা ঘোষণা করলো। ভারতের সাংবিধানিক সভায় লীলা বাংলার প্রতিনিধিরূপে সদস্যা নির্বাচিত হলেন। একই সঙ্গে জঘন্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমন করার প্রচেষ্টা ও ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের প্রয়াস চললো। মুসলিম লীগের প্ররোচনায় পাকিস্তান দাবিকে কেন্দ্র করে ১৬ আগস্ট ১৯৪৬-এ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে' কলকাতায়

নৃশংস হত্যাকাণ্ডের উদ্ভব হলো। এই বিষাদময় অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের বিজয়িনীর অবিস্মরণীয় ভূমিকা ছিল। নিজের জীবন তুচ্ছ করে শুধু হিন্দু নয়, অসংখ্য মুসলমানের প্রাণরক্ষা করেছিলেন তিনি। নারীদের চরম লাঞ্ছনার হাত থেকে উদ্ধার করেছিলেন। রক্তপথে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার অপকৌশল দাবানলের মতো বিহার ও নোয়াখালিতে ছড়িয়ে পড়লো। পূর্ববঙ্গে ৬ দিনে ৯০ মাইল পরিভ্রমণ করে ১৭টি শিবির স্থাপনের মাধ্যমে উদ্ধার ও সেবাকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। নোয়াখালিতে 'জাতীয় পরিচর্য্যা কেন্দ্র' গঠন করে গান্ধীজীর সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

বৃটিশরাজের ষড়যন্ত্র ও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ক্ষমতার অভীপ্রায় মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনায় ভারত বিভাগ স্থির হলো। ক্ষত-বিক্ষত অন্তঃকরণে লীলা সাংগঠনিক সভার সদস্যা হিসেবে দিল্লিতে পণ্ডিত নেহেরু ও গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রত্যাখ্যাত হলেন। বাংলায় প্রত্যাবর্তন করে শহরে, গ্রামে, গঞ্জে, পাকিস্তান প্রস্তাব যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে অবিভাজ্য ভারতের সপক্ষে জনপ্রতিরোধ গঠনের প্রচেষ্টা করলেন। ধর্মের পরিমাপে জাতীয়তার মূল্যায়ন এবং জাতি পরিবর্তন অসম্ভব। বিভিন্ন বাসভূমি সৃষ্টি সামগ্রিকভাবে দেশ ও সমাজের অগ্রগতির পরিপন্থী এবং সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানের অন্তরায়। বাংলা এবং পাঞ্জাব বিভাজনের অর্থ মুসলিম লীগের দাবি মেনে নিয়ে বিভেদগামী সাম্প্রদায়িকতার জয়। চিরশত্রু বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অগ্রাহ্য করে, তাদের কূটনীতির সাহায্যে সুযোগসন্ধানী জননায়করা জাতীয় মর্যাদা বলি দিয়ে দেশ বিভাজনে সম্মত হলেন। ১৫ আগস্ট ১৯৪৭'র মধ্যরাতে ধূমকেতু-সম স্বাধীনতা এলো খণ্ডবিচ্ছিন্ন শোণিতাক্ত ভারতে। অসীম মর্মবেদনায় লীলা রায় ফরওয়ার্ড ব্লকে 'August 15' শিরোনামায় সম্পাদকীয় লিখলেন :

> মাতৃভূমি খণ্ডিত। দেশ শ্বাসরুদ্ধ, রক্তাক্ত। উচ্চস্তরের ক্ষমতা দখলের লড়াই লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনড় করেছে। 'ভারত ছাড়ো'র সফল প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল সমঝোতাকে স্থান দিয়েছে।
>
> না, ১৫ আগস্ট কখনোই উচ্ছ্বসিত উৎসবের দিন নয়। এটি ব্যর্থ আশা ও হীনমন্য আত্ম-সমর্পণের দিন। বর্ত্তমানের জন্য গভীর শোচনা এবং ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আমরা তাকে স্বীকার করি। (ফরওয়ার্ড ব্লক, ৯ আগস্ট ১৯৪৭)।

উপসংহার

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত লীলা রায়ের চিন্তাধারা ও কার্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। কবি T. S. Eliot-এর ভাষায় তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি এবং সৃষ্টিশীলতার মধ্যে কোনো অস্বচ্ছতা ছিল না। বিধিদত্ত ক্ষমতা ও নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাঁর নারীবাদ ও দেশাত্মবোধ। গভীর অনুসন্ধিৎসা এবং আত্মপ্রস্তুতি তাঁকে নারী আন্দোলনের

অভিনব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছিল। নারীমুক্তির সাফল্যের সন্ধিক্ষণে লীলাবতী দেশমুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে রাজনীতি মঞ্চে দৃশ্যমান হলেন। এ সিদ্ধান্তে প্রথম সংগ্রামের গতিময়তা সর্বভারতীয় স্তরে ব্যাহত হলেও তিনি নির্ণয় করেছিলেন ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদ মাতৃভূমির ব্যবহারিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। ভিন্নমুখী আন্দোলন মূল প্রবাহের সঙ্গে সম্মিলিত, একই লক্ষ্যাভিমুখে ধাবমান। রাজনৈতিক সক্রিয়তা তাঁর চরিত্রকে সঙ্কুচিত না করে কর্মধারায় নতুন মাত্রা দিয়েছিল। নারীমঙ্গলের প্রাদেশিক স্তর থেকে তিনি জাতীয়তাবাদের অভিকেন্দ্রে আরোহণ করেছিলেন। নারীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্পৃক্ত করে দুই ভাবাদর্শের সমন্বয় চেয়েছিলেন। দ্বৈত সাধনার সার্থকতার মূল যোগসূত্র ছিল বিপ্লব চেতনা-সর্বপ্রকার ব্যক্তিক, আর্থ-সামাজিক, রাষ্ট্রিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ভয়শূন্য চিরবিদ্রোহী সত্তা। জীবনবোধের অণু-পরমাণুতে অত্যাচার-প্রতিরোধের আমরণ সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি নিয়ে, আত্মোপলব্ধির মর্মস্থলে এসে লীলাবতী নাগ-লীলা রায়ের বিরামহীন পথ-পরিক্রমা সমাপ্ত হয়েছিল এক 'অনন্য, দুর্লভ রক্তিম সূর্যাস্তে।'

আমি চির-বিদ্রোহী বীর–
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির।

(নজরুল ইসলাম, 'বিদ্রোহী,' অগ্নিবীণা, *সঞ্চিতা*, ১৩৭৭)

প্রদীপ, মশাল এবং অন্ধকার

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

তিনটিই সত্য। অন্ধকার থাকে, যে জন্য প্রদীপের দরকার হয়, অনেক সময় প্রদীপেও কাজ হয় না, তখন মশাল জ্বালতে চায় লোকে, ভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটাবে, তাতে যদি অন্ধকারটা কাটে। একশ' বছর আগে, সেই ১৯০০ সালে লীলা নাগের জন্ম হয়েছিল। সত্তর বছর পরে তিনি দেহত্যাগ করেন; তাঁর জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত আমরা জানি না, যাঁরা জানি মনে করি তাঁরাও কমই জানি। কিন্তু যেটুকু জানি তাতেই বোঝা যায়, কষ্ট হয় না বুঝতে যে, তিনি একটি আলোর ফুলকি ছিলেন। সেই ফুলকি কখনো প্রদীপ হয়েছে, কখনো মশাল, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অন্ধকারকে মেনে নেয় নি চূড়ান্ত সত্য বলে। ভাবে নি আত্মসমর্পণ করবে।

অন্ধকার তো ছিল। আজও আছে, তখন তো থাকবেই। গাঢ় হয়েই ছিল। সেই অন্ধকারের প্রধান কারণ দুটি শক্তির যুগপৎ তৎপরতা। একটি শক্তি সাম্রাজ্যবাদ, অপর শক্তি সামন্তবাদ। লীলা নাগ এই উভয়কেই শত্রু বলে চিনেছিলেন। মস্ত বড় শত্রু। এই আমাদের ঢাকা শহর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার বেথুন কলেজে পড়তে গিয়েছিলেন, আসলে সিলেটের মেয়ে। তাঁর পিতা সেই ১৯১৬তে ঢাকার বখশি বাজারে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, সে কারণে ঢাকার মেয়েই হয়ে গিয়েছিলেন, কলকাতাতেও ঢাকাইয়া বলতো তাঁকে, কলকাতার মেয়েরা। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঢাকা মোটেই উন্নত শহর নয়, এর যত্রতত্র অন্ধকার। ঢাকা শহরে মেয়েদের জন্য চলাফেরার স্বাধীনতা এখনই-বা কতটুকু আছে পরপর দু'বার, একবার পূর্ববঙ্গের পরের বার স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হওয়ার পরেও, আর তখন যে কেমন ছিল সেটা বোঝা যাবে দুটি ঘটনা থেকে। একটি এই যে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এর ছাত্র

সংখ্যা ছিল ৮৭৭ জন। এদের মধ্যে ঐতিহ্যগতভাবে, অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে যারা ঢাকাবাসী তাদের কোনো সন্তান ছিল বলে মনে হয় না। সকলেই এসেছে বাইরে থেকে, নয়তো এমন পরিবার থেকে যারা শহরে নব্য আগন্তুক। ৮৭৭ জন ছাত্রের মধ্যে ৮৭৫ জনই পুরুষ, নারী ছিল মাত্র দু'জন। ওই দু'জনের একজন হচ্ছেন লীলা নাগ। তিনিই প্রথম। পরে তাঁকে অনুসরণ করে আরেকটি মেয়ে ভর্তি হয়। লীলা নাগের পক্ষে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটা কিন্তু সহজ ছিল না। কলকাতা থেকে বি এ পাস করে এসেছেন, ইংরেজি অনার্সে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন, স্বর্ণপদক পেয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার যে ভবন তার দেয়ালের অপর পাশেই তাঁদের বাসভবন। এসব সুবিধা ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভর্তি করতে চায় নি। আইনগত বাধা নেই, কিন্তু কয়েকশ' ছেলের মধ্যে একটি মেয়ে কিভাবে চলাফেরা করবে, কেমন করে ক্লাসে আসবে, বসবে এসব প্রশ্ন কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করেছে। লীলা নাগ অনমনীয় ছিলেন, যার দরুন কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছিলেন পরিবেশ সৃষ্টিতে। মেয়েটির পক্ষে একাকী ক্লাস করা কষ্টকর হবে ভেবে ইংরেজ উপাচার্যের স্ত্রী প্রথম কয়েকদিন লীলা নাগের সঙ্গে ক্লাসে আসতেন, বসে সাহচর্য দিতেন। ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেয়ের পড়তে আসার পথে ওই বিঘ্ন একটি ঘটনা যা বলে দেয় কেমন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল তখন ঢাকা শহর।

দ্বিতীয় ঘটনাটি একই সঙ্গে করুণ ও হাস্যকর। ১৯২৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছিল। অনুষ্ঠানে ছোট একটি মেয়ের নাচার কথা। ব্যাপারটা এই রকমের যে মেয়েটি মঞ্চে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করবে, আর পেছন থেকে তার দিদি (অদৃশ্য) একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে। হলের প্রভোস্ট আপত্তির কোনো কারণ দেখেন নি, কিন্তু অনুষ্ঠানলিপিতে 'ড্যান্স' কথাটা লেখা বিপজ্জনক হবে মনে করে লিখতে বলেছিলেন 'এ্যাকশন সঙ'। সেভাবেই লেখা হয়েছিল নাচ নয়, গানের সঙ্গে হাত-পা তোলা। কিন্তু তাতে বিপদ যে কেটে গেছে তা কিন্তু নয় (ঢাকার তখন এটি দুর্দান্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, ক'দিন পরে তার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষর 'খবর' বের হয়েছিল, 'জগন্নাথ হলে আবার মেয়ে নাচিল।') অনুমান করতে পারি অন্ধকারটা কেমন ছিল।

অন্ধকার এবং তার রক্ষক ভূতপ্রেতের তৎপরতাকে লীলা নাগ দেখেছেন, চিনেছেন, কিন্তু ভয় পান নি। অন্ধকারে বিরুদ্ধে তিনি প্রদীপ জ্বালতে চেয়েছিলেন। এই কাজ অন্যরাও করে। সবাই নয়, কেউ কেউ। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাদের অধিকাংশই রণে ভঙ্গ দেয়। লীলা নাগ ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া, তাঁর মধ্যে আপোস ছিল না। লীলা নাগের চার বছর পরে ১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসেন ফজিলাতুননেসা, তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী ছিলেন, অঙ্কে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন এবং তাঁকে আসতে হয়েছিল একাকী, সেই টাঙ্গাইল থেকে অনেক পথঘাট ডিঙিয়ে, বিস্তর ভূতপ্রেতকে পরাভূত করে। তিনিও একটি

প্রদীপ শিখা। নিজে নিজেই। কিন্তু লীলা নাগের কাজটা ছিল ভিন্ন। নিজে তিনি উজ্জ্বল ছিলেন, কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না, অন্যদেরও উজ্জ্বল করতে চেয়েছেন। ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে উঠুক, এটা চেয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে যে মেয়ে ইংরেজিতে এম এ পাস করেছেন, পিতা যাঁর আসাম সিভিল সার্ভিসের অফিসার এবং রায় বাহাদুর, নিজে যিনি অত্যন্ত প্রতিভাময়ী ও সুদর্শনা তাঁর পক্ষে শিক্ষকতার পেশা নিয়ে এবং অচিরেই বিবাহিত হয়ে ঘরসংসার করাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত ছিল। লীলা নাগ সেটা করলেন না। বিয়ে করেছেন অনেক পরে, তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ, বিয়ে করেছেন অনিল রায়কে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি তাঁর সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বন্ধুত্ব যতোটা না ব্যক্তিগত ছিল, তার চেয়ে বেশি ছিল রাজনৈতিক। জেল থেকে সদ্যমুক্ত দুই রাজবন্দির বিবাহ ওই রাজনৈতিক বন্ধুত্বেরই স্বাভাবিক পর্যায়। এম এ পাস করার পরে তিনি শুরু করেছেন প্রদীপ জ্বালাবার কাজ। এই ঢাকাতেই গড়ে তুলেছেন, 'দীপালি সংঘ'। সে এক আশ্চর্য তৎপরতা, অন্ধকার বিতাড়নের। দীপালি সংঘই টিকাটুলিতে নারী শিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, যার বর্তমান নাম শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়। কেবল ওই একটি নয়, আরও পাঁচটি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে, একে একে, যাদের একটি হচ্ছে সদরঘাটের বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয়। এর পাশাপাশি ছিল শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র ও পাঠাগার স্থাপন। ছাত্রীনিবাস, ব্যায়ামাগার এবং কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। দীপালি ভাণ্ডার ও নারী রক্ষা ফান্ডও ছিল। সবটারই লক্ষ্য ছিল মেয়েদেরকে সাহায্য করা, অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসতে এবং অন্ধকারের ভূতপ্রেতের বিরুদ্ধে লড়তে। মেয়েদের জন্য আমোদ-প্রমোদ, অভিনয়, গানবাজনার ব্যবস্থা করাও ছিল দীপালি সংঘের কর্মসূচির অংশ। লীলা নাগ মাসিক পত্রিকাও বের করেছেন। এই ঢাকা শহর থেকেই বের হতো 'জয়শ্রী', যার তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। এই পত্রিকা নানাবিধ সঙ্কটের মুখে পড়েছে, সাময়িকভাবে বন্ধও হয়ে গেছে, তবু দেখি প্রকাশিত আজ অব্দি।

কিন্তু প্রদীপ নয়তো শুধু, মশাল জ্বালাতেও চেয়েছিলেন ঢাকার লীলা নাগ। মশাল তখন জ্বলছিল, অনেক মশাল; আন্দোলন চলছিল স্বাধীনতার জন্য, লীলা নাগ তাতে যোগ দিয়েছিলেন। মূল শত্রু যে সাম্রাজ্যবাদ সেটা তিনি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে চিনে নিয়েছিলেন, কর্মজীবনের শুরুতেই। ভারতবর্ষকে স্বাধীন না করতে পারলে যে এ দেশের মানুষের মুক্তি নেই সেটা যাঁরা নিজেদের কাছে স্পষ্ট করে নিতে পেরেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদেরই দলে। মূল কাজটা আসলে ছিল রাজনৈতিক। সামাজিক কাজ, অর্থাৎ ওই যে দীপালি সংঘ গড়া এবং পত্রিকা প্রকাশ, তা ছিল রাজনৈতিক কাজেরই পরিপূরক। প্রথম নয়, দ্বিতীয়। দীপালি সংঘ চমৎকারভাবে কাজ করেছে। লীলা নাগ যদি শুধু ওই কাজই করতেন তাহলেও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে দাবি করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর কাজ ওইখানেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯২৬-এ রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় এলে ব্রাহ্মসমাজ প্রাঙ্গণে তাঁর

সম্মানে মহিলাদের যে সমাবেশ হয় তার আয়োজন লীলা নাগের নেতৃত্বে দীপালি সংঘই করেছিল। রবীন্দ্রনাথ অভিভূত হয়েছিলেন; বলেছিলেন, 'এশিয়ায় এতো বড় মহিলা সমাবেশ কখনো দেখি নাই।' পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আহ্বান করেছিলেন শান্তিনিকেতনে গিয়ে কাজে যোগ দেয়ার। কিন্তু লীলা নাগ যেতে পারেন নি, কেননা তাঁর 'পথের নিশানা' ততোদিনে ঠিক হয়ে গেছে। সেই পথ প্রত্যক্ষ রাজনীতির। ঢাকায় তখন শ্রীসংঘ নামে সশস্ত্র রাজনীতিতে বিশ্বাসী একটি গোপন সংগঠন অত্যন্ত তৎপর ছিল, যার সঙ্গে লীলা নাগের সহপাঠী ও বন্ধু অনিল রায়ের যোগ ছিল। লীলা নাগ এই গোপন দলে যোগ দেন এবং এটাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর প্রধান কাজ। প্রকাশ্যে তিনি দীপালি সংঘের লোক, কিন্তু গোপনে ও আসলে শ্রীসংঘের। সেখানেও বাধা ছিল। কেবল যে রাজরোষ তা নয়, নিষেধ ছিল সামাজিক-সাংস্কৃতিক সামন্তবাদেরও। একদা রাষ্ট্রীয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে মেয়েটিকে উচ্চ শিক্ষা লাভে প্রবেশাধিকার দিতে অসম্মত হয়েছিল, শিক্ষাজীবন শেষে সেই মেয়েটি দেখে সাম্রাজ্যবাদকে সশস্ত্র পথে বিতাড়িত করার রাষ্ট্রবিরোধী গোপন আন্দোলনে যে যোগ দেবেন তাতেও পুরুষদের আপত্তি। (না, মেয়েদেরকে না নিলেই ভালো।) লীলা নাগ প্রথম বাধাটি যেমন মানেন নি, দ্বিতীয় বাধাও তেমনি চূর্ণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছেলেদের সহপাঠী হয়েছিলেন; গোপন আন্দোলনে পুরুষদের সহযোদ্ধা হলেন। একই স্বতঃস্ফূর্ততায় এবং স্বাভাবিকতায়। কেবল যে সহযোদ্ধা হয়েছেন তা-ই নয়, নেতৃত্বও দিয়েছেন। পরবর্তীকালে গোপন দলের কারো পক্ষেই তাঁকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না, কেননা তাঁর ভেতরে আগুন ছিল।

বৃটিশ সরকারও তাঁকে অস্বীকার করার উপায় দেখে নি। ১৯৩১ সালে তারা লীলা নাগকে গ্রেফতার করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনিই প্রথম বিনাবিচারে আটক মহিলা রাজবন্দি। একটানা ছয় বছর ছিলেন রাজকারাগারে। তাঁকে এ-জেল থেকে ও-জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেখানেই গেছেন বই পড়তেন, সেতার বাজাতেন, বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতেন। একবার অনশনও করেছিলেন দীর্ঘ সময় ধরে। ১৯৪০-এ আবার তিনি গ্রেফতার হন, কলকাতায়। তখন তিনি তাঁর পার্টির ইংরেজি পত্রিকা 'ফরওয়ার্ড ব্লক' এবং তাঁর নিজের পুরনো সেই মাসিক 'জয়শ্রী' সম্পাদনা করেন। সেবারের কারাবাস স্বল্পকালের হলেও, তৃতীয়বারের বন্দিজীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। ১৯৪২-এ গ্রেফতার হয়ে ১৯৪৬ পর্যন্ত জেলেই ছিলেন। কিন্তু আগুনের ফুলকি একবারের জন্যও নিভে যায় নি। তৃতীয়বার যখন বন্দি হন তখন একবার চেষ্টা করেছিলেন জেল ভেঙে বের হয়ে যাওয়ার।

অহিংসার পথে যে হিংস্র সাম্রাজ্যবাদকে বিতাড়ান করা যাবে না লীলা নাগরা সেটা অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে বুঝে নিয়েছিলেন বলেই তাঁদের জন্য আপোসের কোনো পথ খোলা ছিল না। তাঁরা সশস্ত্র পথে চলে গেছেন, কোনো দ্বিধা করেন নি। নিজেদের হাতে ধরা মশালের আলোতে এ সত্যটাও দেখা হয়ে গিয়েছিল তাঁদের যে কেবল ইংরেজকে তাড়ালেই দেশের শ্রমজীবী মানুষের, কৃষক শ্রমিক ও

মধ্যবিত্তের মুক্তি আসবে না। আরও কিছু দরকার হবে। প্রয়োজন হবে সাম্যের। অর্থাৎ সমাজ বিপ্লবের। ১৯৩৯-এ সিলেটে মহিলাদের এক সমাবেশে সভানেত্রী হিসেবে লীলা নাগ যে বক্তৃতা দেন তা একদিকে যেমন ছিল অত্যন্ত উদ্দীপক, অন্যদিকে তেমনি স্পষ্টরূপে পথপ্রদর্শক। তিনি বলেছেন, লক্ষ্যটা হচ্ছে প্রচুরতম লোকের প্রভূততম কল্যাণসাধন করা। সে পথে বাধা দুটি : একটি পরাধীনতা, অপরটি দু'হাজার বছরের পুরনো সমাজব্যবস্থা, যার ভিত্তিতে রয়েছে ধন-বৈষম্য। অতএব, 'গণজাগরণের' মধ্য দিয়ে এই বৈষম্যপূর্ণ সমাজকে বদলে ফেলতে হবে।

কেবল ইংরেজকে তাড়ালে হবে না, তারপরেও এগুতে হবে; এগুনোর পথটা সমাজতন্ত্রের। কথাটা এর আট বছর আগে 'জয়শ্রী' পত্রিকাতেই বলে দেয়া হয়েছিল, "ভাবী ভারত সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসারে গঠিত হবে। অতএব দেশের শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সহযোগে গণআন্দোলন গড়ার দিকেই মন দেওয়া উচিত।" 'জয়শ্রী'র প্রথম সংখ্যার একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল 'সমাজতন্ত্রবাদের অ আ ক খ' নামে। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বসু যখন ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন তখন অনিল রায় ও লীলা নাগ উভয়েই তাতে যোগ দেন। ইতিমধ্যে তিনি লীলা নাগ থেকে লীলা রায় হয়েছেন সহযোদ্ধা অনিল রায়কে বিয়ে করে। তাঁদের জন্য এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। কেননা একদিকে কংগ্রেসের বন্দে মাতরম ও অন্যদিকে মুসলিম লীগের আল্লাহু আকবর—এই দুই রণধ্বনির সাম্প্রদায়িক বিভাজন এবং সেই সঙ্গে গান্ধীর অহিংসা নীতির ব্যর্থতা এমন একটি পীড়াদায়ক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল যে অনেকেই বিকল্প খুঁজে হয়রান হচ্ছিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রয়োজনের ঠিক সেই মুহূর্তটিতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দলের কর্মসূচিতে যেমন ছিল পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপোসহীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের অঙ্গীকার, তেমনি ছিল উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার এবং ব্যাপক শিল্পায়নসহ একটি 'আধুনিক সমাজবাদী' রাষ্ট্র গড়ার প্রতিশ্রুতি। দলটি অসাম্প্রদায়িক ছিল। সুভাষ বসু দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, আর ফেরেন নি; এতে লাভ হয়েছে কিছু, কিন্তু ক্ষতি হয়েছে বেশি। ক্ষতির মধ্যে ছিল সাতচল্লিশের বাংলা দ্বিখণ্ডীকরণ। লীলা নাগ যে এই ভয়ঙ্কর কাজের বিরোধিতা করবেন সে তো খুবই স্বাভাবিক। তিনি করেছেনও। তাঁর যুক্তিগুলো ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, বাঙালির কৃষ্টি ভাষার কারণে ঐক্যবদ্ধ, সেখানে হিন্দু-মুসলমান নেই। বলেছিলেন, বাংলাকে ভাগ করার অর্থ দাঁড়াবে বাংলাকে হত্যা করা। বঙ্গবিভাজন প্রতিরোধের জন্য সুভাষপন্থী কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লিতে গিয়ে নেহরুর সঙ্গে দেখা করেছেন, সেখানে ব্যর্থ হয়ে গেছেন গান্ধীর কাছে; গান্ধী জানিয়েছেন তাঁর মুখ বন্ধ, যা করার নেহরু ও সরদার প্যাটেলই করছেন। বিফল মনোরথ হয়ে তাঁরা ফিরে এসেছেন। সর্বনাশা কাণ্ডটিকে তাঁরা মেনে নেন নি, কিন্তু তাই বলে কলকাতাতেও থাকেন নি, স্বামী-স্ত্রী চলে এসেছিলেন তাঁদের সেই আপন ঢাকা শহরে। কিন্তু ঢাকা তখন

বদলে গেছে। ফলে এখানে তাঁদের থাকা হয় নি, হিন্দু কমিউনিস্ট হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে দেশত্যাগ করতে হয়েছে।

লীলা নাগ সমাজতন্ত্রী ছিলেন ঠিকই, কিন্তু মার্কস্‌বাদী ছিলেন না। তাঁর দলের আরও অনেকের মতো তিনিও ভরসা করতেন যে, সমাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতির মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্বাধীনতার জন্য রক্তপাত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু সমাজতন্ত্রের জন্য তা দরকার হবে না মনে করে তাঁরা এগুনোর আর পথ পান নি; শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছিলেন প্রজা সোশালিস্ট পার্টিতে, যেটা পথ ছিল না। ছিল অন্ধগলি। এই যে সমাজতন্ত্রী হলেন, কিন্তু মার্কস্‌বাদী হতে পারলেন না–এই ব্যাপারটা বিচার করে দেখার মতো। মনে হয় এর পেছনে তাঁর পারিবারিক পটভূমি কার্যকর ছিল। লীলা নাগদের পরিবার অত্যন্ত অগ্রসর; পিতা ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র, আইন পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন, মাতা ছিলেন সুশিক্ষিত ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান; লীলা নাগরা চার ভাইবোন, সবাই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, জেল খেটেছেন; কিন্তু তবু একটা সীমানা ছিল, সেটা প্রথমত পারিবারিক, কিন্তু আবার শ্রেণীগতও। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন নি। লীলা নাগ একজন অসামান্য মানুষ, কিন্তু এক জায়গায় এসে তাঁকেও থেমে যেতে হয়েছে। যে জন্য শেষ জীবনে তিনি আবার প্রদীপ জ্বালতে চেয়েছেন, সংস্কারমূলক কাজের ভেতর দিয়ে। মশাল জ্বালানো আর সম্ভব হয় নি।

কিন্তু যা করেছেন তা অসাধারণ। ঢাকা শহর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এটা গৌরবের ব্যাপার যে এখানে লীলা নাগ ছিলেন। ব্যাপারটাকে অবশ্য ওভাবে দেখা হয় না; কেননা সমাজে এই নিয়ম মোটামুটি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে যে, এখানে দুর্বৃত্তরা বীর হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রকৃত বীর যাঁরা তাঁরা অনেকেই অজ্ঞাত থাকবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসেও দেখি যাঁরা ভালো ফল করেছেন পরীক্ষায়, কিংবা বিভিন্ন কারণে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় তাঁরাই স্মরণের বিষয় হন, আর যাঁরা মানুষের মুক্তির সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা হারিয়ে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো বড়াই করে বলতে পারে যে, একেবারে শুরুতেই এখানে লীলা নাগ ছিলেন। তিনি ইংরেজি বিভাগে পড়েছেন; তাঁর তিন দশক পরে আমরা যখন ওই বিভাগে পড়তে এসেছি তখন লীলা নাগের নাম শুনি নি, শুনেছি ছাত্র হিসেবে বুদ্ধদেব বসু এবং শিক্ষক হিসেবে ড. মাহমুদ হাসানের নাম। বুদ্ধদেব বসুর নাম শোনার কারণ তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন এবং আমাদের ওই বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য প্রিয় লেখকও ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু নিজে অবশ্য তাঁর একটি লেখায় লীলা নাগকে 'ঢাকা শহরের সবচেয়ে খ্যাতনাম্নী মহিলা', 'অবিবাহিত, আদর্শবাদী, সংগ্রামশীল বহির্জগতের অধিবাসিনী, নানা বিষয়ে কর্মিষ্ঠ' বলে উল্লেখ করেছেন। ড. মাহমুদ হাসানকে আমরা শিক্ষক হিসেবে পাই নি, তবে পরে তাঁর সম্পর্কে জেনে, বিশেষ করে আটচল্লিশের সেই সমাবর্তনটিতে, যাতে

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ভয়ঙ্কর কথাটি বলেছিলেন, তাতে উপাচার্য হিসেবে ড. হাসান তাঁর বক্তৃতায় যেভাবে 'ইয়া কায়েদে আজম' বলে রণধ্বনি দিয়েছেন সেটা পড়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করা সম্ভব হয় নি; অথচ তাঁর সম্পর্কে আমরা আমাদের কালে যতো কথা শুনতাম তার একশ' ভাগের এক ভাগও লীলা নাগ সম্পর্কে শুনি নি।

সম্প্রতি লীলা নাগ জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে একটি সভা হয়েছে। এই সভার খবর কোনো কাগজে দেখি নি, কিন্তু সভাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। উদযাপন পরিষদের সম্পাদক সহকর্মী অধ্যাপক অজয় রায়ের অনুরোধে সভায় কিছু বলার প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে বেশ ভালোভাবে বুঝলাম যে, লীলা নাগের একটি প্রামান্য জীবনগ্রন্থ রচনা খুবই জরুরি। হাতের কাছে ছোট একটি বই পেয়েছি, দীপঙ্কর মোহান্ত-লিখিত '*লীলা নাগ ও বাংলার নারী জাগরণ*'। সে বইয়ের তথ্য আভাস দিচ্ছে যে তাঁর সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। কেননা তাঁর কাছে আমাদের ঋণ রয়েছে। আছে জানার ও শেখার বিষয়। প্রদীপ ও মশাল জ্বেলে তিনি আমাদের সমষ্টিগত অন্ধকারকে অবশ্যই বিচলিত করেছিলেন। কিন্তু অন্ধকার এখনো আছে। তাকে তাড়াতে হলে পূর্বসূরিদের প্রচেষ্টার উত্তরাধিকারকে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করার চেষ্টা কিছুতেই সফল হবে না যদি না আমরা অতীতকেও সঙ্গে নিতে পারি, ভূত কিংবা বোঝা হিসেবে নয়, ঐতিহ্য হিসেবে।

নারী আন্দোলন ও নারী সংগঠন—লীলা রায়ের ভূমিকা

আগমনী লাহিড়ী

উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে নবভাবনায় ও নবচেতনায় স্পন্দিত ভারতবর্ষে লীলা রায়ের জন্ম। তাঁর জন্ম ও কর্ম ইতিহাসের বুকে 'চিরপদচিহ্ন' রেখে গেছে। শৈশব থেকে দেশাত্মবোধ, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, নির্ভীকতা, সংস্কৃতিমনস্কতা তাঁর জীবনের পথকে কেটে নিয়ে চলেছে এবং সেই পথেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে তিনি দুর্বার গতিতে এগিয়ে গেছেন। সেই গতি তাঁর ব্যক্তিগত বা পরিবারগত কোনো বন্ধনই স্বীকার করে নেয় নি। রবীন্দ্র ভাবনায় আপ্লুত লীলা রায়ের জীবন-বীণায় যেমন বেজেছে মাধুর্যের অপরূপ মূর্ছনা তেমনই ধ্বনিত হয়েছে বিপ্লবের টঙ্কার।

লীলা রায়ের দেশপ্রেম যে কতো গভীর ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি বেথুন কলেজের ছাত্রী। ১৯২১ সালে লোকমান্য তিলকের মহাপ্রয়াণ ঘটে। সেই দিনটি ছুটি ঘোষণার জন্য বিদেশি অধ্যক্ষার কাছে দাবি জানান লীলা রায়। পরাধীন ভারতের কোনো নাগরিকের এতোবড় স্পর্ধা অধ্যক্ষা কেন সহ্য করবেন? তাই সেই দাবি তিনি অগ্রাহ্য করেন উপরন্তু তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম, ঘৃণ্য, বীভৎস হত্যাকাণ্ডের নায়ক ও'ডায়ার ও তিলকের তুলনা করেন। লীলা রায়ের স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ প্রাণ ও আত্মমর্যাদা বোধ সেদিন দলিত ফনিনীর মতো ফুঁসে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে ছাত্রীদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। শেষ পর্যন্ত অধ্যক্ষা রাইটকে ক্ষমা প্রার্থনা করে এই বিরোধের মীমাংসা করতে হয়। ঢাকায় যখন তিনি এম এ পড়তে আসেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের পরিবেশ ছিল না, যদিও আইনের দিক থেকে বাধা ছিল না। সেখানেও দেখা মেলে লীলা রায়ের বিদ্রোহী সত্তার।। কর্তৃপক্ষকে তাঁর অবিচল দৃঢ়তা ও সঙ্কল্পের কাছে নতি স্বীকার করে মেয়েদের শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে বাধ্য করেন। তিনি ছিলেন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী।

নারী আন্দোলনের প্রতিভূ লীলা রায় নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে সক্রিয়

ভূমিকা গ্রহণ করেন। শ্রীমতী কুমুদিনী বসুর নেতৃত্বে 'সারা বাংলা ভোটাধিকার কমিটি' গঠিত হয়। লীলা রায় সহ-সম্পাদিকার পদে অধিষ্ঠিত হন। লীলা রায় ও ইডেন স্কুলের অধ্যক্ষা শ্রীমতী স্বর্ণলতা দাসের সভানেতৃত্বে এই উদ্দেশ্যে ঢাকায় এক মহিলা সভার আয়োজন করা হয়। আর একটি সভায় কেন্দ্রীয় পরিষদে মেয়েদের ভোটাধিকার সম্পর্কে বিরূপ আলোচনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান লীলা রায় ও সেই মর্মে সভায় একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

১৯২২ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র উত্তর বঙ্গ বন্যাত্রাণে যে কমিটি গঠন করেন সেই কমিটির সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন লীলা রায়। তিনি 'ঢাকা মহিলা কমিটি' গঠন করে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে অর্থ, বস্ত্র সংগ্রহ করেন। একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় যে লীলা রায় চেয়েছিলেন দেশের প্রতিটি কাজে নারীরা যেন সচেতন হয়ে উঠে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ তিনি বুঝেছিলেন নারীকে বাদ দিয়ে বা তাদের অবদমিত রেখে দেশের কোনো কল্যাণ করা সম্ভব নয়।

এই মানসিক তাড়না থেকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন দীপালি সংঘ। ১৯২৩ সালে এই সংঘ প্রতিষ্ঠা করে নারীদের সামনে শিক্ষার আলো তুলে ধরেন লীলা রায়। তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষা ভিন্ন নারী কোনোদিন স্বাবলম্বী ও সচেতন হয়ে উঠতে পারে না। নারীদের নিজেদের সামর্থ্য, মর্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে অবশ্যই সচেতন ও সরব হয়ে উঠতে হবে। নিরক্ষরতার অন্ধকূপে ডুবে থাকলে কোনোদিনও তার প্রাপ্য অধিকার আদায় করে নিতে পারবে না। সংগঠন গড়ে নারীকে সেই পথে চলতে সাহায্য করা, উদ্দীপিত করাই ছিল লীলা রায়ের উদ্দেশ্য। একটি দেশের সামগ্রিক মুক্তি ও কল্যাণ নির্ভর করে সেই দেশের নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদার ওপর।

লীলা রায় তাই দীপালি পাঠক্রমে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে হস্তশিল্প, শারীর শিক্ষারও প্রবর্তন করেন। অর্গলবদ্ধ, অবহেলিত নারীরা শুধু মানসিক দিক থেকেই নয় শারীরিক ক্ষমতার দিক থেকেও অনেকাংশে পঙ্গু ছিল। নির্ভীক, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লীলা রায় ঢাকায় মেয়েদের জন্য বেশ কয়েকটি স্কুল যেমন: নিউ-হাই স্কুল বা দীপালি স্কুল, নারী শিক্ষা মন্দির, শিক্ষা ভবন, শিক্ষা নিকেতন ও চারটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেন। সেই যুগে নারীমুক্তির এ ধরনের প্রচেষ্টা আজও বিস্ময়ের ও শ্রদ্ধার সঞ্চার করে।

১৯২৪ সালে লীলা রায় ঢাকার যুব সম্মেলনে 'দায়ভাগ' প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেন। 'নারীকে রাজনীতিক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া উচিত'—এই মত ব্যক্ত করার জন্য দীপালির উদ্যোগে সভা করে প্রস্তাব গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। সেই প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পাঠিয়ে দেয়ার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেন।

নারীদের সামগ্রিক মুক্তি বিধানের উদ্দেশ্যে লীলা রায় তাদের মানসিক দিকটিকেও উপেক্ষা করেন নি। সেই সময় ঘরে ঘরে নারীদের মানসিক অপমৃত্যু ঘটতো। তাই তাদের জন্য অমোদ-প্রমোদ, সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভ্রমণ, অভিনয় এসবেরও ব্যবস্থা করেন তিনি।

দীপালির পক্ষ থেকে লীলা রায় এক বিশাল মহিলা সভার আয়োজন করেন। উদ্দেশ্য ঢাকায় রবীন্দ্রনাথের আগমন উপলক্ষে কবিগুরুকে অভিনন্দন জানানো। অভূতপূর্ব মহিলা সমাবেশ দেখে কবি বলে ওঠেন—'সমস্ত এশিয়াতে মেয়েদের এতো বড় সভা দেখি নি কোথাও।' লীলা রায়ের অত্যাশ্চর্য সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখে কবি তাঁকে শান্তিনিকেতনে কাজের দায়িত্ব নেয়ার জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু তখন লীলা রায়ের রক্তে বিপ্লবের আগুন, চোখের সামনে পরাধীন ভারতের অগণিত অসহায়, নিরক্ষর, অত্যাচারিত নারীর মিছিল। তাই মনে দ্বিধা জাগলেও সেই দ্বিধাকে দূরে ঠেলে দিয়ে নীরবতার মধ্য দিয়ে কবিকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এ পথ তাঁর জন্য নয়। লীলা রায় পরাধীন ভারতবর্ষে বিদেশি শাসকের নির্লজ্জ অপশাসনের মধ্যে থেকে একথা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারী মুক্তির জন্য রাজনৈতিক মুক্তি বিশেষ প্রয়োজন, পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ রেখে নারীর সমাগ্রিক মুক্তির প্রয়াস কোনোভাবেই সফল হতে পারে না। তাই চিরবিপ্লবী লীলা রায় সামাজিক অঙ্গন থেকে বিপ্লবের প্রাঙ্গণে নেমে এলেন। যোগ দিলেন বিপ্লবী সংগঠন শ্রীসংঘে। এই শ্রীসংঘে তিনিই প্রথম মহিলা, যিনি বিপ্লবী সংগঠনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শুরু হয়ে গেল অক্লান্ত সংগ্রাম। কারাগারে, কারাগারের বাইরে এই বহ্নিকন্যা সহিংস, অহিংস নানা আন্দোলনে যোগ দিয়ে ইংরাজ-সেরকারের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে উঠলেন। তিনি যেমন বিপ্লবী সংগঠন পরিচালনা করতেন তেমনই গান্ধীজির আহ্বানে 'মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি'র নেতৃত্বে থেকে লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

বিপ্লবী আন্দোলনে লীলা রায়ের ভূমিকা ইতিহারেস বুকে অগ্নিসাক্ষর রেখে গেছে। বহু মহিলা তাঁর এই বিপ্লব কর্মকাণ্ডে সামিল হয়েছিলেন। তাঁর সংগঠনিক ক্ষমতা নারীদের রাজনীতি ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণে ব্রতী করে। প্রীতি লতা ওয়াদ্দেদার, বীণা দাস, সুহাসিনী গাঙ্গুলী, শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরী, রেণু সেন, কমলা দাশগুপ্তা, কমলা মুখার্জি. হেলেনা দত্ত, সুশীলা সেন, প্রমীলা দাস গুপ্ত এরকম আরও অনেকে লীলা রায়ের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। এঁদের অস্ত্র, অর্থ বা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এই নেত্রী। বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনার জন্য কলকাতার গোয়াবাগানে 'ছাত্রীভবন' নামে একটি মহিলা আবাসনের ব্যবস্থা করেন। এই আবাসনের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী প্রকাশ্যে নানা কাজে যুক্ত মহিলাদের বাসস্থান ও অত্যন্ত গোপনে অস্ত্রপচারসহ নানা বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

কারাগারে আবদ্ধ থেকে লীলা রায় যেমন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অনশন ইত্যাদি করেছেন, তেমনই সহবন্দি বোনদের নিয়ে নানারকম কার্যক্রমও পরিচালনা করেছেন। কারাগারের ভেতরে খেলাধুলা, ঋতু উৎসব, অভিনয়, গান-বাজনা এসবের ব্যবস্থা করেছেন। সর্বোপরি এই অক্লান্ত যোদ্ধা সহবন্দিদের লেখাপড়ার সব দায়িত্ব নিজে বহন করেছেন। যার যে রকম শিক্ষা অর্থাৎ অক্ষর পরিচয় থেকে প্রবেশিকা, আই এ, বি এ সব রকম পরীক্ষার দায়িত্ব তিনি বহন

করতেন। শিক্ষাব্রতী লীলা রায়ের জীবনের সাধনা 'নারীদের শিক্ষা' তা কারাগারের অভ্যন্তরেও থেমে থাকে নি। শিক্ষাই নারীকে চলার পথ নির্বাচনের সঠিক নির্দেশ দিতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। আরও আশ্চর্য কথা যে, কারাগারে রান্নাঘরের দায়িত্বও তিনি অনেকাংশে পালন করতেন। নানা রকম সুখাদ্য তৈরি করে বোনদের খাওয়ান ও তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দেয়া ছিল তাঁর দৈনিক কার্যক্রমের অঙ্গ।

১৯২৩ সালে দীপালি সংঘ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী সংগঠনের যে বীজ লীলা রায় বহন করেছিলেন তা পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে 'জাতীয় মহিলা সংহতি' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই সংগঠনের তিনটি উদ্দেশ্য মেয়েদের স্বাধীনতা ও মর্যাদা, শিক্ষা ও আত্মনির্ভরতা। তিনিই প্রথম স্বল্পতার বিশিষ্ট মহিলাদের জন্য দক্ষিণ কলকাতায় 'সংহতিশ্রী' আবাসিকা গড়ে তোলেন। ভয়াবহ দাঙ্গার পর উদ্বাস্তু স্রোতে হারিয়ে যাওয়া, অসহায় মেয়েদের জন্য বসিরহাটে 'বিজয়া আবাসিক'ও লীলা রায়ের অবদান।

মেয়েদের আত্মনির্ভর করার জন্য বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, হস্তশিল্পের ব্যবস্থা, প্রদর্শনী, বিনামূল্যে চিকিৎসা কেন্দ্র নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে মানবদরদী, সমাজসেবী লীলা রায় নারী মুক্তির বৈজয়ন্তী তুলে ধরেন। তিনি যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়াতে বারেবারে আহ্বান জানিয়েছেন।

লীলা রায় মসীযুদ্ধেও ছিলেন অদ্বিতীয়। জাতীয় সমস্যা, নারী মুক্তি, ইংরেজের অপশাসন, বিপ্লবের জোয়ার, সুস্থ সংস্কৃতি এসব উপজীব্য করে লেখনী তুলে নিয়েছিলেন লীলা রায়। তারই অমূল্য ফসল রবীন্দ্র আশীর্বাদধন্য '*জয়শ্রী*' প্রথম মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা *জয়শ্রী* (১৯৩১ সাল), সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর আদর্শ, চিন্তাধারা, মনীষীদের অমূল্য আলোচনা, রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য নিয়ে পথ কেটে চলেছে এই পত্রিকা। বহুবার পাশব রাজশক্তি *জয়শ্রী*র কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু লীলা রায়ের অপূর্ব সাংগঠনিক ক্ষমতা, প্রখর ব্যক্তিত্ব এই পত্রিকাকে সাময়িকভাবে বন্ধ করলেও তার মৃত্যু ঘটাতে পারে নি। লীলা রায় যতোদিন বেঁচেছিলেন ততোদিন সমস্ত রকম অন্যায়-অবিচার দমন ও অপসংস্কৃতি বিরুদ্ধে লেখনীর মাধ্যমে অগ্নিবর্ধন করে গিয়েছেন। তাই আজও *জয়শ্রী* আশি বছর অতিক্রম করেও জাতীয় ভাবধারা প্রচার করে চলেছে।

বর্তমান অবক্ষয়ের যুগে শতবর্ষের আলোতে এই মহীয়সী নারীর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার প্রয়োজন আছে। মানবতাবাদ বিচ্যুত, মূল্যহীনতার ব্যাধিতে আক্রান্ত, নীতিহীন রাজনীতির শিকার বর্তমান প্রজন্মের সামনে এঁদের মতো মানুষের আদর্শ তুলে ধরার সময় এসে গেছে। দেশনেত্রী লীলা রায়ের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের পেছনে দেশ, সমাজ ও মানুষকে ভালোবাসার প্রেক্ষাপট কাজ করেছে। সমগ্র জীবন নানা নির্যাতন সহ্য করে সর্বস্ব দিয়ে নতুন যুগের স্বপ্ন দেখে গেছেন। অন্যান্য বিরল ব্যক্তিত্বের মতো লীলা রায়ের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে সমগ্র নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এগিয়ে আসুন এই হোক আজকের প্রার্থনা।

লীলা নাগ : দ্রোহী মানসের সন্ধানে

দীপঙ্কর মোহান্ত

বাঙালির চিরায়ত লোকাচারে গড়ে ওঠা সমাজ চেতনায় উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের বহুমাত্রিক পরশ পরিলক্ষিত হলেও নারী সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্য লক্ষ্য করা যায় নি। পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শন ও ব্রাহ্ম সমাজের উদারবাদী চেতনার মিলনে যে গতিশীল ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল তা কেউ কেউ তাত্ত্বিক পর্যায়ে এনেছিলেন বটে, কিন্তু সামাজিক স্বীকৃতি আদায় কিংবা প্রয়োগের প্রচেষ্টা হয়েছে ক্ষীণ ধারায়। সে সময়ের সংঘাতে নারী সমাজকে বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মূলধারায় সংযুক্তিকরণের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষিত থেকেছে সচেতনভাবে। পরবর্তীকালে নারীদের স্বকীয়তা যতো ছোট বলয় থেকে আসুক না কেন, তার ভেতরের শক্তি সুসংহতভাবে না আসা পর্যন্ত সমাজের এ অবহেলিত অংশ ছিল অনুপস্থিত। পুরুষ সমাজ ও তার ব্যক্তিমননে এ বোধ অনুপস্থিত ছিল যে, একটা সম্ভাবনাময় শক্তিকে আড়ালে রেখে বৃটিশ অধীনতার পাশ ছিন্ন করা অসম্ভব। বিশের দশকে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে হোক আর বিজ্ঞানের কল্যাণমুখী অগ্রগতির কারণে হোক তখন বাংলার সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রে যে আলোক রেখা নবধারায় উদ্ভাসিত হয়েছিল, সেখানে নারী সমাজের রাজনৈতিক সত্তা বা অধিকারের দিকটির স্পষ্টতা লক্ষণীয়। আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব লীলা নাগ এ সম্ভাবনাকে পুরুষ নেতৃত্বের সমান্তরালে এনে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে টেনেছিলেন অমিত তেজে। তাঁর বহুমুখী কর্মকাণ্ডে নারীর ওপর পর্যায়ক্রমিক চাপানো বাধাকে অতিক্রম করে অর্থাৎ পরিবার-সমাজের লৌকিক ভাবনা, ধর্মীয় অযৌক্তিক শৃঙ্খলা ও সামন্ততান্ত্রিক ধারণার মধ্য থেকে গুণগত পর্যায়ে নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ, স্বনির্ভরতা অর্জন ও স্বদেশ মুক্তির স্তরে পৌঁছান সগৌরবে। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী এবং অন্যান্য নারী নেতৃত্ব থেকে পৃথক চিন্তাশীলা, সর্বক্ষেত্রে যুক্তিবাদী, দ্রোহী এবং বিজয়ী।

লীলা নাগ তাঁর সমকালে নিজের ভেতরের আলোকিত চৈতন্য দিয়ে বাইরের জমাট বাঁধা অন্ধকার অবলোকন করেছেন গভীর প্রত্যয়ে। সেখানে আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমিতে অনুভব করেছেন একটি শক্তিধর সমাজ (পুরুষ) অপ্রতিরোধ্য অবস্থান থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে নিঃসঙ্কোচে। কিন্তু তার একান্ত সন্নিকটে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান রয়েছে নিস্প্রভ, অসংগঠিত ও অবহেলিত নারী সমাজ। অশিক্ষার কারণে অবচেতন অবস্থায় পরনির্ভরশীল হয়ে পড়া এ মানুষগুলো সভ্য-গৃহাভ্যন্তরে একসাথে বাস করেও অসহায়। যুগ যুগ ধরে অদৃষ্টের কাছে নতজানু মানসিকতার মধ্যেও কিন্তু লুকিয়ে থাকে বিপুল শক্তি; অথচ কেউ তাদের কাজে লাগাচ্ছে না। ফলে সমাজ উন্নয়ন যেমন ব্যাহত হচ্ছিল, তেমনি সংগঠিত পুরুষ শক্তিও বৃটিশদের তাড়াতে গিয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে বারংবার। লীলা নাগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এ অসম দিকটি ধরা পড়েছে গভীর বিশ্লেষণে। তার বিপুল আয়োজন চলে বাস্তবতার আলোকে, পরিকল্পিতভাবে এবং স্বল্প সময়ে অধিক সাফল্যের দিকে। সম্পূর্ণ অসংগঠিত ও নিদ্রিত নারী সত্তাকে জাতির মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করা ছিল তার জন্য অসাধ্য সাধন।

দুর্গম গিরিপথের যাত্রী লীলা নাগ সামগ্রিকভাবে নারী চেতনার প্রদীপ্ত শিখা প্রজ্বলন করেন বহুকৌশলের নির্যাসের একান্ত সন্নিবেশের মাধ্যমে। রক্ষণশীল সমাজের সমক্ষে নিজের আদর্শবাদী ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা প্রকাশ করেছিলেন কথা-কাজে-কর্মে। সেখানে সমাজের সাথে সংঘাত হয় নি, বরং জাগ্রত বা সৃষ্ট হয়েছে শুভবুদ্ধির মানসিকতা। তাঁর কাজ ছিল ব্যক্তির ভেতরের মুক্তি, বোধগম্যতা ও সৃজনের পন্থা আবিষ্কার। বাস্তবতার আলোকে ও শক্তির সীমার মধ্য হতে কর্ম নির্ধারণ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি খেয়াল রেখে কর্ম পরিচালনা। এগুলোর ধাপ ছিল বিন্যস্ত।

প্রথমত : যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন নারীদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কাটানোর জন্য শিল্প প্রদর্শনী করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও হস্তশিল্প মেলার আয়োজনের মধ্য দিয়ে অপরিচিত মুখগুলোকে প্রীতির ডোরে বাঁধা ও মিলন ঘটানো।

দ্বিতীয়ত : মেয়েদেরকে স্বদেশী ভাবনায় স্কুলমুখীকরণ, স্বদেশী দ্রব্য তৈরি ও ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগ এবং স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দক্ষ দেশকর্মী গড়ে তোলা।

তৃতীয়ত : সবল মানসিক শক্তিধারায় মেয়েদেরকে নিয়মিত অস্ত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যোদ্ধা হিসেবে তৈরি করা। পরে অন্যান্য বিপ্লবী সংগঠনের সাথে সমন্বয় সাধনপূর্বক সম্মিলিতভাবে বৃটিশদের ওপর দুর্বার গতিতে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ। মহিলাদের মানসিক সংগঠন মজবুত করার লক্ষ্যে সাধারণ স্কুল, শিল্পস্কুল, খাদি প্রতিষ্ঠান, ক্লাব প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্থাপন। গ্রাম-শহরের ব্যবধান ঘোচানোর পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানত কুটির শিল্প বা হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটানো।

চতুর্থত : নিজস্ব ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সম্পদের আলোকে দেশের পুনর্গঠন কাজে প্রস্তুত গ্রহণ।

পঞ্চমত : উচ্চ শিক্ষাস্তরে ব্যাপকভাবে নারীর প্রবেশ ঘটানো। এই লক্ষ্যে তিনি কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে একাধিক মহিলা হোস্টেল স্থাপন করেন।

ষষ্ঠত : কর্মজীবী মহিলাদের নিরাপত্তার চিন্তা মাথায় রেখে ঢাকা ও কলিকাতায় কর্মজীবী হোস্টেল স্থাপন করে রাজনৈতিক চেতনার সম্প্রসারণ।

সপ্তমত : স্বাধীন মত প্রকাশ ও চেতনাকে সর্বস্তরের শিক্ষিত মহলে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে পত্রিকা প্রকাশ। এ সমস্ত গঠনমূলক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে একটি অবহেলিত সমাজের পুনর্গঠন কাজ ত্বরান্বিত হয়েছিল।

লীলা নাগ এসব কঠিন বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন খুব দুরূহ জেনেও সুখী জীবনের আয়েসী পথ ছেড়ে ঝঞ্ঝাপূর্ণ অমসৃণ পথের দিকে ছুটেছেন উল্কাগতিতে। বেগম রোকেয়া, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলাদেবী, কাদম্বিনী প্রমুখের কর্মচেতনার সাথে তাঁর অগ্রবর্তী ধ্যান-ধারণা যুক্ত হয়েছিল নতুন মাত্রায়। সেকালে রাজনৈতিক অঙ্গনেও লীলা নাগের অবস্থান ছিল বিশাল ও ব্যাপক। তাঁর ত্যাগের পরিধিও গভীর। এ প্রেক্ষিতে তাঁকে আবিষ্কার করা আবশ্যক।

লীলা নাগের জন্ম পরিবেশ ছিল তাঁর আত্মবিকাশের অনুকূলে। গৃহপরিবেশ ছিল উন্মুক্ত ও উদার, কিন্তু বহির্সমাজ নিদারুণভাবে প্রতিকূলতায় আচ্ছন্ন। এ জন্য বিভিন্ন কারণে সেকালের নাগ পরিবারটিকে ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক, ইনস্টিটিউট, বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর মাতৃকুল-পিতৃকুল উভয়ই স্বদেশী আদর্শের অনুসারী, স্বধর্মে আচারনিষ্ঠ হলেও ধর্মীয় জীবনে গোঁড়ামি বর্জিত মানবিক চেতনার ধারক। তাঁর মাতামহ পূর্ণমাত্রায় ব্রাহ্ম, পিতৃদেব ব্রাহ্ম দর্শন ও রামকৃষ্ণের সমন্বয়ী চিন্তা ধারক; অসবর্ণে বিবাহকারী। আর মা ছিলেন সবকিছুর সমন্বয়ে মানবতা ও স্বদেশী কর্মে লালিত এক অনন্য নারী। যাঁর মন ছিল আকাশের মতো উদার, লৌকিক ব্রত পালনে ভক্তিহীন, ছুঁৎমার্গের ঊর্ধ্বের বাসিন্দা, সমাজের নানা কথা সহ্য করে তিনি বলতে পেরেছিলেন, "মেয়ে পড়াশোনা করেছে সে তার পছন্দমতো বিয়ে করবে, দেশের কাজ করবে।" তখন মেয়েরা সাধারণত দশ-এগারোতে আইবুড়ি হয়ে যেতো। আবার দুইকুলই ছিল উচ্চশিক্ষিত, বৃটিশ রাজশক্তির চাকুরে, কিন্তু স্বাধীনতার স্পৃহায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ। এই পরিমণ্ডলেই লীলা নাগের উত্তরণ। যেখানে বসে কারো পক্ষে বিদ্রোহী হওয়ার কথা নয়,—কিন্তু কেন লীলা নাগের এ পরিবর্তন?

লীলা নাগ তাঁর শৈশবে অঢেল বিত্ত-বৈভব ও প্রাচুর্যতা দেখলেও তা যেন ছিল সামাজিক সম্পদ, অর্থাৎ সমাজের কল্যাণে রাখা। কেবল ব্যক্তির লালাতি সুখের ইন্ধনের উপচার নয়। তাঁর পিতা গিরিশচন্দ্র নাগ কঠোর দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে এক সময় শ্রম ও মেধার সংযোগ ঘটিয়েছিলেন। তিনি উপার্জনের একাংশ স্বদেশী কাজে ব্যয় করতেন, তার অন্য অংশ পল্লী পুনর্গঠন কর্মে, বাকি অংশ পারিবারিক ব্যয় নির্বাহে।

সেকালে উচ্চ শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিরা যেভাবে মাটির শিকড় কেটে শহুরেপনায় নিমগ্ন থাকতেন, সেখানে তিনি নিজ হাতে কোদাল ধরে অজপাড়া গাঁ পাঁচগাঁয়ের ভগ্নদশা রাস্তা তৈরি করতে দ্বিধা করেন নি। ঢাকায় নিজের বাসা ছিল পল্লীর দরিদ্র ছাত্রদের আবাসস্থল। পিতার কাজের সহযোদ্ধা হিসেবে লীলা নাগের গ্রামের দৈন্য, শোচনীয় অবকাঠামো এবং সীমাহীন বৈষম্যের পাহাড় স্বচক্ষে দেখার সুযোগ ঘটে। তাই তাঁর রাজনৈতিক জীবনে গ্রামের পুষ্টি সাধনের দিকে বিভিন্ন কর্মসূচি লক্ষণীয়।

মূলত, লীলা নাগের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব কাজ করেছে সর্বক্ষণ। কিশোরী জীবনে নিজের একান্ত গৃহ পরিবেশে দেখেছেন ভিন্নতর স্বাধীনতা, গতিশীল আলোকিত পথ এবং মুক্তচিন্তার উদারক্ষেত্র। কিন্তু সহজাতবশত সামাজিক পরিমণ্ডলে মিশতে গিয়ে দেখেছেন পরতে-পরতে জটিল আবর্তের কুঞ্চিত কারাগার। এ পঙ্কিল আবর্তে ঘূর্ণায়মান তাঁরই স্ব-সমাজ, যার বিকাশের পথ রুদ্ধ। হয়তো ভেবেছিলেন নিজের উন্নতির ফলে যেটুকু জায়গা অতিক্রম করতে পারবেন, সামাজিক উন্নয়ন ঘটলে তার পথ চলা হবে বহুগুণ বেশি এবং বিচিত্রমুখী। এ জিজ্ঞাসার উত্তরে মৃতপ্রায় নারী সমাজে প্রাণ সঞ্চারণ খুবই জরুরি ও প্রয়োজন মনে করেছিলেন। হয়তো বুঝেছিলেন পরিবারের বাইরে তিনিও পরাধীন এবং মূল্যহীন এক তৃণখণ্ড। অসচেতন দেশবাসীর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে পিতার কাছে তাদের অজ্ঞতাকে দূর করার বাসনা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন সেই কিশোরী বয়সে, তখন তিনি স্কুল পড়ুয়া মেয়ে। সমাজের বদ্ধ জানালা বিচূর্ণ করার তাগিদ আসে অন্তরের অগ্নিদাহ জ্বালা থেকেই সেই স্কুল জীবনে।

লীলা নাগ হঠাৎ করে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন করার কৌশলের আগে তিনি মনোনিবেশ করেছিলেন—শত শত বছর ধরে পলিমাটির মতো জমে থাকা সামাজিক কুসংস্কারের পরিধি অতিক্রম করার পরিবেশ সৃষ্টিতে। তখন তাঁর ভূমিকা ছিল ক্ষুদ্র সমাজ সংস্কারকের। গৃহ-সমাজ পরিবেশের ভেতরগত দুর্বলতা চিহ্নিত করেছেন স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য হিসেবে। অন্যদিকে, বৃটিশ সরকারের অধীনতাকে দেখেছেন সামগ্রিকভাবে। দুই দিকের পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাঁকে লড়তে হয়েছে একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে 'নারী' পরিচয়ে; কিন্তু মানুষের পরিচয় ঘটে আরো বহু পরে। সোজা কথায় আর এক সংগ্রাম হলো সামাজিক চেতনাগত মান উন্নয়ন এবং পরিবর্তনে, অন্যটি বিজাতীয় শোষক বিতাড়নের জন্য সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগে।

লীলা নাগের দ্রোহী মানসিকতার প্রকাশ ঘটে তাঁর কলেজ জীবনের নানা ঘটনায়। সেখানে তাঁর দর্শন ছিল–জীবন মানে মাথা উঁচু করা। চেয়েছেন ঘরের বাইরে এবং ভেতরে একই অবস্থায় মর্যাদাসহ কর্মসাধন ও অবমাননাকর পরিস্থিতির অবসান। বেথুন কলেজে থাকাকালে তিনি লক্ষ্য করেছেন ইংরেজ অধিকর্তাদের প্রতি নতজানু হয়ে অভিবাদন জানানোর কুপ্রথা। আগে কেউ এর

প্রতিবাদ করে নি, সেইবার বড়লাট পত্নীর আগমন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য প্রস্তুতিকে ম্লান করেছে তাঁর নতজানু অভিবাদন রীতির প্রতিবাদে। লীলা নাগ ক্ষেপেছিলেন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। একদিকে তাঁরা, অন্যদিকে অগ্নিতেজা লীলা। মধ্যে দোদুল্যমান ছাত্রীরা, যাঁদের মৌন সমর্থন ছিল লীলা নাগের প্রতি। লীলা নাগ জয়ী হলে শেষ পর্যন্ত নতশিরে দাঁড়িয়ে অধীনতা প্রকাশের ভাষার জায়গায় স্থান পায় সাধারণ রীতি। কলেজের নির্ধারিত পাঠ্য বইয়ের বাইরে পিতার উৎসাহে তিনি বিপ্লবীদের জীবনালেখ্য পাঠ করতেন লুকিয়ে; ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণও করতেন। এ অবস্থায় পরবর্তী পর্বে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণ ঘটে তাঁর মধ্যে। তখন শহরের রাস্তা স্বাধীনতাকামীদের দখলে, আবার বিপ্লবীদের মরণজয়ী প্রচেষ্টার কাল, যা লীলা নাগকে বারবার উদ্দীপ্ত করেছে। চরমপন্থী নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু সংবাদে তাঁরই যেন প্রথম পাঁজর ভাঙে। এ অবস্থায় কলেজের মধ্যে আলোচনা সভায় জাতীয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্যোগ গ্রহণের প্রাক্কালে অধ্যক্ষা বাদ সাধেন। কিন্তু লীলা নাগের হৃদয়ে যে শোকের ছোঁয়া লেগেছে তা যে কতো গভীর ছিল তা কে উপলব্ধি করছে? তিনি অধ্যক্ষাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন এ বীরকে অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাবে ছাত্রীরা, নয়তো ধর্মঘট ও আন্দোলন। নাছোড়বান্দা লীলা নাগ ছাত্রীদের নিয়ে ধর্মঘট করে অনুষ্ঠানের অনুমতি আদায় করেছিলেন সগৌরবে। আবার দেখি সেখানে 'রি-ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠাও তাঁরই কীর্তি। কলেজের পরীক্ষাশেষে লীলা নাগ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেন সামাজিক, রাজনৈতিক পথের সন্ধানে। সামাজিক সমস্যার কারণ খুঁজেছেন গভীরতর মনোসংযোগ, গ্রাম সমাজের নিদারুণ অবস্থা তাঁকে করেছে মর্মাহত। আবার প্রত্যক্ষ করেছেন উচ্চ শিক্ষিত মেয়েদের সঙ্কুচিত অবস্থান। গ্রাম ও শহরের অবস্থা ভিন্নমাত্রায় হলেও সমস্যার মূল রয়েছে একই জায়গায়। তিনি সমাধানের প্রস্তুতিকাল পর্বে প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে প্রয়াস চালানো শ্রেয় মনে করেছিলেন। পরিকল্পনা করেন নদীর মতো একই মোহনার দিকে সকলের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে। মহিলাদের স্বনির্ভর করা ও তাদেরকে দেশের অবস্থা বুঝানোর কৌশল হিসেবে গান্ধীর চরকা ও শিল্প উৎপাদন নীতিকে সঠিক হিসেবে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেন নি। (যদিও গান্ধীজীর অন্যান্য পথ ও প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করেছেন।) আবার তাদের আত্মরক্ষার-নীতিতে ছিল ব্যায়াম, লাঠিখেলা ও ছোরা চালানো। এ যাত্রায় লীলা নাগের মানসপর্ব ছিল অন্য ধরনের। একদিকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে রাস্তা তখন উত্তপ্ত, অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সূচনালগ্ন। দুই অবস্থানের মধ্যে পড়ে ভেবেছেন বিস্তর। অসহযোগ আন্দোলনে স্কুল-কলেজ ত্যাগকে তিনি মূল্যায়ন করেছেন আবেগী ও ভবিষ্যতের অনেকটা নিষ্ফলা বিষয় হিসেবে। এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীর প্রবেশাধিকারকে দেখেছেন অগ্রগতির ও প্রস্তুতির ব্যাপক অংশ হিসেবে। কেননা বিশের দশকে ঢাকা শহরের কলেজ পড়ুয়া মেয়েদের ছিল অনেকটা বিড়ম্বিত অবস্থা। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে মধ্যপথে বসে থাকা

মেয়েদের পক্ষে কলকাতা যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। না হয় পড়াশোনায় ইস্তফা। সামাজিক দিক বিবেচনা করে অভিভাবকরা মেয়েকে কলকাতায় পাঠাতে রাজি হতেন না। তবে দূরদেশে ভর্তির ব্যাপারে পরিবারে লীলা নাগের এ ধরনের সমস্যা ছিল না। তিনি পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মেয়েদের অবস্থা নিয়ে বিস্তর চিন্তা করেছেন। সেকালে মেয়েদের শিক্ষার জন্য ঢাকার নাগরিক সমাজ যে খুব উদ্বিগ্ন ছিল, তাও বলা কঠিন। অনেক ভেবেচিন্তে লীলা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; সে সময় সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার ছিল নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত। আইনগত বাধা ছিল না, বাধা ছিল সামাজিক ও পরিবেশগত। লীলাবতীর অনন্য ইচ্ছায় উপাচার্য হার্টগ তাকে ভর্তি করেন ইংরেজি বিভাগের প্রথম ছাত্রী হিসেবে। এ সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা প্রণিধানযোগ্য। "তিনি ছাত্রীরূপে নবীনকালের দূতের মতো আবির্ভূত হয়ে মেয়েদের জন্য সেখানে শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করেন।" (জয়শ্রী, ভাদ্র, ১৯৭১)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লীলা নাগের পড়াশোনা শুধু তাঁর বিকাশের পথকে সুগম করে নি, বরং গোটা নারী সমাজকে তার দুর্জয় আন্দোলনে যাওয়ার জন্য সাহসী মনোবৃত্তি গঠনের সূতিকাগার হিসেবে বন্ধনমুক্তির পথকে করেছিল উন্মুক্ত। তিনি নবীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশে প্রত্যক্ষ করেছেন অধ্যাপকদের মুক্ত বুদ্ধিচর্চা ও অনিল রায়ের সামাজিক কর্মকাণ্ডের ভেতরের দিকে বহ্নিশিখা। কংগ্রেস বিপ্লবী যখন সর্বশক্তি দিয়ে যখন বটবৃক্ষের মতো থাকা পরাশক্তিকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হলো, লীলা নাগ তখন সম্মিলিত প্রয়াসে এক ঐক্যের সীমানায় দাঁড়িয়ে যার যার অবস্থান থেকে সাঁড়াশি আক্রমণকে কৌশল হিসেবে চিহ্নিত করেন। বারবার রাজনৈতিক পরাজয় ও বিচ্ছিন্নতাকে তিনি দেখেছেন অন্যভাবে। একদিকে কংগ্রেসের ছিল বিপুল জনসমর্থন ও প্রবল সাংগঠনিক ক্ষমতা। কিন্তু অহিংস পন্থায় তারা শক্তিহীন, আবার বিপ্লবীদের ছিল প্রচণ্ড আত্মশক্তি ও সাহস। কিন্তু কঠোরতা ও জনবিচ্ছিন্ন থাকায় অসম বিকাশের কারণে তারা দুর্বল শক্তির অধিকারী। আর এ সবের কাছাকাছি থেকেও বাইরে ছিল কৃষক-শ্রমিকদের বিচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন। লীলা নাগ সকলের সমন্বয়ে আন্দোলনের কৌশল হিসেবে কখনো কখনো দ্বিমুখী-ত্রিমুখী ধারাকে গ্রহণ করেন। তাঁর বিন্যস্ত কর্মপন্থা হলো—প্রথমত : নারী জাগরণের জন্য সামাজিক কাজ। দ্বিতীয়ত : কংগ্রেসের সাথে সহাবস্থানে বাইরের দিক থেকে বৃটিশ সরকারকে অশান্তি-বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলা। তৃতীয়ত : গোপনে গোপনে বৈপ্লবিক পরিকল্পনার আয়োজন করা। চতুর্থত : বিচ্ছিন্ন কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে মিশে গিয়ে সমর্থন দান ও যোগাযোগ রক্ষা। তিনি বিক্ষিপ্ত বিভাজিত-অসম-আঞ্চলিক আন্দোলনকে বৃটিশ সরকারের প্রতিরোধের চেতনায় সংঘবদ্ধ করতে অব্যাহত প্রচেষ্টা চালান। এ প্রক্রিয়া সে সময়ের জন্য অনেকটা সঠিক ছিল বলে অনেকের ধারণা।

লীলা নাগ চল্লিশের দশককে সামনে রেখে তাঁর নিজের পরিকল্পনায় শ্রীসংঘ, কংগ্রেস, দীপালি সংঘ এবং 'জয়শ্রী'র মাধ্যমে বিপ্লববাদী চেতনা সর্বভারতে জালের মতো বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। আর বাইরে রেখেছিলেন সর্বসাধারণের মধ্যে জনসংযোগের ভেতর দিয়ে দেশপ্রেম গঠন ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলা। আবার পেশাজীবীর আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দান ও অকৃপণ সাহায্য প্রদান। অতীতের ব্যর্থতা তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিল যে, বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সময় ভিন্নশক্তির একান্ত সংযোজনের প্রয়োজন। এ বিপ্লবী নেত্রীর কর্মপ্রয়াস এতো দ্রুত ও পরিকল্পিত ছিল যে এক দশকের মধ্যে এতো বড় বিশাল কর্মসূচিকে সূক্ষ্ম ও সুনিপুণভাবে বাংলা-আসাম প্রদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময় তাঁর যাত্রা ছিল দিল্লি-মাদ্রাজের দিকে।

অন্যদিকে, তিনি নারীকে সবদিকে সচেতন করার মানসে বঙ্গীয় ভোটাধিকার সমিতির মাধ্যমেও গণসংযোগ অব্যাহত রাখেন। উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ সমিতির মধ্যে নিঃস্বার্থচিত্তে পুরুষদের চোখের সামনে তাঁর অব্যাহত সেবা প্রদান উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখ থেকে শুরু করে মাস্টারদা সূর্য সেন পর্যন্ত অবহিত ছিলেন এ ব্যাপারে। এতো কিছুর পরও লীলা নাগকে বিপ্লবী দলের অভ্যন্তরে আবার বিপ্লব ঘটাতে হয়েছিল মহাবিস্ফোরণে। গোপনীয় বিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ তখনও ছিল অলীক কল্পনার মধ্যে। কোনো বিপ্লবী এ বিষয়কে গ্রাহ্য করেন নি। এ ভয়ঙ্কর বিপদশঙ্কুল পথে প্রথম পদার্পণ ঘটে লীলা নাগের। তত্ত্বের দিকে খাঁটি হলেও বিপদশঙ্কুল মনে করতেন দলের মধ্যে নারী সদস্যদের সংযোগ ঘটলে বিপ্লবী আদর্শের চ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রচুর এবং শারীরিক ও মনের দিক দিয়েও নারীরা অক্ষম হবে। বেশির ভাগ সদস্যের আপত্তি সত্ত্বেও লীলা নাগ শ্রীসংঘের সদস্যপদ লাভ করে ভ্রান্ত সেই কঠোরতার মূলে কুঠারাঘাত করে বসেন এবং পরে 'মহান নেত্রী' হিসেবে সাফল্যের জয়মাল্যে ভূষিত হন।

আবার চল্লিশের দশকে জেল ফেরত বিপ্লবীদের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দিকে যাত্রাকে লীলা নাগ দেখেছিলেন অন্যভাবে। তিনি মার্কসীয় তত্ত্বকে দেশীয় বাস্তবতার সংমিশ্রণে গড়তে চেয়েছিলেন। তাই আজো দেখা যায় এ দেশের সমাজ কাঠামো ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করে বিপ্লব প্রচেষ্টা কল্পনাতেই রয়ে গেছে। দেশভাগের সময় লীলা নাগ সাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের ভয়াবহতার কথা উচ্চারণ করে এ প্রক্রিয়া ঠেকাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী এখন প্রতি পদে পদে বাস্তবরূপে দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের মধ্যে অবিশ্বাস, হিংসা, যুদ্ধের হুমকি, মানবতার ক্রন্দনরোল প্রতিক্ষণ শোনা যাচ্ছে। শত বছরের আলোকে লীলা নাগের কর্ম ও চিন্তাধারাকে নতুন করে বিশ্লেষণ এবং সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের প্রয়োজন রয়েছে।

স্বাধীনতার অভিযাত্রায় বিপ্লবী দেশনেত্রী

স ন্দী প দা শ

পৃথিবীতে কিছু মানুষ আসেন, যাঁদের প্রচলিত মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা কঠিন। অবিভক্ত ভারতের যতো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, তার মধ্যে অনন্যতমা বিপ্লবী লীলা নাগ(পরে রায়), কিশোর বয়সেই তিনি খ্যাতি চান নি, সম্মান চান নি, কিন্তু খাঁটি থাকতে চেয়েছিলেন। খাঁটি থেকে যদি অবশ্য জনপ্রিয়তা জোটে, তবে আপত্তি নেই। কিন্তু স্বাধীনতা, সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে কোনো কারণেই আপোস করা তাঁর সম্ভব নয়। তাই লীলাদিকে প্রায় সারা জীবন স্রোতের বিরুদ্ধে চলতে হয়েছে।

বাবা-মায়ের অকৃপণ স্নেহ ও প্রভূত পারিবারিক সমর্থন পেলেও প্রথা ও প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে *তাদাত্ম্যতা* সম্ভব ছিল না। সম্ভ্রান্ত ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের একমাত্র কন্যাকে সাড়ম্বরে বিয়ে দিতে পিতা গিরীশচন্দ্র নাগের সহজাত আগ্রহ ছিল। কিন্তু পিতার প্রতিষ্ঠাকে উপজীব্য করে বিবাহে তাঁর প্রচণ্ড আপত্তি। বিবাহ করতেই হবে—এই মনোভাব তাঁর ছিল না। আবার তা না করার 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা'ও তাঁর ছিল না। তাই কর্মে ও মননে যাঁর সঙ্গে তাঁর *তাদাত্ম্যতা* প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাঁকে জীবনসাথি বেছে নিতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। স্কুল-কলেজের ছুটিতে যে মেয়ে বাড়ি এলে পরিবারের পাচক থেকে আরম্ভ করে গোটা পরিবারের সকল সভ্যের মধ্যে আনন্দের শিহরণ বয়ে যেতো, সেই গৃহেই যখন লীলা নাগ অচেনা-অজানা কোনো দুস্থ মেয়েকে আশ্রয় দিতে নিয়ে আসেন, তখন বিরোধাভাস দেখা দেয়াই স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। সেই মেয়েকে আশ্রয় দিতেই হয়, না হলে সতেরো বছরের তরুণী লীলা সেই গৃহে থাকেন কী করে? যে মেয়ে স্কুলে-কলেজে পড়াশোনায় অত্যন্ত কৃতী, সর্বগুণান্বিতা এবং চরিত্র মাধুর্যে অতুলনীয়া, সেই মেয়ে শিক্ষকমণ্ডলী ও অধ্যক্ষাদের প্রিয় পাত্রী হবেন—তার মধ্যে আশ্চর্যের কোনো ব্যাপার নেই। কিন্তু সেই মেয়ে যদি জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদী হয়, কিংবা তিলকের প্রয়াণে সম্মিলিতভাবে শোকের প্রকাশ করতে চায়, তাহলে ইউরোপীয় অধ্যক্ষার সঙ্গে

বিরোধ এড়ানো যায় কী করে? শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষকে নমনীয় হতে হয়। আরও একটি ঘটনা স্মরণীয়। বেথুন কলেজে পুরস্কার বিতরণী সভায় বড়লাট পত্নীকে নতজানু বন্দনা করার নির্দেশ অমান্য করার নেতৃত্ব দেন লীলা নাগ। এখানেও কর্তৃপক্ষকে নমনীয় হতে হয়।

বেথুন কলেজে থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সম্মাননার কৃতী স্নাতক এম এ পড়তে গেলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনগতভাবে মেয়েদের শিক্ষাদানের বাধা ছিল না। কিন্তু তখনও তার পরিবেশ গড়ে উঠে নি তাই তাঁকে ভর্তি করতে কর্তৃপক্ষ বিব্রত বোধ করছিলেন। এখানেও কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলো পরিবেশ সৃষ্টিতে। লীলা নাগ হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী।

এম এ পাস করার পর থেকে মৃত্যুর আগের দু'বছর তাঁর সংজ্ঞালোপের আগে পর্যন্ত দেখা যাবে নির্মাণ ও সংঘর্ষের দ্বৈতসত্তায় দেদীপ্যমান তাঁর ব্যক্তিত্ব। লীলাদির বৈপ্লবিক সত্তার অন্তরালে অন্তসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবহমান ছিল মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা। সারাজীবনে কতো অখ্যাত অপরিচিত ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের পাশে যেমন দাঁড়িয়েছেন, তেমনি দাঁড়িয়েছেন অগণিত অত্যাচারিতা নারীর পাশে এবং সামগ্রিকভাবে শোষিত মানুষের পক্ষে। যে-কোনো মানুষের প্রতি কোনো প্রকার নিষ্ঠুরতা তাঁর সংবেদনশীল মনে বিক্ষুব্ধ মনোভাব সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় বিপুল জনসমাবেশে সাময়িক বিপর্যস্ত উপাচার্য ল্যাঙ্গলিকে বিদ্রূপ করায় রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের সঙ্গে তিনিও ব্যথিত, যা তাঁর রবীন্দ্রস্মৃতিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত।

এম এ পাস করে লীলা নাগ দেখেন শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ করে নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে খোদ ঢাকা নগরীতেই শোচনীয় পরিস্থিতি। ঢাকায় উল্লেখযোগ্য ছাত্রী বিদ্যালয় ইডেন স্কুলে আর কতো ছাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হয়! এক ঢাকা শহরেই তিনি একে একে চারটি উচ্চ বিদ্যালয় ও বারোটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তার সঙ্গে ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা, গণশিক্ষার প্রসার, বয়স্ক মেয়েদের জন্য জীবনমুখী শিক্ষা প্রকল্প, গ্রামাঞ্চলে অনগ্রসর মুসলমান ছেলেমেয়েদের জন্য নৈশ বিদ্যালয়—সে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। বস্তুত নারীশিক্ষা বিস্তারে তাঁর অনন্য ভূমিকার জন্যই তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত। দীপালি সংঘের মাধ্যমে ঢাকায় যে নারী জাগরণের বিরাট কর্মযজ্ঞের তিনি সূচনা করেন, অবিভক্ত ভারতেই তার তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় দীপালির সভায় যোগ দিতে এসে বলেন, এশিয়া মহাদেশে এতোবড় মহিলা সমাবেশ তিনি কখনও দেখেন নি। এখানে এসেছেন দেশের প্রখ্যাত গুণীজনেরা এবং সকলেই লীলা নাগের কর্মযজ্ঞে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁর কর্মকুশলতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে যোগ দিতে আহ্বান করেন। আহ্বান করেন গান্ধীও। লীলা রায় ততোদিনে তাঁর কর্মক্ষেত্র নিজেই রচনা করেন। ব্যক্তিমানুষের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে দেশকে

পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন—তার জন্য বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সামিল হয়ে পড়লেন। অল্পদিন পরেই তাঁর আদর্শ প্রতিফলিত হলো *জয়শ্রী* পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের পছন্দ করা নাম ও রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণীকে পাথেয় করে সাহিত্য ও সংস্কৃতি এবং সমাজ ও রাজনীতি ভাবনার পত্রিকা। সম্পাদনা, পরিচালনা, প্রকাশনার সমস্ত দায়িত্ব মেয়েদের। কিন্তু পত্রিকার আবেদন জাতীয় তথা বিশ্বজনীন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত 'উদ্বোধন'কে বাদ দিলে বাংলার জীবিত সাময়িক পত্রের মধ্যে প্রাচীনতম লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত *জয়শ্রী*। রাজরোষে পড়ে স্বাধীনতার আগে-পরে প্রকাশনা হলেও সরোজিনী নাইডুর কথায় ফিনিক্স পাখির মতো নতুন করে *জয়শ্রী* জেগে উঠেছে। লীলা নাগের কর্মক্ষেত্র এত বিচিত্র এবং এতো প্রসারিত যে তার প্রত্যেকটি দিক নিয়েই বিস্তৃত পরিসরে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

আমরা এখানে তাঁর জীবনের উপরে উল্লিখিত প্রেক্ষাপট থেকে তাঁর জীবনসাধনা, যা তাঁর স্বাধীনতার অভিযাত্রার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে প্রয়াসী।

উনিশ শতকের নবজাগরণকে মন্থন করেই যেন শতাব্দীর উপান্তে তাঁর জন্ম। রামমোহন থেকে সমাজ ও সংস্কৃতিভাবনায় যে যুক্তিবাদ তা তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। পরিবারে ব্রাহ্ম প্রভাবও ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনসাধনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের অমোঘ বাণী—'স্বাধীনতা আত্মার সঙ্গীত'। শিক্ষার মধ্য দিয়ে চেতনার সম্প্রসারণ, জীবনমুখী শিক্ষা, দীপালি সংঘ, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন, সাহিত্য-সংস্কৃতির আঙিনায় নতুন সমাজভাবনা প্রেক্ষাপট সবকিছুর মধ্যেই যেন ব্যক্তির জীবনে একটি পরিপূর্ণ মুক্তির পরিমণ্ডল রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। লীলাদির এই পদক্ষেপগুলি থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রেরও একটি অবিস্মরণীয় উক্তি স্বতঃই মনে আসে—'অক্সিজেন যেমন দেহের পক্ষে আবশ্যক, তেমনি স্বাধীনতাও আত্মার জন্য আবশ্যক।'

ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ মুক্তি কামনার সঙ্গে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তাঁর আকুতি সূচিত হচ্ছিল কিশোর বয়স থেকেই। পিতা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী থেকে রায়বাহাদুর এবং তারপর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। সেই পিতাকে কুড়ি বছরের তরুণী লিখছেন, '...পড়তে গেলেই ও এ-সব নানা কথা (পরাধীন দেশের নানা দুরবস্থা) মনে হয়... আমার অনেক দিন থেকেই মনে হচ্ছে যে এখন আমরা স্বরাজ চাই।...' তবে তাঁর কথায় ভারতীয় স্বরাজ অন্য দেশের অনুকৃতি হবে না। স্বরাজ কোন পথে হবে তা নিয়ে জাতীয় নেতাদের মধ্যেকার মতভেদ কমানো যায় কি না তা নিয়ে সেই তরুণ বয়সেও উদ্বেগ ছিল। বাস্তব প্রেক্ষায় তখন তাঁর মনে হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলনেই যোগ দেয়া উচিত। কারণ তার কোনো বিকল্প তখনও তাঁর চোখে পড়ে নি। লীলা নাগ সক্রিয়ভাবে গান্ধীজী প্রবর্তিত আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। পরবর্তীকালে লবণ সত্যাগ্রহেও অংশ নিয়েছেন। লীলা নাগ

দেখেছেন রাউলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ড। অসহযোগ আন্দোলন ও তার সঙ্গে খিলাফত আন্দোলন শুরু হওয়ায় দেশব্যাপী কি উন্মাদনা। দেশে স্বরাজের ভাবধারা প্রসারিত হচ্ছে। অথচ নারীদের তার সঙ্গে যুক্ত করতে হলে সমান অধিকার চাই। মন্টেগু চেমসফোর্ড আইন অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আংশিকভাবে ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। অথচ নারীর তো ভোটাধিকারই নেই। শুরু হলো নারীর ভোটাধিকার অর্জনের আন্দোলন। ইংরেজরা সবসময়ে স্ত্রী-পুরুষের অধিকারের সমানত্বের কথা বললেও কোনো উপনিবেশে তারা এ সুযোগ দেয় না। সেকালের প্রখ্যাত নারী নেত্রী কুমুদিনী বসু প্রথমে এগিয়ে এসে গঠন করলেন 'নিখিল ভারত নারী ভোটাধিকার কমিটি'। লীলা নাগ হলেন সেই কমিটির সহ সম্পাদিকা। এখানে স্মরণযোগ্য যে, শুধু ঔপনিবেশিক দেশ নয়, পাশ্চাত্যের বহু উন্নত দেশে তখনও মেয়েদের ভোটাধিকার ছিল না। কুমুদিনী বসু, লীলা নাগ প্রমুখ যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারী জাগরণের অন্যতম সোপান মেয়েদের ভোটাধিকার। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা বহু সভা-সমিতি আয়োজন করেন। নিবন্ধকারের সুযোগ হয়েছে পরবর্তীকালের দেশনেত্রীর মুখ থেকে বিস্তৃত ঘটনা শোনার।

এ দিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দানা বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজের ভাবধারা স্পষ্ট হতে থাকে। কিন্তু জাতীয় নেতাদের মধ্যেও এ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে নি। অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী বলেছিলেন, এক বছরের মধ্যে স্বরাজ। কিন্তু তাঁর নিজেরও তখন স্বরাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এ সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা তিনি গড়ে তুলেছেন আরও পরে। বিপিন চন্দ্র পাল, বালগঙ্গাধর তিলক স্বরাজের ধারণাকে অনেক দূর গড়ে তুললেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ড. ভগবান দাসের সহায়তায় স্বরাজভিত্তিক একটি সাংবিধানিক কাঠামোও দিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা ও স্বরাজ অভিন্ন কি না, আবার স্বাধীনতার স্বরূপই-বা কি তা নিয়ে অস্পষ্টতা ছিল। ১৯২০ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজীর কর্মসূচি প্রস্তাবের মধ্যে সংশোধনী আনলেন হজরত মোহানী, যাতে তিনি ইংরেজের সম্পূর্ণ অধীনতা-মুক্ত, স্বাধীনতার দাবি জানালেন। গান্ধী সংশোধনী মেনে নিলেন না। বিপুল ভোটাধিক্যে গান্ধীর মূল প্রস্তাব গৃহীত হলো। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে আবার সুভাষচন্দ্র গান্ধীর মূল প্রস্তাবের ওপর সংশোধনী আনলেন পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। লীলা নাগ, অনিল রায়সহ বাংলার সমস্ত বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের সমর্থক। প্রস্তাবের মূল সমর্থক জওহরলাল শুধুই সমর্থন জানালেন, কোনো বক্তব্যই রাখেন নি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের যুব প্রতিনিধি সকলেই সুভাষের সংশোধনীর সমর্থক। স্বল্প ভোটের ব্যবধানে সংশোধনী পরাজিত হয়। পরবর্তী বছরেই লাহোর কংগ্রেসেই গান্ধীর সমর্থনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হলো। কলকাতা কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই গান্ধী তাঁর *ইয়ং ইন্ডিয়া* পত্রিকায় স্বাধীনতা বনাম স্বরাজ নামে মহত্ত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় লেখেন। তাতে তিনি প্রথমেই ইংরেজ শাসনের অবসান চেয়ে

বলেন, যে-কোনো অবস্থাতেই 'এই শয়তানী শাসনের' অবিলম্বে অবসান প্রয়োজন। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন, ইংরেজ চলে গেলেই কি আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভ করবো? বহু দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের ওপর যে নিপীড়ন হচ্ছে, তা কি আমরা সমর্থন করতে পারি? ইংল্যান্ড, রাশিয়া, তুরস্ক, ভুটান, ইতালি প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাধীন দেশের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন আমরা কাদের ব্যবসা পছন্দ করবো? দারিদ্র্য বেকারি প্রভৃতি কী ইংরেজ চলে গেলেই অপসৃত হবে? স্বাধীন ভারতে আমলাতন্ত্র ও পুলিশের কী ভূমিকা হবে? আপামর জনসাধারণ কতোদূর এবং কীভাবে ক্ষমতায় সামিল হতে পারবে? গান্ধীজীর আশঙ্কা ছিল, আমরা হয়তো ইংরেজ শাসনেরই ভারতীয়করণ করতে চাইছি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, গান্ধীজীর এই সব প্রশ্ন বা আশঙ্কা অনেক বিপ্লবীকেই চিন্তিত করেছে। লীলা রায়ের পরবর্তীকালের স্বাধীনতা ভাবনার সঙ্গে গান্ধীজীর উপরোক্ত ভাবনার সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে লীলা নাগের মাধুর্যমণ্ডিত অথচ ঋজু জীবনের পর্বে পর্বে দেখা যায় যে, কোনো গোঁড়ামি নয়, চিন্তার স্থবিরত্ব নয়, উপনিষদের 'চরৈবতি'-এগিয়ে চলার ডাকে তিনি বিরামহীনভাবে স্বাধীনতার অনুসন্ধানে এগিয়ে চলেছেন। সেই স্বাধীনতার অনুসন্ধানে কখনও ব্যক্তি, কখনও বিশেষ করে নারী, কখনও সামাজিক নিষ্পেষণ, আবার কখনও আর্থিক কিংবা সাংস্কৃতিক, সর্বোপরি রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রাধান্য পেয়েছে। এক তীব্র আবেগপূর্ণ অথচ যুক্তিবাদী মন নিয়ে তিনি তাঁর ভাবনার ও কর্মপ্রচেষ্টার উত্তরণ ঘটিয়ে চলেছেন। ব্যক্তির, গোষ্ঠীর, জাতির ও সর্বমানবের স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন নিয়ে তিনি ভাবিত ছিলেন। আবার স্বাধীনতা যে নিয়ন্ত্রণমুক্ত উচ্ছৃঙ্খলতা নয়—এই গভীর প্রত্যয় থেকে লীলা নাগ জীবনের বিভিন্ন পর্বে যেসমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন, সর্বত্রই শৃঙ্খলা স্থাপনে সযত্ন প্রয়াস ছিল। কিন্তু সেই শৃঙ্খলা কোনো সদস্যের কাছে পীড়নমূলক মনে হয় নি, কারণ তার মধ্যে তাঁর অতুলনীয় ভালোবাসার উত্তাপ অন্তর্নিহিত ছিল।

উল্লিখিত হয়েছে যে, লীলা নাগ গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। আবার তিনি অন্ধভাবে মেনে নিতে পারেন নি যে, স্বাধীনতার এটাই একমাত্র পথ। তাঁর জীবন সাথি বিপ্লবী দার্শনিক অনিল রায়ের সাহচর্যে তিনি বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন। বিপ্লবী দলের গুপ্ত নীতি মেনে দীপালি সংঘ, যাঁর সভ্যেরা ঢাকায় নারীর সামাজিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে কর্মরত, তাঁরাও অগোচরে শ্রীসংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লো। লীলাদির কাছে শুনেছি যে, পুলিশ দীপালির কর্মীদের গ্রেফতারের সময় তাঁরা অবাক হয়ে যান যে, তাঁদের শ্রীসংঘের কর্মী বলে গ্রেফতার করা হচ্ছে। অবশ্যই তাঁরা শ্রীসংঘের সহযোদ্ধা হিসেবে নিজেদের গৌরান্বিতা মনে করেছিলেন। অনিল রায়ের গ্রেফতারের পর শ্রীসংঘের সর্বময় দায়িত্ব লীলা রায়ের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এ ঘটনা নজিরবিহীন যে, একজন নারী একটি প্রধান বিপ্লবী দলের সর্বোচ্চ পদে আসীন।

আবার এখানে এটাও মনে রাখতে হয় যে, প্রিয় ছাত্রী ও শিষ্যা রেণুকা সেনকে নিয়ে তিনিই ভারতের প্রথম মহিলা নিরাপত্তা বন্দি।

অহিংস আন্দোলন থেকে সহিংস বিপ্লব সর্বত্রই তাঁর অবাধ পদচারণার মধ্যে দুর্মর স্বাধীনতা স্পৃহার সঙ্গে সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর অনাবিল ভালোবাসা মূর্ত হয়েছে। তাও আবার তিনি ছিলেন স্বভাব গম্ভীর, যদিও তাঁর পরিহাসপ্রিয়তা কিছু কম ছিল না। তাঁর নিজের স্বাধীন সত্তা যখনই সুযোগ পেয়েছে, তাঁকে সঙ্গীত সাহিত্য দার্শনিক ভাবনা, আবার অধ্যাত্মচেতনায় সমুন্নত করে রেখেছে। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরণের জন্য রাজনীতির কালিমাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। আবার মত বিরোধিতা তাঁকে কারুর প্রতি শ্রদ্ধা ভালোবাসার অবনয়ন ঘটাতে পারে নি। দলভাগে ভিন্ন দলে চলে যাওয়া সহকর্মীর প্রতিও তাঁর দরদ কম ছিল না। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরাকাষ্ঠা দেখা যায় গান্ধীজীর ক্ষেত্রে। একথা সুবিদিত যে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে গান্ধীর সঙ্গে তাঁর তফাত ছিল। ত্রিপুরী কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন–এগুলোর মধ্য দিয়ে পার্থক্য আরও বেড়েছে। কিন্তু তাতে গান্ধী সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধায় কোনো চিড় ধরে নি। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় কেউ যদি কখনও গান্ধী সম্পর্কে অশ্রদ্ধেয় উক্তি করতো, তাহলে তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে পড়তো। তাঁর স্নেহভাজনা এক প্রখ্যাত অধ্যাপককে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন, 'তা বলে তুমি তাঁর উদ্দেশ্যের আন্তরিকতার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর নাকি? mass leader পৃথিবীতে ক'জন জন্মেছেন?'

স্বাধীনতার অভিযাত্রায় তিনি ও তাঁর জীবনসঙ্গী অনিল রায় মত ও পথের সাযুজ্য খুঁজে পেলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ও কার্যক্রমের মধ্যে। অনিল রায় হয়ে পড়লেন নেতাজীর রাজনৈতিক চিন্তার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। লীলা রায় হলেন সুভাষচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করে সুভাষচন্দ্র নিজের সম্পাদনায় ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকার মাধ্যমে নিজের রাজনৈতিক কর্মসূচি ব্যাখ্যা করতেন। অল্পদিনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র গ্রেফতার হলেন। গ্রেফতার হওয়ার প্রাক্কালে পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন অনন্য সহকর্মী লীলা রায়ের ওপর। তাঁর আগে লীলা নাগ পর্বে তিনি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গড়ে-ওঠা ১৯২২ সালের উত্তরবঙ্গ বন্যা-ত্রাণে সম্পদ সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। ১৯২৮ সালের কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে কংগ্রেস অধিবেশনে নারী জাগরণের ইতিহাস উপস্থাপনা করেছেন। হরিপুরা কংগ্রেসের (৩৮তম) সভাপতি সুভাষচন্দ্রের গড়া জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মহিলা বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন লীলা নাগ।

সুভাষচন্দ্রের মত ও পথের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হওয়া সত্ত্বেও মানুষের সার্বিক মুক্তির প্রশ্নে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর মনে হয়েছে সুভাষচন্দ্রের মতবাদের মতটা যুগোপযুগী, সেটাকে বজায় রেখে আরও এগিয়ে যেতে হবে। পঞ্চাশের দশক থেকেই তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক দলের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হতে থাকেন। এই পথে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা কতোদূর পর্যন্ত ঘটতে পারে এই

প্রশ্নে তিনি বিচার-বিবেচনা করতে থাকেন। রাজনৈতিক অনুশাসনের (হুইপ) মধ্যে ব্যক্তির স্বকীয়তা বজায় থাকবে কি না তা নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। রাজনৈতিক দল মানুষের বহুমুখী স্বাধীনতার দাবি মেটাতে অসমর্থ বলেই তাঁর মনে হয়েছে। এ নিয়ে তাঁর চিন্তা *জয়শ্রী*তে প্রকাশিত প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। আবার সোসালিস্ট পার্টির ভাঙনের প্রেক্ষায় ব্যক্তিগত আলাপেও তিনি বিশিষ্ট সহকর্মী অনেকের কাছে এমনকি এই নিবন্ধকারের কাছেও তাঁর সপ্রশ্ন মনোভাব প্রকাশ করেছেন। পাঁচ বছর অন্তর ভোট দেয়ার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি কি তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারে? রাজনীতি কি সমাজনীতির স্থান নিতে পারে? অনেক সময়ে তাঁর প্রশ্নগুলো দেখে মনে হয়েছে যে, তিনি রাজনীতিকে একটি বৃহত্তর পটভূমিতে দেখতে সচেষ্ট ছিলেন। অকপটে স্বীকার করছি, লীলাদির এই প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব তখন বুঝতে পারি নি। আজকে অনেক বেঁকে এগুলো বোঝার একটু চেষ্টা করি মাত্র। মনে হচ্ছে, গান্ধীর মতো তিনিও রাজনীতির একটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উত্তরণ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের ভূদান ও সর্বোদয় আন্দোলন তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন ছিল, সর্বোদয়ের জীবনদর্শন কতোটা বাস্তবে রূপায়িত হওয়া সম্ভব? ভূদান আন্দোলনকে ভূমি সমস্যা সমাধানের একটি নতুন পদক্ষেপ হিসেবে তিনি দেখেছেন। কিন্তু অন্ধ সমর্থনের মনোভাব নিয়ে নয়, যুক্তিবাদী দৃষ্টি থেকে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে, ভূমি বণ্টনের পথ কি? কায়েমি স্বার্থ সেখানে তাকে বিপথগামী করবে কি না—এ আশঙ্কা তিনি করতেন। লীলাদির অবর্তমানে তাঁর এই আশঙ্কাই সত্যে পরিণত হলো। সরকারি-নির্ভর হয়ে ভূদান আন্দোলন তার বৈপ্লবিক সমস্যার মূলে কুঠারাঘাত করলো। সর্বোদয় আন্দোলনেরও প্রতিবাদী চরিত্র থেকে অনেকটা বিচ্যুতি ঘটলো। ভারতের জরুরি অবস্থার সময়ে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে তা থেকে উত্তরণের একটা প্রয়াস ঘটেছিল। দেশনেত্রী লীলা রায় সংসদীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থেকেও তা বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না—অন্তত যতোদিন পর্যন্ত তার উপযোগী বিকল্প উদ্ভাবিত না হয়। আসলে যে-কোনো ধরনের স্বৈরতন্ত্রের তিনি ছিলেন তীব্র বিরোধী। সংসদীয় ব্যবস্থায়, অন্তত বৃটিশ ওয়েস্টমিনিস্টার ধাঁচ বজায় থাকলে ন্যূনতম গণতন্ত্র বজায় থাকে। উপযুক্ত বিকল্প না গড়ে উঠলে, যদি সংসদীয় গণতন্ত্রও না থাকে, যদি স্বৈরতন্ত্র তা সামরিকই হোক, তা ব্যক্তি-কেন্দ্রিকই হোক, কিংবা রাজনৈতিক আদর্শের মোড়কে দলতন্ত্রই হোক না কেন, জনজীবনকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে রাখবে। তাই এ সম্পর্কে তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী।

গান্ধী নোয়াখালি যাওয়ার আগেই লীলা রায়ের ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউট-এর শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়। বিপন্ন হিন্দু রমণীদের রক্ষা করা মূল দায়িত্ব হলেও লীলাদিরা সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়কে সহযোগী করেই প্রতিটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন।

স্বাধীনতা—এই প্রত্যয়টি লীলা রায়ের জীবনে নানাভাবে দেখা দিয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুৎসাহী মনোভাব, যার সঙ্গে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, তাদের সমাজের অর্ধেকের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জন্মাতে দিচ্ছে না। এই নিগড় থেকে নারীকে মুক্ত করতে না পারলে সামাজিক মুক্তি সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই তিনি নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। গড়ে তুলেছেন এদের জন্য পরপর নানা ধরনের নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন বয়সের উপযোগী, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভিন্নতর ব্যবস্থা। নারীর আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্ম-অধিকার পরিব্যাপ্তির জন্য গড়ে তুলেছেন দীপালি সংঘ, জাতীয় মহিলা সংহতি এবং মহিলা পরিচালিত *জয়শ্রী* পত্রিকা।

বাংলার অনেক বিপ্লবীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ কখনও কখনও শোনা যায়—ওঁরা নাকি হিন্দুত্বের গণ্ডির বাইরে যেতে পারেন নি। লীলা রায়, অনিল রায় বা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কোনো সংগঠনের বিরুদ্ধে অন্তত এ অভিযোগ টিকবে না। লীলা রায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মহিলা সংহতির প্রথম সম্পাদিকা ছিলেন আনোয়ারা খাতুন। *জয়শ্রীর* প্রথম পর্বে যুক্ত ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল। বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ এবং আরও অনেক বিশিষ্ট মুসলিম বুদ্ধিজীবী। অনগ্রসর মুসলিম অঞ্চলে গিয়ে ওরা গড়ে তুলেছেন নৈশ বিদ্যালয়। এই নিবন্ধকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক মুসলমান নেতার সংস্পর্শে এসেছেন, যাঁরা শ্রীসংঘ বা লীলা রায়-অনিল রায়ের সহকর্মী ছিলেন।

গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মতো লীলা রায়ও মনে করতেন সাম্প্রদায়িকতা রাজনৈতিক পরাধীনতার চেয়েও মারাত্মক ব্যাধি। তাই সর্ব প্রযত্নে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে ছিলেন সতত নিমগ্ন। তার প্রত্যয় ছিল দেশ বিভাগ স্বাধীনতাকে কীটদংশ করবে। তাই বারবার ছুটে গিয়েছেন জাতীয় নেতাদের কাছে, গিয়েছেন গান্ধীজীর কাছে। গান্ধীজীর প্রয়োজন ততোদিনে কংগ্রেস নেতাদের কাছে ফুরিয়ে গিয়েছে। তবে তিনি লীলা রায়কে আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'যদি তুমি জনমত গঠনে এগিয়ে যাও, তবে আমি এসে নেতৃত্ব দেব।' এই অক্ষমতা তাঁকে পীড়িত করেছে। কী দুঃসাহস নিয়েই যে তিনি সেই সময় মুসলমান সহকর্মী নৌশের আলী, আশরাফউদ্দীন চৌধুরীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছেন, তার কোনো তুলনা নেই। অনেকদিন পর মরহুম চৌধুরী সাহেব লীলা রায় সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখেছেন, 'এই ঘটনা স্মরণ করলে আজও আমার শরীরের রোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে।'

স্বাধীনতার পর তাঁর মনে হয়েছে, 'আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি বলে যাঁরা নিশ্চিতভাবে মনে করছেন, আমি তাঁদের একজন নই। আমার পরিকল্পিত স্বাধীনতার মধ্যে ইংরেজের চলে যাওয়া, না যাওয়াই প্রধান স্থান অধিকার করে নি। স্বাধীনতার কষ্টিপাথর হলো জনগণ তাদের হাজার বন্ধনে নিশ্চেষ্ট ও জর্জরিত

জীবনে অন্তরে ও বাইরে মুক্তির আস্বাদ পেল কি না। যে মুক্তির ছোঁয়াচ তার রুদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করে নতুন সৃষ্টির পথে অভিযান করাবে। সে অভিযানের পথে হয়তো দুঃখ আছে, ভুলভ্রান্তি আছে, সে মুক্তির ছোঁয়াচ নিশ্চিতভাবে সকল বাধাকে অতিক্রম করার মতো মনের শক্তি ও বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা দেবে। এই কষ্টিপাথরে যাচাই করে যে স্বাধীনতা আজকে লাভ করেছি, তার স্থান খুব উচেঁ নয়।... যে মুক্তি তার মনকে ও বুদ্ধিকে জাগ্রত করবে এবং সর্বপ্রকার আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শোষণকে অসম্ভব করবে। বৈদেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি মিলেছে, কিন্তু সমাজজীবনে 'স্বাধীনতা' আজও দূরে রয়েছে। শোষণহীন মুক্ত সমাজ ও জীবনকে গড়ে তোলাই আমাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য। এই কর্তব্য উদ্‌যাপন করার অর্থই হলো আর্থিক জীবনে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। লীলা রায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছেন দরিদ্র ও কর্মহীন মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ সমাজতন্ত্র। কিন্তু সবসময়েই তিনি সচেতন ছিলেন এই সমাজতন্ত্র যেন রাষ্ট্রসর্বস্বতায় পর্যবসিত না হয়। অর্থাৎ গণতন্ত্র বিচ্যুত সমাজতন্ত্রকে তিনি স্বাধীনতার পরিপন্থী বলেই মনে করতেন। এই মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি ফরওয়ার্ড ব্লককে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছেন। ১৯৪৬ সালে কারামুক্তির পর ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনের জন্য যখন তিনি নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন শিলংয়ের এক জনসভায় গিয়ে দেখেন সভামঞ্চের পটভূমিতে লেখা রয়েছে—স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব। তা লক্ষ্য করে তিনি তাঁর ভাষণ কেন্দ্রীভূত করলেন স্বাধীনতার তাৎপর্য আলোচনায়। বললেন, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হলেই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সহাবস্থান সম্ভব হবে।

স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কে লীলা রায়ের চিন্তার সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায় গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের চিন্তার সঙ্গে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী হয়েও সুভাষচন্দ্র আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন, আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা শূন্যগর্ভ। গান্ধীজী তাঁর স্বরাজের অবধারণাকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন, যাতে তিনি স্বরাজকে একটি বর্গক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বর্গক্ষেত্রের চারটি রেখা ও কোণগুলো সমান। স্বরাজ স্বরূপ এই বর্গক্ষেত্রের একটি রেখা রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বিপরীত প্রান্তের রেখাটি হচ্ছে আর্থিক স্বাধীনতা। অপরদিকে একদিকে সামাজিক স্বাধীনতা, তার বিপরীত প্রান্তে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা। স্বরাজরূপ বর্গক্ষেত্রের কোনো একটি দিককে উপেক্ষা করলে তা আর পরিপূর্ণভাবে স্বরাজ বা স্বাধীনতা থাকবে না। দেশনেত্রী লীলা রায়ও তাঁর স্বাধীনতার প্রত্যয়কে তেমনি শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা হিসেবে দেখেন নি। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার সঙ্গে ব্যক্তির সামগ্রিক স্বাধীনতা তাঁর মানসপটে চির জাগরূক ছিল। মিথ্যা বা অনৈতিকতার সঙ্গে কোনোরূপ আপোস করা কোনোদিনই তাঁর ধাতে ছিল না। তাই জনপ্রিয়তা অর্জনের চেয়ে খাঁটি হওয়া তাঁর কাছে অনেক বেশি কাম্য ছিল। তিনি মনে করতেন, 'জয়পরাজয়, সাংসারিক সার্থকতা এ সবে

কি মানুষের কিছু পরিচয় আছে? আছে তাঁর চিন্তায়, ব্যবহারে, সংগ্রামে।' সামাজিক ব্যবধান ঘোচানোর জন্য তিনি যেমন চেয়েছেন সম্পদের ও সুযোগের সমবণ্টন, তেমনি চেয়েছেন নারী-পুরুষের, হিন্দু-মুসলমানের ও জাতজাতের ভেদ ঘোচাতে। তিনি চেয়েছেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি এই বিভেদ ঘোচানোর কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিক। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সংস্কৃতি থেকে সাম্প্রদায়িকতাকে মুক্ত করবে এবং সামাজিক বিভেদ অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। দেশভাগের পর লীলা রায় সাহিত্যিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে বলেন, আজকের সাহিত্যিকদের সংগঠনকে স্বাধীনতার যথার্থরূপ ফোটাতে, জনগণের প্রকৃত মুক্তির ইঙ্গিত দিতে হবে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর বোম্বেতে অনুষ্ঠিত প্রবাসী পরবর্তীকালে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শাখা সভানেত্রীর ভাষণে তিনি বলেন : 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে। আজকে এটাই দেশের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ... সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সাম্প্রদায়িক বর্বরতার বিরুদ্ধে... পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান মেয়েদের নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ কাজ করতে গিয়েই এই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে যে, মুসলমান মেয়েদের মধ্যে এই কাজে সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে বেশি।'

সাংস্কৃতিক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী লীলা রায় প্রশ্ন তুলেছেন বিভাগোত্তর দুই বাংলার ভাষা ও কৃষ্টির মধ্যে ঐক্য থাকবে কি না। তাঁর মতে, 'ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে কৃষ্টি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত বলে যাঁদের অভিমত, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই।... ভাষাকে আশ্রয় করে বাঙালির যে বিশিষ্ট কৃষ্টি গড়ে উঠেছে, তাকে রূপ দেয়ার কাজে হিন্দুর দান ও মুসলমানের দান বেশি কি না, সেটা বিচারের বিষয় নয়।' অযথা উর্দু বা সংস্কৃত ঢুকালে বাংলা ভাষার স্বাধীন সত্তা বা সাবলীলতা ব্যাহত হবে বলে তাঁর ধারণা ছিল। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করাই যুগধর্ম, একে সঙ্কীর্ণতর করলে আধুনিক মানুষের মনন ও ভাবরাজ্যের উপযুক্ত বাহক সে সংস্কৃতি কখনও হতে পারবে না। আর এই গতিহীন জমাটধরা সঙ্কুচিত সংস্কৃতি ও সাহিত্য মানুষের বিকাশের পরিপন্থী হয়ে মানবতার বিকৃতি ঘটাবে।' তিনি উপলব্ধি করেছেন সংস্কৃতি উদার ও স্বাধীনতার বার্তাবাহী হয়, তাহলে সাম্প্রদায়িকতার কালিমা তাকে লিপ্ত করবে না। সেক্ষেত্রে গণসাহিত্য সৃষ্টি সাম্প্রদায়িকতা অবসানের একটি সমাধান। তাঁর মতে, 'এ যাবৎকাল (১৯৪৭) বাংলা সাহিত্যে কেবলমাত্র উচ্চ ও মধ্যবর্তী শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহক হওয়ার দরুন বাংলার চাষী ও মজুর এই সাহিত্যে স্থান পায় নি। অথচ বাংলার চাষী-মজুরের অধিকাংশই মুসলমান। বাংলা সাহিত্যে চাষী-মজুরের জীবন প্রতিফলিত হলে তার সঙ্গে মুসলিম রীতিনীতিও ভাষা সাহিত্যে স্থান পাবে।' তাঁর মতে, তা না করে কৃত্রিমভাবে শব্দ সংযোজন করলে সাংস্কৃতিক ব্যবধান সৃষ্টি হবে। অন্যত্র তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, 'বাংলার কৃষ্টিকে রক্ষা করতে হলে হিন্দু ও মুসলমানকে আলাদা হয়ে চারা গাছের মতো বৃহত্তর আকাশের সজীব

স্পর্শ থেকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখলেই মঙ্গল হবে—এমন কথা ইতিহাস বা সমাজতত্ত্ব কোথাও বলে না।'

স্বাধীনতার অভিযাত্রী সঙ্কট সম্পর্কে অবহিত থেকে আশা ব্যক্ত করে বলছেন, 'সমাধানের সমস্ত উপায় একদিনে আমাদের সামনে উন্মুক্ত হবে না।' তাঁর বিশ্বাস, 'পুঞ্জীভূত বেদনা, হতাশা নতুন সার্থকভাবে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে। না হলে মানব সভ্যতার চিরন্তন অগ্রগতিতে বিশ্বাস থাকতো না।' তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, ক্ষমতার সঙ্গে অপব্যবহারের একটি সংযোগ গড়ে ওঠে। তাই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে, 'অপব্যবহৃত ক্ষমতার অত্যাচার থেকে মানব সমাজ আত্মরক্ষা করতে পারবে সহজে'। তাঁর লক্ষ্য ছিল, প্রতিটি ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতার মধ্যে পরিপূর্ণ বিকাশ। 'তাঁর মানে এই নয় যে ব্যক্তি সর্বস্বতার মধ্যেই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বীজ নিহিত আছে।' বিপ্লবী নেত্রী প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণে প্রতিটি ব্যক্তিকে 'স্ব'রাট (স্বয়ং দীপ্যমানও করতে চেয়েছেন; একই সূত্র ধরে গান্ধীজীও বলেছিলেন যে তিনি নিছক 'সু-রাজ' চান না, তিনি চান স্ব-রাজ।) আবার দেশনেত্রী বিকেন্দ্রীকৃত স্বয়ম্বর গোষ্ঠীর বিকাশের মধ্যে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পরবর্তী বছরগুলোতে লোকনায়ক জয়প্রকাশ তাঁর জনসম্প্রদায়গত গণতন্ত্র (Communization democracy) প্রসঙ্গে যে জাতীয় ভাবনা প্রকাশ করেছেন এবং যা আধুনিকোত্তর রাজনীতির পাশ্চাত্যের ভাষ্যকারদের নব্বইয়ের দশকের চিন্তায় যে অনুরণন দেখা যাচ্ছে তার ইঙ্গিত ষাটের দশকের দেশনেত্রীর চিন্তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আজকের আধুনিকোত্তর রাজনীতির প্রবক্তাদের চিন্তায় যে নতুন প্রেক্ষায় রাজনীতিকে দেখার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তার বীজ চার দশক আগে লীলা রায়ের চিন্তায় অঙ্কুরিত ছিল। উত্তর তাঁর কাছে স্পষ্ট ছিল না। এখনও তার উত্তর পাওয়া যায় নি। তবে প্রশ্নের গভীরে গেলে উত্তর খোঁজার তাগিদও থাকবে। কিন্তু তাঁর সেদিনের প্রশ্নগুলো আজ আরও তীব্রতর হয়ে যারা বিকল্প রাজনীতির চিন্তা করছেন তাঁদের মুখোমুখি এসে পড়েছে। যেমন 'স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে চিন্তা ও কর্মকে বিকেন্দ্রীকৃত করার ফলে কেন্দ্রাতিগ দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটে। পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন আঞ্চলিক ভিত্তিতে চিন্তা ও কাজ করতে অভ্যস্ত এই সামাজিক শক্তিকেন্দ্রগুলোর পক্ষে ঐক্যবদ্ধ চিন্তা ও কর্মপ্রয়াস জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিভাবে সম্ভব হবে?' প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, সর্বোদয় সমাজ প্রভৃতি সফল ব্যবস্থার উল্লেখ করে তাঁর অভিমত হচ্ছে, 'পূর্বনির্দিষ্ট অভিমত ও গোঁড়ামি দ্বারা এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়।' দীর্ঘদিন বিপ্লবী দল শ্রীসংঘ, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রজাসমাজতন্ত্রী পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃত্বে অবস্থান করেও তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, 'বিচার ও যুক্তিনির্ভর আলোচনা, স্বচ্ছ দৃষ্টি, পরিচ্ছন্ন বুদ্ধি এবং সর্বাপেক্ষা বেশি মানব সভ্যতার অগ্রগতির ওপর অটুট বিশ্বাসই বর্তমান সঙ্কটকে অতিক্রম করে নতুন সভ্যতা অভিমুখী পদক্ষেপ করতে পারে।'

দেশনেত্রী লীলা রায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহধন্যা এবং তাঁর মননে ও কর্মে এর স্বাক্ষর রয়েছে। গান্ধীজীর স্নেহ ও স্বীকৃতি ও তাঁর জীবনে ঘটেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তো প্রায় সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহকর্মী ছিলেন। তাঁর জীবনসাথি স্বামী অনিল রায় তো সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যকে একটি দার্শনিক প্রেক্ষায় উপস্থাপিত করেছেন। অবশ্য অনিলচন্দ্র নিছক সুভাষচন্দ্রের ব্যাখ্যাকার ছিলেন না, প্রতিভায় ও মৌলিকত্বেও তিনি স্বকীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। লীলা রায়-অনিল রায়ের নিবিড় সংযোগ ও ভাববিনিময়ের মধ্যে লীলা রায়ের ওপর অনিল রায়ের চিন্তার প্রভাব রয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও মনে হয়, বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায় শুধু কর্মক্ষেত্রে নয়, চিন্তার জগতে এঁদের সকলকে ছাড়িয়ে মৌলিকত্বে অনন্যা; যখন তিনি বলেন, 'আজকের সামাজিক মানুষ সর্বগ্রাসী রাজনীতিকে অতিক্রম করে নিজের প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন প্রকৃতির সামাজিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।' ভাবতে অবাক লাগে কতোকাল আগে রাজনীতির দাবিদার বলছেন, নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে বিভিন্ন এলাকা ও জনগণের বিভিন্ন সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হবে।

(...'the new states will increasingly come to share sovereign control over the teritory and citizenry--politics will share space with new grouping, such as social movements. Old allegiance and alliances will melt, old issues disappear, new ones arise.')

(R Gibbens of Bo Reineu-The Politics of Post Modcrnity, P 132)

এই দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু হ্যারল্ড লাস্কির বহুত্ববাদী রাষ্ট্র বা লোহিয়ার চৌখাম্বারাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে অনেকদূর প্রসারিত। এই আবেদন দলীয় আবেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে রাজনীতিকে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও সামাজিক আন্দোলনের সামীপ্যে আনার দাবি। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়েই তিনি নিত্য নিত্য বিচার ও বিবেক দ্বারা অনাগত ভবিষ্যতের দাবি অনুযায়ী স্বাধীনতাকে আহ্বান করেছেন।

বিপ্লবী দেশনেত্রী লীলা রায়

আবুল কাসেম ফজলুল হক

ঢাকা শহরে লীলা রায় (১৯০০-১৯৭০) এখন একটি বিস্মৃত নাম। অথচ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে এই নামটি ছিল এ অঞ্চলে সকলের মুখে মুখে উচ্চারিত এক উজ্জ্বল নাম। লীলা রায় ছিলেন ঢাকায় বৃটিশ উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লববাদী ধারার অন্যতম প্রভাবশালী দীক্ষাদাতা। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে লীলা রায়ের কর্মকেন্দ্র ছিল ঢাকা শহর। তাঁর পৈতৃক ভিটা ছিল তৎকালীন আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার মৌলভীবাজার মহকুমার পাঁচগাঁও গ্রামে। তিনি ঢাকার ইডেন গার্লস স্কুল, কলকাতার বেথুন কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাস করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন কৃতিত্বপূর্ণ। লীলা রায়ের স্বামী অনিলচন্দ্র রায়ের (১৯০১-১৯৫২) পৈতৃক ভিটা ছিল তৎকালীন ঢাকা জেলার সদর মহকুমার নবাবগঞ্জ থানার গোবিন্দপুর গ্রামে। তিনিও কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং বিপ্লববাদী নেতা ছিলেন। তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং ১৯২৩ সালে লীলা রায়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম এ পাস করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ দেখা দেয়। বিপ্লবী জীবনে সংগঠনের মধ্যে এজন্য তাঁদেরকে যথেষ্ট বিপর্যয়ও অতিক্রম করতে হয়েছে। ১৯৩৯ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। দুই বিপ্লবী চরিত্রের এ ছিল এক অসাধারণ মিলন। ঢাকার ৭ বক্‌সি বাজারে ছিল তাঁদের আবাস।

বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের নিগড় থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য বিপ্লববাদী গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতির একাংশ সংগঠনের নেতৃত্বে আস্থা হারিয়ে সংগঠন থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠা করে যুগান্তর সমিতি।

অল্পদিনের মধ্যেই ঢাকায় যুগান্তরের একাংশ সংগঠনের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে আলাদা হয়ে প্রতিষ্ঠা করে শ্রীসংঘ (ইংরেজিতে Social Welfare League)। কিছুকাল পরে শ্রীসংঘের কিছু সদস্য সংগঠন থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন Bengal Volunteers নামে আলাদা সমিতি। আরো পরে সুভাষচন্দ্র বসু ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করার পরে চেষ্টা করেন বিপ্লববাদী সমাজতন্ত্রী ও মার্কসবাদী সকল সংগ্রামী শক্তিকে বিপ্লবের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে। তখন গঠিত হয় আর একটি গুপ্ত সমিতি Bengal Volunteers Corps। আরো পরে গঠিত হয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে শ্রীসংঘ শক্তিশালী সংগঠন ছিল।

এইসব গুপ্ত সমিতির একটি প্রধান কর্মনীতি ছিল ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে গোপনে একে একে শাসক ইংরেজদের হত্যা করা। এ কাজে অগ্রসর হয়ে এসব সংগঠনের কর্মীরা যেমন অনেক ইংরেজকে হত্য করেছেন তেমনি শাসক ইংরেজদের পুলিশবাহিনীর হাতে তাঁরাও অনেক বেশি সংখ্যায় প্রাণ হারিয়েছেন। বৃটিশ আমলে পুলিশ বাহিনী সংহত ছিল এবং তাদের চরিত্রও ভিন্ন ছিল। বিপ্লববাদীদের অনেকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলেছেন, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করেছেন, বছরের পর বছর দশকের পর দশক কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে মুক্তির প্রহর গুনেছেন। তাঁরা আত্মপরিচয় দিয়েছেন বিপ্লববাদী বলে আর ইংরেজ সরকার তাঁদেরকে অভিহিত করেছে সন্ত্রাসবাদী (terrorist), দুষ্কৃতকারী (miscreant) ইত্যাদি বলে।

বিপ্লববাদী সংগঠনসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল শত্রুতামূলক এবং এক সংগঠন সুযোগ পেলে অন্য সংগঠনের কর্মীদের হত্যা করেছে। প্রত্যেক সংগঠনের নেতা-কর্মীরাই মনে করেছেন যে, কেবল তাঁদের সংগঠনের কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতিই নির্ভুল এবং বাকি সকল সংগঠনের কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি ভুল। নেতৃত্বের সমস্যাও ছিল। সংগঠনের ভাঙন তিক্ততার মধ্য দিয়ে হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেকটি সংগঠনের অভ্যন্তরেও প্রায়শ কোনো কোনো কর্মী সম্পর্কে বিশ্বাসভঙ্গের বা বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ উঠেছে এবং তার পরিণতিতে তাঁরা নিজ সংগঠন কর্তৃক প্রাণদণ্ড ভোগ করেছেন। কখনো কখনো বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির নেতাদের মধ্যে ঐক্যের আলোচনা ও কর্মসূচিও গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু কোনো প্রয়াসই সফল হয় নি। তা সত্ত্বেও বিপ্লববাদীদের সংগ্রাম ও সুভাষচন্দ্র বসুর সার্বিক সশস্ত্র আয়োজন ছাড়া কেবল গান্ধী-নেহেরুর অহিংস অসহযোগ আর ইংরেজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে গান্ধী-জিন্নাহর গোলটেবিল বৈঠক ও আপোস-আলোচনা দ্বারা কস্মিনকালেও ভারতবর্ষ ইংরেজ শাসন থেকে মুক্ত হতে পারতো না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতারা বিপ্লববাদীদের সংগ্রামের ফসল অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে নিজেদের ঘরে তুলতে পেরেছিলেন।

বিপ্লববাদীরা বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার নামে অনুপ্রাণিত হলেও কার্যক্ষেত্রে অবলম্বন করেছেন বিবেকানন্দের ত্যাগ ও সেবার আদর্শ। আত্মত্যাগের প্রশ্নে ব্যক্তি

পর্যায়ে তাঁদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় এ নিয়ে সংশয় প্রকাশের কিংবা বিচার-বিবেচনার সুযোগ থাকতো বলে মনে হয় না। সাংগঠনিক জীবনে তাঁরা আত্মত্যাগকে মহিমান্বিত করতে করতে এমন এক উপলব্ধিতে পৌঁছে যেতেন যে, তাঁরা মনে করতেন আত্মত্যাগই মানব-জীবনের মহত্তম লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকে কখনো এইরকম উপলব্ধিতে ঠেলে দিতে চান নি। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রখর নৈতিক চেতনা থাকলেও সে দৃষ্টিভঙ্গি জাগতিক আকাঙ্ক্ষা ও উপযোগবাদের (utilitarianism) উপাদানে সমৃদ্ধ ছিল। সুখ শব্দটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ও সমাজদর্শন বিষয়ক লেখাগুলোতে ঘন-ঘন পাওয়া যায়। বিপ্লববাদীরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত করতেন আত্মনিগ্রহ ও আত্মত্যাগের নীতির ওপর যে নীতির চিন্তাগত উৎস ছিল বিবেকানন্দের শিক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠে* দেখা যায়, জীবনধর্মকে অস্বীকার করে মাতৃমুক্তিতে অর্থাৎ স্বদেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক বিপ্লবীই রিপুর তাড়নায় বিপথগামী হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মোটেই ধার্মিক ছিলেন না আর বিবেকানন্দ ছিলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী।

অনিলচন্দ্র রায় মাত্র তেরো বছর বয়সে, ১৯১৪ সালে মন্ত্রগুপ্তি নিয়ে গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন এবং দুই দশকের মধ্যে নিজের অসাধারণ যোগ্যতার বলে শ্রীসংঘের নেতৃত্বের শীর্ষে আসীন হন। শ্রীসংঘ তখন পূর্ব বাংলায় শক্তিশালী সংগঠন ছিল এবং বিপ্লববাদী সংগঠন হিসেবে সারা ভারতে স্বীকৃত ছিল। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে (১৯৩৮) অনিল রায় ও লীলা রায় উক্ত সংগঠনে সক্রিয় হন এবং নেতৃত্বের *সক্রিয়* উচ্চ পর্যায়ে আসীন হন। লীলা রায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে সহপাঠী অনিল রায়ের প্রভাবে ও আকর্ষণে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হন এবং এম এ পরীক্ষা শেষ করার পরে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। লীলা রায়ের উদ্যোগে ও অনিল রায়ের সহায়তায় গঠিত নারী সংগঠন দীপালি সংঘ ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে ঢাকায় শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত সংগঠন ছিল। শ্রীসংঘের সঙ্গে সংযোগ সত্ত্বেও দীপালি সংঘ মেয়েদের মধ্যে কাজ করেছে প্রকাশ্যে। লীলা রায়ের নেতৃত্বে দীপালি সংঘ অত্যন্ত সক্রিয় সংগঠন ছিল এবং এই সংগঠন মেয়েদের মধ্যে এবং সমাজে দেশপ্রেমের নবচেতনা সঞ্চার করেছিল। বঙ্গদেশের বহু জেলায় এই সংগঠন সম্প্রসারিত হয়েছিল। শিশু-কিশোরদের মধ্যেও লীলা রায়ের কর্মতৎপরতা ছিল। সাংগঠনিক কাজে লীলা রায় অনিল রায়ের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করতেন। ঢাকার হাটখোলায় অবস্থিত নারীশিক্ষা মন্দিরের (বর্তমান শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়) তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথমে কিছুদিন অধ্যক্ষ। আমার বিশ্বাস, নারীশিক্ষা মন্দিরের নাম পরিবর্তন করে যাঁরা শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয় করেছেন তাঁরা অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছেন। ঢাকার কামরুন্নেসা গার্লস হাই স্কুলেরও (পূর্বনাম দীপালি স্কুল) তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাছাড়াও নানা ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র তাঁর নেতৃত্বে ঢাকায় গড়ে উঠেছিল।

লীলা রায়ের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় ঢাকা থেকে ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা *জয়শ্রী* (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ ১৩৩৮)। প্রথম সংখ্যার সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয়তে লীলা রায় উল্লেখ করেন : "বাংলার মহিলাদের মুখপত্ররূপে কোনো পত্রিকা এ পর্যন্ত ছিল না। এই অভাব দূর করিবার প্রয়াসে *জয়শ্রী* প্রকাশিত হইল।... আশা করি বাংলার পাঠক-পাঠিকাগণ-বিশেষতঃ মহিলাগণ—*জয়শ্রী*-কে সাদরে গ্রহণ করিয়া লইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। *জয়শ্রী* মহিলাদের কাগজ। ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার সকল দায়িত্ব তাঁহাদিগকেই লইতে হইবে।" *জয়শ্রী*'র উদ্দেশ্য ও কর্মনীতি সম্পর্কে লীলা রায় বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেন : "মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও শঙ্কাহীন দেশপ্রেমের ভাব জাগ্রত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই *জয়শ্রী* আত্মপ্রকাশ করল।" "এ পত্রিকার উদ্দেশ্য সর্বপ্রকার দেশসেবা।" "ভাবী ভারত সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসারে গঠিত হবে, অতএব দেশের শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সহযোগে গণআন্দোলন গড়ার দিকেই মন দেওয়া উচিত। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, বিশ্বমানবের অবিচ্ছিন্ন প্রগতিতে আমরা বিশ্বাসী।... যেসব শক্তি এই প্রগতিকে অগ্রসর করছে, দৃঢ়তার সঙ্গে *জয়শ্রী* তাদের সমর্থন করবে। বিপক্ষ শক্তিকেও সমস্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বাধা দেবে।" "ভবিষ্যৎ সমাজ কি রকম হবে এ নিয়ে আজ মত-সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। *জয়শ্রী* এই মত-সংঘর্ষের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সামাজিক আদর্শ বা মতবাদের প্রতিনিধি।... রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণসংগ্রামকে *জয়শ্রী* স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পন্থা মনে করে। শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ছাত্র ও যুব আন্দোলন, কংগ্রেস আন্দোলন, নারী আন্দোলন—এই সকলের সমবেত সংহতিতে যে সংগ্রাম গড়ে উঠবে তাকেই বলা চলে গণসংগ্রাম।... *জয়শ্রী*'র মতে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল নয়, আদর্শনৈতিক দলই বর্তমান যুগে প্রয়োজন।" "সারা বিশ্বের ওপর 'আমেরিকান সেঞ্চুরি' অথবা রুশ-চীনের পক্ষচ্ছায়া বিস্তারের পরিবেশ রচনা নয়। স্ব-স্ব প্রয়োজন, প্রতিভা, ঐতিহ্যবিচার ও রুচি অনুযায়ী বিচিত্র, বিভিন্ন পথে সভ্যতার ক্রমবিকাশে আমরা বিশ্বাসী। ভারতবর্ষকে সেই মহান প্রয়াসের পূর্ণ শরিক ও অংশীদার করতে আমরা প্রয়াসী ও দৃঢ়প্রত্যয়ী। আমাদের নীতি—আমরা নির্ভেজাল ভারতপন্থী।"

জয়শ্রী রাজনৈতিক আদর্শের পত্রিকা হলেও শিল্প-সাহিত্যের প্রতিও এর বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং সমাজ ও জাতি গঠনে সাহিত্যের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে তারাশঙ্কর-জীবনানন্দ পর্যন্ত—আরো পরবর্তীকালেরও, বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখা এতে মুদ্রিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে যামিনী রায়ের চিত্রকলা। সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালাতে গিয়ে এবং *জয়শ্রী* প্রকাশ করতে গিয়ে লীলা রায়কে বারবার কারা-নির্যাতন বরণ করতে হয়েছে। *জয়শ্রী*তে লীলা রায়ের সহকর্মীরাও কারানির্যাতন ভোগ করেছেন। *জয়শ্রী*'র প্রকাশও একাধিকবার নিষিদ্ধ হয়েছে। জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। দীর্ঘ ছয় বছর কারা-নির্যাতন ভোগের পর পুনরায় *জয়শ্রী* প্রকাশে উদ্যোগী হলে ১৯৩৮ সালে রবীন্দ্রনাথ লীলা রায়কে

লেখেন : "মানুষের হিংস্র বর্বরতার অভিজ্ঞতা তুমি পেয়েছ—আশা করি এর একটা মূল্য আছে, এ তোমার কল্যাণসাধনাকে আরো বেশি বল দেবে। কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করে—পাশব বলে মনুষ্যত্বকে চিরদিনের মতো পিষ্ট করে দেবে, কিন্তু মনুষ্যত্বের মহিমার জোরেই সেটা সত্য না হোক। পশুশক্তির উর্ধ্বে জয়ী হোক তোমার আত্মার শক্তি।" কারা-নির্যাতন আর বারবার *জয়শ্রী* বন্ধ করে দেয়া এবং জামানত বাজেয়াপ্ত করা সত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশে লীলা রায়ের সঙ্কল্পনিষ্ঠা অনেককেই বিস্মিত করে। ১৯৪৬ সালে সরোজিনী নাইডো লীলা রায়কে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন : 'The Jayasree, like the Phoenix has died many times and re-risen out of its own ashes.' *জয়শ্রী*'র পেছনে জনসমর্থন ছিল বলেই সরকারি নির্যাতন অতিক্রম করে জয়শ্রী টিকতে পেরেছিল।

লীলা রায় সাহসী ও দায়িত্বশীল সম্পাদক ছিলেন। *জয়শ্রী* প্রথম পর্যায়ে স্বল্পকাল ঢাকা থেকে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। *জয়শ্রী* এখনও প্রকাশিত হয়, তবে এখন এর বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারিতা আগের মতো নেই। লীলা রায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ও *জয়শ্রী*'র লক্ষ্য ছিল বিকাশশীল। প্রথম পর্যায়ে *জয়শ্রী* মহিলাদের পত্রিকা ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে এটি সর্বজনীন পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। লীলা রায় যতোদিন সক্ষম ছিলেন ততোদিনই পরিপূর্ণ যত্নে ও প্রাণপণ শ্রমে এই পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। এতে নারী-পুরুষ সম্পর্কে উন্নতি ও নারীমুক্তি, বৃটিশ-শাসন থেকে জাতির মুক্তি, ভারতপন্থা, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়েছে। *জয়শ্রী* লীলা রায়ের অক্ষয় কীর্তি।

কংগ্রেসে অনিল রায় ও লীলা রায় সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগী ও সহকর্মী ছিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লক গঠিত হলে এই সংগঠনের নেতৃত্বের শীর্ষ পর্যায়ে তাঁরা সাংগঠনিক কাজে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। সুভাষ বসুর অনুরোধে লীলা রায় দলের মুখপত্র Forward Block'র সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকা সম্পাদনা করতে গিয়েও তিনি সরকারি নির্যাতন ভোগ করেন।

লীলা রায় এবং অনিল রায় দু'জনেরই রাজনীতি ও সমাজদর্শন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলি আছে। তাঁদের পরিণত বয়সের চিন্তার মর্মে আছে ভারতপন্থা, গণধারা, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সংশ্লেষণধর্মী বা সমন্বয়কারী স্বদেশী ঐতিহ্য অবলম্বনধারী তাঁরা মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের চিন্তাধারাকে আত্মীকৃত করতে চেয়েছেন। ভারতপন্থা অবলম্বন করে সমাজতন্ত্রের একটা ভারতীয় রূপ তাঁরা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। অনুকরণ কিংবা অনুসরণে আগ্রহী ছিলেন না তাঁরা, তাঁদের আগ্রহ ছিল সংশ্লেষণ ও আত্মীকরণে।

অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা আর নেতৃত্বের বলিষ্ঠ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন লীলা রায়। জনগণের মুক্তির সংগ্রামে নিবেদিত, প্রতিভাশালী, সাহসী, কর্মঠ, মিষ্টভাষী, সুদর্শনা এই মহিলার সুউন্নত ব্যক্তিত্বে ছিল দুর্লভ আকর্ষণ শক্তি।

মানুষকে কাছে টানার ও আপন করে নেয়ার সহজাত গুণে সমৃদ্ধ ছিল তাঁর মন। লীলা রায়ের গুণাবলি সম্পর্কে অনেকেই লিখেছেন। ১৯২০ ও ১৯৩০'এর দশকে ঢাকার ও বঙ্গদেশের এবং ১৯৪০-এর দশকে সারা ভারতের রাজনীতিতে কিংবদন্তি তুল্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। ভারতের প্রথম শহীদ নারী বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সূর্য সেনের পরামর্শে লীলা রায়ের কাছেই বিপ্লবের দীক্ষা নিয়েছিলেন এবং দীপালি সংঘের সদস্য হয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পরে দেশব্যাপী ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। তখন অনিল রায় গ্রেফতার হয়ে গেলে শ্রীসংঘের নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন লীলা রায়। তখনও তাঁদের বিয়ে হয় নি। দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পরিচালনা, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ ইত্যাদি সকল কাজে লীলা রায় অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। কিন্তু বছর পার হতে না হতেই লীলা রায়কে কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি প্রথমবার কারারুদ্ধ হন ঢাকায় ১৯৩১ সালে এবং শেষবার কারারুদ্ধ হন কলকাতা ১৯৬৪ সালে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনতিপরে পূর্ববাংলা সরকারও ঢাকায় তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিল। বারবার কারারুদ্ধ থেকে তাঁর কর্মজীবনের অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লীলা রায়কে এম এ পাস করার পরে আহ্বান করেছিলেন বিশ্বভারতীতে কোনো গুরুদায়িত্ব গ্রহণের জন্য। লীলা রায় সেদিন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করাকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র বসুর অনুপস্থিততে অনিল রায় ও লীলা রায় ফরওয়ার্ড ব্লককে সংগঠিত ও শক্তিশালী করে তোলার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে চূড়ান্ত পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ফরওয়ার্ড ব্লক সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। সুভাষ চন্দ্র তখন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অক্ষ-শক্তির (জার্মানি, ইতালি, পর্তুগাল, স্পেন, জাপান) সহায়তা নিয়ে অগ্রসর হতে থাকেন। হিটলার মস্কো আক্রমণ করলে রাশিয়া মিত্র শক্তির (বৃটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া) সাথে যোগ দেয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন মিত্র শক্তির পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে জনযুদ্ধ নামে অভিহিত করে। বৃটিশ সরকারসহ ভারতের সকল রাজনৈতিক দল তখন সুভাষচন্দ্র ও ফরওয়ার্ড ব্লককে দশ দিক থেকে আক্রমণ করতে থাকে। সেই দুঃসময়ে লীলা রায় দুঃসাহসের সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম, সুভাষচন্দ্র ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সমর্থনে লেখনী চালনা করে পরম সততা ও শঙ্কল্পনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে সকলের মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগান। একটা প্রশ্ন এখানে তোলা যায় : বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অক্ষ-শক্তিকে যে দৃষ্টিতে বিচার করে দরিদ্র বিশ্বের জনসাধারণের কি সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা উচিত?

অনিল রায় ও লীলা রায় বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হিসেবেও সক্রিয় ভূমিকা

পালন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা থেকে লীলা রায় ভারত ইউনিয়নের Constituent Assembly'র সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবু বিপ্লবী ধারা ও ফরওয়ার্ড ব্লকই ছিল লীলা রায় ও অনিল রায়ের মূল সংগঠন ও কর্মধারা। প্রথম জীবনে গুপ্ত সমিতির রাজনীতি করলেও পরে বিপ্লবী আদর্শ নিয়েও তাঁরা গণধারার রাজনীতি করেছেন। ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের পরে লীলা রায় ও অনিল রায় পূর্ব বাংলায় এবং প্রধানত পশ্চিম বাংলায় বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসনের কাজে যথাসাধ্য সক্রিয় ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও দাঙ্গা-সমস্যার সমাধান এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্যও তাঁরা আজীবন কাজ করেছেন। দেশ-বিভাগ তাঁদের মর্মাহত করেছিল। বৃটিশ-শাসন অবসানের অনতিপরে *জয়শ্রী*তে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০) রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে 'রাজনীতি কোন্ পথে?' শীর্ষক প্রবন্ধে লীলা রায় লিখেছিলেন, "ভারতবর্ষের বিপ্লব অহিংস হবে না রক্তঝরানো পথে হবে তার আবির্ভাব,—একথা কেউ আজ বলতে পারে না। এ-বিষয়ে কোনো গোঁড়ামি থাকা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক যেমন নয়, তেমনি যা আসে আসুক, যখন আসে তখন ব্যবস্থা হবে—এ মনোভাবও কোনো সচেতন কর্মীর মনোভাব নয়। কাজেই সম্ভবমতো বিপ্লবের জন্য শক্তি সংহত করতে হবে—তার শেষ অভিব্যক্তি যাই হোক না কেন। এই শক্তি সংহত করা বলতেও জনতার সকল স্তরে অজস্র শক্তিকেন্দ্র গড়ে তোলা বোঝাবে, যারা একদিকে সর্বপ্রকার অত্যাচারকে রুখবার ক্ষমতা রাখে এবং তাকে পরাজিত করে শাসনভার নিজের হাতে নিতে পারে। এই শক্তিকেন্দ্র যতো দ্রুত গড়ে তুলতে এবং যে পরিমাণে অপ্রতিহত করতে পারা যাবে, ভারতের অনাগত বিপ্লবের সম্ভাবনা ততো বেশি সুনিশ্চিত হবে। রাজনৈতিক দল ও কর্মীদের ওপর নির্ভর করছে সে সম্ভাবনাকে বাস্তবে উত্তীর্ণ করা।' বিপ্লব বলতে কেবল পুরাতনকে ধ্বংস করা নয়, মূলত নবসৃষ্টি বোঝায়—এই ধারণা থেকে লীলা রায় ও অনিল রায় কখনও বিচ্যুত হন নি। সুভাষচন্দ্র বসুর চিন্তাধারা ও নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত তাঁদের জীবনে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। একটা কল্পিত উন্নত স্বদেশের রূপ তাঁদের চেতনায় ছিল।

আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন তাঁরা। আদর্শের বাস্তবায়ন চেয়েছেন; কিন্তু আলাদাভাবে নিজেদের জন্য জীবনে তাঁরা মন থেকে মুছে দিতে পারেন নি। লীলা রায়ের লেখায় আছে : "জয়-পরাজয়, সাংসারিক সার্থকতা-ব্যর্থতা এ-সবে কি মানুষের কিছু পরিচয় আছে? আছে তার চিন্তায় ও কর্মে, সাধনায় ও সংগ্রামে। Achievements কি? কোনো পাওয়া? ভেবে ভেবে দেখেছি অনেক, তাতে আমার কোনো আকর্ষণ নেই।" "চিরবিপ্লবীর জীবনই চাই, মানুষকে ভালোবাসি, চিরদিন বেসেছি, আমার সকল কাজের উৎসাহ তাই, কিন্তু ভালোবাসা আমার বন্ধন নয়—প্রেরণা ও আনন্দ।" "আমি আত্মনিবেদিত বিপ্লবী, পিছুটান আমি রাখি না।" "সমুদ্র প্রতিক্ষণ আমার কাছে নতুন বার্তা নিয়ে আসে, সমুদ্র সামনে এলেই জগৎ ও জীবন—কোথা থেকে এলাম কোথায় যাচ্ছি—এসব প্রশ্ন আমার মনকে উদাস

করে দেয়।"—জীবনের শেষ পর্যায়ের এসব উক্তিতে কি কোনো অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ নেই? কেবল আক্ষরিক অর্থই কি একথাগুলোর একমাত্র অর্থ? আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, চিন্তার ও কাজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে conditioned reflex-এর মতো কিছু একটা ব্যাপার হয়তো তাঁদের জীবন প্রক্রিয়ায় ঘটে যায়। তবু যেন দ্বন্দ্বও অনিরাকৃত থেকে যায়। লীলা রায়ের একজন জীবনীকার লিখেছেন, শ্রীসংঘে যোগদান উপলক্ষে অনিল রায়ের সঙ্গে আলাপকালে তাঁর মন আন্দোলিত হয়েছিল এইসব প্রশ্নের দ্বারা : "কোন্ পথ প্রশস্ততর? অহিংস অসহযোগ না সর্বস্বপণ বিপ্লব-সাধনা? গোপন বিপ্লবী দলের লৌহকঠিন কাঠামোতে তাঁর যুক্তিবাদী মানস পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাবে কি?–না এই কাঠামোর নির্বিচার আনুগত্যের দাবি মানতেই তাঁর ব্যক্তিসত্তা নিঃশেষিত হবে?" "বিপ্লবী নেতা অনিল রায় ছিলেন প্রকাণ্ড প্রশান্ত পুরুষ। এই বিচিত্রকর্মা পুরুষের উপনিষদসিক্ত মনেও ছাত্রজীবনে পথজিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল। কোন্ পথ? আত্মমোক্ষ না দেশের মুক্তি? দুই দিনের বদ্ধঘরের নিরালায় নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার পরে অনিল রায় মীমাংসা নিয়ে বেরিয়ে এলেন—আত্মমুক্তি নয়, বিপ্লব-সাধনার মধ্য দিয়ে মাতৃভূমির বন্ধনমুক্তির দুর্গম পথ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে।" অনিল রায়ই লীলা রায়কে রাজনীতিতে আকৃষ্ট করেছিলেন এবং বিপ্লববাদী ধারায় যুক্ত করেছিলেন। অনিল রায় নানা গুণে সমৃদ্ধ, অসাধারণ জ্ঞানী, দুঃসাহসী, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত, উদ্দেশ্যনিষ্ঠ নেতা ছিলেন। *জয়শ্রী*তে প্রকাশিত তাঁর অর্থাতো পথ-জিজ্ঞাসা, 'বৈজ্ঞানিকের জগত', 'শঙ্কর মায়াবাদ ও ভারতের দুর্গতি', 'স্বাধীনতার রূপান্তর', 'রাজনৈতিক দল ও নেতা', 'সোস্যালিজম ও কমিউনিজম', 'ফরোয়ার্ড ব্লক, শ্রেণীচেতনা ও রুশীয় নারোদ্‌নিকী', 'সংখ্যালঘুর আনুগত্য', 'ইসলামিক সংস্কৃতি', 'সংস্কৃতির বিপর্যয়' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও সন্দর্ভে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় আছে। লীলা রায়ের লেখার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তাঁদের বিয়ের পর থেকে। তাঁর লেখাও আন্তরিকতাপূর্ণ, চিন্তাসমৃদ্ধ। তাঁদের রচনাবলি প্রকাশিত হলে বাংলা ভাষায় চিন্তাধারায় তা গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনরূপে স্বীকৃতি পাবে।

বিবাহের পূর্বে লীলা রায় পরিচিত ছিলেন লীলাবতী নাগ নামে। বিবাহের পরে প্রথমে লীলাবতী রায় এবং অল্পদিন পরেই লীলা রায় নাম গ্রহণ করেন। বিপ্লবী সংগঠনে আরো কোনো নাম তিনি নিয়ে থাকতে পারেন। পিতা-মাতা তাঁর ডাকনাম রেখেছিলেন বুড়ি। লীলা রায় নামেই তিনি পরিচিত।

লীলা রায়ের জন্মের পরে একশ' বছর পূর্ণ হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ৩২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। লীলা রায় ও অনিল রায়কে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে দেয়া উচিত হবে না। বিপ্লববাদীরা অধিকাংশই পরবর্তীকালে মার্কসবাদে দীক্ষা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেছিলেন। মণি সিংহ, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, সুখেন্দু দস্তিদার, জিতেন ঘোষ, খোকা রায়, নগেন সরকার, সোমেন চন্দ, রেবতী

বর্মণ, ফণী মজুমদার, মনোরঞ্জন ধর, সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত প্রমুখ পূর্ব বাংলার সুপরিচিত জনেরা অনেকেই প্রথম জীবনে বিপ্লববাদী গুপ্ত সমিতির কর্মী ছিলেন। চট্টগ্রামের সূর্য সেন ও তাঁর সহকর্মীরা ছিলেন যুগান্তর সমিতির বিপ্লবী। বিপ্লববাদীদের ও কমিউনিস্টদের শতাব্দীকালের বিপ্লবপ্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু জেনে নেয়ার দরকার আছে ভবিষ্যৎ প্রগতির প্রয়োজনে। অতীত ভুলের পুনরাবৃত্তি পরিহার ও ভবিষ্যৎ সাফল্যের পথ সন্ধানে সহায়তা লাভের জন্য ইতিহাসচেতনা ও ইতিহাসচর্চা অপরিহার্য। অনিল রায় ও লীলা রায়ের জীবন ও কর্ম এবং শ্রীসংঘ ও দীপালি সংঘের ইতিহাস থেকে বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামের এবং ঢাকার রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানার সুযোগ আছে। অতীতের অনেক বিস্মৃত অভিজ্ঞতা আমাদের অজ্ঞাতে আমাদের চেতনায় গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। প্রগতির দাবিতে সেগুলো সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাত হওয়া দারকার। অতীতচারিতা নয়, অভিজ্ঞতার সঞ্চয় আর নতুন জ্ঞান নিয়ে সমৃদ্ধ-সুন্দর-উজ্জ্বল নতুন ভবিষ্যৎ সৃষ্টির অভিলাষে আমরা সামনে চলতে চাই।

লীলা নাগের জীবনের অজানা কিছু তথ্য

রতন লাল চক্রবর্তী

লীলাবতী নাগকে (পরে রায়) একজন নারী শিক্ষার পথিকৃৎ বা ধর্মীয় কোনো পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার অর্থ হবে কূপমণ্ডুকতা এবং জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। প্রকৃতপক্ষে লীলা নাগ ছিলেন সমকালীন পরিস্থিতিতে একটি অনন্য বিপ্লবী প্রতিভার মূর্ত প্রতীক। দুঃখজনক হলেও সত্য, এপার বাংলায় লীলাবতী রায়ের বিশাল কর্মকাণ্ডের কোনো মূল্যায়ন হয় নি। এদেশে তাঁর মূল্যায়নে সর্বপ্রধান বাঁধা অযোগ্যতা ছিল তাঁর ধর্মীয় পরিচয়। পশ্চিমবঙ্গে তাঁর বিপুল কর্মসাধনা নিয়ে কিছু কিছু কাজ হলেও সর্বভারতীয় পর্যায়ে সঠিক মূল্যায়ন, আমার বিবেচনায়, আজও হয় নি। ভারতবর্ষে জাতীয় পর্যায়ে তাঁর মূল্যায়নের পথে বিশেষ বাধা ছিল তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়। বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে তিনি যোগদান করেছিলেন।

এদেশে কেউ কেউ লীলা নাগের পরিচয় জানেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী হিসেবে, মুষ্টিমেয় গবেষক জানেন লীলা নাগকে 'জয়শ্রী' নামক একটি মহিলা পত্রিকার সম্পাদিকা হিসেবে। কিন্তু ক'জন জানেন লীলা নাগের রাজনৈতিক জীবন, প্রজ্ঞা ও তাঁর আপোসহীন সংগ্রামের বিবরণ? সঠিক অর্থে বলা যায় তিনি ছিলেন তুলনাহীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

একথা অনেকেরই জানা যে, ১৯২৬ সালে লীলা নাগ গড়ে তুলেছিলেন বাংলার প্রথম ছাত্রী সংগঠন, যা 'দীপালি সংঘ' নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীকালে লীলা নাগ যোগ দেন 'শ্রীসংঘ' নামক প্রতিষ্ঠানে, যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর স্বামী অনিল রায়। দীপালি সংঘ ও শ্রীসংঘ কোনো কোনো সময় যৌথভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতো। এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে : *Report on the Dacca Sri Sangha upto 1929* —by R. E. A. Ray, Special Superintendent, I B, C I D, Bengal, Calcutta :

Bengal Government Press, 1932 (For official use only); *Terrorism in Bengal : A Collection of Documents*,—Compiled and Edited by Amiya K. Samanta, (Calcutta : West Bengal Government Press, 1935). Vol. II.-শীর্ষক বিবরণীতে।

বর্তমান প্রবন্ধে লীলা রায়ের জীবনের দুটি অজানা বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। এই তথ্যসমূহ পাওয়া গেছে বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষিত দলিলপত্রে। লীলা নাগ জীবনে বহুবার এবং বহুদিন কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। প্রথম জীবনে কংগ্রেসের সমর্থক থাকলেও ১৯৩৯ সাল থেকে লীলা রায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' যোগদান করেন। ইতোমধ্যে লীলা নাগ অনিল রায়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিচিত হতে থাকেন লীলা রায় নামে। এ সময় সুভাষচন্দ্র বসুর নির্দেশে যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও দিল্লিতে ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত ছিলেন লীলা রায় ও অনিল রায়। ফলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে লীলা রায়ের রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রেফতারের প্রতিবাদে পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে ভাষণ দেয়ার অভিযোগে ১৯৩৯ সালের ১৭ জুলাই লীলা রায় গ্রেফতার হন। মাসাধিককাল কারাভোগের পর ২৯ আগস্ট তিনি কারামুক্ত হন।

১৯৪২ সালে ক্রিপ্‌স মিশনের বিরোধিতা এবং বিবৃতি প্রদান করলে ১০ এপ্রিল লীলা রায়কে গ্রেফতার করে দিনাজপুর জেলে প্রেরণ করা হয়। দিনাজপুর জেলে দীর্ঘদিন অবস্থান ও জেল কর্তৃপক্ষের নির্যাতন ও অবহেলার ফলে ১৯৪৪ সালে লীলা রায় মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় বঙ্গীয় আইন পরিষদে শ্রীমতী নীরা দত্তগুপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আইনানুগতভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে লীলা রায় নামে কোনো নিরাপত্তা বন্দি দিনাজপুর জেলে আটক রয়েছে কিনা? বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বিধায় তাঁকে কোনো মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তর করা যায় কিনা? এই প্রশ্ন দুটি স্বরাষ্ট্র দফতরে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্মকর্তা জানান যে :

Mrs. Leela Roy was having excessive loss of blood for the last few months. Symptomatic treatment was given to her at the Dinajpur Jail but without improvement. At her own request she was then permitted to have homeopathic treatment inside the jail at her own cost and risk on the 21st March, 1944. She was further examined on the 30th April, 1944 by the Chief Lady Doctor of the Arakanese Camp at Dinajpur, who diagnosed the case of fibriod of the uterus which resulted in the excessive hemorrhage. As there was no proper arrangements for the treatment of female diseases at the Dinajpur Jail, orders were issued on

the 4th May, 1944 for her transfer to Presidency Jail. But as she was not fit to travel, she was removed temporarily to the Dinajpur Sadar Hospital on 9th May, 1944. (Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Jail, Bangladesh National Archives, Bundle No. 18, April, 1947, Proceedings No. 18.)

এ সময় লীলা রায়ের স্বামী অনিল রায় ছিলেন দমদম জেলে। জেল হতেই অনিল রায় অসুস্থ স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানিয়েছিলেন। অনিল রায়ের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় যে তাঁর আবেদনটি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

The question of permitting her husband security prisoner Babu Anil Roy of the Dum Dum Central Jail to be by the side of his ailing wife is under consideration. (Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Jail, Bangladesh National Archives, Bundle No. 18, April, 1947, Proceedings No. 18.)

একইভাবে লীলা রায়ের ভাই নির্মল নাগ তাঁর বোনের সাথে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করলে স্বরাষ্ট্র বিভাগ হতে অনুরূপ মন্তব্য করা হয়।

দিনাজপুর জেলের কারাগারের চিকিৎসক লীলা রায়ের অবস্থা জটিল হিসেবে আখ্যায়িত করলে তাঁকে দিনাজপুর হাসপাতালে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করা হয়। এতেও লীলা রায়ের শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হলে সরকারের পক্ষ হতে বলা হয় যে, কলকাতার কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক কলকাতা জেলে স্থানান্তর করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে ডাক্তার শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী বসু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলে সরকারি কর্তৃপক্ষের মধ্যে সন্দেহের দানা বেধে ওঠে। কেননা সরকারি ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ডা. মৈত্রেয়ী বসুকে রাজনৈতিকভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করেন।

As regards the question of a specialist visiting her from Calcutta, M. C. has already stated that if someone volunteered the question will be considered. Mr. K. S. Ray and Dr. N. Sanyal have intimated that Dr. Mrs. Moitrayee Bose has agreed to go. We have asked the I. B. for their views on the proposal. The I. B. are likely to oppose strongly as Dr. Mrs. Bose is politically undesirable. (Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Jail, Bangladesh National Archives, Bundle No. 18, April, 1947, Proceedings No. 18.)

যাই হোক, এ সময়ে লীলা রায়ের শারীরিক অবস্থা এতই খারাপ হয়ে পড়েছিল যে স্বাভাবিকভাবে তাঁর কলকাতা গমন ছিল প্রায় অসম্ভব। এ সময় সরকার তাঁকে কলকাতা জেলে স্থানান্তরের অনুমতি দেয়। কিন্তু কলকাতা মেডিকেল কলেজে

লীলা রায়ের স্থানান্তরের বিষয়টি কলকাতার বিশেষজ্ঞদের মতামতের ওপর নির্ভর ফেলে রাখা হয় :

Orders for her immediate transfer to a Calcutta Jail have been issued. She is not prepared to have the usual medical treatment; she has been given necessary facilities for treatment at her own choice. The question of her transfer to the Medical College Hospital will depend on the advice of specialists in Calcutta. (Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Jail, Bangladesh National Archives, Bundle No. 18, April, 1947, Proceedings No. 18.)

বঙ্গীয় আইন পরিষদে প্রশ্নোত্তর দেয়ার সময় স্বরাষ্ট্র বিভাগ হতে উপদেশ দেয়া হয় যে, ডাক্তার মৈত্রেয়ী বসুর সম্মতির বিষয়টি যেন সাধারণভাবে সকলের অগোচরে রাখা হয়।

The department advises that Dr. Mrs. Bose's name should be left and unless brought in by the opposition, and if so, the answer should be 'the question will be considered later.' (Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Jail, Bangladesh National Archives, Bundle No. 18, April, 1947, Proceedings No. 18.)

যাই হোক শেষ পর্যন্ত সরকার পক্ষ হতে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয় যে, নিরাপত্তাজনিত কারণেই কোনো মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে লীলা রায়কে স্থানান্তর করা সমীচীন নয়। সরকার পক্ষ থেকে আরো বলা হয় যে, লীলা রায় নিজের ইচ্ছায় হোমিওপ্যাথিক বা কবিরাজি চিকিৎসা গ্রহণ করছেন। এই চিকিৎসায় কোনো উন্নতি না হলে সরকার বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

It has been considered inadvisable on security ground to remove her to Medical College Hospitals unless it becomes indispensable for saving her life and as such the question of her release does not perhaps arise. She herself has expressed a predilection for Homeopathic or Kaviraji treatment and will have operative treatment in the last resort if the former methods fail. (Government of Bengal, B-Proceedings, Home, Jail, Bangladesh National Archives, Bundle No. 18, April, 1947, Proceedings No. 18.)

উল্লেখ্য, লীলা রায়কে দিনাজপুর হাসপাতালেই অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল এবং পরে একটু সুস্থ হলে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠানো হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে লীলা রায় কারামুক্তি লাভ করেন।

নারী শিক্ষার জন্য লীলা নাগ ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। কেবল ঢাকা শহরেই তিনি পাঁচটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে ক. অভয়দাস লেনের

দীপালি স্কুল, খ. টিকাটুলীর নারী শিক্ষা মন্দির, গ. বক্‌শীবাজারের শিক্ষাভবন, ঘ. কায়েতটুলীর শিক্ষায়তন এবং ঙ. বাংলাবাজারের বালিকা বিদ্যালয়। ১৯২৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি লীলা নাগ নারী শিক্ষা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩০ সালে এই বিদ্যালয়টি বোর্ডের অনুমোদন লাভ করে। ১৯৩৯ সাল হতেই সরকার এই বিদ্যালয়ে প্রদেয় আর্থিক অনুদান বন্ধ করে দেয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হলে লীলা রায় পূর্ব বাংলায়ই থেকে যান। নারী শিক্ষা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে তিনি পূর্ব বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সচিবের কাছে নারী শিক্ষা মন্দিরের জন্য আর্থিক অনুদান দাবি করেন। এ সময় নারী শিক্ষা মন্দিরের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ছিলেন লীলা রায় নিজেই। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ঢাকার প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী অনিলচন্দ্র ঘোষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. শশীভূষণ চৌধুরী, ঢাকা জজ কোর্টের আইনজীবী পরেশ নাথ বণিক, ঢাকার ডাক্তার অদিতি কুমার গুপ্ত ও নারী শিক্ষা মন্দিরের শিক্ষিকা অনিমা মিত্র, নারী শিক্ষা মন্দিরের অধ্যক্ষ ও সচিব উষা রানী রায় ও শিক্ষক নগেন্দ্র মোহন বসু। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরাট একটি অংশ দেশ ত্যাগ করে এবং এর ফলে নারী শিক্ষা মন্দিরের শিক্ষার্থী সংখ্যা হ্রাস পায়। এই অবস্থায় কর্তৃপক্ষের কাছে লীলা রায় আবেদন জানিয়েছিলেন :

That in addition to the above, owing to the sudden closing of the institution by order of the Board in June last and owing to a sharp fall in the roll due to transfer of Hindu officers who formed the bulk of the students, this locality being almost exclusively a Hindu area, the institution is facing a very serious crisis, and if the Government do not come to the aid of the institution, it will have to close down, which would be a great loss to the cause of education. (Government of Bengal, B-Proceedings, Education, Bangladesh National Archives, Bundle No. 71, July 1951, Proceedings No. 93-94.)

পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা যায় যে, সরকার নারী শিক্ষা মন্দিরের বাজেট বরাদ্দ কমিয়ে দেন। অন্যদিকে, লীলা রায় দেশত্যাগ করে ভারত গমন করলে নারী শিক্ষা মন্দিরের নাম পরিবর্তিত হয়ে, শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয়, নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব অব্যাহত থাকে।

এই প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য ছিল লীলা রায়ের জীবনের অজানা অধ্যায়ের কিছু তথ্য সাধারণের নিকট উপস্থাপন করা, লীলা রায়ের জীবনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও বিপ্লবী নেতৃত্বের মূল্যায়ন করা নয়। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, লীলা রায় বাংলাদেশে কতটুকু মর্যাদা পেয়েছেন, যদিও তাঁর জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের অধিকাংশই ছিল পূর্ববাংলাকে ঘিরে, যা আজ স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

অনিল রায়-লীলা রায় : আর এক প্রেক্ষাপট

নির্মল সেন

অনিল রায় এবং লীলা রায় এঁদের মধ্যে যে-কোনো একজন সম্পর্কে লিখতে গেলে অপরজনকে বাদ দেয়া যায় না। লীলা রায়ের পৈতৃক পদবি নাগ এবং তাঁর নাম লীলাবতী নাগও গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। লীলা নাগ জন্মেছিলেন ১৯০০ সালে এবং অনিল রায় ১৯০১ সালে। তাঁদের জন্মের কালটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একালের সাথে জড়িত সেকালের রাজনীতি এবং তাঁদের পারিবারিক পটভূমি।

ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম বাগানে। একশ বছর পর ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ। শঙ্কিত বৃটিশ। ভারতবাসী স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করছে সশস্ত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এর পরবর্তীকালে পরপর ঘটনা ঘটতে থাকে। এ ঘটনা শিক্ষিত তরুণদের মনে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সেকালের শিক্ষানীতি। অপরটি ইলবার্ট বিল।

টমাস বেরিংটন মেকলে। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারের ইতিহাসের সাথে এ নামটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি ভারতের পেনাল কোডের রচয়িতা। ঐতিহ্য আজো আমরা বহন করছি। তিনি একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল একদল শিক্ষিত ভারতীয় দালাল সৃষ্টি। তার ভাবনায়, ওরা রক্তে ভারতীয় হলেও ধ্যান-ধারণায় হবে বৃটিশ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য বাঁচিয়ে রাখার হাতিয়ার। তার এ প্রচেষ্টা সম্পর্কে '*White Shahibs in India*' নামক পুস্তকে বৃটিশ লেখক Reginald Reynolds লিখেছেন—বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের জন্ম ও বিক্ষোভের মূল খুঁজে পাওয়া যাবে মেকলের নীতির মধ্যে। এই নীতি দ্বারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের জনসাধারণের মাঝ থেকে একটি বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিল। এদের ইউরোপীয় আদর্শে শিক্ষিত করে তোলা হয়েছিল। বৃটিশ শাসন ব্যবস্থার নিম্নস্তরের কাজগুলো করানোই ছিল এ সম্প্রদায় সৃষ্টির লক্ষ্য। এ কাজ শ্বেতাঙ্গদের

জন্য সম্মানজনক ছিল না। বৃটিশ সরকার এভাবে কেরানির কাজ সৃষ্টি করে এবং তাদের বেতন ভাতা কমিয়ে রাখে। শ্রমের বাবদ ব্যয়ে কেরানিকুলের জন্য এ পদক্ষেপ লাভজনক হলেও এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই অবিমিশ্র সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে না।... এ থেকেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে নতুন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল। Vereney Lovett তার History of National Movemat in India নামক পুস্তকে লিখলেন—ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলাদেশে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও শিক্ষকের পদগুলো পূর্ণ হয়ে গেল। প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ালো। এ ছাড়া, ভারতীয় শিক্ষকদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম। বাঁচবার শেষ উপায় হিসেবে তারা এ পেশা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে বিক্ষোভের অন্ত নেই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের স্কুল-কলেজে বৈপ্লবিক ভাবধারা বিস্তারের আংশিক কারণ হলো শিক্ষকদের সামান্য বেতন। ভয়াবহ দারিদ্র্য ও জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিত সাহিত্যই তাদের এভাবে গড়ে তোলে। অনেক সময় তারা সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণ করেন এবং এ ভাবধারা প্রচার করে সামান্য জীবিকা উপার্জন করেন। অর্থাৎ বুমেরাং হয়েছিল মেকলের শিক্ষানীতি। তার শিক্ষানীতি একটি শিক্ষিত বিক্ষুব্ধ শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল। এ সময় ইলবার্ট বিল নিয়ে এক অবমাননাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যে অপমান জাতীয় অপমান বলে অনুভূত হয় প্রতিটি শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে। ১৮৮৩ সালে তৎকালীন ভারতের বড়লাট লর্ড রিবানের আইন সচিব স্যার সি. পি. ইলবার্টের নামানুসারে এ বিলের নামকরণ করা হয়। কারণ তিনি এ বিলের প্রণেতা। এ বিলের পটভূমি হচ্ছে ইংরেজ ভারত দখল করার পর নিয়ম করেছিল এ দেশে কোনো অশ্বেতাঙ্গ শ্বেতাঙ্গদের অপরাধীদের বিচার করতে পারবে না। একমাত্র শ্বেতাঙ্গরাই তাদের বিচার করবে। এ বিধানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিলে লর্ড রিবানের আমলে এ প্রথা বাতিল করে ইলবার্ট বিল প্রণয়ন করা হয়। এ বিলে বিধান করা হয় যে, অশ্বেতাঙ্গরাও শ্বেতাঙ্গদের বিচার করতে পারবে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের চরম বিরোধিতার মুখে ইলবার্ট বিল বাতিল হয়। পুরনো বিধিই বহাল রইলো। ইলবার্ট বিলের এ পরিণতি কোনো মর্যাদাবোধ সম্পন্ন ভারতবাসী মেনে নেয় নি।

ইতিহাসের এ প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যাবে ভারতের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের সাথে একটি গভীর সম্পর্ক ছিল লীলা নাগ ও অনিল রায়ের পূর্বপুরুষের। ইলবার্ট বিল প্রণীত হয়েছিল ১৮৮৩ সালে। আর লীলা নাগের পিতা গিরিশচন্দ্র নাগ জন্মেছিলেন ১৮৬১ সালে মৌলভীবাজারের রাজনগর থানার পাঁচগাঁও গ্রামে। আর মনে হবে তিনি পরবর্তীকালে ইলবার্ট বিলের অপমানের শোধ নিয়েছিলেন হাকিম হিসেবে এক শ্বেতাঙ্গকে কঠিন শাস্তি দিয়ে। গিরিশচন্দ্র কখনো অধ্যাপনা, কখনো আইনের ব্যবসা করেছেন। সর্বশেষে নিয়েছিলেন সরকারি চাকরি। সরকারি অনুগ্রহের পদবি রায় বাহাদুর পেয়েছিলেন। আবার ১৯১৯ সালে

মন্টেগু চেমসফোর্ড রিফর্মস অনুযায়ী প্রথম ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আসামের শিলং থেকে সদস্য মনোনীত হলেও লবণকর প্রবর্তনের প্রতিবাদে তিনি যা করেছিলেন, এটা ছিল সেকালের শিক্ষিত শ্রেণীর একটি অংশের জীবনের এক দ্বন্দ্ব। এরা ইংরেজি শিখেছেন, সরকারের আনুগত্য লাভের চেষ্টা করেছেন, আবার বিপ্লবীদের সাথে সম্পর্ক রেখেছেন, তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। এবং লীলা নাগের পিতা গিরিশচন্দ্র এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ছিলেন না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তার পরিবারে খদ্দর পরা অনিবার্য ছিল। ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিনে কান্নার রোল উঠেছিল। এই পরিবেশে বড় হয়েছেন লীলা নাগ। অপরদিকে, অনিল রায় জন্মেছিলেন উচ্চবর্ণের শিক্ষিত পরিবারে। তার পিতা ছিলেন সরকারের শিক্ষা দফতরের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। শ্বেতাঙ্গদের সাথে এক সময় প্রতিযোগিতায় চাকরি করেছেন তিনি। সে পরিবেশে বেড়ে উঠেছিল অনিল রায়।

এ উত্তরাধিকার ছাড়াও অনিল রায়-লীলা নাগের জীবন ছিল সেই সুকান্তের কবিতার মতো—'জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি'। এই ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমির চক্র ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর আরো সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতের বণিক শ্রেণী বৃটিশের সাথে প্রতিযোগিতায় হেরে যেতে থাকে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সর্বত্রই একটি বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং গোপনে সারা ভারতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ নেয়া হতে থাকে। এ সংবাদ বৃটিশ সরকারের অজানা ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল পরিস্থিতি সামাল দেয়ার। এ পটভূমিতে ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হয়। কোনো ভারতীয় নয়—এক বৃটিশ আমলাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কংগ্রেস গঠনে। ব্রিটিশ আমলা এলান অক্টাভিয়ান হিউম ছিলেন ১৮৮২ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারের ভারপ্রাপ্ত কৃষি মন্ত্রী। তিনি সরকারি কাজ থেকে অব্যাহতি নিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সরকারি আমলা হিসেবে সরকার থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, ভারতবর্ষ এক গভীর বিক্ষোভে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এক ভয়ঙ্কর বিক্ষোভ আসন্ন। এ প্রেক্ষাপটেই সরকারের উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। কোনো আন্দোলন নয়, আবেদন-নিবেদন এবং আলোচনার মাধ্যমে দাবি আদায় করতে হবে—এই ছিল নবগঠিত কংগ্রেসের নীতি এবং বিপ্লবীদের কাছে তাই প্রথম থেকেই কংগ্রেস ছিল আবেদন-নিবেদনের মঞ্চ।

ইতিহাস পাঠকরা জানেন বৃটিশ আমলা অক্টাভিয়ান হিউমের ভয় ছিল অন্যত্র। তিনি যাদের নিয়ে কংগ্রেস গঠন করেছিলেন তাদের বাইরেও আর একটি স্রোত ছিল। তাদের পরিকল্পনা ছিল সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বৃটিশকে তাড়াতে হবে। এদের পরিকল্পনা লিখতে গিয়ে '*Freedom and Anushilan Samity*'-পুস্তকে ড. নীহার রায় লিখেছেন ১৮৭০ সালের দিকে বাংলাদেশে একাধিক গোপন সংস্থা গড়ে ওঠে। যারা লাঠি খেলা ও ছোরা খেলায় পারদর্শী। ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে—এ ধরনের প্রথম প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল মহারাষ্ট্রে। এ সংগঠনের নেতা

ছিলেন বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে। পুলিশ ফাদকেকে গ্রেফতার করে। ফাদকে ১৮৮৩ সালে কারাগারে মারা যান। এর ১৫ বছর পর ১৮৯৭ সালের ২২ জুন দামোদর চাপেকার প্লেগ কমিশনার মি. ব্যান্ড ও পরে সহকর্মী আয়ারস্টককে হত্যা করে। দামোদার চাপেকারের সাথে ছিলেন ছোট ভাই বালকুরণ চাপেকার। দামোদর। গ্রেফতার হয়ে যান—তার ফাঁসি হয়। যতোদূর জানা গেছে, এটাই কোনো বিপ্লবীদের প্রথম সহিংস কর্মকাণ্ড ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে।

ড. নীহার রায় আরো লিখেছেন, চাপেকার গ্রুপই বোধহয় সারা দেশে এই নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সারা ভারতে এর প্রভাব পড়ে। এবং এক সময় বৃটিশ সৃষ্ট কংগ্রেসের চেয়ে বিপ্লবী সংগঠনগুলো বৃটিশের ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে তোলে।

ড. নীহার রায় এর পরে লিখেছেন ব্যারিস্টার পি মিত্রের কথা। ব্যারিস্টার প্রমথ নাথ মিত্র কলকাতা হাইকোর্টে আইনের ব্যবসা করতেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তিনি বৃটিশ এবং ফরাসি সেনাবাহিনীতে যোগদানের চেষ্টা করেছিলেন। পারেন নি। দেশে ফেরার আগে ইতালি, আয়ারল্যান্ড এবং রাশিয়ার গুপ্ত সংগঠন সম্পর্কে পড়াশোনা করেন। এবং লক্ষণীয় যে, পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা এবং তার কর্মকাণ্ড নির্ধারণে ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নায়ক মাৎসিনির কর্মসূচী অনুসরণ করা হয়। শুধু মাৎসিনি নয়, গ্যারিবল্ডি এবং আয়ারল্যান্ডের ডি. ভ্যালেরা'ও ছিল সেকালের বিপ্লবীদের আদর্শ। (স্মর্তব্য যে, তখনো রাশিয়ায় বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় নি।)

১৯০২ সালে বাংলাদেশের একশ্রেণীর নেতা কংগ্রেসের রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নতুন সংগঠন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। এদের মধ্যে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং ব্যারিস্টার পি. মিত্র। এ সংগঠনের নাম অনুশীলন সমিতি। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র এ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯০৬ সালে ব্যারিস্টার পি. মিত্র বিপিন পালকে নিয়ে পূর্ববঙ্গ সফরে আসেন এবং শিক্ষক পুলিন দাসকে ঢাকা সমিতি গড়ার দায়িত্ব দেন। প্রকৃতপক্ষে তৎকালে পূর্ব বাংলায় অনুশীলন সমিতিই বিপ্লবীদের শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ে ওঠে। এরপর আসে যুগান্তর, শ্রীসংঘ, বেঙ্গল ভলানটিয়ার্স এবং নানা উপদল সারা দেশে। অনিল রায় ও লীলা রায় এক্যবদ্ধ শ্রীসংঘের সদস্য ছিলেন এর জন্মকাল থেকে।

এক ঐতিহাসিক সময়ে জন্মেছিলেন অনিল রায়, লীলা রায়। অনিল রায় জন্ম নিলেন ১৯০১ সালে। লীলা নাগ ১৯০০ সালে। এরপর শুরু হয় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ নিরোধ আন্দোলন। ইতোমধ্যে সারা ভারতে কংগ্রেসের বিকল্প বিপ্লবী সংগঠন রাজনীতির অঙ্গনে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাদের আদর্শ, লক্ষ্য বা সংগ্রামের পথ কী ছিল? তাদের চোখের সামনে ছিল দেশমাতৃকার মূর্তি। কিন্তু সে মাতা কে? অনুশীলন সমিতির কাছে ছিল শক্তির দেবতা কালী। আর ছিল গীতার

বাণী। ফলে অনুশীলন সমিতি মুসলমান যুবকদের আকর্ষণ করতে পারলো না। ময়মনসিংহের কমিউনিস্ট নেতা কমরেড আলতাফ আলী বলেছিলেন—অনুশীলন সমিতিতে ঢুকতে না পেরে এক সময় মনে হয়েছিল একটা মুসলমানদের অনুশীলন কমিটি গঠন করি। এ কথা সহজে বোধগম্য যে সেকালে অনিবার্য কারণে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য বইপুস্তকই প্রাথমিকভাবে মুক্তির দিশারি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু মুক্তি অর্জনের পথ কি! পথ হিসেবে তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল ইতালির মাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি এবং আয়ারল্যান্ডের ডি ভ্যালেরার পথ। এ পথ ছিল ব্যক্তি সন্ত্রাস এবং ব্যক্তি হত্যার পথ। এবং লক্ষণীয় যে ভারতবর্ষে অনেকাংশ অগ্নিযুগের বিপ্লবী দল এ ভিত্তিতে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেছে।

পরিবর্তন দেখা দিল ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিপ্লবের পর। বৃটিশ সরকার বিপ্লবীদের ব্যক্তি সন্ত্রাসের পথ থেকে সরিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে জেলখানায় রুশ বিপ্লবের বইপত্র দিতে শুরু করে। এ বইপত্রে জেলখানায় অধিকাংশ বিপ্লবীদের ধারণা পরিবর্তিত হয়। ব্যক্তি সন্ত্রাসের পরিবর্তে সমাজবিপ্লবের ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়। এদের কাছে মুখ্য প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় স্বাধীনতা কি শ্বেতাঙ্গের হাত থেকে কৃষ্ণাঙ্গেদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর? না, সমাজ পরিবর্তন? লক্ষণীয় যে এ ধারা গ্রহণ করে বিশ ও ত্রিশের দশকে অসংখ্য বিপ্লবী জেলখানা থেকে বের হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। মূল অনুশীলন দলের বিপ্লবীদের স্ট্যালিনের নেতৃত্বের সাথে মতানৈক্য থাকায় তারা বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল (Revolutionary Socialist Party) গঠন করেন ১৯৫০ সালে।

কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা রুশ বিপ্লবে অভিভূত হলেও সকল বিপ্লবী সে পথ গ্রহণ করেন নি। সে কালের অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের মধ্যে আর একটি ধারাও ছিল শক্তিশালী। এ ধারাটি বিবেকানন্দ-বঙ্কিমের ধারা। এ ধারাটি এক সময় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনও গ্রহণ করেন নি। এবং লক্ষণীয় যে এ ধারায় অনুপ্রাণিত অনিল রায়, লীলা নাগ দু'জনেই গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে সাড়া দেন নি। দু'জনেই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এরা আদৌ মনে করেন নি যে স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিয়ে কিছু করা যাবে। মার্কিন যুক্তরাস্ট্রের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক David M Laushey তাঁর 'Bengal Terrorism and Marxist Left' নামক পুস্তকে লিখেছেন—"It is significant that Roy was pursuing his education during the very years of Non-cooperation movement when Gandhi was calling on his followers to boycott English sponsored schools. Clearly Roy (Anil Roy) was not impressed with the Gandhian approach or willing to follow his leadership... This attitude was shared by a large number of Bengali bhadralok who were less than enthusiastic followers of Mahatma. Gandhism seemed to run directly contrary to the teachings of the great

Bengali religious leader Swami Vivekananda. He taught that Indian should be strong, proud and self assertive. Vivekananda urged Indian youth to develop their spiritual strength through Vedantaism, Their intellectual strength through education and their physical strength through exercise and games. These teachings seemed much more compatible with the Bengali Spirit than Gandhism."

এ প্রেক্ষিতে অনিল রায়-লীলা রায়ের মূল্যায়ন হলে একটি ভিন্ন ধারার খোঁজ পাওয়া যাবে। যে ধারায় এ দুটি নর-নারীর জীবনের ঐক্য ছিল সমাজসেবা, নারী উন্নতি এবং সমাজ সংস্কার অঙ্গনে। অগ্নিযুগের মার্কসবাদী যুবকরা একটি নতুন ধারায় সমাজ গঠনের মানসে সমাজ পাল্টানোর শপথ নিলেও অনিল রায়, লীলা রায় এ সমাজ সংরক্ষণের মধ্য দিয়েই সমাজ সংস্কারের রাজনীতি করেছেন। এ পার্থক্যের জন্যই প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার লীলা নাগের কাছে প্রশিক্ষণ নিলেও তার জীবন হয়েছে ভিন্নতর। এবং শেষ পর্যন্ত অনিল রায়, লীলা রায় তাদের আদর্শিক আশ্রয় পেয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে কেন্দ্র করে।

এ নিয়ে গবেষণা করা সময় সাপেক্ষ। নেতাজীকে নিয়ে অনিল রায়ের এ ধ্যান-ধারণার অনেক তথ্য আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে দমদম জেলে থাকতে অনিল রায় কিছু প্রবন্ধ লেখেন। সে প্রবন্ধ বই আকারে পরে '*সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ*' নামে প্রকাশিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য, ১৯৪০ সালে নেতাজী ভারত ত্যাগের কালে অনিল রায়, লীলা রায়কে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃত্ব গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগের পর ১৯৪০ সালের ১৯ মার্চ নেতাজী বিহারের রামগড়ে আপোসবিরোধী সম্মেলনে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন। অনিল রায়ের একটি পুস্তিকার নাম নেতাজী কি চাইতেন—*What Netaji Stands For*. এ পুস্তিকায় নেতাজীর বরাত দিয়ে অনিল রায় নিজের রাজনীতির কথাই লিখেছেন। অনিল রায়ের এ পুস্তিকার উল্লেখ করে D. M. Laushey লিখেছেন—

"The message of Netaji is the message of India. It will be a grand synthesis of material and the Spiritual and a synthesis of East & West and a synthesis of the past & present." অনিল রায়ের পুস্তকের ভাষায় নেতাজী ফ্যাসিস্ট নন, মার্কসিস্ট নন, তিনি গান্ধীবাদীও নন।

নেতাজী আর ফিরে আসেন নি। অনিল রায়ের বক্তব্য মূল্যায়নের কোনো অবকাশ হয় নি। তবে নেতাজীর নিজস্ব বক্তৃতা এবং লেখায় তার রাজনীতির মূল্যায়ন অনেকে করেছেন এবং করবেন। সে আলোচনা দীর্ঘ। কিন্তু তবে নেতাজীর এই কথিত রাজনীতির ভিত্তিতে পরবর্তীকালে ফরওয়ার্ড ব্লক বিভক্ত হয়। একদিকে ফরওয়ার্ড ব্লক মার্কসিস্ট, অপরদিকে ফরওয়ার্ড ব্লক সুভাসিস্ট বা সুভাষবাদী। যোগলেকার এবং দীনভদ্র সাহা ছিলেন মার্কসবাদী ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা। এবং এ দলের উত্তরাধিকারী আজো পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টে আছে।

সুভাষবাদীদের নেতৃত্বে ছিল অনিল রায়, লীলা রায় এবং ঢাকার জগন্নাথ কলেজের এককালীন রসায়নের অধ্যাপক সমর গুহ।

সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলাদেশের অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হন। একটি মার্কসবাদী ধারা, যে ধারাটি ভারতে এখনো সি. পি. আই, সি. পি. আই (এম), আর এস. পি, এস. ইউ. সি বহন করছে। সুভাষবাদী ধারাটি নেই। অপর ধারাটি টিকে ছিল গান্ধী আশ্রমকে কেন্দ্র করে। আর একটি ধারা মিশে গিয়েছিল মূল কংগ্রেসে। বেঁচে আছে নেতাজী বসু অসামান্য এক মর্যাদা নিয়ে। কিংবদন্তীর নায়ক হয়ে।

তবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ ধারার চেয়ে অনেক সময় ব্যক্তি অনেক বেশি সামনে এসেছিল। অনেক বড় কাজ করেছেন ব্যক্তি হিসেবে। এবং সে ক্ষেত্রে লীলা রায় অনন্য ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। অনিল রায়ের জীবনও ছিল বর্ণাঢ্য। এরা কোনো ধারা সৃষ্টি না করেও ব্যক্তি হিসেবে বেঁচে থাকবেন যুগ যুগ ধরে একটি যুগের অগ্রগামী মানুষ হিসেবে।

বিপ্লবী লীলা নাগ ও বৃটিশবিরোধী সংগ্রাম

হায়দার আকবর খান রনো

ঢাকার মেয়ে বিপ্লবী লীলা নাগের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। আজকের ঢাকার ছেলেমেয়েরা বিপ্লবী লীলা নাগের নাম ক'জন জানে, তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। লীলা নাগ জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন পরিষদ যে আজকের প্রজন্মের কাছে তাঁর জীবন কথা এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার চেষ্টা নিয়েছে, তা খুবই ভালো উদ্যোগ।

সত্যি বলতে কি, আমি নিজেও সেই ছেলেবেলা থেকে আজ প্রবীণ বয়স পর্যন্ত এই ঢাকা শহরে বাস করেও বিপ্লবী লীলা নাগ সম্পর্কে তেমন বেশি জানি না। অথচ এই ঢাকা শহরেরই নামকরা স্কুল "নারী শিক্ষা মন্দির" যার বর্তমান পরিবর্তিত নাম শের-এ-বাংলা মহাবিদ্যালয় কিংবা আজকের "কামরুন্নেসা স্কুলের" প্রতিষ্ঠাতা লীলা নাগ, সে কথা সম্ভবত ঐ স্কুলের ছাত্রীরা বা তাদের অভিভাবকদের শতকরা ৯৯ জন জানেন না। এটা সত্যিই দুঃখজনক।

লীলা নাগের জীবন কর্মবহুল এবং বিস্তৃত। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন নয়, নারী আন্দোলন, প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারমূলক কাজ, সমাজসেবা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী কাজ ইত্যাদি বহুবিধ কাজের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন এবং উদ্যোগী ভূমিকা ছিল। দীপালি সংঘ নামে একটি নারী সংগঠনের তিনি ছিলেন অন্যতম নেত্রী। এখানে উল্লেখ্য যে, শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারও এক সময় এই সংঘের সদস্যা ছিলেন। ১৯৪১ সালে ঢাকায় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এবং ১৯৪৬ সালে নোয়াখালীতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তিনি দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকায় কাজ করেন। এসব কাজের গুরুত্বকে মোটেও খাটো না করেও, আমি যে কারণে তাকে বেশি শ্রদ্ধা করি তা হলো তাঁর রাজনৈতিক বিপ্লবী ভূমিকার জন্য।

আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জনকে কেবল রাজনৈতিক সংগ্রামের ফল হিসেবে দেখা একপেশে হবে বলে আমার মনে হয়। রাজনৈতিক সংগ্রামের

পাশাপাশি প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানো এবং সামাজিক পুনর্গঠনের কাজকে মোটেও খাটো করে দেখা ঠিক হবে না। রামমোহন রায় বা বিদ্যাসাগর অথবা পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র, বেগম রোকেয়া এইসব মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর ভূমিকাও বিরাট, যদিও তারা সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। (অবশ্য নজরুল রাজনৈতিক কারণে কারাবরণ করেছেন এবং শরৎচন্দ্রের *পথের দাবি* রাজনৈতিক কারণে নিষিদ্ধ হয়েছিল)। স্বল্পসংখ্যক শ্বেতাঙ্গ যে দু'শ বছর আমাদের দেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব করে গেল, তার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার অভাব ছিল এবং সমাজের মধ্যে নানা ধরনের পশ্চাৎপদতা বাসা বেঁধে ছিল। তাই সমাজকে যারা প্রগতিশীল অভিমুখে পুনর্গঠনের প্রয়াস নিয়েছেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের ভূমিকাও বিরাট। এই দিক দিয়েও লীলা নাগের ভূমিকা স্মরণীয় এবং তার সামাজিক কর্মকাণ্ড শুধু ঢাকায় নয়, গোটা বাংলা এবং আসাম জুড়ে বিস্তৃত ছিল।

তবে তার চেয়েও বড় কথা লীলা নাগ সরাসরি বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। তখনকার দিনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র মহিলা শিক্ষার্থী (১৯২১-১৯২৩) এবং মেয়েদের মধ্যে প্রথম পদ্মাবতী স্বর্ণপদক অর্জনকারী (১৯২১ সাল, কলকাতার বেথুন কলেজ) এই মহীয়সী নারী ছাত্রীজীবন থেকেই ছিলেন প্রতিবাদী ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন। ছাত্রী অবস্থায় তিনি সম্মানিতা ইংরেজ মহিলা কলেজ পরিদর্শনকালে তার সামনে হাঁটু গেড়ে কুর্নিশ করার প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বিপ্লবী চেতনা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অল্প বয়সেই তিনি গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। তিনি যখন সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সদস্যা, তখন তিনি একই সঙ্গে গান্ধীর নেতৃত্বাধীন অসহযোগ আন্দোলনেও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ইতিহাসে অবশ্য এইরকম আরও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, বিপ্লবী সূর্য সেন গোপন বিপ্লবী দল সংগঠিত করার সময় চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এমনকি, চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক যুব বিদ্রোহের আগের দিনও তাকে গান্ধীর লবণ আন্দোলনের কাজে তৎপর থাকতে দেখা গেছে। বিপ্লবী লীলা নাগের রাজনৈতিক দুর্বলতা বেশি ছিল নেতাজী সুভাষ বসুর প্রতি। পরবর্তী সময়ে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেন। তার রাজনৈতিক জীবনে তিনি কয়েকবার কারাবরণও করেন।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বিপ্লবী দলে লীলা নাগের মতো আরও অনেক বিপ্লবী নারী ছিলেন। তাদের নাম আজ আমরা ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে এই বিপ্লবী নারীদের ভূমিকা যে শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামেই নয়, সমাজ প্রগতির ক্ষেত্রেও কতো বড় অবদান রেখেছে, তা আমরা আজ মনে করতে চেষ্টা করি না। এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। অথচ অল্পদিনের আগের এই ইতিহাসের গৌরবজনক অধ্যায়কে যদি আমরা উপেক্ষা করি, তাহলে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও দুর্বল হতে বাধ্য। অতীতকে, বিশেষ করে নিকট অতীতকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎ রচনা করা যায় না।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আরেকটি দুঃখজনক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আমরা এখন স্বাধীনতা সংগ্রাম বলতে ১৯৪৭-এর পরবর্তী ঘটনাবলি ও ১৯৭১-এর সুমহান সশস্ত্র যুদ্ধকেই কেবল স্মরণ করি। তা অবশ্যই করতে হবে। ১৯৭১-এর রণাঙ্গনের একজন সৈনিক হিসেবে আমার নিজেরও সেন্টিমেন্ট ও গর্ব আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ১৯৪৭-পূর্ববর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাদ দিতে হবে। দুঃখজনকভাবে এটাও সত্য যে, আমরা, এমনকি প্রগতিশীলরাও বৃটিশবিরোধী সংগ্রামকে খুব বেশি স্মরণ করি না।

অন্যদিকে, ভারতবর্ষেও বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসকে একতরফাভাবে গান্ধী-নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের একচেটিয়া সংগ্রাম হিসেবে চিত্রিত করার প্রবণতা আছে। আসলে ভারতে বৃটিশবিরোধী সংগ্রামে অনেকগুলো ধারা ছিল, তার মধ্যে তিনটি ধারা প্রধান :

১. গান্ধী-নেতৃত্বাধীন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন

২. সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংগ্রাম

৩. কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন শ্রমিক কৃষকের সংগ্রাম।

এর কোনোটিকেই খাটো করে দেখা ঠিক হবে না। এই তিন ধারার পাশাপাশি মুসলিম লীগের নেতৃত্বাধীন আরেকটি ধারাও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শুরু হয় এবং তা চল্লিশের দশকে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে। বস্তুত, এই ধারাটি ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও মদদপুষ্ট।

যা হোক, ভারতের স্বাধীনতা মূলত সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে অর্জিত না হলেও স্বাধীনতা লাভের বাস্তব শর্ত তৈরির ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিপ্লবীদের যে বিরাট অবদান ছিল, নিরপেক্ষভাবে দেখলে তা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না।

ভারতবর্ষের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসকে তিন পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

এক. অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সশস্ত্র সংগ্রাম

দুই. বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের সশস্ত্র সংগ্রাম

তিন. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রায় একশো বছরের বাংলার ইতিহাস অসংখ্য সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের ঘটনায় ভরপুর। এই সকল কৃষক বিদ্রোহ ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। কি ভারত, কি বাংলাদেশ কোথাও এইসব সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের ঘটনা লিখিত ইতিহাসে তেমন একটা স্থান পায় না। অথচ দু'শ বছর পর আমরা যে বৃটিশকে তাড়াতে পেরেছি, তা কয়েকদিনের নেতৃপর্যায়ের আলোচনা ও সমঝোতার মধ্য দিয়ে হয়ে গেছে, এমনটি মনে করলে, ইতিহাসকেই অস্বীকার করা হবে। তবে একথা ঠিক যে, ঐসব সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ তখনকার মতো জয়যুক্ত হতে পারে নি। তার কারণও আছে। প্রথমত, এই সকল কৃষক বিদ্রোহ যথেষ্ট সংগঠিত আকারে পরিচালিত হলেও এবং তার মধ্যে বৃটিশকে তাড়ানোর আকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে থাকলেও, তখন পর্যন্ত

আধুনিক জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতার চেতনা বিকাশ লাভ করে নি। দ্বিতীয়ত, এই বিদ্রোহগুলো ছিল নেহায়েতই কৃষক বিদ্রোহ। বহুবিধ কারণে জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দিতে পারে মাত্র দুটি শ্রেণী—শ্রমিক শ্রেণী অথবা বুর্জোয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে শ্রমিকশ্রেণী (বা তার পার্টি), আর আলজেরিয়ার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আমাদের দেশে বুর্জোয়া বা শ্রমিকশ্রেণী জন্মলাভ করলেও, তেমন বিকাশ লাভ করে নি বা পরিপক্ব হয়ে ওঠে নি। উনবিংশ শতাব্দীতে সবচেয়ে বড় সশস্ত্র সংগ্রাম হলো ১৮৫৭-এর সিপাহি বিদ্রোহ, যাকে কার্ল মার্কস ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই বৃটিশ শাসনের অবসান ও স্বাধীনতা অর্জনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে গড়ে ওঠে বেশ কিছু গোপন সশস্ত্র বিপ্লবী দল। এদেরকে সাধারণত রাজনেতিক দল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় না। কিন্তু আমি এই বিপ্লবী দলগুলোকে রাজনৈতিক দল হিসেবেই বিবেচনা করতে চাই। এই দলগুলোকে সাধারণভাবে সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এমনকি, পাঠ্যপুস্তকেও এইভাবে লেখা হয়। এই ধরনের নামকরণ শুধু ভুল নয়, তা মহান বিপ্লবীদের প্রতি অপমানজনকও বটে। তবে এ কথা সত্য যে, এইসব দলের কার্যক্রমের মধ্যে অনেক ভুল ছিল, অসাধাবণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মুজফফর আহমদ তাদেরকে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী বলে আখ্যায়িত করার কথা বলেছেন। আমার মতে, তিনি সঠিকই বলেছেন। এই সকল সশস্ত্র বিপ্লবী দলের নেতাদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ, রাসবিহারী বসু, বাঘা যতীন, মাস্টারদা সূর্য সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তারা সবাই ইতিহাসের মহানায়ক।

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনা ক্যান্টনমেন্টসমূহে ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন। সামান্য ক্রটির জন্য তা ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জাপান থেকে ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে মুক্তিফৌজ গঠনের প্রচেষ্টা নেন। বৃটিশেব পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে যারা জাপানের কাছে বন্দি হন, সেই সব ভারতীয় সৈন্যদের তিনি মুক্ত করানোর ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে তাদের দিয়েই গঠিত হয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, যার নেতৃত্ব দেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভূমিকা যে পরবর্তীকালে আমাদের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল, তা অস্বীকার করা যাবে না।

১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহও একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তাকে ছোট করে দেখার কোনো কারণ নেই। তাছাড়াও সেনাবাহিনীর মধ্যে যে কতো ছোট-বড় বিদ্রোহ হয়েছে, তার পরিপূর্ণ বিবরণ এখনও তৈরি করা হয় নি। ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়াত নেতা রবিন সেনের লেখা পাঁচ অধ্যায় নামক গ্রন্থে সে সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাকেও সাধারণত উপেক্ষা করা হয়। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হলেও, তিরিশের দশক থেকেই পার্টি রাজনৈতিক মঞ্চে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে শুরু করে। তখন পার্টি ছিল বেআইনি, তাই আত্মগোপনে কাজ করতো। সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজ ছাড়াও পার্টি স্বাধীনতা আন্দোলনের সপক্ষে যে ভূমিকা রাখে তা মোটেই উপেক্ষা করার মতো নয়। কংগ্রেসের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের সংগঠিত করে চাপ সৃষ্টির প্রয়াস পায়। পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টি ছিল আপোসহীন।ফলে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পরবর্তীকালে দলে দলে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। বিশেষ করে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি বেশি ঘটেছে। শ্রমিক কৃষকের লড়াই, ঐতিহাসিক তে-ভাগা আন্দোলন, তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম, নৌ-বিদ্রোহ, রেল ধর্মঘট, ডাক ধর্মঘট, কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন এই ধরনের বহুমুখী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বৃটিশবিরোধী সংগ্রাম এক নতুন মাত্রা অর্জন করে।

গান্ধীবাদী কংগ্রেসী আন্দোলনে (যা নামে অহিংস হলেও অনেক সময় যথেষ্ট জঙ্গিরূপ লাভ করে এবং কখনও কখনও কিছুটা পরিমাণে সশস্ত্র হয়ে উঠেছিল, যেমন ১৯৪২-এর ভারত ছাড় আন্দোলন), সশস্ত্র বিপ্লববাদী জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম, সেনা বিদ্রোহ, নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বাধীন আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও তার যুদ্ধতৎপরতা, শ্রমিক কৃষকের জঙ্গি লড়াই, কমিউনিস্টদের লাগাতার সংগ্রাম—সব মিলিয়েই হলো ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। এই বহুবিধ ও বহুমুখী সংগ্রামের পরিণতিতে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ভারতবর্ষকে দখল করে রাখা আর বেশি দিন সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের লালফৌজের হাতে ফ্যাসিবাদের পরাজয়, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যুদয়, বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দারুণ ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্বল অবস্থা, সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। পুরনো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পতনের শর্তসমূহ পরিপক্ক হয়ে ওঠে। এই সময় সুচতুর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোস ও সমঝোতা করে মানে মানে সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কেবল লক্ষ্য রাখে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, আর ভারত যেন বিপ্লবের পথে না যায়। এজন্য তারা এদেশীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোস করা ছাড়াও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করে, সফলও হয়। সেই অজুহাতে তারা দেশকেও বিভক্ত করে গেল। তৈরি হলো দুটি নতুন দেশ ভারত ও পাকিস্তান। এই হলো ১৯৪৭-এর স্বাধীনতার প্রেক্ষাপট। এটিই বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের মূল কথা।

উল্লেখ্য, উপরে বর্ণিত বহুবিধ সংগ্রামের কোনোটাকেই গুরুত্বহীন ভাবা অনৈতিহাসিক হবে। সে কারণে একথা অবশ্যই মানতে হবে যে, গান্ধীবাদী অহিংস

পথেই কেবল ভারতের স্বাধীনতা আসে নি। সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী দলগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রাম যে খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে, তা স্ব-প্রণোদিত অন্ধ ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে।

লীলা নাগ সেই বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয় একজন কর্মী ছিলেন। আজকে আমরা যারা স্বাধীনতা ভোগ করছি, তার জন্য যাদের কাছে আমরা ঋণী বিপ্লবী লীলা নাগ তাদেরই অন্যতম। এই বিপ্লবী নারীর জন্ম শতবর্ষে তার প্রতি আমি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছি।

লীলা নাগ ও বাংলাদেশের নারী আন্দোলন

মালেকা বেগম

লীলা নাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী। ১৯২১ সালে যাত্রা শুরুর সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, আইনগত বাধা না থাকলেও, ছাত্রীদের পড়াশুনার পরিবেশ গড়ে উঠে নি। তার আগ্রহাতিশয্যে উপাচার্য পি. জে. হার্টগ তার ভর্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে পরিবেশ সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। লীলা নাগ ভর্তি হয়েছিলেন এম এ ক্লাসে, ইংরেজি বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী হিসেবে। এম এ পাস করে তিনি রাজনীতিতে যুক্ত হলেন। একই সাথে নারী শিক্ষার জন্য, নারী আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য তিনি পরিকল্পিতভাবে কয়েকটি কাজ শুরু করেন। সেদিক থেকে তাঁকে রাজনীতিবিদ এবং সমাজসচেতন নারী নেত্রী হিসেবেও মূল্যায়ন করলে ভুল হবে না।

১৯২৩ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত ২৫ বছর তিনি পূর্ববঙ্গের রাজনীতির সাথে যুক্ত থেকেছেন। বৃটিশ শাসনবিরোধী দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত বিপ্লবী সংগঠন 'শ্রীসংঘে'র মূল সংগঠক ও নেতা অনিল রায়ের সাথে তাঁর বিয়ে হয় ১৩ মে, ১৯৩৯ বহু ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংগ্রাম, বিপ্লবের মাঝে। রাজনৈতিক আন্দোলনে মহিলাদের যুক্ত হওয়ার জন্য বিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে প্রথম আহ্বান জানান অনিল রায়। ঢাকায় তখন তরুণী মেয়েরা সংগঠিত হতে থাকে লীলা নাগের উদ্যোগ গড়ে ওঠা 'দীপালি সংঘে'র চত্বরে।

ঢাকার ইতিহাস লীলা রায়ের কর্মকাণ্ডের বিবরণ ছাড়া পূর্ণ হবে না। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ইতিহাস রচনা সম্ভব নয় পূর্বসূরি লীলা রায়ের সাফল্যময় উদ্যোগ ও কর্মকাণ্ডের গুলোর উল্লেখ ছাড়া। এ দেশের নারী আন্দোলনের নতুন একটি ধারা তিনি শুরু করেছিলেন ১৯২৬ সাল থেকে। ঢাকা শহরের এলাকায় এলাকায় দীপালি সংঘের নানা শাখা গড়ে তোলেন তিনি। নারী সমাজকে রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ দেয়ার জন্য এবং সাহিত্য-দেশপ্রেম চর্চার জন্য

পাঠচক্র পরিচালনা করেন লীলা রায়। *'ইন্ডিয়া ইন বন্ডেজ'* (১৯২৪) পড়াতে শুরু করলেন পাঠচক্রের ক্লাসে।

শুধু লেখাপড়া নয়, মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য শরীর চর্চা, লাঠিখেলা, ছোরা খেলা শেখানো শুরু করেন লীলা নাগ। বিপ্লবী পুলিন দাস এসব শেখাতেন।

নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে লীলা নাগ ছিলেন সার্বিকভাবে যুক্ত। 'নিখিল বঙ্গ ভোটাধিকার কমিটি'র সম্পাদিকা কুমুদিনী বসুর সাথে তিনি ছিলেন সহ-সম্পাদিকার দায়িত্বে (১৯২১)। ঢাকায় সে সময় তিনি কমিটির উদ্যোগে মহিলা সভার আয়োজন করেন। সভানেতৃত্ব করেছিলেন ইডেন স্কুলের অধ্যক্ষা শ্রীমতী স্বর্ণলতা দাস। এই কমিটি ভোটাধিকার ছাড়াও নারী সমাজের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক অধিকারের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল।

রাজনৈতিক অধিকারের আন্দোলনে যুক্ত হয়ে লীলা নাগ জেলে ছিলেন। তাঁর মতে মানুষের কাছে যেতে হবে, মানুষের চাহিদা জানতে হবে, মানুষের মঙ্গল করতে হবে। ১৯২২ সালে উত্তরবঙ্গে সর্বনাশা বন্যা হয়। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে সংগঠিত হয় 'উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটি'। এই কমিটির সম্পাদিকা লীলা নাগ নিবেদিতকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন।

তাঁর শিক্ষাব্রতী সাধনার প্রকাশ ঘটে ৬টি নারীশিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে। সেগুলো হচ্ছে :

১. দীপালি স্কুল, ১৯২৩, অভয় দাস লেন

 এই স্কুলে তিন বছর বিনা বেতনে কাজ করে লীলা রায় দৃঢ় ভিত্তিতে দাড় করান। পরে তা 'কামরুন্নেসা হাই স্কুল' নামে পরিচিত হয়।

 অগ্রহায়ণ ১৩৪০ (১৯৩৪)-এর *জয়শ্রী* পত্রিকায় (লীলা নাগ সম্পাদিত) আলোচনা বিভাগে খবর উঠেছিল : 'স্থানীয় কামরুন্নেসা ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে আই. এ. ক্লাশের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছে ও অল্পকাল মধ্যেই ইহার ছাত্রীসংখ্যা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, অধ্যাপনার ব্যবস্থা সবিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছে, আমাদের একটা আশঙ্কা ছিল কলেজের একটি শ্রেণী খুলিলে স্কুলে অধ্যাপনার ক্ষতি হইতে পারে। কিন্তু আনন্দের কথা যে, ইহাতে স্কুলের কোন ক্ষতি তো হয় নাই, বরং স্কুলের অধ্যাপনা রীতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এই নূতন প্রচেষ্টায় আমরা মঙ্গল কামনা করি।'

২. ১৯২৪ সালে (নাম অজানা) আরও একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন দীপালি সংঘের সহযোগিতায়। (দীপঙ্কর মোহান্ত, *লীলা নাগ*, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৩১)

৩. নারী শিক্ষামন্দির (১৯২৮, ২ ফেব্রুয়ারি, টিকাটুলি)

 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর 'শেরে বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়' নামকরণ হয়।

৪. শিক্ষাভবন (বক্‌শীবাজার)
৫. শিক্ষায়তন (কায়েতটুলী)
৬. বাংলাবাজার বালিকা বিদ্যালয়

শুধু স্কুল নয়, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র, পাঠাগার স্থাপন, ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠা, ব্যায়ামাগার, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, দীপালি ভাণ্ডার, নারী রক্ষা ফান্ড—এসব ছিল লীলা নাগের কর্মকাণ্ডের নিদর্শন।

সে সময়ের দেশের, সমাজের কূপমণ্ডূক অবস্থার কথা ভেবেই লীলা নাগ শিক্ষার দীপ জ্বালিয়ে কিশোরী, তরুণী, বয়স্ক মহিলাদের অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করতে চেয়েছিলেন। এ দেশে নারী আন্দোলনের এই বিশেষ ধারাটির প্রবক্তা ও উদ্যোক্তা লীলা নাগ বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের পূর্বসূরি ও পথিকৃৎ হিসেবেইস্মরণীয় থাকবেন।

আজকের পৃথিবীতে এবং বাংলাদেশে 'প্রজেক্ট' শব্দটি বহুল পরিচিত। কিন্তু এর সাথে যুক্ত থাকছে 'অর্থদাতা' কোনো দেশ বা প্রতিষ্ঠানের অনুমতি। লীলা নাগ 'প্রজেক্ট' করেছিলেন নিজের অর্থবলে, শ্রমে, বুদ্ধিতে, আন্তরিকতায়। তাঁর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছিল স্থিতিশীল নারী আন্দোলন ও রাজনৈতিক দল গড়ে তোলা। অন্ধকারাচ্ছন্ন সামাজিক-পারিবারিক পরিস্থিতিতে নারী সমাজ, এমনকি তরুণ-পুরুষ সমাজও পশ্চাৎপদ থাকতে বাধ্য। তিনি তাদের মধ্যে নবজাগরণ ঘটানোর জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। কতো ধৈর্য ধরে তাঁকে নারী আন্দোলনের পথ তৈরি করতে হয়েছে তা আমাদের বুঝতে হবে।

'*জয়শ্রী*' পত্রিকা ছিল তাঁর আর একটি 'প্রজেক্ট', যার মাধ্যমে তিনি নারী-পুরুষ জাগরণ ঘটাতে প্রয়াসী ছিলেন। তিনি কতোটা অসাধ্য সাধন করেছেন তা বলেছেন বহুজন। সে সব আমাদের জানতে হবে। *জয়শ্রী* পত্রিকায়, (অগ্রহায়ণ ১৩৪০), ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয় 'নারী হরণ সংখ্যা সম্বন্ধে সরকাবের মত' শীর্ষক একটি খবর :

"পার্লামেন্টে জনৈক সদস্য প্রশ্ন কবেন যে, বাংলার নারী হরণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহার প্রতিকারের জন্য গভর্নমেন্ট কি ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারের জবাব এই যে, যদিও গভর্নমেন্ট নারী হরণের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন, কিন্তু বাংলায়র নারী হরণ বৃদ্ধি পাইয়াছে একথা বলা যায় না। সেদিন ঢাকায় বড়লার্টও এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, 'বর্তমানে সংবাদপত্রে প্রচারাদির ফলে ও নানা প্রতিষ্ঠানের জন্য এই ধরনের কুকার্য লোকের দৃষ্টিগোচর আসিতেছে, বাস্তবিক পক্ষে নারী হরণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই।

আমাদের বিশ্বাস অন্যরূপ, সমাজের ভয়ে, লোক লজ্জায়, এই ধরনের কলঙ্ক অতি সামান্যই প্রকাশ পায়. সংবাদপত্রে কতটুকু আর প্রচার হয়। সুতরাং বৃদ্ধি পায় নাই বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবার কথা নাই। লাঞ্ছিত নারীদের আর্তনাদে দেশের বাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এখন কি এ বিষয়ে সামান্য বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে

তাহা নিয়া চুলচেরা বিচার করিবার সময় আছে? ইহা এমন একটি ঘৃণিত কার্য যে কোন মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। সরকারী, বেসরকারী সকলে সহযোগিতা করিয়া অবিলম্বে এ পাপ দমনে সবিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন।"

স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে যুগে-যুগে নারীর অবস্থা একই রয়ে গেছে। সরকারের আত্মপক্ষ সমর্থনের কৌশল এবং ধামাচাপা দিয়ে নারী নির্যাতনের জন্য দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টিও বদলায় নি। বৃটিশ সরকার এবং বাংলাদেশের সরকার একইভাবে সংবাদপত্রের খবর প্রকাশের ওপর দায় চাপানোর পথ নিয়েছেন।

নারী আন্দোলনের সংগঠনগুলি এবং কর্মী-নেত্রীরা আমরা এখন যা করছি তা লীলা নাগের কর্মকাণ্ডের তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ প্রমাণিত হবে। বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এখন আন্দোলনের বিষয়-বৈচিত্র্য বেড়েছে। কিন্তু স্থানীয়ভাবে নিজের দেশের ঐতিহ্যের, সব সম্পদের ব্যবহার করে নারী সমাজকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নারী আন্দোলনের বর্তমান প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বিদেশি সহায়তায় 'প্রজেক্ট' করে নারী আন্দোলনের স্থায়ী ভিত্তি গড়ে উঠছে না। লীলা নাগের কর্মকৌশল ও পদ্ধতি অনুধাবন করলে একুশ শতকে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের একটি স্থায়ী ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত ঢাকায় এবং পরবর্তীকালে লীলা নাগ ভারতের কলিকাতায় একইভাবে রাজনীতি, নারী আন্দোলনের কাজে ও জয়শ্রী প্রকাশনা চালিয়েছেন। অব্যাহতভাবে দেশ ও সমাজের কাজ করে যাওয়ার দীক্ষা তিনি দিয়েছেন বহু নারীকে। দেশ বিভাগের পর (১৯৪৭) কবি সুফিয়া কামাল সপরিবারে ঢাকায় এসে উঠেছিলেন সলিমুল্লাহ এতিমখানায়। খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে লীলা রায় কবি সুফিয়া কামালের সাথে পরিচিত হন। তাঁকে সপরিবারে থাকার জন্য তারাবাগে (টিকাটুলি) একটি বাসা ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন লীলা রায়। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ছিল লীলা নাগের।

পূর্ব পাকিস্তানে তখন মুসলিম লীগ সরকার শাসন ক্ষমতায়। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জাগরণ শুরু হয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নারী সমাজের জন্য প্রয়োজন হলো মুসলিম নারী নেত্রীর। ব্যাপক হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণ দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যাচ্ছিলেন। লীলা রায় নিজে দেশত্যাগ না করে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন যেন জন্মভূমি ছেড়ে কেউ না যান। কিন্তু তিনি ও কয়েকজন থেকে গেলেও বহু রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী, পেশাজীবী বরেণ্য ব্যক্তি দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। এই পরিস্থিতিতে লীলা নাগ আগে থেকেই পূর্ববঙ্গে বসবাসরত হিন্দু মুসলিম মহিলাদের সাথে এবং ভারত থেকে পূর্ববঙ্গে চলে আসা মুসলিম ব্যক্তিত্বদের সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলেন। কবি সুফিয়া কামাল, দৌলতুননেছা, খাতুন নূরজাহান মুরশিদ, রোকেয়া রহমান কবির, লায়লা সামাদ, বদরুন্নেসা আহমদ, আনোয়ারা বাহার চৌধুরী, মেহেরুন নেসা ইসলাম প্রমুখ কলকাতা থেকে ঢাকা আসেন। আর পূর্ববঙ্গে ছিলেন জোবেদা খাতুন চৌধুরী,

আশালতা সেন, সেলিনা বানু, আনোয়ারা বেগম, ডলি ঘোষ, নিবেদিতা নাগ, যুঁইফুল রায় প্রমুখ নেত্রীবৃন্দ। এদের সকলের সাথে নারী আন্দোলনের সূত্রে লীলা নাগের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও দেশ বিভাগের পর নারী শিক্ষা প্রসারে, নারী অধিকার বিষয়ে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে এঁরা সকলেই একাত্মা হয়ে কাজ করেছেন।

লীলা নাগের দূরদর্শিতা ও বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক-মানবিক আদর্শ এদেশের প্রগতিশীল নারী-পুরুষ সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৪৭-৫০ এই তিন বছরেই তিনি গড়ে দিয়েছিলেন পরবর্তী সময়ের নেতৃত্বকে। তাঁর রাজনীতি ছিল 'ফরওয়ার্ড ব্লক'-রাজনৈতিক দলভিত্তিক। এ দেশে সেই রাজনীতির ভবিষ্যৎ নেই বুঝেই লীলা নাগ দেশত্যাগ করেন। সেই সাথে মুসলিম লীগ সরকারের তৈরি সাম্প্রদায়িকতার আক্রমণও দেশত্যাগ করতে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। সেই পরিস্থিতিতে সুফিয়া কামালসহ অন্য নেত্রীবৃন্দের হাতে তিনি তুলে দিলেন এ দেশের নারী আন্দোলনের দীপশিখা।

কবি সুফিয়া কামাল (১৯১১-৯৯) নারী শিক্ষা মন্দিরের পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন। তার দেয়া পথ-নির্দেশনা বহু বছর কার্যকরী রেখেছিলেন ঐকান্তিক চেষ্টায়। ষাটের দশকে তিনি টিকাটুলি থেকে (তারাবাগ) চলে যান ধানমন্ডিতে। স্কুল পরিচালনা কমিটি তার অনুপস্থিতির সুযোগে ১৯৭২ সালের পর লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত 'নারী শিক্ষা মন্দির' নাম বদলে 'শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয়' ও পরে 'মহাবিদ্যালয়' করে। এই অনুচিত ও সঙ্কীর্ণ পদক্ষেপটির জন্য কবি সুফিয়া কামালের জীবনভর অনুশোচনা ও দুঃখ ছিল। সুফিয়া কামাল আজীবন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও লীলা নাগের আদর্শ-শিক্ষা গ্রহণ করে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন।

লীলা নাগের শতবর্ষ (১৯০০-২০০০) উদযাপন সার্থক ও ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছে যখন তাঁর দীপশিখায় আলোকিত বাংলাদেশের আর এক মহিয়সী নারী কবি সুফিয়া কামাল এবং তার অনুবর্তীরা নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিলেন সেই দীপশিখা।

বিভাগ-পূর্ব বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শা ম ছু জ্জা মা ন সে লি ম

অবিভক্ত বাংলার এক প্রতিভাময়ী নারী, প্রখর রাজনৈতিক ব্যক্তি ঢাকারই মেয়ে বিপ্লবী লীলা নাগ বা লীলা রায়ের নাম আমরা ভুলে গেছি। স্বাভাবিক কারণেই,—১৯৪৭'র দেশবিভাগের পর যারা এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন তাদের কর্ম, ত্যাগ, অবদান ইত্যাদিকে আমরা আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের মধ্যে স্থান দিতে কুণ্ঠা বোধ করেছি। অথচ ১৯২৩-১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মূলতঃ পূর্ববাংলাই ছিল লীলাবতীর বিপ্লবের চারণভূমি। নারী শিক্ষার জন্য, নারী জাগরণের জন্য, নারীদের বিপ্লবের পথে টেনে আনবার জন্য একদিকে যেমন গঠন করেছেন নানা নারী প্রতিষ্ঠান—দীপালি সংঘ, ছাত্রীনিবাস..., নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—দীপালি স্কুল, শিক্ষাভবন, নারী শিক্ষা মন্দির... অন্যদিকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে বৃটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবার লক্ষ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন 'শ্রীসংঘে',—যার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন বিপ্লবী নারীদের জন্যও। পরবর্তীকালে সুভাষ বসুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বসুর 'স্বাধীনতা যুদ্ধের পথের' সাথে একাত্ম হয়েছিলেন। এ হেন বিপ্লবী নারীর শততম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য স্মরণিকায় আমার এ ক্ষুদ্র লেখা তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি মাত্র।

১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিকসহ মেহনতি মানুষের নিজস্ব আন্দোলন সমস্ত ভারতবর্ষের মেহনতি জনতার আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজকের বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ববঙ্গে শ্রমিক আন্দোলন অপেক্ষা কৃষক সমাজের আন্দোলন-সংগঠন ছিল অধিকতর শক্তিশালী। শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে এই ভূখণ্ড বরাবরের জন্যই পিছিয়ে ছিল। ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে চা বাগান, রেলপথ, সুতাকল, জলপথের স্টিমার শ্রমিকদের আন্দোলন-সংগঠন কম বেশি হয়েছে। কৃষিনির্ভর এই দেশে স্বাভাবিক কারণেই কৃষক আন্দোলন-সংগঠনের ব্যাপ্তি ও তৎপরতা ছিল মুখ্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা বাংলার কৃষকদের জন্য এক ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। এই ব্যবস্থার ফলে খোদ কৃষক জমির ওপর থেকে তার স্বত্ব ও অধিকার হারায়। উৎপাদক কৃষক শোষিত হতে থাকে তীব্রভাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের কৃষক সমাজ এই শোষণের বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন-পরবর্তী দেড়শ বছরের মধ্যে একদল মধ্যস্বত্বভোগী এবং জমিদারদের একশ ভাগ নিয়ন্ত্রণে চলে যায় বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি। জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণের তীব্রতা ছিল ভয়াবহ। এই শোষণ এতোই ভয়াবহ ছিল যে, পরিণতিতে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল একাধিকবার দুর্ভিক্ষের মুখে পড়ে। এই শোষণের খানিকটা অনুধাবনের জন্য ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত ভবানী সেনের জরিপের ফলাফলের কিছু অংশ নিচে উল্লেখ করা হলো।

জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকদের কাছ থেকে বাৎসরিক যে খাজনা আদায় করতো তার মোট পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা। এই টাকার মধ্য থেকে সরকারের রাজস্ব ও সেচ বাবদ পরিশোধ করতে হতো ৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা এবং জমিদারি পরিচালনার জন্য খরচ হতো ৩ কোটি টাকা। এই টাকা বাদ দিয়ে জমিদারদের লাভ হতো নিট ১০ কোটি টাকা। আইনি হিসেবে জমিদারদের আয় ছিল ১০ কোটি টাকা। কিন্তু বেআইনিভাবে জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশি টাকা আদায় করতো। ১৯২৯-৩০ সালের বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ব্যাংকিং এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট থেকে দেখা যায় জমিদার পরিবারের একজন সদস্যের বাৎসরিক গড়পড়তা আয় ছিল ৭৫ হাজার টাকা। অপরদিকে, কৃষক পরিবারের একজন সদস্যের বাৎসরিক গড়পড়তা আয় ছিল মাত্র ছয় টাকা। জমিদাররা তাদের এই বিশাল আয় তুলে আনতেন শুধু কৃষকের ঘর থেকে। জমিদারদের আয়ের অন্য কোনো উৎস ছিল না। কিন্তু একমাত্র ভোগবিলাস ছাড়া এই বিশাল আয় থেকে জমিদাররা কৃষক এবং কৃষির উন্নয়নের জন্য কিছুই করে নি। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার চরিত্র বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক অমলেন্দু দে বলেছেন, "১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে নতুন ভূমি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তার ফলে কৃষক শ্রেণীর ওপর ধাপে ধাপে জমিদার, তালুকদার, গাঁতিদার, পত্তনিদার, দর-দরপত্তনিদার প্রভৃতি নানা খাজনা আদায় সংক্রান্ত মধ্য শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। জমিজমা ভাগবিলির আশ্রয়ে বিনা পরিশ্রমে ও বিনা মূলধনে জোতস্বত্ব ভোগ করে এমন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়। সরকারের নিয়মিত খাজনা আদায়ের কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ভূমিস্বত্ব নানা অংশে বিভক্ত হওয়ায় এবং কৃষির ওপর নির্ভরশীল বিভিন্ন মধ্যবর্তীর সৃষ্টি হওয়ায় ভূমি ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে বাংলাদেশে এক নতুন প্রকার শ্রেণীবিন্যাস দেখা দেয়। তার ফলে একদিকে যেমন কৃষির অবনতি হয়, তেমনি এক নতুন ধরনের জটিল সামাজিক বৈষম্যের

সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে সৃষ্ট এই শ্রেণী বিভাগ ক্রমান্বয়ে জমিহীন আধিয়ার, ভাগীদার ও দিনমজুর শ্রেণীর সৃষ্টি করায় এবং জমির অবাধ লেনদেনের ক্ষেত্রে মহাজনের আবির্ভাব ঘটায় গ্রামবাংলায় আর্থিক ব্যবধান ভয়ানক বৃদ্ধি পায়" (*বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, পৃ. ১৯৩-৯৪)।

ওপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই গ্রামবাংলায় তীব্র শোষণ কৃষক আন্দোলনের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে দিয়েছিল। কারণ শোষক এবং শোষিতের দ্বন্দ্ব লড়াই ছাড়া মীমাংসা হয় না।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলার কৃষক আন্দোলনের বহুবিধ রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ১৯৩৬ সালে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে সর্বভারতীয় কৃষক সভার পত্তনের আগে প্রায় দেড় শতাব্দীকাল ধরে বাংলার কৃষক সমাজ বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহ করেছে। এ সকল বিদ্রোহের এক ধরনের রাজনৈতিক পরিচয় থাকলেও বাস্তবে তা ছিল কৃষকের শ্রেণীসংগ্রাম। সাঁওতাল বিদ্রোহ, ফকির-সন্ন্যাস বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, ফরাজি আন্দোলন–সবই ছিল কৃষকের সংগ্রাম। কমিউনিস্টদের কৃষক আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্যোগ পূর্ববর্তীকাল ছিল প্রকৃত শ্রেণীর শত্রুর বিরুদ্ধে শোষিত কৃষক সমাজের স্বতঃস্ফূর্ত লড়াইয়ের কাল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কাল পর্যন্ত কৃষককে দুই শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। এক. দেশীয় শোষক গোষ্ঠী জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগী, দুই. বৃটিশ উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। ফলে কৃষকের এই লড়াইকে বারবারই রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরুর কালপর্ব অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের শুরুতে কমিউনিস্টদের উদ্যোগে বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের ধারা শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। এই আন্দোলন ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথমে আধিয়ারের সুদ বিরোধী আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে তেভাগা, টংক ও নানকার আন্দোলন ছিল কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত সবচেয়ে সংগঠিত ও জঙ্গি কৃষক আন্দোলন।

১৯৪৬-৪৯ সময়ে বর্তমান বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে নানকার প্রথা এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে টংক প্রথা বিরোধী আন্দোলন হয়। কমরেড মণি সিংহের নেতৃত্বে পরিচালিত টংক আন্দোলন সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহে পরিণত হয়। সশস্ত্র লড়াইয়ে টংক বিরোধী আন্দোলনের ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবক শহীদ হন। অজয় ভট্টাচার্য এবং বারীণ দত্তের নেতৃত্বে পরিচালিত নানকার বিরোধী আন্দোলনের মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে ১৪ জন কৃষক নেতা ও কর্মী শহীদ হন। উত্তরবঙ্গের ১৬টি জেলা এবং নড়াইল ও খুলনা অঞ্চলে তেভাগার দাবিতে জঙ্গি কৃষক আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যায়। তেভাগা আন্দোলনে শহীদ হন শতাধিক কৃষক নেতা, কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক। মূলত, বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে তেভাগার দাবিতে

পরিচালিত কৃষক আন্দোলন ছিল বিগত শতাব্দীর সবচেয়ে সংগঠিত ও জঙ্গি আন্দোলন।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক আন্দোলন ছিল আজকের বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনের মূলধারা। ১৭৯৩ সালে কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার অবসান এই আন্দোলনের ফলেই সম্ভব হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট বৈষম্য ও শোষণের অনিবার্য পরিণতি ছিল এই আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে আজকের বাংলাদেশে টংক, নানকার প্রথা এবং জমিদারি ব্যবস্থা বিলুপ্ত হলেও আজও ভাগচাষীদের জমিতে তেভাগা পদ্ধতি চালু হয় নি, কৃষকের ওপর থেকে শোষণেরও অবসান ঘটে নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সর্বভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৎকালীন পূর্ববাংলায় একটা বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমর্থন দেয় এবং ১৯৪৬ সালে এই অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাও সংঘটিত হয়। তদানীন্তন পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণ, বিশেষ করে মুসলিম কৃষক সমাজ পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলাদেশে যে নয়জন বৃহৎ জমিদারের সৃষ্টি হয়েছিল তার মধ্যে আটজনই ছিলেন হিন্দুধর্মাবলম্বী। এর মধ্যে পূর্ববাংলার সব জমিদারই ছিলেন হিন্দু। দেড়শ বছর ধরে পূর্ববাংলার কৃষক সমাজ জমিদারি ও মধ্যস্বত্বভোগী শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছেন। ১৮১৮ সাল থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত চলতে থাকা ফরাজি আন্দোলন ছিল জমিদারি শোষণ বিরোধী কৃষক প্রজাদের আন্দোলন। ধর্মীয় আবরণে হলেও এই আন্দোলন ছিল শোষিত কৃষকের বড় ধরনের শ্রেণীসংগ্রাম। এই সংগ্রামে কৃষক সবসময়ই সম্মুখে দেখেছে হিন্দু জমিদার শ্রেণীকে। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম কৃষক প্রজাদের মনস্তত্ত্বে এক ধরনের হিন্দুবিরোধী ছাপ পড়েছিল। তৎকালীন পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সমাজ মনে করেছিল পাকিস্তান হলে হিন্দু জমিদার থাকবে না এবং কৃষকরা মুক্তি পাবে।

টংক, নানকার এবং তেভাগার আন্দোলন সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক সমাজের এই পশ্চাৎপদ এক ধরনের ধর্মাচ্ছন্ন চেতনাকে আঘাত করেছিল। কৃষক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন ১৯৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে রুখে দিয়েছিল। বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের তেভাগা আন্দোলনের নেতা মণিকৃষ্ণ সেন তাঁর স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধে লিখেছেন যে, তেভাগার আন্দোলন কৃষককে নতুন মাত্রার গণতান্ত্রিক চেতনায় উন্নীত করেছিল। নীলফামারী শহরে পঞ্চাশ হাজার কৃষকের লাঠি মিছিল সেদিন সৈয়দপুরসহ সমগ্র রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে দাঙ্গাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। কৃষক সভার নিয়ন্ত্রণাধীন কুমিল্লার হাসনাবাদ গ্রাম ছিল সেদিনের দাঙ্গাপীড়িত মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য, ভয়শূন্য আবাসস্থল।

তেভাগা আন্দোলন বর্তমান বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাদীক্ষাহীন কৃষক সমাজের মধ্যে একদল অগ্রসর এবং সংস্কৃতিমনা রাজনীতিসচেতন মানুষের জন্ম দিয়েছিল। এই মানুষরা কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সংস্পর্শে এসে একদম নিরক্ষর অবস্থান থেকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, সংস্কৃতিবান, রাজনীতি সচেতন মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি থানার সাহাবুদ্দিন দুখু মিয়া ছিলেন এ রকম একজন মানুষ, যিনি নিজ হাতে তার আত্মজীবনী লিখে রেখে গেছেন। সাহাবুদ্দিন দুখু মিয়া ছিলেন ১৯৪৬ সালে নির্বাচিত কমিউনিস্ট এম. পি. রূপনারায়ণ রায়ের জঙ্গি সহকর্মী। এখনো জীবিত আছেন এ রকম একজন হলেন রংপুরের বদরগঞ্জের কমরেড ছয়ের উদ্দিন।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শুরুতে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির স্বাধিকার সচেতনতা, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষা ও সেক্যুলার গণতান্ত্রিক চেতনার যে উন্মেষ দেখা গিয়েছিল তার ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল সমগ্র চল্লিশের দশক জুড়ে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক আন্দোলন, বিশেষ করে তেভাগা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও অভিঘাত থেকে। অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবোধের সূতিকাগার ছিল ১৯৪৬-৪৭ সালের তেভাগা আন্দোলন। আজকের বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলনকে দু'পর্বে বিচার করতে হবে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালুর পর থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত কালপর্বকে বিবেচনা করতে হবে প্রথম পর্ব হিসেবে এবং ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কে বিবেচনা করতে হবে দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে। যদিও গত অর্ধ শতাব্দীতে পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তারপরও বলতে হয় আজকের বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন এই পর্বের ধারাবাহিকতায়ই অগ্রসর হচ্ছে। শুধু বাংলাদেশের কৃষক নেতৃবৃন্দই নয়, বাম ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দকে গত আড়াইশ বছরের কৃষক আন্দোলনকে গভীর মনোনিবেশ সহকারে অনুধাবন করা উচিত। কারণ এযাবৎকালে এ ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে এবং হচ্ছে কৃষক সমাজের ভূমিকার ওপর নির্ভর করে।

লীলা নাগের শততম জন্ম বার্ষিকীতে তার মতো নারী নেত্রীর কর্মযজ্ঞ থেকে, বিপ্লবী চেতনা থেকে ভবিষ্যতের সমাজ নির্মাণের কারিগররা অনুপ্রেরণা পবে—এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তাই লীলা নাগের কথা আমাদের বার বলতে হবে—তাঁকে স্মরণ করতে হবে।

উদভ্রান্ত সময়ের ছিন্নমূল নায়িকা

ম ফি দু ল হ ক

লীলাবতী নাগ যৌবনের সূচনাতে পরিণত হয়েছিলেন আলোচিত ব্যক্তিত্বে। অচিরে হয়ে ওঠেন কিংবদন্তীর নায়িকা, 'কল্পলোকের রাণী'; তাঁকে নিয়ে গল্প-কাহিনী ফিরতে থাকে লোকের মুখে মুখে। তাঁর তুল্য খ্যাতি তৎকালে আর কোনো নারী অর্জন করেছিল কি না সন্দেহ। এই খ্যাতি নিছক জনপ্রিয়তার ঢেউয়ে আসীন একান্ত স্বল্পস্থায়ী ব্যাপক পরিচিতি নয়, যা চিত্রনায়িকা অথবা গ্ল্যামারের রাজরাণীরা দাবি করতে পারেন। লীলাবতীর খ্যাতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা এবং আরো বেশি করে ছিল প্রত্যাশা, যে প্রত্যাশা তিনি নানাভাবে পূরণ করে এর মাত্রা ক্রমশ সম্প্রসারিত করে চলেছিলেন। কিন্তু লীলা নাগ ঝড়ো যুগের পাখি, আপন ডানায় যতো শক্তি তিনি ধারণ করুন না কেন, সেই শক্তিতে যতো উঁচুতে ডানা মেলুন না কেন, ঝড়ো হাওয়া তাঁর বিচরণ সহজ হতে দেয় নি এবং শেষ পর্যন্ত আছড়ে এনে ফেলেছে দূরের এক উপকূলে। হ্যামলেট কথিত টাইম আউট অব জয়েন্ট বা গ্রন্থিচ্যুত সময়কে সুস্থিত করতে টু বি অর নট টু বির কোনো দ্বিধা ছিল না লীলা নাগের মনে, তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন আয়ুধ, ঝাঁপ দিয়েছিলেন বিপুল কর্মযজ্ঞে, কিন্তু প্রবল বৈরী সময়ের বিরুদ্ধে একাকী মানুষ আর কতোটাই বা যুঝতে পারে! তবে চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর লড়াই কখনো থেমে থাকে নি, আর সে-কারণে তিনি ছিন্নমূল নায়িকা হলেও হয়ে আছেন ট্র্যাজিক মহিমায় উদ্ভাসিত।

লীলা নাগ বিংশ শতাব্দীর সমবয়সী, জন্ম ১৯০০ সালে, সিলেট তাঁদের দেশ, থাকতেন ঢাকার বকশিবাজারে, ইডেন স্কুলের পাঠ শেষে পড়তে যান কলকাতার বেথুন কলেজে। বেথুনে পড়বার সময়ে তাঁর তেজস্বিতা ও নেতৃগুণের পরিচয় ফুটে ওঠে। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের লাবণ্যময়ী এই তরুণী সহজেই মন জয় করতে

পারেন সবার। পারিবারিক প্রভাবে দেশ ও সমাজ নিয়ে নানা ভাবনাতে লীলা নাগ তখনই হয়েছিলেন আলোড়িত। ফলে অনেকগুলো বিরল গুণের সমাহার ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে, বিএ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ছুটিতে যখন অবস্থান করছেন ঢাকায়, ২১ বছরের এই তরুণী দিল্লিতে আইনসভা-সদস্য পিতাকে পত্রে লিখেছেন, "পড়ব কি? পড়তে গেলেই এসব নানা কথা মনে হয়। ইচ্ছে করে পড়াশোনা সব ছেড়ে দিয়ে যা হয় একটা কিছু করি। এমনি কোরে নিশ্চেষ্ট হোয়ে আর থাকা যায় না। আমার অনেক দিন থেকে মনে হচ্ছে যে যখন আমরা 'স্বরাজ' চাই, যে বিষয় কোনো মতভিন্নতা নেই তখন শুধু বিবাদ হচ্ছে কোন্ পথে পাওয়া যাবে। 'স্বরাজ' যে কি রকমের হবে তা বুঝতে পারি নি এখনও তবে একরকম যে হবে তা নিশ্চয়। আমাদের দেশের সঙ্গে যেমন কোনো দেশের সাদৃশ্য নেই, তেমনি কোনো দেশের সঙ্গে analogy draw করে হয়তো আমাদের স্বরাজের defination-এও পৌঁছব না। এটাও বেশ বুঝতে পারি স্বরাজ কি রকম হবে তা জানি না বলে অন্যের অধীন থাকতে হবে তারও কোনো মানে নেই।"

বিএ পাশ করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একান্ত জোর-জবরদস্তি করে সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অনুমোদন আদায় করলেন লীলা নাগ। তিনি এবং অপর সহপাঠী সুষমা সেনগুপ্ত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী। এই ঐতিহাসিক ঘটনার কারণেও লীলা নাগ ইতিহাসের পাতায় থেকে যেতে পারতেন স্মরণীয় হয়ে, যেমন আছেন সুষমা সেনগুপ্ত, যিনিও ছিলেন বেথুন কলেজের শিক্ষার্থী। তবে বেথুনে পাঠকালেই সুষমার বিয়ে হয়ে যায় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন তিনি স্নাতক হলেন তখন দ্বিতীয় কন্যার জন্মের কারণে তাঁর আর পাঠ অব্যাহত রাখা সম্ভব হয় নি। লীলা নাগ প্রতিষ্ঠিত দীপালি সংঘের কাজে গোড়ায় তিনি জড়িত ছিলেন কিন্তু ক্রমে সামাজিক জীবন থেকে অন্তরালে চলে গেলেন। সুষমার জীবন তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার শক্তি ও দুর্বলতা উভয় দিক একই সঙ্গে প্রকাশ করে। আর লীলার মধ্যে দেখা গেল কেবলই শক্তি-রূপিনীকে, প্রবল সামাজিক বাধার কোনো পরোয়া যিনি রাখেন না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে লীলা নাগ তাঁর ভেতরকার প্রতিশ্রুতি নানাভাবে বাস্তবে মেলে ধরতে লাগলেন।

তিন নম্বর বকশিবাজারের বাসভবন থেকে তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে যেতেন তখন কি স্বল্প সেই দূরত্ব হেঁটে অতিক্রম করতেন, অথবা যেতেন ঘোড়াগাড়িতে? ঘোড়াগাড়িতে যেতে হলে তিনি নিশ্চয় খড়খড়ি তুলে দিতেন না, মুসলিম মেয়েদের ঘরের বার হতে যে রীতি ছিল বাধ্যতামূলক-এমন কি সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের মেয়েদের ক্ষেত্রেও বিশেষ অন্যথা ছিল না। ঢাকায় জোরদার ব্রাহ্ম আন্দোলনের সুবাদে মধ্যবিত্ত মেয়েদের মধ্যে একটা জাগরণ তো দুর্নিরীক্ষ্য ছিল না। লীলাবতীর মা কুঞ্জলতা ব্রাহ্ম নারী, পিতা গিরিশচন্দ্র আচারনিষ্ঠ হিন্দু। পিতার প্রতি সর্বদা সশ্রদ্ধ রইলেও লীলা নাগ মায়ের কাছ থেকেই বুঝি পেয়েছিলেন বহির্মুখিতার শক্তি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে লীলা নাগের উপস্থিতি, শহরের পথে

তাঁর নিত্য-চলাচল, এসবের প্রভাব, অনুমান করা যায় নিছক প্রথমার প্রভাবই ছিল না, বহন করেছিল তার চেয়ে অতিরিক্ত মাত্রা।

১৯২৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন লীলা নাগ। পঁচিশ বছরের সুদর্শনা তরুণী, বিত্তবান আলোকিত পরিবারের কন্যা, তাঁর অনূঢ়া থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সহপাঠী সুষমা তো বটে, অন্য সাথী-বান্ধবীরা সবাই ততদিনে বিয়ে করে ঘর-সংসারে স্থিত হয়েছেন। লীলা নাগের ওপরও সেই পারিবারিক সামাজিক চাপ নিশ্চয় প্রবলভাবে ছিল। কিন্তু তিনি যে ভিড়ের মধ্যে আলাদা সেই প্রমাণ অবশ্য নানাভাবে রেখেছিলেন এবং সেই জীবনদৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্নতর জীবনসাধনার পথে পা বাড়ালেন তিনি। জীবনে সফলতা বলতে যা বোঝায় সবই ছিল তাঁর হাতের নাগালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম.এ ডিগ্রিপ্রাপ্তা হিসেবে ছিল বৃত্তি নিয়ে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ, নিতে পারতেন সরকারি চাকুরি কিংবা পারতেন যোগ্য পাত্রের গৃহিণী হয়ে সংসার সূচিত করতে, কিন্তু পরম নিস্পৃহভাবে সেসব উপেক্ষা করে তিনি চলতে শুরু করলেন কণ্টকময় রক্তঝরা পথে।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল অনিল রায়ের, ঢাকার গুপ্তবাদী আন্দোলনের এক প্রধান পুরুষ। চারিত্রিক তেজস্বিতার কারণে অহিংস অসহযোগ দ্বারা লীলা নাগ খুব তাড়িত বোধ করেন নি। আবার মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনের ডাকে যে অভূতপূর্ব গণ-সাড়া জেগে উঠেছিল সেটা তাঁর দেশব্রতী মানসকে স্বাভাবিকভাবে উদ্বেলিত করেছিল। ইংরেজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগের আবেদনে তিনি সাড়া দেন নি, এর যৌক্তিকতা খুঁজে পান নি বলে। আর তাই বেথুনে স্নাতকের পাঠ তিনি অব্যাহত রেখেছেন, প্রস্তুতি নিয়েছেন পরীক্ষার, যদিও মন পড়ে ছিল দেশবাসীর সংগ্রামের দিকে। তাই পূর্বোক্ত পত্রে আরো লিখেছিলেন, "পড়া আমার কাছে next to impossibility মনে হোয়েছে। মন বসানো কিছুতেই যায় না।" অসহযোগকে তিনি অস্বীকার করেন নি, কিন্তু খুঁজছিলেন দুর্বলের নয়, সবলের অসহযোগের কোনো কার্যকর পন্থা, এবং সে-তাগিদে চলে এসেছিলেন গুপ্ত বিপ্লবীদের কাছাকাছি। কিন্তু বিশের দশকে ততদিনে গুপ্ত সন্ত্রাসী আন্দোলনে ভাটার টান লেগেছে। কমে এসেছে সন্ত্রাসবাদী অভিযানের তীব্রতা, গণ-আন্দোলনের জোয়ার থেকে দূরে গোপন প্রস্তুতির দীর্ঘ কালক্ষেপণ ততটা কাম্য ছিল না। সংঘবদ্ধ জনতার শক্তিতে আস্থা বিপ্লবীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। তাই প্রকাশ্যে তারাও যোগ দিয়েছেন আন্দোলনে, অনেকে কাজ করেছেন কংগ্রেসে, কেউ কেউ-বা অন্য রাজনৈতিক দলে। ফলে গুপ্ত বিপ্লবীরা আর তত গুপ্ত থাকতে পারছিলেন না, তারা মূল রাজনৈতিক স্রোতোধারার অংশী হয়ে উঠেছিলেন ক্রমশ। ১৯২০ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যেকার পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রাক্তন এক বিপ্লবী লিখেছিলেন, "সত্যি বলতে কি,... গোটা বিশের দশকের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের খতিয়ান যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে আগেকার দুই দশকের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন ছিল বলে কি দাবি করা যায়? একটি বা দুটি ডাকাতি

একটি বা দুটি হত্যাকাণ্ড, বোমা নিক্ষেপ বা আবিষ্কার—তাই হলো দশটি বছরের উদ্দীপনাহীন ফসল।" প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রতিষ্ঠিত শ্রীসংঘ ১৯২৮ সালে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র ঘোষ আলাদাভাবে গঠন করেছিলেন বি. ভি বা বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স এবং শ্রীসংঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন অনিল রায়।

এম.এ পাশ করে একদিকে বিভিন্ন জাগরণী কর্মকাণ্ডের সূচনা করলেন লীলা রায়, অবলম্বন হল নব-প্রতিষ্ঠিত দীপালি সংঘ, অপরদিকে চললো গোপন বিপ্লবী প্রস্তুতি, আশ্রয় হলো শ্রীসংঘ। দীপালি সংঘের তুলনীয় নারী জাগরণমূলক সংস্থা বাংলার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মেয়েদের শিক্ষামূলক বৃত্তিমূলক কাজের সঙ্গে শারীরিক শক্তিচর্চাও ছিল তাদের কর্মসূচির অংশ। লীলা নাগের নেতৃত্বে মেয়েদের লাঠিখেলার দল নারীচিত্তে ও জনমানসে যে অভিঘাত সঞ্চার করেছিল তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। অপরদিকে বিপ্লবী দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সৌভ্রাতৃত্ব লীলা নাগকে নারী বিপ্লবীদের স্বাভাবিক আশ্রয় ও নেতৃত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বেথুনে পড়তে যাওয়ার আগে মাস্টারদার নির্দেশে ঢাকায় দীপালি সংঘের কাজে কিছুকাল জড়িত থাকেন। কুমিল্লায় শান্তি—সুনীতির গুলিতে ম্যাজিস্ট্রেট স্টিফেনের মৃত্যুতে সচকিত বৃটিশ প্রশাসন এর পেছনে লীলা নাগের যোগসাজশ অনুমান করে সচকিত হয়ে ওঠে। ভৈরবে দুঃসাহসিক ট্রেন ডাকাতির পেছনে শ্রীসংঘ রয়েছে ভেবে অনিল রায়কে গ্রেফতার করা হয় ১৯৩০ সালে। শীর্ষনেতার এই গ্রেফতারের পর খুব স্বাভাবিকভাবে গোপন দল শ্রীসংঘের নেতৃত্ব অর্পিত হয় লীলা রায়ের ওপর—বাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে কোনো দলে নারীকে সর্বোচ্চ নেতৃত্বে বরণ সেই প্রথম ও শেষ।

লীলা নাগ ও অনিল রায় ঢাকার সামাজিক জীবনের সঙ্গে কতো গভীরভাবে মিশে ছিলেন সেটা বোঝা যাবে তৎকালীন দুই কিশোরের ভাষ্যে। কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৮-১৯৯৮) স্মৃতিচারণকালে লিখেছেন : "কৈশোরে বাসাবাড়ি লেনে থাকতেই দশ বছর বয়সে প্রথম 'স্বদেশী' শব্দটির অর্থ জানতে পেরেছিলাম। আমাদের পাড়ায়ই অন্তত ছিলেন তিনজন যাঁরা দারুন স্বদেশী করতেন বলে পাড়ার সবাই জানতেন। কেননা পুলিশের গোয়েন্দারা এসে প্রায়ই তাঁদের খোঁজ-খবর করতেন। এঁদের মধ্যে অনিলদা অর্থাৎ অনিলচন্দ্র রায় ছিলেন আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং নিকট আত্মীয়। অনিলদার বাবা ছিলেন আমার বাবার বন্ধু, দুই পরিবারের মধ্যে অব্যাহত ছিল ঘনিষ্ঠতা। তখন দুষ্টুমি ও দৌরাত্ম্য করতাম বলে বকুনিও কম খাই নি রানীদির কাছে। রানীদি নিনিদিরা ছিলেন সম্পর্কে অনিলদার বোন। পরে রানীদি (উষারানী রায়) জয়শ্রী পত্রিকার সম্পাদিকা হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে লীলাদি (দেশনেত্রী লীলা রায়) প্রতিষ্ঠিত ঢাকার নারী শিক্ষা মন্দিরের প্রধান শিক্ষিকা হয়েছিলেন। লীলাদি পরিচালনাধীন সব রকমের জনকল্যাণমূলক কাজে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন।" একই সূত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন

অধ্যাপক সঙ্গীত-বিশারদ সুকুমার রায় লিখেছিলেন : "নিতান্ত ছেলেবেলায় স্কুলের প্রাইজ বিতরণী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের গান করেছিলাম। সেই থেকে বাড়িতে বাধা সত্ত্বেও গানের টান থেকে গেল। পাড়ায় কিশোরদের থিয়েটারের জন্য দাদার (বিপ্লবী অনিল রায়) ডাক এলো। লীলাদির (তখনকার লীলা নাগ) বাড়িতে থিয়েটার। লীলা নাগকে কে না জানতো? বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সম্মানিতা ছাত্রী। সেই থিয়েটার সূত্রে ঢুকে পড়লাম তরুণ দলে। কুস্তি করা, বই পড়া, শেষ রাতে উঠে মাঠে দৌড়-ঝাঁপ, কুচকাওয়াজ, হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা চালানো—এসবই হলো নিত্যকার রুটিন।"

প্রকাশ্য সামাজিক কর্মকাণ্ড ও গোপন দলের বিপ্লবী তৎপরতা, এই দুইয়ের সংযোগ লীলা নাগকে দ্রুত কল্পকথার উপজীব্য করে তোলে। রাজার দুলালি যেন নেমে এসেছেন ধূলির পথে, এই লীলা তাই সহজে বহুজনের আপন হয়ে উঠলেন। তেজস্বি কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ছটা তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। যৌবনের স্মৃতি প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, "ঢাকা যে বিপ্লববাদের পীঠস্থান তা আমার অজানা ছিল না; আর সেই সূত্রে, একজন নেপথ্যনেত্রী হিসেবে, 'লীলা নাগ' নামটি উল্লিখিত হতে শুনতাম। একদিন সন্ধে বেলা বন্ধুদের সঙ্গে রমনায় বেড়াচ্ছি। একটি যাত্রীবিহীন বাস্ আমাদের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল তার চালক একজন শাড়ি-পরা মহিলা। আমার সঙ্গীদের একজন মৃদুস্বরে বললে, 'দেখলে, ঐ লীলা নাগ।'—আমার জীবন ছিল সম্পূর্ণ সাহিত্যাশ্রিত, রাজনীতির সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আমার ছিল না; হয়তো সেইজন্যই ঢাকায় বাসকালীন তাঁর সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত যোগাযোগ আমার ঘটে নি; কিন্তু নানাজনের মুখে তাঁর বহুমুখী কৃতিত্ব ও চারিত্রিক নিষ্ঠার কথা শুনে-শুনে আমি, আমার বয়সী অন্য অনেকেরই মতো, তাঁর প্রতি একটি বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা অনুভব করতাম।"

এই যে একরোখা, তেজি, বিদুষী, পরম লাবণ্যময়ী দীপ্ত নারী, জীবনের সাথে যিনি বাজি খেলায় মেতেছেন আপন দেশমাতৃকার মুক্তি পণ করে, ভেতরে ভেতরে তিনি বহন করেছেন পরম আবেগবিহ্বল এক মানস, যে চেতনা-সূত্রে তাঁকে চেনা যায় একান্ত 'বাঙাল' হিসেবে, যাঁরা বুদ্ধির চেয়ে আবেগকে দেন উচ্চে স্থান এবং প্রায় রোমান্টিক এক মাধুরী দিয়ে ভরে ফেলতে পারেন জীবনের অনেক অপূর্ণতা। বেপরোয়া নারীর এই নমনীয় রূপটি প্রায়শ আড়ালে থেকে গেছে তার বহিরঙ্গের জৌলুষের কারণে। কিন্তু তাঁরই নিজের জবানিতে আমরা চকিতে এই রূপ ফুটে উঠতে দেখি। ১৯২৫ সালে লীলা নাগের নেতৃত্বে ঢাকায় আয়োজিত দীপালি সংঘের সংবর্ধনায় মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য আমরা জানি, কিন্তু এই অত্যুজ্জ্বল ঘটনার যিনি মূল নায়িকা, তাঁর মনোভাবের খোঁজ বিশেষ করা হয় নি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে রোগে অশক্ত শরীরের কারণে যখন কাবু হয়ে পড়েছেন, সে-রকম এক দিনে পরম স্নেহসিক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি বলেছিলেন সেদিনের কথা, "রবীন্দ্রনাথ দীপালি

সংঘের আহ্বানে এলেন, তাঁর পাশাপাশি চলেছি, একবারও তাঁর মুখের দিকে তাকাই নি। যদি আমার স্বপ্নভঙ্গ হয়, যদি কল্পিত চেহারার সঙ্গে না মেলে। তখন কি রোমান্টিক ও আইডিয়ালিস্টই ছিলাম।" লীলা নাগের চারিত্র্যে দার্ঢ্য ও আবেগপ্রবণতার যুগল অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে ১৯৩১ সালে তাঁর গ্রেফতারের সময়। সেবার তিনি যখন গ্রেফতার হলেন এবং ছয় বছর কাটালেন কারান্তরালে, সেই সময়কার কথা প্রসঙ্গে পরে লিখেছিলেন, রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনকালে, "গ্রেপ্তার করতে এসে কোনো বই সঙ্গে নিতে দিল না সাহেব পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট; শুধু মহুয়াখানি নেবার অনুমতি পেলাম, প্রতিদিন ভোর রাতে লক্ আপ খোলার সঙ্গে সঙ্গে মহুয়াখানি নিয়ে সেলের স্বল্প পরিসর উঠোনে বেরিয়ে পড়তাম আমি ও আমার এক তরুণী সঙ্গিনী। পাল্লা দিয়ে মহুয়া মুখস্থ করে ভোর ও সকাল কেটে যেত। একমাস ঐভাবে কেটেছিল যতদিন না অন্যকোনো বইপত্র আনার অনুমতি জুটলো।" একটি কথা লীলা নাগ বলেন নি, ঐ গ্রেপ্তারের সুবাদে তিনি হয়েছিলেন বাংলার আরেক প্রথমা, বিনাবিচারে আটককৃত পথিকৃৎ রাজবন্দিনী। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে সেই প্রথম গ্রেপ্তারি ঘটনায় অপর ডেটিনিউ ছিলেন রেণু সেন।

এর আগে সে-বৎসরেরই এপ্রিলে, বাংলা নববর্ষের সূচনায়, যাত্রা শুরু করেছিল লীলা নাগ সম্পাদিত মাসিক সাহিত্যপত্র 'জয়শ্রী', ঢাকা থেকে প্রকাশিত উচ্চ মানসম্পন্ন পত্রিকার এক অনন্য উদাহরণ। শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কার, প্রকাশ্য গণ-আন্দোলন ও গোপন বিপ্লবী তৎপরতা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও মননের চর্চা ইত্যাদি নানামুখী তৎপরতা দ্বারা ঢাকা ও পূর্ববঙ্গব্যাপী যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন লীলা রায় সেই বিপুল প্রয়াসে আকস্মিক ছেদ নেমে আসে ১৯৩১ সালের ২০ ডিসেম্বর তাঁর গ্রেপ্তারে। লীলা রায় কোনো মামুলী রাজবন্দি ছিলেন না, তাঁর প্রভাব ও কর্মক্ষমতা সম্পর্কে সরকার যে সম্যক অবহিত রয়েছেন সেটা বোঝা গেল কারাবাসের দীর্ঘতার মধ্য দিয়ে। ঢাকা, রাজশাহী, সিউড়ি, হিজলি ইত্যাদি বিভিন্ন কারাগার হয়ে তিনি মুক্তি পেলেন ১৯৩৭ সালে। ইতিমধ্যে দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক আবহে অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের মাধ্যমে শেষবারের মতো ঝলসে উঠেছিল সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি, এর বিপরীতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ক্রমে স্বীকৃত হচ্ছিল গণসংগ্রামের পন্থা। ভারত সংস্কার আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ রাজনীতিকে শাসক সম্প্রদায়ও কিছুটা ছাড় দিয়েছিল। দমন-নিপীড়নের ফলে গোপন বিপ্লবী দলগুলোর তখন ছত্রখান অবস্থা, জেল ও দ্বীপান্তরে আটক নেতা-কর্মীদের অনেকে ঝুঁকছেন বামপন্থার দিকে, শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত শক্তির প্রকাশ মিলছে নানাভাবে, ফলে ১৯৩৭ সালে লীলা নাগ এবং ১৯৩৮ সালে অনিল রায় কারামুক্ত হয়ে যে বাস্তবতার সম্মুখীন হলেন তা ছিল ১৯৩০ থেকে একেবারে ভিন্ন। দীপালি সংঘের পুরনো ভিত্তি আর নেই, শ্রীসংঘ পরিচালনার তাৎপর্য পাল্টে গেছে, দেশমুক্তির উদ্দেশ্য রূপায়নের জন্য বরণ করতে হবে ভিন্ন পন্থা। লীলা নাগ ও অনিল রায়ের একটি বড় সুবিধার দিক

ছিল তাদের প্রকাশ্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিপুল ব্যাপ্তি। গুপ্তদলের নেতা হলেও তাঁদের মুখ্য পরিচয় ছিল সংস্কারমূলক কাজের কাণ্ডারি হিসেবে। তাই দেখা যায় কারামুক্ত অনিল রায় সংবর্ধিত হন একজন জননেতা হিসেবে এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক 'শান্তি' পত্রিকায় লেখা হয় : "ঢাকার রাজবন্দী শ্রী অনিল রায় এম. এ, বি.এল ও কায়েৎটুলির রাজবন্দী শ্রী ভবেশচন্দ্র নন্দী সম্প্রতি মুক্তি লাভ করিয়াছেন। ঢাকা বার লাইব্রেরীতে অনিল বাবুকে জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন দেওয়া হয়। বারের সভাপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহুলোক উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক অতুল সেন, সভাপতি মহাশয়, জিতেন কুশারী, খাজা মাইনুদ্দিন ও আশালতা সেন প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।"

লীলা নাগ ও অনিল রায় এবার নিবিড়ভাবে জড়ালেন কংগ্রেসের কাজে। কংগ্রেসে তাঁদের সাক্ষাৎ প্রেরণা হিসেবে বিরাজ করছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, উভয়ের মানসিক গড়নের সঙ্গে সুভাষ-চেতনার মিল ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। ১৯৩৯ সালে কর্মের যোগের সঙ্গে জীবনের যোগ মিলিয়ে লীলা নাগ-অনিল রায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হলেন, ঝড়ো দিনে বাঁধা হলো নীড়। কিন্তু বৈরী সময়ের দংশন ইতিমধ্যেই তাঁদের জীবনে নিষ্ঠুর খেলা শুরু করেছিল। তাঁদের যৌবনের স্বর্ণসময়টুকু গ্রাস করেছিল দীর্ঘ কারাবাস। লীলার ক্ষেত্রে ছয় বছর, অনিল রায়ের আট বছর। বন্দিত্ব শেষে মুক্তজীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর অবকাশটুকু বিশেষ মিললো না। কংগ্রেসে তখন প্রবল দ্বন্দ্ব দেশনায়ক সুভাষ বসুকে ঘিরে, সমাজতান্ত্রিক চেতনাবহ সুভাষের জনপ্রিয়তার শক্তিতে দিশেহারা দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সুভাষ বসুর নেতৃত্বে বিপুল জনগোষ্ঠী। জোরদার বামপন্থী আন্দোলনও এই প্রক্রিয়ার স্বাভাবিক মিত্র। কিন্তু যুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদান পাল্টে দেয় সেই হিসেব, সোভিয়েত সমর্থক গোষ্ঠী হিসেবে বামপন্থীদের অবস্থান রাতারাতি তাদের করে তোলে প্রবলভাবে সুভাষ-বিরোধী ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনবিমুখ। কারাগার থেকে বের হয়ে আসতে থাকেন বামপন্থীরা, আর কারাগার ভরে তোলে কংগ্রেসী সত্যাগ্রহী ও সুভাষ-অনুগামীরা।

মুক্তিলাভ করে জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা পালনের দায়িত্ব নির্বাহকল্পে কর্মক্ষেত্র কলকাতায় স্থানান্তর করেন রায়-দম্পতি, 'জয়শ্রী' পুনঃপ্রকাশও শুরু হয় কলকাতা থেকে। কিন্তু রাজনীতির পট তখন দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে এবং রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে হয়েছে রায়-দম্পতিকে। ১৯৪০ সালে হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনকালে স্বল্পমেয়াদী কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় তাঁদের। কিন্তু পরে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে আবার গ্রেফতার হন তাঁরা এবং নির্জন কারাবাসসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক দণ্ড ভোগ করতে হয় কারান্তরালে। আগস্ট বিপ্লবের উত্তালতা তাঁরা কারাগার থেকে অনুভব করেন, রাখতে পারলেন না আন্দোলনে কোনো প্রত্যক্ষ

ভূমিকা। ১৯৪৬ সালে যখন মুক্তি পান তখন উপমহাদেশ থেকে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনের বিদায়-ঘণ্টা বেজে উঠেছে, কিন্তু স্বাধীনতার সেই উদ্ভাসন আত্মগৌরবের না হয়ে আত্মগ্লানির রূপ নিতে চলেছে হিন্দু-মুসলিম রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক সংঘাতের ভেতর দিয়ে। ১৯৪৬ সালের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-কে ঘিরে শুরু হয়ে গেল গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং, হিংসায় উন্মত্ত সেই পটভূমিকায় শান্তশ্রী অথচ দৃঢ়চেতা ত্রাণকর্মী হয়ে উদ্ধার করে আনলেন মুসলমান সাথীদের, যাঁর সাক্ষ্য হয়েছিলেন কুমিল্লার ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা আশরাফউদ্দিন চৌধুরী ও আরো অনেকে। কলকাতার আগুন নিভতে না নিভতেই দহন শুরু হলো নোয়াখালিতে। এবারও লীলা রায় ছুটলেন কর্মীবাহিনী নিয়ে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে ত্রাণ সহায়তা যোগালেন, প্রসারিত করলেন সম্প্রীতির বোধ। ছয় মাসেরও বেশি সময় জুড়ে দাঙ্গাবিধ্বস্ত রামগঞ্জে তিনি দুর্গত ত্রাণের কাজ পরিচালনা করেন।

কিন্তু রাজনীতি তখন অমোঘ পরিবর্তনের পথে যাত্রা শুরু করেছে, ভারত-ইতিহাসের সবচেয়ে রহস্যাবৃত এক পর্বে দ্রুতচালে ঘটছিল নানা পরিবর্তন। বিভাজন যেন হয়ে উঠছিল অমোচনীয় নিয়তি। প্রতিহিংসার বিপরীতে সম্প্রীতি, সংঘাতের বিপরীতে শান্তির আদর্শের দাঁড়াবার কোনো জায়গা বুঝি রইলো না। এই নিয়তিকে মেনে নিতে অস্বীকার করে উদভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করেছেন লীলা রায় অনিল রায়। দিল্লিতে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আশাভঙ্গের বেদনা নিয়ে তাঁরা ফিরলেন। পরে বাংলা যখন বিভক্ত হয়ে উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলো লীলা রায় অনিল বায় কলকাতা ছেড়ে ফিরে এলেন ঢাকায়, পূর্ববঙ্গের মানুষ হিসেবে তাঁদের আপন দেশে। ঢাকাতেও লীলা রায়ের ব্যস্ত সময় কেটেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে মানবিক প্রতিরোধ রচনার কাজে। কিন্তু বাংলাদেশের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানকে বরদাস্ত করা ধর্মান্ধ সঙ্কীর্ণতা আক্রান্ত মুসলিম লীগ নেতৃত্বের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সমাজও তখন মেতে উঠেছিল ভিন্ন উন্মাদনায়। তাঁদের কার্য পরিচালনায় আরোপিত হয় নানা বাধা, শেষ পর্যন্ত উত্থাপন করা হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ, কিছুদিন আত্মগোপনে থেকে তারপর তাঁরা বাধ্য হন দেশত্যাগে, তবে যাওয়ার আগে কলকাতা থেকে আগত সুফিয়া কামালকে খুঁজে বের করে তাঁকে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত করে যান লীলা রায়, লীলাদির যে স্নেহজড়িত অভিজ্ঞান আজীবন বহন করেছেন মহিয়সী এই নারী।

দেশভাগ-পরবর্তী যে কলকাতায় ফিরে গেলেন লীলা রায় অনিল রায় সেখানে ছিন্ন মালা আবার গেঁথে নেয়ার বিশেষ অবকাশ ছিল না, ছিল না নতুন করে কর্মভিত্তি গড়ে তোলার সুযোগ। তদুপরি রাজনৈতিকভাবে তাঁদের যোগ যে সুভাষ-ঘরানার সঙ্গে, জনচিত্তে তার আবেদন প্রবল রইলেও ফ্যাসি-শক্তির সঙ্গে হাত মেলাবার কারণে কি কংগ্রেস কি কমিউনিস্ট সবাই সুভাষচন্দ্রের নিন্দাবাদে মুখর। মিত্রশক্তির জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদের অমানবিক হিংস্রতার যেসব নজির প্রকাশ পাচ্ছিল সেসবও প্রতিকূল আবহ তৈরিতে অবদান রেখেছিল। উত্তেজক সেই সময়ে

সুভাষ বসুর চিন্তাচেতনা বিবেচনায় নেয়ার অবকাশ বিশেষ রাখা হয় নি। এরই মধ্যে কংগ্রেসের সুবিধাবাদিতা ও সমাজতন্ত্রের বস্তুবাদী দর্শনের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে যেভাবে সাম্যবাদী অর্থনীতির পক্ষে অবস্থান নিতে চেয়েছিলেন রায় দম্পতি তার জায়গা বিশেষ থাকলো না। সর্বোপরি খণ্ডিত বাংলায় আপন অবস্থানের ভূমি তথা ঢাকার সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় তাঁদের রাজনীতিক ভিত্তি থেকে তাঁরা বঞ্চিত হয়েছিলেন। যে-পরিস্থিতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জন্য সৃষ্ট হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানে, কিংবা বর্ধমান ছেড়ে এসে ঢাকায় যেভাবে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে পড়লেন অবিভক্ত বাংলার রাজনীতির সিংহপুরুষ আবুল হাশিম, ততোটা না হলেও অনেকটা সেই ধরনের পরিণতি বরণ করলেন লীলা রায় অনিল রায়। আপন শক্তিতে নিজেদের একটা স্থান তাঁরা করে নিচ্ছিলেন বটে, তবে এর সঙ্গে বিভাগপূর্ব অবস্থানের কোনো তুলনা চলে না।

এমনি পরিস্থিতিতে অকালে মৃত্যুবরণ করলেন অনিল রায়, ১৯৫২ সালে। লীলা রায় কর্মধারা অব্যাহত রাখলেন, তবে পুরনো সেই সুর আর খুঁজে পেলেন না। তাঁর যে প্রাসঙ্গিকতা ছিল ঢাকা তথা বাংলার রাজনীতিতে, দেশবিভাগে তচনচ হয়ে যাওয়া সমাজে সেই প্রাসঙ্গিকতার জের বিশেষ রইলো না।

পশ্চিমবাংলায় লীলা রায় ছিলেন প্রকৃত অর্থেই ছিন্নমূল। অপরদিকে উপুর্যপরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক পীড়ন ও অপমানে জর্জরিত হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত বিপুল সংখ্যক মানুষের অব্যাহত দেশত্যাগ লীলা রায়কে আরেক বাস্তবতার মুখোমুখি করে তুললো। ছিন্নমূল এইসব মানুষের স্বাভাবিক নির্ভর-স্বরূপ ছিলেন লীলা রায়, কেননা পশ্চিমবাংলায় তাঁর তুলনীয় খ্যাতিমান পূর্ববঙ্গের আর কোনো নেতা-নেত্রী ছিল না। ছিন্নমূল নায়িকা তাই ছিন্নমূলদের নায়িকা হয়ে উঠলেন, কিন্তু প্রায় অক্ষম এক নায়িকা, যিনি সর্বস্বপণ করেও উদ্বাস্তুদের জীবন সুসহ করতে কার্যকর কোনো অবদান রাখতে পারলেন না। এর কারণ লীলা রায়ের অক্ষমতা বা সীমাবদ্ধতা নয়, কারণ নিহিত সময়ের আরো জটিল গ্রন্থিতে, যে গ্রন্থিমোচন ছিল প্রায় অসম্ভব। দাঙ্গা-পীড়িত বিভাজিত পাঞ্জাবে যে জনবিনিময় ঘটেছিল, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে সীমান্তের দু-ধারের দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষজনের পারস্পরিক হিজরত, তার দায়ভার বহন করতে গিয়ে ভারত সরকার বুঝেছিল এর অসারতা এবং বিপুল ব্যয়বহুলতা। জনবিনিময়ের স্বীকৃতির ফলে পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে সরকার ছিল দায়বদ্ধ। সরকারের নীতি-নির্ধারক পর্যায়ে উত্তর-ভারতীয়দের আধিক্য তাদের হয়তো পাঞ্জাবের প্রশ্নে অনেক উদার করে থাকতে পারে। কিন্তু বাংলায় জনবিনিময় কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। সেই প্রবণতা ঠেকাতে তাই নেহেরু সরকার ছিল দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ ছিল ভারতের সরকারি নীতির এক দিক। অন্যদিকে সামগ্রিক বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে যথাসম্ভব নিষ্ক্রিয় থাকার নীতি গ্রহণ করেছিল ভারত সরকার, অন্তত এভাবেও যদি উদ্বাস্তু আগমনকে

নিরুৎসাহিত করা যায়। পাক-ভারত সম্পর্কের এই বৃহত্তর পটভূমিকা পাল্টানোর ক্ষমতা ছিল না বাংলার প্রাদেশিক নেতৃত্বের। ফলে বাংলার উদ্বাস্তুরা হয়ে থাকলেন মার্জিনাল ম্যান বা প্রান্তিক মানব, আর তাঁদের সমস্যা সমাধানে আকুল হয়ে ফিরলেন উদভ্রান্ত নায়িকা, সান্ত্বনার চাইতে অধিক কিছু যোগাবার পথ যিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

অপরদিকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ববঙ্গে চলছিল ভিন্নতর টানাপোড়েন। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নোর নির্বাচন, বিবিধ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি সূত্রে চলছিল বাঙালি সত্তাকে মেলে ধরে অসাম্প্রদায়িক জাতীয় চেতনার লালন। এর বিপরীতে ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের অলীক ভাবনার জবরদস্তি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় সমর্থনপুষ্ট উদ্যোগ। বাংলাভাষার অধিকার অস্বীকার, বর্ণমালা সংস্কার, রবীন্দ্র-বিরোধিতা ইত্যাদি কালাপাহাড়ি অভিযানের কথা তো আমরা জানি। এর সঙ্গে চলছিল নিরন্তর এক অন্তঃসলিলা অঘোষিত সাম্প্রদায়িকতা, যার ফলে লীলা রায়ও হয়ে গেলেন সর্বাংশে পরিত্যাজ্য। যে-ঢাকাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল তাঁর জীবনের উন্মেষকালীন বিপুল কর্মকাণ্ড দেশভাগ-পরবর্তী সেই ঢাকা সাংস্কৃতিক-সামাজিক পরম্পরা সর্বাংশে অস্বীকার করতে চাইলো, তাই লীলা রায়ের নামোচ্চারণও অলিখিত বিধি-নিষেধের আওতাভুক্ত হলো। এর জের হিসেবে দেখি তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'নারী শিক্ষা মন্দির'-এর নাম পাল্টে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে করা হলো, 'শেরে বাংলা বালিকা বিদ্যালয়'। পূর্ববঙ্গ থেকে এমনিভাবে লীলা রায়ের মূলোৎপাটনে সক্রিয় হয়েছিল পাকিস্তানি শাসক সম্প্রদায়।

সময়ের নিষ্ঠুর আঘাতে তচনচ হয়ে যাওয়া জীবনে পূর্বের সেই সংলগ্নতা আর খুঁজে পেলেন না লীলা রায়। নিষ্ঠুর রাজনৈতিক বাস্তবতা তাঁর পূর্ববঙ্গীয় শেকড় জবরদস্তিভাবে উৎপাটন করে তাঁকে উৎখাত করেছিল স্বভূমি থেকে, স্বাভাবিক সর্বপ্রকার যোগাযোগের সুযোগ রহিত করে। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে তিনি মার্জিনালই রইলেন, কি রাজনৈতিক কি সামাজিকভাবে। নেতিবাচক সমাজ বাস্তবতার কারণে সর্ব অর্থে তিনি হয়ে রইলেন ছিন্নমূল। কর্মের যজ্ঞ থেকে সরে এলেন না বটে, তবে তাঁর কর্মধারা সমাজে আগের অনুরণন তুলতে ব্যর্থ হলো, যেমনটা ঘটেছিল ত্রিশ বা চল্লিশের দশকে। রাজনীতিতে আদর্শ-চেতনা অক্ষুণ্ন রেখে তিনি হয়ে রইলেন প্রান্তবাসী, ফরওয়ার্ড ব্লক কিংবা ঐক্যমূলক প্রজা-সোশালিস্ট পার্টি ছেড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক গড়লে চটকদার সাফল্য নিশ্চিত ছিল, কিন্তু বৈরাগ্য সাধনের পথ তিনি পরিত্যাগ করলেন না কোনোভাবেই। অনিল রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর শরীরও দ্রুত ভেঙে পড়তে থাকে এবং ১৯৫৫ সালে প্রথমবারের মতো আক্রান্ত হলেন হৃদরোগে। রাজনৈতিক বা সামাজিক কোনোভাবেই আর খুঁজে পেলেন না সেই সংলগ্নতা যা একজন ভূমিপুত্র বা পুত্রীর অনায়াস করায়ত্ত। তাই বুঝি কলকাতার জীবন থেকেও একসময় চলে যেতে

চেয়েছেন দূরে, সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলে গড়ে তুলেছিলেন মাটির বাড়ি 'শ্রী'।

যে-শ্রীমন্ত জীবন লীলা রায় চেয়েছিলেন সকল মানুষের জন্য ঝড়ো হাওয়া এসে তা একেবারে তচনচ করে দিয়েছিল, কিন্তু তারপরও আবার ভাঙা হাট জুড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি পরম মমতা নিয়ে। অসাধ্য ছিল বটে সেই কাজ, কিন্তু সমস্যা যতো বিপুলই হোক স্বপ্নপূরণের কর্মসাধনা থেকে তিনি বিরত হন নি। জীবনপ্রান্তে, ১৯৬৭ সালে, তিনি বলেছিলেন, "জয়-পরাজয়, সাংসারিক সার্থকতা-ব্যর্থতায় এসবে কি মানুষের কিছু পরিচয় আছে? আছে তার চিন্তায়, ব্যবহারে, সংগ্রামে। Achievements কি? কোনো কিছু পাওয়া? ভেবে ভেবে দেখেছি, তাতে আমার কোনো আকর্ষণ নেই।" তাঁর পথচলাতেই আনন্দ, সে পথ যতো রক্তাক্ত ও কণ্টকময় হোক না কেন। ১৯২৫ সালে অসাধারণ কর্মযজ্ঞের নায়িকা কম্পিত-বক্ষ যে তরুণী রবীন্দ্রনাথের মুখের দিকে তাকাতে দ্বিধান্বিত ছিলেন পাছে স্বপ্নভঙ্গ হয়, সেই নারী জীবনের রূঢ় আঘাতে জর্জরিত হয়েও বাস্তবের দিকে তাকিয়েছেন চোখে চোখ রেখে এবং যে চিত্র দেখেছেন তার নিষ্ঠুরতা যতো তীব্রই হোক না কেন স্বপ্নভঙ্গ ঘটতে দেন নি কখনো। লীলাবতী নাগ তাই খণ্ডকালের কিংবদন্তী নন, চিরকালের নায়িকা।

লীলা নাগের কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংরেজি বিভাগ

অজয় রায়

প্রথমেই আমাদের বুঝে নিতে হবে লীলা নাগের কাল বলতে আমরা কোন কালপর্বকে চিহ্নিত করতে চাই। ইতিহাস বর্ণনায় কালপর্বায়ন সবসময়ই একটি বিপজ্জনক সমস্যা। বস্তুত ইতিহাস বা সমাজ প্রগতির ধারাবাহিকতাকে কোন ক্রমেই কতকগুলি খণ্ডীকৃত কালপর্বে বিভাজন (Periodization) করে দেখা সম্ভব নয়।

তবু, কখনও কখনও কোন ঘটনাকে আলোকিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের পর্বায়ন করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। সেদিক থেকে লীলা নাগের জীবন-কালকেই তাঁর কাল বলে সহজে চিহ্নিত করা যেতে পারে। লীলা নাগের জীবনপঞ্জির ওপর দৃকপাত করলে দেখা যায় তিনি জন্মেছিলেন ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর, আর তিনি ১৯২১ সালে ইংরেজি বিভাগে ১ম পর্বে এম. এ ক্লাসে ভর্তি হয়ে দু'বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা মাত্র দু'বছরের (১৯২১-২৩)। কিন্তু ঢাকাই ছিল তাঁর মূল কর্মভূমি গোটা ত্রিশের দশক ও চল্লিশের দশক জুড়ে। লীলা নাগকে দেশবিভাগের অত্যল্প পরেই তাঁর প্রিয় কর্মভূমি ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়।

সুতরাং লীলা নাগের কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে শুধু ১৯২১-২৩ এ দুটি বছর বোঝাতে চাইব না—যে দুটি বছরে তিনি ছিলেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। বিশের ও ত্রিশের দুটি দশককে আমরা লীলা নাগের কাল বলে চিহ্নিত করতে চাই। দুই দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতিলাভ করেছে ও বিকশিত হয়েছে, এর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে ভারতে ও ভারতের বাইরেও। যুক্ত বাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে, তরুণ মনে যুক্তিবাদী মননচর্চায়, মুক্তবুদ্ধির চর্চায় ও সর্বোপরি মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ নির্মাণে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অনন্য ভূমিকা রাখে।

সেই কালের ঢাকা

'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে'র সুপারিশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২১ সালে একটি পূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়রূপে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অঙ্গে ধারণ করে। তৎকালীন বাংলাদেশে দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল ঢাকা শহরের উত্তর প্রান্তে রমণীয় রমনার উন্মুক্ত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে, যে শহরটি অতীতে দু'বার বাংলার রাজধানী হওয়ার গৌরব বহন করছে। ঢাকাকে উপযুক্ত স্থান হিসেবে বেছে নেবার পক্ষে কমিশন ঢাকা সম্পর্কে যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

> "এক লক্ষ বিশ হাজার বাসিন্দার এই শহরটি প্রদেশের দ্বিতীয় নগর। প্রাচীন ও ঐতিহাসিক রাজধানী হিসেবে শহরটি গৌরবমণ্ডিত। এটি এখন বাণিজ্যিক এবং ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠছে। পূর্ববঙ্গের ঘনবসতিপূর্ণ জেলাগুলির মধ্যে এর রেল ও নদীপথের যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বোত্তম। শহরটি বাংলার গুণীজনদের অনেকের আবাসস্থল বিক্রমপুরের অতি নিকটে। এখানে ১৮০০ ছাত্রেরও অধিক ছাত্রসহ দুটি প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কলেজ রয়েছে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে কলা, বিজ্ঞান ও আইন বিষয়ে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। এখানে অবিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃতিরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে চিকিৎসা, প্রকৌশলবিদ্যা শিক্ষাদান করা হয় এবং একটি সরকারি কৃষিফার্মও আছে। কলেজ দুটির মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সেটি ঢাকা কলেজ- এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। এর ভবনসমূহ সুন্দর এবং মফস্বল কলেজের মধ্যে সবচাইতে সুসজ্জিত। কলেজটি একটি সুদৃশ্য ও উন্মুক্ত উদ্যানে (রমনা) অবস্থিত শহরকেন্দ্র থেকে দু'এক মাইলের মধ্যে। এর চতুষ্পার্শে রয়েছে সুন্দর জায়গা যেখানে বক্তৃতাদানের কক্ষ, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, ছাত্রাবাস প্রভৃতি ভবন নির্মাণ সম্ভব। ঘটনাচক্রে এই প্রকল্পের বাস্তবায়নে যা সহায়ক হবে সে ধরনের আগে থেকেই বৃহৎ ও সুনির্মিত বেশ কিছুসংখ্যক ভবন রয়েছে, যা এক সময় সরকারের প্রয়োজনে নির্মিত হলেও বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না। এসব ভবন এখন আর্থিক সুবিধার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে লাগবে।" (Report of the Calcutta University Commission, 1917 থেকে বাংলায় অনুবাদ)।[১]

মোগল ঢাকা

বাংলাদেশে, মনে হয় সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যেও ঢাকা একটি প্রাচীন শহর। এর উৎপত্তি কবে হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস আজও অনুদ্ঘাটিত। ঢাকার পুরানো ইতিহাস যে গৌরবময় এতে সন্দেহ নেই। অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ নগরীর অন্যতম ছিল আমাদের এই শহরটি, আর এর স্থান ছিল দ্বাদশতম। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে পূর্ববাংলার, যা বর্তমানে বাংলাদেশ, ইতিহাস গঠনে ঢাকার ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা।

তবে একথা সবাই স্বীকার করেন যে সপ্তদশ শতকের আগেও ঢাকা একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল প্রাক মুসলিম যুগেও। হয়তো স্বাধীন সুলতানী যুগেও ঢাকার মর্যাদা ছিল গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে। ঢাকা নামের উৎপত্তি নিয়েও রয়েছে মতদ্বৈধতা। একটি চলতি মত হলো এখানে এককালে প্রচুর *ঢাক* গাছ (*Butea Frondosa*) জন্মাত, আর এই নাম থেকেই এই জনপদের নাম হয়েছিল '*ঢাকা*'। আর একটি কিংবদন্তি হলো সেন বংশের প্রথম রাজা বল্লাল সেন এখানে গভীর জঙ্গলে দেবী কালীকা মূর্তি আবিষ্কার করেন। দেবী এখানে গুপ্ত অবস্থায় (ঢাকা) ছিলেন বলে এই অঞ্চলের নাম হয় ঢাকা এবং দেবী 'ঢাকেশ্বরী' (ঢাকা-ঈশ্বরী : covered goddess) নামে পূজিত হতে থাকেন। আর একটি তত্ত্ব হলো মোগল সুবেদার শেখ আলাউদ্দিন ইসলাম খান পূর্ববঙ্গে মোগল শাসন দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর বিপুল নৌবাহিনী নিয়ে বুড়িগঙ্গার তীরে বর্তমান ইসলামপুর অঞ্চলে উপনীত হন ১৬০৮ সালে। স্থানটি সামরিক দিক থেকে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় তিনি এখানে বাংলার রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। বলা হয়ে থাকে রাজধানীর সীমানা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে তিনি একদল ঢাকবাদ্যকরকে ঢাক বাজাতে নির্দেশ দেন। আর এই ঢাকের (বাদ্যযন্ত্র) নাম থেকে অঞ্চলের নাম হয় 'ঢাকা' এবং ঢাকের বাজনা যতদূর শোনা গিয়েছিল তাই নির্ধারিত হয়েছিল নতুন নগরের সীমানা। এসব কিংবদন্তির পশ্চাতে ঐতিহাসিক উপাদান কতটা আছে তা আজ নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব।

ঢাকার আসল গৌরব অবশ্য শুরু হয় যখন মোগল বাদশা জাহাঙ্গীরের শাসনামলে সুবে-বাংলার সুবেদার ইসলাম খান বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন ১৬০৮, মতান্তরে ১৬১০ সালে। সুবেদার ইসলাম ঢাকার নতুন নাম করেন বাদশার নামে 'জাহাঙ্গীর নগর', যা কেবল সরকারি নথিপত্রের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সাধারণের কাছে এবং বহির্বিশ্বে শহরটি 'ঢাকা' নামেই সুপরিচিত ছিল। রাজধানী স্থানান্তরের পেছনে সামরিক কারণই ছিল মুখ্য। ১৬০৮-১৭১৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা একশ' বছরেরও অধিককাল মোগল বাংলার রাজধানী ছিল, আর একালেই ঢাকার উন্নতি ও বিকাশ ঘটে নানা দিকে—ব্যবসা-বাণিজ্যে, বয়নশিল্পে, নৌযান-শিল্পে, স্থাপত্যে। গড়ে উঠে নগর সভ্যতা।

ইসলাম খানের আমলে ঢাকা ছিল নিতান্তই ছোট শহর- পূর্বে সদরঘাট থেকে পশ্চিমে বর্তমান চকবাজার। তবে রাজধানী পুনরায় মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরকালে (১৭১৭) এর ব্যাপ্তি ও প্রসার ঘটে বিপুলভাবে। পশ্চিমি পর্যটকদের বিবরণ থেকে দেখা যায় শহরের পরিধি ছিল ৪০ মাইল আর বিস্তৃতি ছিল পূর্বে ডেমরা খাল থেকে পশ্চিমে সাত মসজিদ রোড এবং দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা থেকে উত্তরে টঙ্গি পর্যন্ত। তবে নগরের প্রাণ চাঞ্চল্য ছিল ব্যবসা কেন্দ্র, সরকারি ও প্রশাসনিক দপ্তরসমূহ শহরের দক্ষিণ অঞ্চলে পূর্ব-পশ্চিমে নদীর তীর বরাবর।

রাজধানীর মর্যাদা হারাবার পর থেকেই ঢাকার অবনতি দ্রুত ঘটতে থাকে।

অচিরেই ঢাকা পরিণত হয় জঙ্গলময় দূষিত, ব্যবসা-বাণজ্যহীন জনবিরল একটি অনাকর্ষণীয় জনপদে।২-১০

আধুনিকতার স্পর্শে ঢাকা

১৮৫৭ সিপাহি বিদ্রোহের অবসানের পর অবশিষ্ট ভারতের মতো ঢাকাও সরাসরি ইংরেজ শাসনাধীনে আসে। ঢাকা আসে আধুনিকতার সংস্পর্শে—আধুনিক চিন্তা-ভাবনার সাথে পরিচিত হয়, পরিচিত হয় আধুনিক শিক্ষা ও শাসন-ব্যবস্থার সাথে। ১৮৬৪ সালে চালু হয় ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি আর ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জিলা বোর্ড। ১৮৩৫-এ স্থাপিত হয়েছিল ঢাকার প্রথম ইংরেজি স্কুল, যা পরে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল নাম পরিগ্রহ করে। এর পরপরই (১৮৪১) বিজ্ঞান ও উচ্চতর মানববিদ্যা বিষয়ে উচ্চশিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় কলেজ অব ঢাকা বা 'ঢাকা কলেজ'। পি. এন. পগোজ নামে ঢাকার আর্মেনীয় জমিদার ও ব্যবসায়ীর বদান্যতায় ১৮৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিখ্যাত পগোজ স্কুল। তিনি স্বয়ং প্রধান শিক্ষক ছিলেন ১৮৪৮-৫৫ পর্যন্ত। ১৮৯২ সালে বেলজিয়াম থেকে আগত পাদ্রী 'ফাদার গ্রেগরি' মহোদয়ের উদ্যোগে স্থাপিত হয় ঢাকার প্রথিতযশা স্কুলগুলির অন্যতম 'সেইন্ট গ্রেগরি' বিদ্যালয়। জমিদার কিশোরীলাল রায়চৌধুরীর উদ্যোগে ১৮৮৪ সালে প্রথম বেসরকারি মহাবিদ্যালয় 'জগন্নাথ কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের কোষাধ্যক্ষ লিখেছিলেন, 'গরীব ও পশ্চাৎপদ জনসংখ্যার হাতের নাগালের মধ্যে বিদ্যাকে এনে দিয়ে জগন্নাথ কলেজ পূর্ববাংলায় সৃষ্টি করেছিল সামাজিক বিপ্লব।' ১৮৫৮ সালে মিটফোর্ড হাসপাতাল স্থাপিত হয়, রবার্ট মিটফোর্ডের বদান্যতায়। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয ১৮৮৫ সালে, পরের বছর ময়মনসিংহ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অন্যদিকে গোয়ালন্দ-নারায়ণগঞ্জের মধ্যে আধুনিক জলপথ ব্যবস্থা স্টিমার সার্ভিস চালু হয় ১৮৬২ সাল থেকে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়েই ঢাকা প্রবেশ করে বিংশ শতাব্দীতে। বঙ্গভঙ্গের পেছনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার, স্পষ্টতই রাজনৈতিক। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের ক্রমবর্ধমান ইংরেজবিরোধী ব্রিটিশ কথিত 'সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে' গুঁড়িয়ে দেয়া এবং স্বাধীনতাকামী শিক্ষায় অগ্রসর বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজকে, যার অধিকাংশই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত, তাদের পরিচালিত স্বাধীনতার আন্দোলনকে সাধারণ জন, যার অধিকাংশই, অন্তত পূর্ববঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন করা। অন্য উদ্দেশ্য ছিল এই বিভেদ বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়ে বাংলাদেশে বাঙালি জনকে 'হিন্দু-মুসলমান' এই সাম্প্রদায়িক রেখায় বিভক্ত করা। অন্য উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মুসলমানরা, বাংলা ভাষাভাষী হয়েও তারা বাঙালি নয়, স্বতন্ত্র একটি জাতিসত্তা- এই চেতনা সৃষ্টি করা। এতে ইংরেজদের দুটি সুবিধা

অর্জিত হয়েছে, তারা সবসময় বলতে পেরেছে যে বাঙালিদের স্বাধীনতা আন্দোলন মূলত হিন্দুদের আন্দোলন- একটি সাম্প্রদায়িক আন্দোলন যার সাথে বৃহত্তর জনগোষ্ঠি মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন সম্পৃক্ততা নেই।

ইংরেজ রাজ অবশ্য প্রকাশ্যে বলেছে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ইচ্ছা থেকে নয়, বরং এতদঞ্চলের অবহেলিত বৃহৎ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে মুসলমানদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার সৎ ইচ্ছা থেকে। এছাড়া পূর্ববঙ্গ-আসাম একটি প্রশাসনিক একক হলে এ অঞ্চলের অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলমান ব্যক্তিবৃন্দ প্রশাসনের সাথে যুক্ত হতে পারবেন এবং এর ফলে তাঁদের তথাকথিত 'রাজ্য হারানো'র বেদনার কিছুটা উপশম হবে। ১৮৮২ সালে গঠিত 'ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে'র প্রতিবেদন, যা সাধারণ্যে হান্টার কমিশন নামে পরিচিত, যে বঙ্গভঙ্গের পেছনে বড় ভূমিকা রেখেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিবেদনে একস্থানে বলা হয়েছে :

> *'the most powerful factors are to be found in the pride of race, a memory of bygone superiority, religious fears, and a not unnatural attachment of to the learning of Islam'*

তবে সাধারণ মানুষের চিন্তা-ভাবনা যাই হোক অভিজাত মুসলমান নেতৃবৃন্দ ইংরেজদের এই পদক্ষেপকে সানন্দে আবাহন জানিয়েছিল শুভ পদক্ষেপ হিসেবে। এঁদেরই প্রতিনিধি স্যার সলিমুল্লাহর কণ্ঠে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে :

> *'No one viewing things dispassionately can gainsay that the newly-born province of Eastern Bengal and Assam is full of great possibilities... The Mohamedan population is the preponderating element in this province.... No one can deny that the partition has roused the entire Mohamedan community of Eastern Bengal.'* [১১]

অন্যদিকে একজন সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালির প্রতিক্রিয়া ছিল 'নতুন প্রদেশে মুসলিম জনসংখ্যা হবে বিপুল, ... ফলে বাঙালি হিন্দুরা হয়ে পড়বে সংখ্যালঘু। আমরা আমাদের স্বভূমিতে হয়ে পড়ব পরদেশী।' (১৯০৫ সালে ৭ আগস্ট কলকাতায় টাউন হলে আয়োজিত নাগরিক সভায় উত্থিত টিপিক্যাল মত)।

কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির আবেশ তৈরিতে 'রাখীবন্ধন' মিলনমেলায় তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই প্রবল আন্দোলনে, ইংরেজ সরকার ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর দিল্লির দরবারে হিজ ম্যাজেস্টি পঞ্চম জর্জের দিল্লি-ঘোষণার মাধ্যমে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করে, যা সবারই জানা। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ মিলে নতুন প্রদেশ গঠিত হয় 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি' নামে। আসাম স্বতন্ত্র প্রশাসনিক একক হিসেবে মুখ্য কমিশনারের দায়িত্বে থাকবে। বিহার ও উড়িষ্যা মিলে গঠিত হয় নতুন আর একটি প্রদেশ।[১২]

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকা আবারও 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে কথিত নতুন প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। শহরের কাঠামোগত পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে—আধুনিক রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়াও শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গ রোধের ফলে এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ভাটা পড়ে। কিন্তু এই স্বল্প কয়েক বছরেই বেশ কিছু ইমারত ও সুদৃশ্য ভবন গড়ে ওঠে রমনার মনোরম পরিবেশে, যার পরিচিতি ঘটে 'নতুন ঢাকা' নামে। প্রদেশের নতুন শাসক, লে. গভর্নর স্যার ব্যামফ্লিড ফুলার অতি উৎসাহের সঙ্গে ঢাকাকে নতুন প্রশাসনের উপযুক্ত কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলায় হাত দেন। লর্ড কার্জনের হাত দিয়ে কার্জন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনার মধ্য দিয়েই শুরু হয় রমনা এলাকায় নতুন শহর গড়ে তোলার কাজ। এ সময়কার উন্নয়ন সম্পর্কে জনৈক সমকালীন লেখক Bradely Brit মন্তব্য করেছেন এভাবে :

'*But in the midst of it, starting in its newness, brick-red against the time-worn gray, a modern city has begun to rise. As yet it is but in its inception, and its first beginnings give but a faint forecast of what it will one day be. Yet already, in a marvelously short space of time, a temporary Government House has sprung into existence...* (*Romance of an Eastern Capital*)' [১৩]

সে সময়ের ঢাকা ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রি'র মন্তব্যও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে:

> '*A new and very handsome suburb of Dacca sprang up at Ramna This took the form of a veritable garden suburb and was furnished with many large and handsome buildings intended for use as government offices and official residences ...*[১৪]

এ সময়ে নির্মিত ভবনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—কার্জন হল, ইঞ্জিনিয়ারিং হোস্টেল (বর্তমানে ফজলুল হক হল) ও স্কুল (বর্তমানে বিজ্ঞান ভবনসমূহ), ঢাকা হল, গভর্নর হাউজ (বর্তমানে প্রতিরক্ষা দপ্তর ভবন), সেক্রেটারিয়েট ভবন (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল), প্রেস ভবন (বর্তমানে প্রকৌশল বিদ্যালয়), বর্ধমান ভবন (বর্তমানে বাংলা একাডেমী), রমনা রেস্ট হাউজ।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রোধ নিঃসন্দেহে অভিজাত মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে ছিল আশাভঙ্গের বেদনা। কিন্তু ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি রোধ করার মতো শক্তি ও সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার মতো দৃঢ় মনোবল এই অভিজাত শ্রেণীর ছিল না। এই বিরোধিতার জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী মধ্যবিত্ত সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতনতা। সেইকালে মুসলিম সমাজে এ দুটিরই অভাব ছিল, বস্তুত মধ্যবিত্ত সমাজ গড়েই ওঠেনি। সুতরাং ১২ ডিসেম্বরের ঘোষণায় ঢাকার অভিজাত মুসলিম

নেতৃবৃন্দের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলেও এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। নবাব সলিমুল্লাহকে চুপ করিয়ে দেয়া হলো তাঁকে GCIE উপাধিতে ভূষিত করে। অন্যদিকে ঢাকার হিন্দু বাঙালি সমাজে মধ্যবিত্ত চেতনা দৃঢ়তর হতে থাকে, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও কংগ্রেসী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা ক্রমশ স্বরাজ বা স্বাধীনতার কথা বলে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। লীলা নাগ এই সময়সীমারই উজ্জ্বল প্রতিনিধি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমি

এই রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা যদি একটু পেছনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যে বঙ্গভঙ্গ রদের পরপরই ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয়ের ১৯১২ সালে ঢাকা পরিভ্রমণের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বীজ উপ্ত হয়েছিল। ঢাকা সফরের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম নেতৃবৃন্দের আশাভঙ্গের বেদনার কিছুটা উপশম করা। স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিনিধিদল ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্মারকলিপি প্রদান করেন (৩১ জানুয়ারি)। ভাইসরয় ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় আনেন এবং দ্রুততার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।[১৫]

এ সিদ্ধান্তের খবর প্রকাশিত হলে, রাসবিহারী ঘোষ, আবদুর রসুল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে গঠিত অন্য একটি প্রতিনিধিদল ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯১২ তারিখে কলকাতায় ভাইসরয়ের সাথে দেখা করে এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন যে, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালটি দ্বারা পূর্ববঙ্গের বিপুলসংখ্যক কৃষক শ্রেণীর দরিদ্র মুসলিম জনগণ উপকৃত হবে না, উপরন্তু সরকারের এই পদক্ষেপ হবে 'অভ্যন্তরীণ বঙ্গভঙ্গের' (an internal partition of Bengal) সামিল। তাঁদের মতে, মুসলিম জনগণের শিক্ষা বিস্তারে প্রয়োজন সারা গ্রামবাংলায়, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে, বিপুলসংখ্যক বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপন।

প্রতিনিধিদলের আশঙ্কা নস্যাৎ করে ভাইসরয় ভারত সরকারের মাধ্যমে বাংলা সরকারকে একটি নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেন যার চরিত্র হবে- সবার জন্য উন্মুক্ত একটি শিক্ষা-প্রদায়ী ও আবাসিক (a teaching and residential University) প্রতিষ্ঠান এবং এর উদ্দেশ্য হবে : "*serve as an example and test the new type of University and in the second to afford some relief to the congested state of the Calcutta University.*"

নাথন কমিটির সুপারিশের বিশেষ দিকসমূহ

বাংলা সরকার এতদুদ্দেশ্যে রবার্ট নাথনকে সভাপতি করে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন (২৭ মে, ১৯১২), যার মুখ্য শর্তাবলি ছিল : (ক)

বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে শিক্ষা-প্রদায়ী ও আবাসিক চরিত্রের, কোনভাবেই এর চরিত্রে ফেডারেল ধারণা প্রতিফলিত হবে না; (ক) প্রতিষ্ঠানটি কেবল শহরের অভ্যন্তরে অবস্থিত কলেজগুলোকে একত্রবদ্ধ করবে এবং শহরের সীমা-বহির্ভূত কোন কলেজকে অধিভুক্ত করবে না অর্থাৎ (a). *'the University should be the teaching and residential and not of the federal type' and (b). 'it should bind together the colleges of the city and should not include any college which is beyond the limits of the town'* । এ কমিটি সাধারণভাবে নাথন কমিটি নামে পরিচিত অতি দ্রুততার সাথে তার ওপর দায়িত্ব পালন করে এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করে, যা নাথন কমিটি রিপোর্ট নামে আখ্যায়িত হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি হবে ঐকিক শিক্ষা-প্রদায়ী ও আবাসিক ('unitary teaching and residential') এবং প্রশাসনিক দিক থেকে হবে রাষ্ট্রিয় প্রতিষ্ঠান ('state university') অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত। স্থানীয় বিদ্যমান কয়েকটি কলেজ হবে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের একক, যেখানে থাকবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ও ছাত্রদের বাসের জন্য হোস্টেল। তাছাড়া প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী অধ্যয়ন বিষয় নিয়ে একটি বিভাগ খোলা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব গঠিত হবে চ্যান্সেলর, ভাইস-চ্যান্সেলর, সমাবর্তন ও কাউন্সিল সমন্বয়ে। বাংলার গভর্নর হবেন চ্যান্সেলর। বাংলা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় প্রশাসনিক অধিকর্তা। সমাবর্তন বা কনভোকেশন হবে ১৪০ সদস্যবিশিষ্ট, অন্যদিকে ২০ সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিল হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নির্বাহী সংস্থা ('supreme executive body')। কনভোকেশন ও কাউন্সিলে যেন যথাযথ মুসলিম প্রতিনিধিত্ব থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখা হয়। কমিটি অতি দ্রুততার সাথে ১৯১২ সালের অক্টোবর মাসে প্রতিবেদন প্রণয়ন সমাপ্ত করে। ১২ ডিসেম্বর, ১৯১৩ তারিখে প্রকল্পটি ভারত সরকারের অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের ডামাডোলে ও অর্থনেতিক সঙ্কটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটি চাপা পড়ে যায়। [১৬, ১৭]

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ বাবদ ৫৩ লক্ষ টাকা ও আবর্তক ব্যয় নিমিত্ত প্রতিবছর ১২ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়। রমনার রমণীয় উন্মুক্ত সবুজ পরিবেশে প্রায় সাড়ে চারশ' একর এলাকায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেছিল কমিটি। এই বিশাল এলাকার অভ্যন্তরে ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছিল আসাম ও পূর্ববঙ্গ নামে নতুন প্রদেশের কতিপয় প্রশাসনিক ভবন, সেক্রেটারিয়েট ভবন, নতুন সরকারি ভবন, সরকারি প্রেস, সংসদ ভবন (কার্জন হল) ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের জন্য নয়নাভিরাম বাসভবন। ঢাকা কলেজও এই এলাকায় অবস্থিত ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯২০

যুদ্ধ শেষ হলে, ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাদি চিহ্নিত ও সমাধানকল্পে ইংরেজ সরকার 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠন করে : ১. ড. এম. ই. স্যাডলার (M. E. Sadler), উপাচার্য, লীডস বিশ্ববিদ্যালয়, ২. ড. জে. ডব্লিউ. গ্রেগরী (J. W. Gregory), ভূগোলের অধ্যাপক, গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়, ৩. মি. পি. জে. হার্টগ (P. J. Hartog), একাডেমিক রেজিস্ট্রার, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ৪. অধ্যাপক রামজে মুইর (Ramsay Muir), ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় ৫. স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, জুনিয়র বিচারক (Puisne Judge), কলকাতা হাইকোর্ট, ৬. ডব্লিউ. ডব্লিউ. হর্নেল (W. W. Hornell), বাংলার ডি. পি. আই, ৭. ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, গণিতের অধ্যাপক, আলিগড় মুসলিম ওরিয়েন্টাল কলেজ। মি. জি. অ্যান্ডারসন (G. Anderson), সহকারী সচিব, শিক্ষা দপ্তর, ভারত সরকার এই কমিশনের সেক্রেটারি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এটিকে পরিমার্জিত আকারে বাস্তবায়নের নির্দেশনাদানের দায়িত্বও এই কমিশনের ওপর অর্পিত হয়। স্যাডলার কমিশন অত্যন্ত সুচারুভাবে এ দায়িত্ব পালন করে। কমিশন ঢাকায় একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোরালো সুপারিশ করে। এ প্রসঙ্গে কমিশনের বক্তব্য হলো : [১৮]

> "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে ভারত সরকার যদি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নাও হতেন, তাহলেও বাংলায় 'বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠনের যে নীতি' আমরা জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে ইচ্ছুক সেই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরাও এই শহরটিতে এখনই অথবা যত শীঘ্র সম্ভব একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করতাম। কারণ, যদি বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা, কলকাতার ওপর অত্যধিক চাপ লাঘব, আর ক্রমে ক্রমে মফস্বল এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা ... প্রভৃতি ধারণাগুলোকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হয় তাহলে ঢাকাকে সুস্পষ্টভাবে এধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এক লক্ষ বিশ হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত শহরটি প্রদেশের দ্বিতীয় নগর; এটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক রাজধানীর গৌরবও বহন করে ।"

ঢাকার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক তৎপরতা ও শিল্পায়ন-অগ্রগতির প্রতিও কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সুন্দর রমনা এলাকায় ঢাকার দুটি প্রথম শ্রেণীর কলেজকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে। দুটি কলেজের মধ্যে ঢাকা কলেজ মফস্বল কলেজগুলোর মধ্যে সবচাইতে সুসজ্জিত এবং চমৎকার ভবনে প্রতিষ্ঠিত। কমিশন আরও লক্ষ্য করেছিল যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭,২৯০ ছাত্রদের মধ্যে ঢাকা ডিভিশন ও ত্রিপুরা রাজ্য থেকে আসা ছাত্রের সংখ্যা ৭,০৯৭ জন। "*Dacca is, therefore, already in the center of a great student population.*" [১৮]

সুতরাং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন দ্বিধাহীন চিত্তে ঢাকায় একটি নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করে—যার প্রশাসনিক ভিত্তির নীতি হবে সরকার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত স্বায়ত্তশাসন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্র হবে শিক্ষা-প্রদায়ী ও আবাসিক। ভারতীয় সরকার স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে। অতঃপর ভারতীয় বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত 'ভারত সরকার অ্যাক্ট অষ্টাদশ (১৯২০) (Government of India Act XVIII (১৯২০)'-এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অ্যাক্টের উদ্দেশ্য এর শিরোনামে[১৫] পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে : "*An Act to establish and incorporate a Unitary Teaching and Residential University at Dacca.*"[১৬]

নিম্নলিখিত বক্তব্য দিয়ে অ্যাক্টটি সূচিত হয়েছে :

"*Whereas it is expedient to establish and incorporate a unitary teaching and residential University at Dacca; it is hereby enacted as follows:*

১. *This Act may be called the Dacca University Act, 1920*"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জন্মের পশ্চাতে রয়েছে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত দুটি কমিটির সুপারিশ। কমিটি দুটি হলো (ক) রবার্ট নাথনের নেতৃত্বাধীন 'The Dacca University Committee' এবং (খ) এম. ই. স্যাডলারের সভাপতিত্বাধীন 'The Calcutta University Commission.'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পশ্চাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যে উপাদানগুলো চিহ্নিত করেছেন তা হচ্ছে কমিশনের ভাষায় :

"*First and foremost, the desire of the Musalmans of Eastern Bengal to stimulate the educational progress of their community, and secondly, the desire of the Government of India to create a new type of residential and teaching university in India, as opposed to the present affiliating type. To these must be added a third factor of especial importance, the desire of the Government of India to relieve the congestion of the University of Calcutta.*" [১৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উভয় কমিটির সুপারিশে মতৈক্য থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের চরিত্রে ও প্রশাসনিক কাঠামোতে উভয় কমিটির দৃষ্টিভঙ্গি ও পার্থক্য দুস্তর। নাথন কমিটির সুপারিশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে 'রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়' (a state university) অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে একটি সরকারি নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সরকারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কাঠামোয় এটি হবে সম্পূর্ণ স্বশাসিত।

ভারত সরকার স্যাডলার কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করে এবং *Dacca*

University Act, 1920-এর মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বাস্তবায়িত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন-চরিত্র, যা কমিশন তীব্রভাবে অনুভব করেছিল, এই আইনে সম্পূর্ণ না হলেও সেকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর বহুলাংশ প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই স্বশাসনের দিকটির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে নব প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের প্রথম অধিবেশনে (১৭ আগস্ট, ১৯২১) বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর বাংলার লে. গভর্নর, আর্ল অব রোনাল্ডশে যে অবিস্মরণীয় বক্তব্য রেখেছিলেন তার প্রাসঙ্গিকতা আজও শেষ হয় নি :[২০]

> *"The first thing upon which I would lay stress is that the University is not a Government Institution It is a self governing institution and the Court which comes into existence today is so constituted as to embrace representatives of diverse interests so that, if the use of metaphor is permitted, it constitutes a mirror reflecting those varying shades of view, which when synthesized are described compendiously as public opinion."*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সাধারণ সংগঠন

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, স্যাডলার কমিশনের ধারণা অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট ১৯২০-এর মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই অ্যাক্ট অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত সংগঠনটির রূপরেখা হলো :

> *"The first Chancellor and Vice Chancellor of the University and first members of the Court, the Executive Council, and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, are hereby constituted a body corporate by the name of the University of Dacca".*

আর এই প্রতিষ্ঠানটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো :

> "*to provide for instruction in such branches of learning as the University may think fit, and to some provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge* (Clause 3, 4, D.U. Act 1920)."

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগাঠনিক কাঠামো বহুলাংশে ইংল্যান্ডের প্রাদেশিক যেমন ম্যাঞ্চেস্টার, লিভারপুল, লীডস বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুরূপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষগুলো হচ্ছে কোর্ট, নির্বাহী পর্ষদ (Executive Council), একাডেমিক পর্ষদ (Academic Council) ও অনুষদসমূহ। উপাচার্য হলেন

একাডেমিক ও নির্বাহী প্রধান (Academic and Executive Head of the University)।

কোর্ট হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সংস্থা (supreme body) - যাদের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই জনগণের 'জনমতের' (public opinion) প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হল এই কোর্ট। নিম্নবর্ণিত প্রতিনিধিবর্গ নিয়ে গঠিত ১৫৮ সদস্যবিশিষ্ট কোর্টকে অনেকটা ক্ষুদ্রাবয়ব-সংসদ (mini legislative body) বলা যায়। এর সদস্য হবেন : আচার্য, উপাচার্য, রিডার ও প্রভোস্টবৃন্দ, ৫জন নির্বাচিত প্রভাষক, ৩০ জন নির্বাচিত রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট, বিভিন্ন পেশার সদস্যবৃন্দ, সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিবর্গ; এখানে উল্লেখ্য, অ-ইউরোপীয় সদস্যদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ (৫০%) আসন মুসলিম সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আইন-কানুন প্রণয়ন ছাড়াও বাজেটসহ বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পৃক্ত যে কোন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও মতামতদানের ক্ষমতা কোর্টের রয়েছে।

উপাচার্য, প্রভোস্টবৃন্দ, ডিনবৃন্দ, কোর্ট কর্তৃক ৬জন মনোনীত সদস্য, আচার্য কর্তৃক মনোনীত ৪ জন (এর মধ্যে ২জন হবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) সদস্য নিয়ে গঠিত হবে নির্বাহী পর্ষদ। নির্বাহী পর্ষদ মুখ্য নির্বাহী সংস্থা হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কর্তৃপক্ষ-সংস্থার অ্যাক্টে প্রদত্ত ক্ষমতাকে খর্ব করার কোন ক্ষমতা এর নেই। আর এটিই হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনের মুখ্য দিক- যাকে বলা হয় কলেজীয় সমতা (collegiate equality)। উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে আচার্য ও নির্বাহী পর্ষদ যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবে, এখানে সরকারি কোন ভূমিকা, অন্তত বাহ্যত, নেই। উপাচার্য নিযুক্তি বিষয়ে অ্যাক্টে বলা হচ্ছে : "*The Vice Chancellor shall be appointed by the Chancellor after consideration of the recommendation of the Executive Council, and shall hold office for such terms and subject to such conditions as may be prescribed by the statutes* " (Clause (10), Act 1920)। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হল একাডেমিক পর্ষদ, একাডেমিক বিষয়ে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। এর গঠন হলো নিম্নরূপ: ডিনবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধানগণ, অধ্যাপকবৃন্দ, একাডেমিক পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত ৩ জন রিডার, ২ জন প্রভাষক, আচার্য কর্তৃক মনোনীত ৩ জন শিক্ষাবিদ। একাডেমিক পর্ষদ সম্পর্কে অ্যাক্টে বলা হয়েছে :

> "*The Academic Council shall be the academic body of the University, and shall have the control and general regulation and be responsible for the maintenance of standards of instruction, education and examination within the University*". (Clause (16), D.U. Act 1920).

শিক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে একটি নির্বাচনী কমিটির সুপারিশক্রমে নির্বাহী পর্ষদ চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দান করবে। ভবিষ্যতে কোন বিরোধ

দেখা দিলে অ্যাক্টে বর্ণিত স্ট্যাটউটের দ্বারা গঠিত ট্রাইবুনালের মাধ্যমে বিষয়টির সুরাহা করা হবে (Clause (45), D.U. Act 1920)। আর্থিক বিষয়াদি একটি আর্থিক কমিটির মাধ্যমে পরিচালনার জন্য অ্যাক্টে বলা হয়েছে :

> *"The Executive Council shall appoint from among its own members a Finance Committee to advise on matters of finance. The Treasurer shall be the Chairman of the finance committee, and at least one member of the committee shall be a member elected to the Executive Council by the Court".* (Clause (45). D.U. Act 1920).

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগাঠণিক এককসমূহ (constituent units) হচ্ছে আবাসিক ছাত্রাবাসগুলো, যাদের নামকরণ করা হয়েছে 'হল'। যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মূলত আবাসিক, তাই এর সাংগঠনিক এককগুলো হচ্ছে আবাসিক হলসমূহ। এই বৈশিষ্ট্যই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনন্যতা দিয়েছিল। অন্যদিকে নাথন কমিটির সুপারিশ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগাঠনিক উপাদানগলো হবে কতিপয় শিক্ষা প্রদানকারী কলেজ। ছাত্ররা হলে ভর্তি হবে, এবং কোন না কোন হলের বাসিন্দা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি নিয়ে ছাত্ররা হলের বাইরেও থাকতে পারবে, তবে তাদেরকে কোন না কোন হলের সংযুক্ত ছাত্র (attached students) হতে হবে। প্রতিটি শিক্ষককেও কোন না কোন হলের সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। হলের প্রশাসনিক প্রধান হলেন প্রভোস্ট। তিনি অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবেন (ন্যূনপক্ষে রিডার) এবং পদাধিকারবলে নির্বাহী পর্ষদের সভ্য হবেন। যাত্রালগ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল তিনটি সাংগাঠনিক একক: ঢাকা হল (ঢাকা কলেজের উত্তরসূরি), জগন্নাথ হল (জগন্নাথ কলেজের উত্তরসূরি), মুসলমান ছাত্রদের জন্য সৃষ্ট নতুন আবাস 'মুসলিম হল'। এই হল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ ছিল নিম্নরূপ :

> *'The establishment of college for Mussalmans was an essential feature of the original scheme. It received the approval of the Muslim community and of the Government. ... We have proposed in lieu of a Muslim college the establishment of a University Muslim Hall. It will offer to the Muslim students a full corporate life and will enable the sons of Muslim parents to receive education under those religious influence to which they attach so much importance; it will not segregate the Muslim and Hindu students in their studies, but on the contrary it will enable them to mix with the latter on terms of equality and to join in the general life of the University in a far more satisfactory manner than has hitherto been possible."*

ছাত্রদের শিক্ষা প্রদানের দায়িত্ব অর্পিত হয় বিভিন্ন অনুষদ অন্তর্ভুক্ত

বিভাগসমূহের ওপর। অনুষদ প্রধান হলেন ডিন- যিনি অনুষদের সদস্যবৃন্দ কর্তৃক বিভাগীয় প্রধানদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

ভারতের বড়লাট অর্থাৎ 'গভর্নর জেনারেল' হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিদর্শক' (Visitor)। পরিদর্শকের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন স্থাপনা (ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি), ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের: এই পরিদর্শনের ফলাফল সম্পর্কে, তিনি ইচ্ছে করলে আচার্যকে অবহিত করতে পারেন, তাঁর সুপারিশসহ। আচার্য এই ফলাফল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে প্রয়োজনে যথাকর্তব্য নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করবেন। ভারত সরকারের দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয় হলো জনগণের সম্পত্তি, তাই এর ব্যবস্থাপনায় অবশ্য 'রোধ ও সাম্য' (check and balance) থাকা বাঞ্ছনীয়।

বিশ্ববিদ্যালয়টির মুখ্য ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—এটি একটি "একক শিক্ষা-প্রদায়ী ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়" ও স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরবৃন্দ প্রতিষ্ঠানটির এই শেষোক্ত বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন বারবার। বাংলা সরকার, এমনকি ভারত সরকারও দৃশ্যত বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ও প্রশাসনে, অন্তত প্রকাশ্যে, কোন হস্তক্ষেপ করেনি, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাডেমিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বাংলা সরকারের যে বিরোধ ছিল তা আর্থিক লেনদেনের বিষয় নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত পরিবেশ ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার আবহ সম্পর্কে প্রথম আচার্য, যাঁর উদ্বোধনী ভাষণ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হয়েছে, পুনর্বার অন্যত্র বলেছেন :

> *"Restriction restricts growth. Let thousand flowers blossom in the midst of free atmosphere."* [২০]

দ্বিতীয় চ্যান্সেলর, বাংলার গভর্নর আলেক্সান্ডার জর্জ লিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বৈশিষ্ট্যকে আখ্যায়িত করেছেন "একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র" (*a State in miniature*) রূপে। জন্মলগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার একাডেমিক অর্জনের, জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার পরিবেশ সৃষ্টির ও স্বয়ংশাসিত বৈশিষ্ট্যের জন্য তৎকালীন আচার্যদের দৃষ্টিতে একটি আদর্শ জ্ঞানপীঠ হিসেবে নন্দিত হয়েছিল। এই অনুভূতি ১৯৩৩ সালে তৎকালীন আচার্য বাংলার গভর্নর জন অ্যান্ডারসন কর্তৃক প্রদত্ত সমাবর্তন ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছিল :

> *"…. let me then reiterate that Government recognize fully their obligations towards the University and in my capacity as the Chancellor I shall always endeavor to ensure that any legitimate claims that you (Vice Chancellor) may put forward are not at any time subordinate to others unless the latter are really entitled to take priority."* [২১]

স্বায়ত্তশাসন কী ও কেন এই স্বায়ত্তশাসন

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন বলতে আমরা কি বুঝি তা ইতিমধ্যেই উপস্থাপন করা হয়েছে। এর নির্যাস হলো ক. 'জ্ঞানচর্চায় ও শিক্ষা প্রদানে শিক্ষকদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা', খ. সরকারের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে ও অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে অবাধ স্বাধীনতা। আর স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হলো পবিত্র জ্ঞানমন্দির যেখানে জ্ঞান সৃষ্ট হয়, সংরক্ষিত হয় আর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সংবাহিত হয়। একথাটিই ব্রুস ট্রাসকট অন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন :

> *"A university is a corporation or society which devotes itself to a search after knowledge for the sake of its intrinsic value."* [২২]

অন্যকথায় আমরা বলতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হলো মুখ্যত ১. মৌলিক কাজের চর্চা ও ২. প্রতিটি নতুন প্রজন্মকে শিক্ষাদান করা। [২৩, ২৪] আর জ্ঞান পরিবেশন ও জ্ঞান-মুক্তবুদ্ধি চর্চার জন্য প্রয়োজন মুক্ত পরিবেশ। মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বয়ংশাসন (self governance) অপরিহার্য।

সবার জন্য উন্মুক্ত এই প্রতিষ্ঠান

যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পশ্চাতে রাজনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল অর্থাৎ কলকাতা কমিশনের ভাষায় "*First and foremost, the desire of the Musalmans of Eastern Bengal to stimulate the educational progress of their community*", তথাপি স্থপতিদের চিন্তায় এটি কখনও স্থান পায়নি যে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টির চবিত্র হবে সাম্প্রদায়িক (sectarian) অর্থাৎ কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত। ভাইসরয় রাসবিহারী-প্রতিনিধিদলকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিলেন যে, ভারত সরকার এমন কোন কার্যক্রম বা নীতি গ্রহণ করবে না যা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ('a Muhammadan University') পরিণত করে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে এটিই একমাত্র কারণ ছিল না, আরও দুটি কারণ কার্যকর ছিল যা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও একটি ভুল ধারণা প্রচলিত হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য স্থাপিত হয়েছে। পরিহাস করে এটিকে অনেকেই 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' (*Mecca University*) নামে অভিহিত করতো। কিন্তু এই ধারণা স্থূল চিন্তাপ্রসূত। এ প্রসঙ্গে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টের ৫ম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বক্তব্য স্মরণ করতে পারি :

> *"The University shall be open to all persons of either sex and of whatever race, creed or class, and it shall be not be lawful for the University to adopt or impose on any person any test whatsoever of*

religious belief or profession in order to entitle him to be admitted thereto as a teacher or student, ... "।

বস্তুত ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড, তা একাডেমিক বা একাডেমিক-বহির্ভূত হোক, বহুলাংশে অমুসলমান শিক্ষক ও ছাত্র সম্প্রদায় কর্তৃক প্রভাবিত হতো। [২৫] তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থপতিরা একথাও ভেবেছিলেন যে চিন্তা ও চেতনে বিশ্ববিদ্যালয়টি পশ্চিমী উদারনৈতিকতা ধারণ করলেও এর অবয়বে ভারতীয় চরিত্রও প্রতিফলিত হবে। এ প্রসঙ্গে আমরা পুনরায় ১ম আচার্যের কোর্টের ১ম অধিবেশনে প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক অংশটি স্মরণ করতে পারি, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক চরিত্রটিকে তুলে ধরা হয়েছে :

> *"But while I am most anxious to see this University providing boon to the Muhammedan population, I would venture to remind you that it was never intended that it should be a purely denominational institution... And it would be the most profound anomaly, surely, if situated as it is in such close proximity to historic Vikrampur with its great tradition of oriental learning, Sanskritic studies did not find an honourable place side by side with studies of Islam. If the University is to preserve a specifically Indian character such studies must necessarily form an essential part of the curriculum."* [২০]

প্রথম যুগের বিভাগসমূহ ও শিক্ষকমণ্ডলী

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম উপাচার্য পি. জে. হার্টগের নিযুক্তির মধ্য দিয়ে ১ ডিসেম্বর তারিখ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার কার্যক্রম শুরু করে। আনুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় ১৯২১ সালের ১ জুলাই থেকে। তিনটি ফ্যাকাল্টি বা অনুষদ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করে- এগুলো হচ্ছে : কলা অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদ ও আইন অনুষদ। হার্টগের পর, ৪৭-পূর্বকালে যে ক'জন উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই কোন না কোন সময়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। এঁরা হলেন: দর্শনের অধ্যাপক জি. এইচ. ল্যাংলি (০১. ০১.২৬ - ৩০. ০৬. ৩৪), ইতিহাস বিভাগের স্যার এ. এফ. রহমান (০১. ০৭. ৩৪ - ৩১. ১২. ৩৬), ইতিহাসের অধ্যাপক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (০১. ০১. ৩৭ - ৩০. ০৬. ৪২), ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদ হাসান (০১. ০৭. ৪২ - ২১. ১০. ৪৮)।

যাত্রালগ্নে তিনটি হলে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৭৭ জন। এর মধ্যে ঢাকা হলে ৩৮৬ জন, জগন্নাথ হলে ৩১৩ জন ও মুসলিম হলে ১৭৮ জন ছাত্র ছিল। ঢাকা হল ছিল ২২৫ ও ১৯৪ ফুট বাহুবিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রাকার ভূমির ওপর একটি সুদৃশ্য দ্বিতল লাল ভবন- ১৬০ জন ছাত্র বাসোপযোগী। এটি ছিল

পূর্বতন ঢাকা কলেজের হিন্দু ছাত্রাবাস। জগন্নাথ হল তখনও নির্মাণাধীন- দুটি 'ই' অক্ষর আকৃতির ভবন ও একটি কেন্দ্রীয় ভবন (মিলনায়তনসহ) নিয়ে এই ছাত্রাবাস কমপ্লেক্স পরিকল্পিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

> *"a new residential accommodation including the necessary libraries, reading rooms, and rooms for tutorial teaching etc. should be provided for 300 students (including graduate students) of the Jagannath Hall."*

জগন্নাথ হলের পরিকল্পনাটি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডারেও (১৯২১-২২, ১৯২২-২৩ ও ১৯২৩-২৪) একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। [২৬]

পুরাতন সেক্রেটারিয়েট ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবন। এ ভবনেরই দ্বিতলে মুসলিম হলকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ৬০টি কক্ষ নিয়ে।

ঢাকা হলের প্রভোস্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন মি. এফ. এস. টার্নার, যিনি লাইব্রেরিয়ান ও ইংরেজি বিভাগের অনারারি প্রভাষকও ছিলেন। অন্যদিকে জগন্নাথ হল ও মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন যথাক্রমে আইন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান ড. নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত এবং ইতিহাস বিভাগের রিডার এ. এফ. রহমান।

তৎকালীন বাংলার গভর্নর হিসেবে আর্ল অব রোনাল্ডশে (Earl of Ronaldshay) খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিনকে (Bengal Civil Service) প্রথম রেজিস্ট্রার আর মি. জে. এইচ. লিন্ডসেকে (J. H. Lindsay, ICS) প্রথম (অনারারি) কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

শিক্ষকদের পদমর্যাদা ও বেতন বিন্যাস

প্রথমদিকের শিক্ষক ও অন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নিযুক্তির বিষয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্টের অস্থায়ী ব্যবস্থার (transitory provision) বিধান অনুযায়ী। এই বিধানের ৫০(১) অনুচ্ছেদের (গ) ধারা অনুযায়ী প্রথমদিকের শিক্ষকবৃন্দ উপদেষ্টামণ্ডলীর পরামর্শক্রমে বাংলার গভর্নর কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। এই উপদেষ্টা পর্ষদ উপাচার্য ও বাংলার ডি.পি.আই ছাড়াও গভর্নরের অভিলাষ অনুযায়ী বিভিন্ন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল। উপদেষ্টা পর্ষদের অন্য সদস্যরা ছিলেন : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (প্রথমে স্যার নীলরতন সরকার- পরে স্যার আশুতোষ মুখার্জী), বাংলার বিধানসভার সভাপতি নওয়াব স্যার শামসুল হুদা (পরে নবাবজাদা কে. এম. আফজাল, খান বাহাদুর)। সে সময় ডি.পি.আই ছিলেন ডব্লিউ. ডব্লিউ. হর্নেল। উপদেষ্টা পর্ষদ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক নিযুক্তির প্রয়োজনে বিদেশী বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ১২টি নির্বাচন কমিটি গঠন করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মেধা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চার শ্রেণীর

পদবিন্যাস ছিল : অধ্যাপক (Professor), রিডার (Reader), প্রভাষক (Lecturer) ও সহকারী প্রভাষক (Assistant Lecturer)।

প্রথমদিকে বিভিন্ন পদের শিক্ষকদের যে বেতনক্রম ছিল, তা পরে আর্থিক সঙ্কট ও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পরিমার্জিত হয়। [২৭,২৮]

এই পরিমার্জিত বেতনক্রম নিয়ে প্রথমদিকে নিয়োজিত বেশ ক'জন শিক্ষকদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বাদানুবাদ শুরু হয়। এর মধ্যে বিজ্ঞানী সত্যেন বোস ও দার্শনিক হরিদাস ভট্টাচার্য তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত নিয়োগপত্র অনুযায়ী হরিদাস ভট্টাচার্যকে রিডার হিসেবে মূল বেতনক্রমে মাসিক ৭০০ টাকা বেতনে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং এই বেতন নির্দিষ্ট বাৎসরিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ ১২০০ টাকায় উন্নীত হবে। কিন্তু অদ্ভুত কাণ্ড হল হরিদাস ভট্টাচার্যের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদিত চুক্তিপত্রে বলা হলো যে, তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যতদিন কাজ করবেন ততদিন প্রতিমাসে নির্দিষ্ট ৭০০ টাকা বেতন পাবেন। চুক্তিপত্রে উল্লিখিত এ শর্তের প্রতিবাদ জানিয়ে ভট্টাচার্য মহোদয় ১৮-১২-২৩ তারিখে রেজিস্ট্রারকে লিখেছিলেন :[২৯]

> "... ... *This is the first official information that I have received from the University that the maximum has been reduced from Rs 1200/- to Rs 700/- in the case of Readers... . Taking all the facts together the matter comes to this that instead of a maximum of 1200- pay and 120/ as P. F. contribution of the university I am being offered now practically half of what was in the original offer and this in spite of the fact I wanted a definite assurance from the Vice-Chancellor that maximum offered would not be varied from .... .*"

অন্যদিকে সত্যেন বোসকে রিডার হিসেবে ৪০০ টাকা মাসিক বেতনে প্রাথমিক পর্যায়ে দু'বছরের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল যে বোসের কাজকর্ম সন্তোষজনক হলে এই নিয়োগ স্থায়ী হবে। কিন্তু দু'বছর অন্তে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে স্থায়ী না করে আরও দু'বছরের জন্য নির্দিষ্ট ৫০০ টাকা মাসিক বেতনে পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব দেয়। এ প্রসঙ্গে বোসের সঙ্গে তৎকালীন উপাচার্য হার্টগের দীর্ঘ পত্রালাপ চলে। রেজিস্ট্রারের চিঠির জবাবে বিক্ষুব্ধ বোস হার্টগকে লিখেছিলেন (বঙ্গানুবাদ) : [৩০]

"আমি রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে একটি চিঠি পেয়েছি যার মাধ্যমে আমাকে জানানো হয়েছে যে আমাকে মাত্র আরো দু'বছরের জন্য নির্দিষ্ট মাসিক ৫০০ টাকা বেতনে নিয়োগ করা হয়েছে। এবং এই নিযুক্তি আমি গ্রহণ করব কি না তা তিন দিনের মধ্যে অফিসকে জানাতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আশা করি আপনার মনে আছে যে আমার মূল নিয়োগপত্রে এমন কিছু ছিল

না যা থেকে প্রদর্শিত হতে পারে যে, আমার নিযুক্তি দু'বছর পর সমাপ্ত হবে। ... আপনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে প্রথম পর্বের দ্বিবাৎসরিক নিযুক্তি একটি সাধারণ বিধি মাত্র, ... । ... আমি যে নিয়োগপত্র পেয়েছিলাম, তাতে বলা হয়েছিল যে আমাকে মাসিক ৪০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করা হল এবং এই বেতন নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পেয়ে কালে ১২০০ টাকায় উন্নীত হবে।

আমি সবসময় ভেবে এসেছিলাম যে আমি স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়েছি এবং আমার মনে হয় নিয়োগপত্রটির এটিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হতে পারে, অন্য কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না। ... আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে আপনার বিশ্ববিদ্যালয় আমার প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণ প্রদর্শন করে নি। আমাকে আমন্ত্রণ করে একটি সম্মানজনক পদ থেকে এখানে আনা হয়েছিল, যা আপনারা এখন ব্যগ্রভাবে ভুলে যেতে চান। দু'বছর ধরে সৎ ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করার স্বীকৃতি যদি এ ধরনের হয়, তাহলে আমার জানা নেই কিভাবে বাংলার শিক্ষার ইতিহাসে এই বিশ্ববিদ্যালয় নতুন অধ্যায় সংযোজন করতে পারে। ... "

হার্টগ এর জবাবে বোসকে আশ্বস্ত করে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ হলো :

"... এটি আমার প্রত্যাশা এবং নিশ্চিতভাবে আমি অনুভব করি যে কার্যকরী সংসদ ও একাডেমিক সংসদও ইচ্ছা পোষণ করে যে নতুন শর্তাবলির অধীনে আপনার সার্ভিস এখানে অক্ষুণ্ন রাখা।"

কিন্তু বোস হার্টগের এই ব্যক্তিগত প্রত্যাশার ওপর আস্থা রাখতে পারেন নি। ছুটিতে কলকাতায় গিয়ে এর জবাব দেন :

"আপনার ২০ তারিখের চিঠি হস্তগত হয়েছে। আমার মনে হয় আমি আপনাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছি যে অন্তত আমার ক্ষেত্রে কার্যকর সংসদ যদি তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা না করে তাহলে আমার পক্ষে সেখানে (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে) থাকা সম্ভব হবে না। আমি আশা করব ছুটির পর কার্যকরী সংসদের পরবর্তী সভায় আপনি পুনরায় বিষয়টি উত্থাপন করবেন। ... "

এই বাদানুবাদের ফলে নতুন শর্তে বোসকে শেষ পর্যন্ত (৬৫০-৫০-৭৫০) এই বেতন স্কেলে ৬৫০ টাকা মাসিক বেতনে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হলো এবং হার্টগের বিশেষ অনুরোধে বোস তা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালের উপাচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদার স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে,

"প্রথমেই এক দুর্দৈব ঘটল। ১৯১৯ সনের নতুন আইন অনুসারে বাংলাদেশের শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয় একজন এ-দেশীয় মন্ত্রীর উপর। ..... মন্ত্রী হয়েই তিনি আদেশ দিলেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যে বেতনে নিযুক্ত করা হয়েছে বাংলা সরকার তা বহন করতে অক্ষম । ...... এর ফলে শিক্ষকদের বেতনের হার কমিয়ে দেওয়া হল। অধ্যাপকদের (Professor)

বেতন ১০০০-১৮০০। সেটি কমিয়ে করা হল ১০০০। এভাবে সকল শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতন অনেক কমে গেল।" ৩১

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু

কলা, বিজ্ঞান ও আইন এ তিনটি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এ সময়ে এই তিনটি অনুষদের ডিন নির্বাচিত হয়েছিলেন :

কলা অনুষদ : ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান

বিজ্ঞান অনুষদ : অধ্যাপক ডব্লিউ. এ. জেকিনস, পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান

আইন অনুষদ : ড. নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত, আইন বিভাগের অধ্যাপক ও প্রধান

১. কলা অনুষদ

কলা অনুষদ ইংরেজি, সংস্কৃত-বাংলা, ইতিহাস, দর্শন ও অর্থনীতি-রাজনীতি পাঁচটি বিভাগ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। আমরা এখানে কেবল ইংরেজি বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব।

ইংরেজী বিভাগ

মাদ্রাজ পচাপয়ার কলেজের অধ্যক্ষ ও ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতনামা পণ্ডিত সি. এল. রেন (C. L. Wrenn) রিডার ও বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হয়েছিলেন। অন্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা কলেজের শিক্ষক রায়বাহাদুর এস. এন. ভদ্র (বি.ই.এস) ও ঢাকা মাধ্যমিক কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল এ. কে. চন্দ (আই. ই. এস); এরা উভয়েই ছিলেন খণ্ডকালীন অনারারি রিডার পদে। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে যাঁরা বিভাগের সাথে শিক্ষক (প্রভাষক) হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন—আনন্দমোহন কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক পি. কে. গুহ, মাহমুদ হাসান, ইউ. সি. নাগ, বসন্ত কুমার রায়। অত্যল্পকাল পরে অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ড. এস. কে. দে'কে রিডার হিসেবে আনা হয়।

এছাড়া ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল এফ. সি. টার্নার (F. C. Turner) অনারারি লেকচারার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরেই (১৯২৫-২৬) যোগ দিয়েছিলেন সত্যেন রায় প্রভাষক হিসেবে। শিক্ষক হিসেবে তিনি খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ত্রিশের দশকের শেষ দিকে এ বিভাগেরই কৃতীমান ছাত্র (১৯২৬-৩০) অমলেন্দু বোস বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন এবং শিক্ষক হিসেবে ও ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসেবে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন (১৯৩৭-৪৮)। বিভাগপূর্ব কালে এরপর যাঁরা বিভাগে যোগ দেন তাঁরা হলেন—চারুপমা বোস (১৯৩৭-৩৮), ফজলুর রহমান (১৯৪০-৪১), ড. অ্যারনসন (১৯৪৪-৪৫), এস. এ. আশরাফ (১৯৪৬-৪৭)।

অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমারের প্রসিদ্ধি ছিল খ্যাতিমান শেক্সপিয়র গবেষক হিসেবে। এই গুণী অধ্যাপকেরা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় প্রভূত অবদান রেখে বিভাগের সুনাম বয়ে আনেন, যে ঐতিহ্য আজও বহমান। রেন সাহেব বিদায় নিলে বিভাগের হাল ধরেছিলেন সুযোগ্য শিক্ষক ও প্রশাসক ড. মাহমুদ হাসান, যিনি ছিলেন বিভাগপূর্বকালের শেষ উপাচার্য এবং বিভাগোত্তরকালের প্রথম উপাচার্য (১৯৪২-১৯৪৮)।

অধ্যাপক গুহ ইংরেজি বিভাগে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি চমৎকার স্মৃতিচারণে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে অনেক সুন্দর কথা ব্যক্ত করেছেন যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : ৩২

> "১৯৪৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার সূচনা হতে তেইশ বৎসরব্যাপী সেবা অন্তে যখন কলিকাতার শিক্ষাজগতে প্রবেশ করিলাম তখন আমার একমাত্র পাথেয় হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচিত্র ও অমূল্য অভিজ্ঞতা। ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল শুধু ছাত্রছাত্রীদের নয় শিক্ষকদেরও শিক্ষাকেন্দ্র। খড়গপুরে I.I.T প্রতিষ্ঠিত করার সময়ে ড. জে. সি. ঘোষ বলেছিলেন, 'I completed my education in Ramna'। ...(আর) আমি অকুণ্ঠচিত্তে বলতে পারি : 'It is the students who have made me waht I am.'
>
> ... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সৌভাগ্য যে এর প্রাথমিক কর্ণধারগণের প্রত্যেকেরই এমন একটি উদারচিত্র ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত প্রকৃত শিক্ষকের বিশুদ্ধ academic spirit ছিল যে তাদের পরিচালনায় প্রথম হতেই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি পবিত্র বিদ্যামন্দিরে পরিণত হল। ... এবং তাঁদের এই মহৎ সংকল্পে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যেও গড়ে উঠল এক প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধন। এ. এফ. রহমান, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, জ্ঞান ঘোষ, শহীদুল্লাহ, নরেশ সেনগুপ্ত শুধু তাঁদের ঔদার্য ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন। ... মুসলমান সমাজে পূর্বে কোন middle class ছিল না। এই middle class সৃজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কীর্তি। ... হার্টগ সাহেবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ হলো এ. এফ. রহমানকে সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট পদে প্রতিষ্ঠিত করা। এ. এফ. রহমান সাহেবের মতো উদারচেতা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত এক বিরাট ব্যক্তির প্রভাবে মুসলমান ছাত্রদের মনে হিন্দুবিরোধী কোন চিন্তা প্রবেশ করতে পারল না।
>
> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক শিক্ষকগণের মধ্যে ছিলেন কয়েকটি ইংরেজ অধ্যাপক মি. ল্যাংলি, মি. জেনকিনস, এঁরাও পরিপূর্ণভাবে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের প্রতি নিরপেক্ষভাব পোষণ করতেন এবং এঁরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে শুদ্ধ একাডেমিক পরিবেশ সৃজনে সহায়তা করলেন।
>
> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরম সৌভাগ্য হলো যে এতে অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রী এসে যোগদান করলো। এদের উপযুক্ত উচ্চাঙ্গ শিক্ষাদীক্ষা দান শিক্ষকমণ্ডলীর

একটি অতি আনন্দদায়ক ব্রত হয়ে উঠলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পরবর্তী জীবনে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। নাট্যকার মন্মথ রায় ও কবি বুদ্ধদেব বসুর হাতেখড়ি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রভাবেই ঘটেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপ্রসূ, এর কৃতী সন্তানদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, ড. অমলেন্দু বসু, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট পরেশ ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতীর উপাচার্য ক্ষিতীশ চৌধুরী, বিখ্যাত অর্থনৈতিক ড. অমিয় দাশগুপ্ত, ডি.পি.আই ড. পরিমল রায়, প্রসিদ্ধ এডভোকেট ননী চক্রবর্তী। এঁরা সকলই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে তাঁদের উন্নতির মূলে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদীক্ষা। ...”

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর এক সৌভাগ্য যে প্রথম হতেই মেধাবী ছাত্রীগণও এতে যোগদান করেছিল। এখানকার শিক্ষাদীক্ষায় এই ছাত্রীদের শুধু বিদ্যালাভ হয় নি— তাদের ব্যক্তিত্বও গঠিত হয়। পরবর্তী জীবনে এই মেয়েরা নানাবিধ দায়িত্বপূর্ণ কার্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করে। এদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে লীলা রায়ের নাম। শ্রীমতী লীলা নারী জাগরণ ও নারীশিক্ষা বিস্তারের পথিকৃতের কার্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বৃদ্ধি করেন। শিক্ষাজগতে খ্যাতি অর্জন করেন করুণাকণা গুপ্তা, অধ্যক্ষা চারুপমা বসু।

... দুটি বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করি– কথাসাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে Honarary Doctorate-এ ভূষিত করা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন University Degree ছিল না বলে কোন University তাঁকে Doctorate দিয়ে তাঁর সর্বভাবে প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করে নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই ত্রুটি সংশোধন করল। অপর ঘটনাটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন। কার্জন হলে The Meaning of Art বিষয়ে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা রবীন্দ্রনাথের সব লেখার মধ্যে একটি অমূল্য সম্পদ।

...রেন সাহেব এই ভাষণটি সম্বন্ধে আমাদিগকে বলেছিলেন, “He has gone deeper into the meaning of Art than even Shelley. And his English is unique – he added a new dimension in our language।”

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে তখন, অধ্যাপক গুহের মতে, দুটি বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব প্রবহমান ছিল। সে সম্পর্কে তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক :

“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সনে স্থাপিত হয়। পনের ষোলো বছরের মধ্যেই এটা ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু প্রারম্ভে এটাকে গুরুতর প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ঢাকা শহরেই বিদগ্ধ সমাজ এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ঢাকার উচ্চশিক্ষার অন্তরায় বলে মনে করলেন। ঢাকা নগরে রব উঠলো : They have killed a good college (Dacca College) to make a bad University.

ওদিকে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মূলে একটি গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সরকারের মনে ছিল। সরকার সত্যিই এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে তাঁদের Divide and rule নীতির সহায়কভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন। সরকার চেয়েছিলেন যে মুসলমান শিক্ষক ও মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি একটি সাম্প্রদায়িক কল হরকেন্দ্র 'communal cockport'-এ পরিণত করেন।

কিন্তু ঢাকা শহরবাসীর শঙ্কা ও সন্দেহ এবং সরকারের দুরভিসন্ধি উভয়ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশাসকমণ্ডলীর যাদুস্পর্শে।"

প্রথম উপাচার্য সম্পর্কে এই বিদগ্ধ অধ্যাপকের মূল্যায়নও বিবেচনার দাবি রাখে :

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌভাগ্য হলো পি. জ. হার্টগের মতো একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদকে প্রথম উপাচার্য পাওয়া। ... প্রথম উপাচার্যের যে গুণাবলি থাকা আবশ্যক হার্টগ সাহেবের মধ্যে তার পূর্ণ সমন্বয় ছিল। তিনি জানতেন যে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য সবচেয়ে আবশ্যক প্রকৃত শিক্ষাব্রতী ও দক্ষ অধ্যাপকমণ্ডলীর সমাবেশ। তিনি নানা দিক দেশ হতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ও দক্ষ অধ্যাপক সংগ্রহ করলেন। এ বিষয়ে ছিলেন তিনি একটি প্রকৃত জহুরী।"

অধ্যাপক গুহ তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবনের প্রথম ছাত্রী লীলা নাগকে অন্য একটি প্রবন্ধে স্মৃতিবন্দি করেছেন এভাবে :

"কল্যাণীয়া শ্রীমতী লীলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে আমার স্নাতকোত্তর ছাত্রী ছিলেন। ... সে বৎসর শ্রীমতী লীলা ও ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের কন্যা, মাত্র দুইটি মেয়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।...

শ্রীমতী লীলার আচার-ব্যবহারে এমন একটি শালীনতা ছিল যে, প্রথম হতেই তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। ক্লাসে তিনি একটি মাত্র মেয়ে। অধ্যাপকেরা বিস্ময় ও আনন্দে লক্ষ্য করতেন যে মেয়েটি একাগ্র মনে ও নিবিষ্টচিত্তে শিক্ষকদের প্রত্যেকটি কথা বুঝতে চেষ্টা করেন এবং নত মস্তকে তার সবটাই লিপিবদ্ধ করেন। সহপাঠীরা তাঁর এই নিষ্ঠা ও তন্ময়তা দেখে সসম্মান-প্রীতিতে অভিভূত হয়ে যেতো। ... আমি Shakespeare-এর sonnets সম্বন্ধে একটু পড়াশোনা করে ঐ বিষয়ে ক্লাসে কয়েকদিন আলোচনা করেছিলাম। কি বলেছিলাম তার অনেকটা ভুলে গিয়েছিলাম। পরে শ্রীমতী লীলার নোটবইয়ের সাহায্যে সব লিখে রাখি। শ্রীমতী লীলা খুব দ্রুত লিখতে পারতেন। এম. এ. পরীক্ষায় এক প্রশ্নপত্রে সাতটি প্রশ্নের মধ্যে পাঁচটির উত্তর চাওয়া হয়েছিল। শ্রীমতী ঐ নির্দেশটি লক্ষ্য না করে সাতটি প্রশ্নেরই উত্তর লিখে ফেলেন। আমি সেই বিষয়টির পরীক্ষক ছিলাম। দেখলাম যে সব উত্তরই সন্তোষজনক হয়েছে এবং একটিও রচনার অশুদ্ধি নাই।

... ইংরেজি সাহিত্য তিনি যেভাবে আয়ত্ত করেছিলেন তাতে তিনি

অধ্যাপিকারূপে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু শিক্ষাজগতের সীমিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে দেশ-সেবার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নিজেকে উৎসর্গ করে তিনি তাঁর অপূর্ব মানসিক ও নৈতিক শক্তির পূর্ণ প্রয়োগ করেছেন। শ্রীমতী লীলার অসাধারণ ব্যক্তিগত আকর্ষণী শক্তি, সংগঠন প্রতিভা, দেশের সর্ববিধ কল্যাণ প্রচেষ্টার অদম্য আগ্রহ ও উৎসাহ তাঁর জীবনকে এক অপূর্ব জ্যোতিতে বিভূষিত করেছে। এই মহৎ কার্যে তাঁর সহযোগী ছিলেন তাঁর সুযোগ্য স্বামী অনিল চন্দ্র রায়। অনিলও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র ছিলেন। বক্সিবাজারে তাঁর সমাজ-সেবার প্রারম্ভিক প্রয়াসে আমি উপদেষ্টাভাবে সংযুক্ত ছিলাম।" ৩৩

এই বিভাগের আর এক কৃতী সন্তান যিনি এ বিভাগের শিক্ষক হিসেবে (১৯৩৭-৪৮) মেধায় ও মননে, লেখায় ও সাহিত্যকর্মে ইংরেজি বিভাগের জন্য দুর্লভ সম্মান বয়ে এনেছিলেন, ড. অমলেন্দু বোসও তাঁর স্মৃতিচারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল্যায়ন করেছেন নানা দিক থেকে। আমরা এখানে কিছু কিছু অংশ তুলে ধরতে চাই : ৩৪

"আমি ও আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অতি নিকটতম প্রতিবেশী কবি অজিত দত্ত, দু'জনে সাইকেলে চড়ে শহরের উত্তারঞ্চলে নব-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল-এ নন-রেসিডেন্ট অ্যাটাচড ছাত্র হিসাবে ভর্তি হলাম। পরের বৎসর আমাদের সাহিত্যপ্রেমী 'প্রগতি' গোষ্ঠীর বুদ্ধদেব বসু ও পরিমল রায় একই জগন্নাথ হল-এ এসে ভর্তি হলেন। ... আজ আমার তিন বন্ধুই ওপারে চলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শা-জাহান' কবিতার শেষাংশের মত আমি ভাবি–

স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

... আমরা দেখলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা নিরন্তর অগ্রসরমান, এখানে ব্যক্তিত্বের সংযত বিকাশের অমূল্য সুযোগ, এখানে জ্ঞানপথিক যুবজনচিত্ত ক্রমেই এগিয়ে যায়, তার জীবনের মন্ত্র, উপনিষদের ভাষায় 'চরৈবেতি', এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো Excelsior। সহসা বোধ করলাম যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি কতকগুলি সুদৃশ্য ও বিশাল হর্ম্যে বিচরণ করার জন্য নয়, এসেছি তাকে অন্তঃস্থ আলোকিত মনোজগতে বিচরণ করার জন্য। সহসা যেন আমার অনভিজ্ঞ, আদর্শ-সন্ধানী, তরুণ সত্তায় অনুভব করলাম একটা বিরাট দায়িত্ব। এই দায়িত্বের চেতনা এবং দায়িত্ব পালনের অনির্বাণ সন্তোষ, দুয়েরই উৎস ছিল আমাদের শিক্ষায়তন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যখন আমি সেখানে ছাত্র ছিলাম (১৯২৬-৩০), পরে যখন সেখানে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক হয়েছিলাম, তখনও (১৯৩৭-৪৮)।

... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যা পেয়েছি তার সীমা নেই। রোমন্থিত স্মৃতিতে একবারে তো সবকথা উঠে আসে না। ... নিয়ম অনুসারে আমি জগন্নাথ হল-এর

সঙ্গে যুক্ত ছিলাম (শিক্ষকতা কালে), তবুও অন্য তিনটি হল-এর সঙ্গে - ঢাকা হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক হল—আমার সংযোগ ঘনিষ্ঠ ছিল, সব হল-এ আমার দু'চারজন প্রিয় ছাত্র ছিল, তাদের সবাই (যেমন জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, মুনীর চৌধুরী, আবদুল হাই) আজ মর্ত্যলোকে নেই, কিন্তু তাদের স্মৃতি আমার চিত্তে উজ্জ্বল, উজ্জ্বল থাকবে আর যে কয়দিন আমি এই লোকে থাকবো।

জগন্নাথ হল একটি একক হল ছিল না। সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনের প্রতীক ছিল। ... "

অধ্যাপক বোস অন্যত্র তাঁর ধাত্রীমাতা সম্পর্কে আরও কিছু সুন্দর স্মৃতিচারণ করেছেন : ৩৫

"ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো অধ্যাপকদের কথা শুনি (যেমন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্বন্ধে, তরুণ অধ্যাপক সত্যেন বোস সম্বন্ধে, তাঁদের কোনো কোনো কাহিনী তখনই 'লেজেণ্ড' হয়ে গেছে), কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার সময় কোথায় তখন ? এদিকে শ্রীসংঘের শক্ত নিয়মনিষ্ঠায় নিগড়াবদ্ধ হয়েছি, ভবেশ নন্দী-সত্য গুপ্ত-ভূপেন রক্ষিত-অনিল রায় প্রভৃতি জ্যেষ্ঠের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের কাছে সমর্পিত প্রাণ হয়েছি। ... (এহেন অবস্থায়) আমি নিজেই গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম (১৯২৬)।

... ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্রের সংখ্যা দীর্ঘকাল মুসলমানদের অনুপাতে বেশি ছিল, তবে সম্ভবত দেশবিভাগের পর (১৯৪৮-এর জুন মাসে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে অন্যত্র যাই, সে সময়) এই অনুপাত বদলে গিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অমুসলমান ছাত্রদের খেলাধুলা বিদ্যাচর্চা, সামাজিক জীবন কোনক্রমেই সঙ্কুচিত ছিল বলে আমি ১৯২৬-১৯৪৮ সালের মধ্যে আমার ছাত্রজীবনের ও শিক্ষক-জীবনে দেখিনি, তবে মুসলমান ছাত্রদের বিদ্যোৎসাহী করার জন্য বিশেষ অর্থসাহায্য ছিল, যেমন ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বী তফসিলীদের জন্য সাহায্যের।

... আমার ছাত্রজীবনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষক মাত্র তিনজন ছিলেন বলে স্মরণ হয় : ইতিহাসের এ. এফ. রহমান সাহেব (পরবর্তীকালে হয়েছিলেন স্যার ফজলুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর), ইংরেজি বিভাগের মাহমুদ হাসান (আমার শিক্ষক, পরবর্তীকালে ভাইস-চ্যান্সেলর), বাংলা-সংস্কৃত বিভাগের শহীদুল্লাহ সাহেব। ... এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য মেধার বলে শিক্ষণকার্যের ও জ্ঞানজগতের উচ্চপর্যায় অধিকার করেছিলেন, মুসলমানত্বের বলে নয়। শহীদুল্লাহ সাহেব ভাইস-চ্যান্সেলর হননি, পাকিস্তানকালেও হননি, কিন্তু কে না মানবে যে তিনি এই শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মহাপণ্ডিতদের অন্যতম ছিলেন?

যাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে 'মেক্কা অব দি ইস্ট' আখ্যার শ্লেষোক্তি

প্রয়োগ করতেন তাঁদের শ্লেষ যেমন স্থূল ছিল তেমনি এই শ্লেষ প্রয়োগে এ কথার প্রমাণ হয় যে তখনকার দিনে শিক্ষিত ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু সমাজে সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান এবং স্বকপোলকল্পিত আত্মগরিমা এত অধিক ছিল যে তাঁরা ভাবতেন যে সমাজের এক অংশের শ্রীবৃদ্ধি হলেই (অর্থাৎ তাঁরা নিজেরা যে অংশের অন্তর্গত সে অংশের শ্রীবৃদ্ধি হলেই) সমগ্র সমাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়ে যাবে। ঐক্য মানে যে বহুর সমন্বয়, সেই বহুর কোন অংশের দুর্বলতায় যে সমন্বয়ও সংক্রমিত হয়, এই সত্যোপলব্ধি যেন কেমন করে শক্তিধর সমাজকোণ থেকে অপসৃত হয়েছিল।"

ড. বোস সেই কালের তাঁর বিভাগের শিক্ষকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ ক'জন শিক্ষক সম্পর্কে স্মৃতি রোমন্থন করেছেন স্বভাবসুলভ শ্রদ্ধা ও মমতায়।

" ... আচার্য সত্যেন বোসের নিরভিমান মহত্ত্ব যে কোনো স্থানে, যে কোনো কালেই বিরল। কিন্তু কথাটা হলো এহেন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার অপরিসীম সৌভাগ্য আমরা পেয়েছিলাম আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌলতেই। .... ইংরেজি বিভাগের ডক্টর সত্যেন সেনের বাড়িতেও তেমনি স্বাধীনতা। অধ্যাপক প্রফুল্ল গুহ মহাশয়ের বাড়িতে আমরা নিতান্ত স্বজনের মতোই চলাফেরা করতাম।"

অধ্যাপক বোস উল্লেখ করেছেন যে তাঁর সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে তিনটি পরস্পরছেদী স্রোতধারা।

"প্রথমত আমরা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্র : মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ; স্ত্রী, পুরুষ; ভারতীয় অভারতীয়, (যেমন ল্যাংলি সাহেব, ডিউক সাহেব, রেন সাহেব), বাঙালি, অবাঙালি। ... অবাঙালি অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন অঙ্কের বিজয় রাঘবন, ইংরেজির কৃষ্ণান, অর্থনীতির পানাণ্ডিকর, কমার্সের জুন্নারকার, অর্থনীতির আইয়ার। এঁরা সবাই পরিবারের সঙ্গে বেমালুম মিশে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় স্রোতে আমরা সবাই শিক্ষক বা ছাত্র, স্ত্রী বা পুরুষ– কোনো না কোনো আবাসিক কেন্দ্রের সাথে জড়িত থাকতাম। সুতরাং সেই হলের মান-মর্যাদার জন্য নিজেদের দায়ী বোধ করতাম। ...

তৃতীয় স্রোতে আমরা যার যার বিভাগের জন্য আনুগত্য বোধ করতাম। আমার বর্তমান মধ্য ষষ্ঠ দশকী বয়সে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছে যে আমার বিভাগ– ইংরেজি বিভাগ ভারতীয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অতীব উঁচুস্থান অধিকার করেছিল।

চতুর্থ স্রোতটি ছিল অনাবাসিক ছাত্রদের একান্ত এলাকা। আমরা যারা শহরের বাসিন্দা (শাঁখারিবাজার, কলতাবাজার, ...) তাদের পল্লী-আনুগত্য প্রবল ছিল। ... আমাদের শ্রীসংঘ যদিও শুরুতে ঢাকার বিভিন্ন পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়েই সংগঠিত হয়েছিল, অচিরেই এই সংঘের আওতায় (অনিল রায় ও লীলা রায় দু'জনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন) এসে পড়েছিল জগন্নাথ হল ও ঢাকা হলের অনেক ছেলে ও মেয়ে যারা বহিরাগত। এইভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃহৎ পরিবারটির অনেকগুলি স্তর বিন্যস্ত ছিল।

আমার নিজের পক্ষে পঞ্চম একটি স্তরও ছিল, সেটি ছিল সাহিত্যের নেশার স্তর। আমি ছাত্রজীবনে ও শিক্ষক-জীবনে দেখেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সবারই একটি গভীর সাহিত্যপ্রীতি ছিল। ... কিন্তু বুদ্ধদেবের প্রয়াণের পরে এখন অবশ্যই দিন এসেছে যে ১৯২১-৪৭ মধ্যবর্তী বৎসরগুলিতে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ছিলেন, তাঁদের কতজন কতটা কৃতিত্বের সঙ্গে সাহিত্যের আসরে বসেছেন, তার একটা আদমশুমারি ও মূল্যায়ন করা। ১৯৪৭ থেকে আজ অবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যিক কৃতিত্ব অতি উজ্জ্বল, বর্তমান পূর্ববঙ্গের সাহিত্য বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই সাহিত্য, এর মূল্যায়ন আবশ্যক। ...

আমরা ভাবতে পারি না যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া না করে অন্য কোথাও করলেই বুঝি-বা ভালো ছিল আমাদের পক্ষে। এ এক অনবদ্য ধাত্রী যার সন্তানেরা ভারতীয় মহাজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোনো না কোনো অবদান রেখেছেন। অবদানের মূলে আমাদের অবিস্মরণীয় সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।"

ড. বসু শ্রীমতী লীলা রায়কে মনে রেখেছেন এভাবে :

"In May 1931, Sreemati Leela Nag started the journal which was named Jayasree by Rabindranath Tagore Our society in those days urgently needed such a forum, and Leela Nag's forum in no time acquired the active participation of numerous ladies from all over the country and thus earned status for Indian women, especially the women of the younger generation . . I had the privilege of being a student at Dacca when Leela Nag, a postgraduate student there used to walk down the long corridor of the University Central Building, walk with a lofty natural dignity that earned respectful namaskars from everyone else in the corridor, students, teachers, university workers. ... Of the multi-dimensional and constantly vivid personality of this incomparable lady, of her unresting activities, Jayasree is only one part, although an invaluable part." [৩৬]

এই বিভাগের অনেক কৃতী ছাত্রদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর স্মৃতিচারণে অবশ্য বিভাগের কথা খুব একটা আসেনি- শুধু এক স্থানে কয়েকজন শিক্ষকের সাথে সত্যেন রায় প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এভাবে :

"—সেই যানবিরল পথেও অতি সতর্ক সাইকেল চালিয়ে আস্তে আমাকে ছাড়িয়ে যান ডক্টর দে—সংস্কৃত-বাংলার অধিনায়ক সুশীলকুমার। বা হয়তো দেখা যায় জগন্নাথ হলের দিক থেকে বেঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকে ঢুকলেন ইতিহাসবিশারদ রমেশচন্দ্র মজুমদার, যুবকদের চেয়েও দ্রুত এবং বলিষ্ঠ তাঁর পদক্ষেপ। অথবা, আমি যখন কলেজের গাড়ি-বারান্দায়, ঠিক তক্ষুণি সাইকেল থেকে নামেন আমাদের ইংরেজি বিভাগের সত্যেন্দ্রনাথ রায়, সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে

যাঁর তুল্য লাজুক অধ্যাপক আর নেই—আমাকে দেখে ঈষৎ লাল হন তিনি, মৃদু কেশে নরম আওয়াজে বলেন, "এই যে বুদ্ধু, ভালো আছো ?" [৩৭]

চল্লিশের দশকের প্রথমদিকের এই বিভাগের আর একজন উজ্জ্বল ছাত্র ছিলেন কবীর চৌধুরী (১৯৪০-১৯৪৪)। তাঁর স্মৃতিতে ইংরেজি বিভাগ এভাবে উঠে এসেছে : [৩৮]

"আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকি তখন ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার। ইংরেজিতে আমাদের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ড. মাহমুদ হাসান। অবশ্য ১৯৪৪-এ আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়বার আগেই ড. মাহমুদ হাসানকে পাই ভাইস-চ্যান্সেলর হিসাবে, আর ড. এস. এন. রায়কে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে। ... ড. হাসান আমাদের প্রথম বর্ষের কয়েকটা ক্লাস নিয়েছিলেন। শেক্সপীয়রের নাটক সম্পর্কে পরিচিতিমূলক ক্লাস। চমৎকার বাকভঙ্গি ছিল তাঁর, নিখুঁত উচ্চারণ, আকর্ষণীয় প্রাণবন্ত উপস্থাপন-কৌশল। রীতিমতো সাহেব মানুষ ছিলেন ... । ... ড. এস. এন. রায় ছিলেন একটু ভিন্ন স্বভাবের মানুষ। লাজুক-লাজুক, কোমল কণ্ঠস্বর, স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব, স্নেহপ্রবণ।পড়াশোনাকে হৃদয়-মন দিয়ে ভালোবাসতেন। তাঁর বাড়িতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরি ছিল। ... তাঁর বাড়ি ছিল এখন যাকে তোপখানা রোড বলি তার কাছে। ... বাড়ির নাম ছিল উশ্রী।

আমার বিভাগীয় অধ্যাপকদের মধ্যে কয়েকজনের কথা খুব উজ্জ্বলভাবে মনে আছে, কয়েকজনের স্মৃতি কিছুটা ধূসর হয়ে এসেছে। ... অধ্যাপক পি. কে. গুহ শেক্সপীয়রের নাটক পড়াবার সময়ে গলায় আবেগ ঢেলে দিয়ে সংলাপ স্বগতোক্তিগুলি উচ্চারণ করতেন; প্রায় মঞ্চাভিনয়ের পর্যায়ে নিয়ে যেতেন। ফর্সা মোটাসোটা মানুষটি, ধুতিচাদর পরে ক্লাসে আসতেন। অমায়িক কিন্তু গম্ভীরও। ড. সুকুমার গাঙ্গুলি আমাদের চসার পরাতেন।... বি. কে. রায় পড়াতেন প্রাচীন ইংরেজে। খুব নীরস লাগত তখন।

... আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন প্রাচীন বা মধ্যযুগের ইংরেজি সাহিত্য আমাকে আকর্ষণ করেনি, আমাকে তখন বিশেষ আকর্ষণ করেছিল ব্রাউনিংয়ের কবিতা। হয়তো এর পেছনে কাজ করেছিল অধ্যাপক অমলেন্দু বসুর পড়াবার ভঙ্গি। তিনি তখন তরুণ, সদ্য ভালো ডিগ্রি নিয়ে বিদেশ থেকে ফিরেছেন, সুদর্শন, চটপটে, খুবই আর্টিকুলেট। ... আমার সাবসিডিয়ারি ছিল ইকনমিক্স। এ. কে. দাশগুপ্তের ক্লাস অসম্ভব ভালো লাগতো।"

সে সময়কার বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নিয়েও অধ্যাপক চৌধুরী কিছু কথা বলেছেন অন্য একটি স্মৃতিচারণে :

"এ ঘটনাকে (নাজির আহমেদ নামের একটি ছাত্রের ছুরিকাহত হওয়া) বলতে পারি সেদিনকার আবহাওয়ায় একটি ব্যতিক্রম। কারণ আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কেবল হিন্দু ছাত্রদের সাথে নয়, শিক্ষকদের

অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু সমাজের। আমাদের ইংরেজিতে ড. মাহমুদ হাসান ব্যতীত সেদিন কোনো মুসলমান অধ্যাপক ছিলেন না। ... হিন্দু শিক্ষকদের বাড়িতে গিয়ে আমাদের গল্প করা, ক্লাশ করা– এটা ছিল সেদিনকার সেই পরিবেশের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এই শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মন্মথ ঘোষ, তেমনি পি. কে. গুহ, অমলেন্দু বোস আর এস. এন. রায়। এঁদের সঙ্গে আমাদের অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, ছাত্রদের এত আন্তরিক, অমায়িক সম্পর্ক ছিলো যে, সে কথা আজ একেবারে অকল্পনীয় বলে মনে হয়। ... অধ্যাপক জুনারকরের পরিবারের কথা মনে পড়ে। এই পরিবারের সঙ্গে মুনীরের সম্পর্ক তো পরবর্তীকালে খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছিলো। ... তবে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে সেইকালে সাম্প্রদায়িকতা তীব্রভাবে না থাকলেও একটা গোত্রবোধ ছিলো, সেটি আমি স্মরণ করতে পারি।

... তবে ছাত্র-শিক্ষক সবার মধ্যে আমি সেদিন সাম্প্রদায়িকতার চাইতে মানবিক একটি বোধেরই প্রকাশ দেখতাম। কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে এবং শিক্ষকদের মধ্যে যে চল্লিশের দশকে ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করছিলো এবং নানা মহল থেকে প্রবেশ করানো হচ্ছিল, সে কথাও ঠিক। কিন্তু এখানে যেটি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে এই যে, এমন অবস্থায় মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে এমন কিছু ছাত্র ছিলো যারা সাম্প্রদায়িক হওয়ার চাইতে বামপন্থী রাজনীতির দিকে অধিক আকর্ষিত হয়েছে। ... আমি সেদিন রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে কোন সক্রিয় কর্মী ছিলাম না। কিন্তু তবু সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেদিনকার ঢাকার বামপন্থী গুণীদের মধ্যে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (কবি), রণেশ দাশগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী– এঁরা যে ক্রমান্বয়ে আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছিলেন এবং আমরা যে তাঁদের দিকে এগুচ্ছিলাম, এ ভাবটি তো আমার আজো মনে জাগে। কারণ, '৪৭-এর পূর্ববর্তী সময়ে একদিকে কংগ্রেস, আর একদিকে মুসলিম লীগ : এর বাইরে প্রগতিশীল বামপন্থী চিন্তা সম্পন্ন একটি ধারা ছিলো।" [৩৯]

উচ্চতর অধ্যয়ন ও গবেষণায় এই বিভাগের অর্জন কম নয় সেই প্রত্যূষকালে- কয়েকটি তাৎপর্যময় অর্জনের উল্লেখ করা হচ্ছে।

- C. L. Wren: *Shakespeare's Richard The III*
- P. K. Guha: *Realism in English Romanticism*
- " : *Is Hamlet a Problem?*
- B. K. Roy: *Old English Morphology*
- P. K. Guha: *On Two Problems of Shakespeare's Hamlet*
- U. C. Nag: *A Midsummer Night's Dream*

সেই ত্রিশের দশকে বিভাগের প্রভাষক বসন্ত কুমার রায় (বি. কে. রায়) অর্জন করেছিলেন ইংরেজি বিভাগ থেকে প্রথম পিএইচ. ডি (Ph. D) ডিগ্রি (১৯৩০)। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল : '*Morphology of the old English Noun and Verb traced from pro-ethnic Indo Germanic*'। এছাড়া এই বিভাগ থেকে আরও

দু'জন ছাত্র পিএইচ. ডি (Ph. D) ডিগ্রি পেয়েছিলেন- ১. ধীরেন্দ্রলাল দাস (The Absolutism of F. H. Bradle, ১৯৪২) এবং ২. বি. এন. ভট্টাচার্য (*The Place of Nature in Some British Idealistic Systems of Thought, 1942*)।

২১ অন্যান্য অনুষদ

যাত্রাকালে বিজ্ঞান অনুষদে স্থান পায় মাত্র তিনটি বিভাগ : পদার্থবিদ্যা, গণিত ও রসায়ন। পদার্থবিদ্যা বিভাগটি সংগঠিত করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল ঢাকা কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক মি. ডব্লিউ. এ. জেঙ্কিনসকে (W. A. Jenkins) বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক হিসেবে। এর পরপরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতিময় ও প্রতিভাবান তরুণ স্কলার প্রভাষক সত্যেন বোসকে রিডার হিসেবে নিয়োগ করা হয়। বিশের দশকের শেষার্ধে সত্যেন বোসের সাথে যোগ দেন রমন বিক্ষেপণ সহ-উদ্ভাবক খ্যাত পরীক্ষণ পদার্থবিদ কে. এস. কৃষ্ণাণ রিডার পদে। সত্যেন বোস কর্তৃক কোয়ান্টাম সংখ্যায়নের (Quantum Statitics) উদ্ভাবন, যা বর্তমানে 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' (Bose-Einstein Statistics) নামে পরিচিত (১৯২৪) [৪০] এবং 'কৃস্টাল-চুম্বকত্ব'-এর ওপর কৃষ্ণাণের ক্লাসিক গবেষণা (১৯৩০-৩৫) বিভাগটিকে আন্তর্জাতিক জগতে খ্যাতিমান করে তোলে। [৪১]

ঢাকা কলেজের গণিতের অধ্যাপক বিশিষ্ট গণিতবিদ ড. বি. এম. সেনগুপ্ত বিভাগের প্রধান ও অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন ড. নলিনী মোহন বসু ও নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী - এছাড়া নিযুক্ত হয়েছিলেন দু'জন সহকারী প্রভাষক। ত্রিশের দশকের প্রথমদিকে রিডার হিসেবে যোগ দেন টি. বিজয়রাঘবন। ড. নলিনী মোহন বোস ও রাঘবনের উচ্চতর গবেষণা গণিত বিভাগকে এনে দেয় আন্তর্জাতিক সম্মান। [৪১]

রসায়ন বিভাগে খ্যাতনামা ভারতীয় রসায়নবিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সুযোগ্য ছাত্র প্রতিভাবান রসায়নবিদ ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষকে নিযুক্ত করা হয় বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক হিসেবে। ড. ঘোষের সুখ্যাত 'ঘোষ তড়িৎ-বিশ্লেষ্য তত্ত্ব' ও তৎসংশ্লিষ্ট গবেষণা বিভাগকে এনে দেয় সুনাম ও প্রশংসা।[৪২] ১৯৩৯-৫৪ সাল পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধান হিসেবে শিক্ষকতায় ও গবেষণায় প্রভূত অবদান রেখেছিলেন খ্যাতনামা রসায়নবিদ অধ্যাপক জে. কে. চৌধুরী। [৪২]

১৯৩৯-৪০ শিক্ষাবর্ষে 'জীববিদ্যা' নাম আর একটি নতুন বিভাগ বিজ্ঞান অনুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃত গবেষক ও প্রথিতযশা উদ্ভিদবিজ্ঞানী ড. পি. মাহেশ্বরীকে রিডার ও বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে বিভাগটি অচিরেই একটি বিশ্বমানের বিভাগে উন্নীত হয়। [৪২]

একটি মাত্র বিভাগ 'আইন' শাস্ত্র' নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই অনুষদ। ডিন ও বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন খ্যাতনামা আইনজ্ঞ ও সাহিত্যিক ড. নরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত।

তথ্যপঞ্জি :

১. *Calcutta University Commission Report*, 1917

২. *Dacca Past and Present*, G. K. Lohani, Allahabad, 1911

৩. *Notes on the Antiquities of Dacca.* Syed Aulad Hasan, Dacca, 1912

৪. *ঢাকার কথা*, হরিদাস বসু, ঢাকা, ১৯২৪

৫. *The Reminiscence of Dacca,* Hridaynath Majumdar, Calcutta, 1926

৬. *ঢাকার কথা*, নির্মল গুপ্ত, কলকাতা, ১৯৪০ (১ম সংস্করণ), ১৯৯৫(৩য় সংস্করণ)

৭. *DACCA*. Ahmad Hasan Dani, Asiatic Press, Dacca, 1956 (first edition), 1962 (Second edition)

৮. *Dacca : The Mughal Capital,* Abdul Karim, Dacca, 1964

৯. *Dacca : The City of Mosques*, Syed Mahmudul Hasan, Dacca, 1981

১০. *ঢাকা ঃ স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, মুনতাসীর মামুন, অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৩ (১ম প্রকাশ)

১১. *The New Province – its future possibilities*, Sir Salimullah, Journal of the Moslem Institute, Vol. I (4), 1906

১২. *Cambridge History of India,* Vol. V

১৩. *Romance of an Eastern Capital*, Bradley Birt, London, 1906

১৪. *The Baptist Mission Society,* 1906, Ms. p61

১৫. *Calcutta University Commission Report*, Vol. IV, pt. II, p 113

১৬. *Report of the Nathan Committee*. 1912

১৭. *Report of the Dacca University Committee*, Calcutta, 1914

১৮. *Calcutta University Commission Report*, Vol IV, Pt. II, p 132

১৯. *Dacca University Act, 1920* (Government of India Act, XVIII, 1920)

২০. *Speech of His Excellency the Earl of Ronaldshay, G.C.I.E., Governor of* Bengal, Chancellor of the University given at the inaugural session of the first meeting of the Court of Dacca University (August 17, 1921)

২১. *Dhaka University: The Convocation Speeches*, Compiled and Edited by Sirajul Islam Choudhury, Vol. 1, 192-46.

২২. *Redbrick University*, Bruce Truscot, London, 1943

২৩. *Universities in Transitions*, H. C. Dent, London, 1961

২৪. *University Grants Committee,* University Development, 1947-52

২৫. *আমাদের সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*, শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৭৪

২৬. *Calendar for the years* 1921-22, 1922-23 & 1923-24

২৭. *Minutes of the Executive Council(Resolution 13),* 12th September, 1921

২৮. *Minutes of the Court*, 5th April, 1923 and 12th July, 1924

রচনা-নিদর্শন

আমাদের রবীন্দ্রতর্পণ

লীলা রায়

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের অবতারণা করে এ আলোচনা নয়, কারণ তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগের সূত্র একান্তই আকস্মিক এবং সঙ্কীর্ণ। সাহিত্য আমার পেশা বা নেশা কোনোটাই নয়। কাজেই বাংলার কোনো সাহিত্যিকের কলমে রবীন্দ্র-তর্পণও এ নয়। সে তর্পণের প্রাচুর্য্য, বৈচিত্র্য ও বৈদগ্ধ আগামী কয়েকদিনে অগণিত পত্র-পত্রিকা, সুভিনিরে আত্মপ্রকাশ করবে। আমার দাবী আরো সার্বজনীন। বিগত শতাব্দীর না হোক্ অন্ততপক্ষে বিগত অর্ধ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ-সচেতন বাঙালিদের একজন হিসেবে, আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রাপ্তি স্বীকারের সামান্য প্রয়াস এ। এ প্রাপ্তির পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে সহজ বা সম্পূর্ণ সম্ভবও নয়। আমরা রবীন্দ্র-যুগজাতই শুধু নই; তাতেই বিধৃত, আলো বাতাসের মতই আমরা নিশ্বাস গ্রহণ করেছি রবীন্দ্র আকাশে. আমাদের মনন ও মানসিকতা, আচার ও আচরণ, বিকাশের বিচিত্র উপকরণ এবং প্রকাশের বিশিষ্ট ঢং-এর জন্য গত অর্ধশতাব্দীর বাঙালিরা বহুল পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের নিকট ঋণী। ভাষা ও সাহিত্যের কথা না হয় উল্লেখ নাই করলাম। বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে বাঙালির ঘরে ঘরে শিশুদের শৈশব বিকশিত হয়েছে তাদের জন্য লিখিত রবীন্দ্র-কবিতাবলী আবৃত্তি করে ও সেই সব গান গেয়ে। এ যুগের এমন শিক্ষিত বাঙালি বিরল 'মেঘের কোলে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি'র মহেন্দ্রক্ষণটিতে, লালদীঘিতে-কেয়া-পাতার নৌকা ভাসিয়ে দিয়ে যার শৈশবের কল্পনা অচেনা রাজ্যে পাড়ি জমায়নি। এ যুগের প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালির ললাটে জন্মক্ষণেই অঙ্কিত হয়েছে রবীন্দ্র-যুগের টিকা। একে অস্বীকার করবার ক্ষমতা কোথায় তার? মনে পড়ে প্রতি সকালে সন্ধ্যায় পারিবারিক সম্মিলিত প্রার্থনায় অথবা ছাত্রাবস্থায় দৈনন্দিন সম্মিলিত সঙ্গীতে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের গানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উন্মোষিত হয়েছে জীবন সম্বন্ধে নিষ্ঠা, গাম্ভীর্য, বিপদে নিঃশঙ্কতা ও আত্মপ্রত্যয়, অর্থাৎ অলক্ষ্যে পত্তন হয়েছে জীবনের প্রাথমিক বুনিয়াদ রবীন্দ্র-প্রসাদ সিঞ্চনে। লক্ষ উপদেশাবলী যা করতে পারত কি না সন্দেহ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাব ভাষা ও সুর অতি সহজে স্বাভাবিকভাবে তা করেছে। কেবলি কি তিনি কবি! জীবনের সকল সৌন্দর্য্যানুভূতি, গভীর বেদনাবোধ, ক্ষমতাবানের নিপীড়নের বিরুদ্ধে কঠিন শপথ, দেশাত্মবোধের সর্বস্বপণ-করা প্রেরণা, কি না পেয়েছি তাঁর নিকট! জাতির জীবনের প্রতিটি বিশিষ্টক্ষণে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে যে প্রতিফলন—জাতির মানসিকতার প্রকাশই শুধু তা নয়, তাকে গঠনও করেছে সে বহু

পরিমাণে। ১৯১৯ সনের জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক অত্যাচারের প্রতিবাদে যে ভাষায় বিবৃতি দিয়ে কবি নাইট পদবী পরিত্যাগ করেছিলেন, আজও মনুষ্যত্বের অপমানের প্রতিবাদে যে ধিক্কার বিভিন্ন সময়ে জগতের মহৎ ব্যক্তিরা উচ্চারণ করেছেন, তার মধ্যে গৌরবের স্থান অধিকার করে থাকবে। আজও অন্তরে জ্বলন্ত অক্ষরে ভাস্বর হয়ে আছে সেই মহৎ বাক্যগুলি :

"The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen..." শুধু বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির নয়, একটি বিরাট প্রাণের অভিব্যক্তি এ, যে প্রাণের ব্যাপ্তি ও প্রাচুর্য্য স্বদেশ ও বিশ্বকে একই সাথে স্থান দিয়েছিল নিজের অন্তরলোকে। সেই যুগের তরুণদের উপর, যারা দেশের মুক্তি-সংগ্রামে সর্বস্ব পণ করেছিল, তাদের উপর এই চিঠির প্রভাব বিস্ময়কর। তেমনি পরবর্তীকালে মিস্ রাথবোনের নিকট লেখা তাঁর চিঠি, হিজলি আটক বন্দীদের হত্যায় তাঁর অতুলনীয় জ্বলন্ত প্রতিবাদ, সভ্যতার সঙ্কট, ইত্যাদি লেখা সেদিনের বাংলার তরুণদের দুঃখবরণকে কত সহজ ও সুন্দর করেছিল তার খবর আজ অনেকেই জানে না। ফাঁসির রজ্জু গলায় পরার কালে পরপারের তরুণ যাত্রীর অন্তরের অনুক্তভাব সেদিন ভাষা পেয়েছিল যে কবির ভাষায় :

"এ যে মালা নয়-গো
এ যে তোমার তরবারি
গর্জে ওঠে অগ্নিসম
বজ্রসম ভারী"

তাঁকে প্রণাম করি।

২৬ শে জানুয়ারী ১৯৩৮ মনুমেন্টের তলায় জাতির নায়ক সুভাষচন্দ্রকে বিদেশী শাসনের দূতেরা বেটনের আঘাতে আঘাতে অজ্ঞান করে দিয়েছে। সমস্ত জাতি, তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত একসঙ্গে ভেঙ্গে পড়ল দুর্ধর্ষ প্রতিজ্ঞায়। ঢাকা শহরে সেদিন হাজার হাজার অন্তঃপুরিকারা পথে বেড়িয়ে এলো জাতির প্রতিবাদের সঙ্গে পদক্ষেপ মেলাতে। অনভ্যস্ত শঙ্কিত পায়ে বেজে উঠল শৃঙ্খল-ভাঙার দুর্বার ছন্দ। আজও পরিষ্কার মনে আছে সেই অভূতপূর্ব শোভাযাত্রা ভাষা পেয়েছিল কবির গানে :

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ততই বাঁধন টুটবে (মোদের)
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুট্‌বে (ততই)।"

জনবহুল রাস্তার দুধারে কাতারে কাতারে লোক জড় হয়েছে, হাজার হাজার মেয়েরা চলেছে দৃপ্ত কণ্ঠে গেয়ে। সারা জাতির সে দুঃসহ অপমান ও রুদ্ধ ক্ষোভকে কে এমন শঙ্কাহীন দুর্বার ছন্দ দিতে পারত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া? জাতির মুক্তি-সাধনা শঙ্কাহীন ছন্দ পেয়েছিল যাঁর ভাব, ভাষা ও সুরে তাঁকে সকৃতজ্ঞ প্রণাম।

১৯৩১ সালে হিজলী বন্দী-নিবাসে নিরস্ত্র আটক বন্দীদের গুলি করে হত্যা করা হয়, জাতীয় পতাকা তোলার অপরাধে। জাতির সেই অপরিসীম লাঞ্ছনার দিনে কবি একান্ত অপটু শরীর নিয়ে টাউন হলের বিশাল জনসভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য বেরিয়ে

এসেছিলেন। লোকে লোকারণ্য টাউনহল—স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় সেদিনই পরে আরো দুটি সভা হোল ময়দানে। কবি শুরু করলেন : "প্রথমেই বলে রাখা ভালো আমি রাষ্ট্রনেতা নেই, আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্র-আন্দোলনের বাহিরে।... এই যে হিজলীর গুলি চালনার ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা কিছু আমার বলবার সে কেবল অপমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে। ...প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার স্থৈর্য্য যেন আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্য্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর দুঃখ-স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।"

যে কবির কবি-প্রতিভা তাকে গজদন্ত প্রাসাদে বসে মধুর বীণাবাদনে নিযুক্ত রাখেনি কিন্তু মনুষ্যত্বের সকল অপমান-লাঞ্ছনার ক্ষণে নিজের আশ্চর্য্য সুকুমার অনুভূতি দিয়ে বারে বারে জাতির চিত্তকে স্পর্শ করেছে, উদ্বুদ্ধ করেছে, বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে সংহত রূপ দিয়েছে—সে কবির ঋণ শোধ আমরা করবো কি ভাবে?

কবির সঙ্গে প্রথম পরিচয় খুব সম্ভব ১৯২৫ এ, যখন কয়েকটি বক্তৃতা দেবার প্রতিশ্রুতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কবি প্রথম ঢাকায় আসেন। নির্দিষ্ট দিনের কয়েকদিন পূর্বেই পৌঁছে একটি বড় বজরা নৌকায় বুড়িগঙ্গার ওপর তিনি অবস্থান করলেন। ঢাকার নাগরিকেরা এই সুযোগে নানা সভানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এতে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কারণ তাদের ইচ্ছা ছিল ঢাকাবাসীদের নিকট রবীন্দ্রনাথকে প্রথম উপস্থিত করবার গৌরব তাঁরাই অর্জন করবেন। এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও ঢাকার জনসাধারণদের মধ্যে বিশেষ অপ্রীতিকর মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এই সংকীর্ণ মনোভাবে অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন নির্দিষ্ট দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়া ব্যতীত তাঁর অন্য কোনো কাজকর্ম্মের স্বাধীনতার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুমাত্র এক্তিয়ার নেই এবং এই বিষয়ে তাদের পক্ষে কোনো মতামত প্রকাশ করা অত্যন্ত অশোভন ও অন্যায় ধৃষ্টতা। কবির স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে সেদিন ঢাকাবাসী মুগ্ধ হয়েছিল।

এই সময়কার দুটি ঘটনা মনে আছে ঢাকার কয়েকজন দেশসেবী যুবক এ সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে মপলা বিদ্রোহ নিয়ে আলোচনা করেন। সেদিন যে নিষ্ঠুরতার সহিত ইংরেজ শাসক বিদ্রোহী মপলাদের শায়েস্তা করবার অভিযান শুরু করেছিল, ভারতবর্ষের সচেতন জনমত তাতে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। যদিও সামগ্রিকভাবে দেশে এ নিয়ে খুব একটা আলোড়ন হয়নি। আলোচনার বিষয় ছিল কেন সারা দেশ এ নিয়ে আন্দোলন করলো না তার কারণ কবি কি মনে করেন। সেদিন কবি যা বলেছিলেন তার সারমর্ম : দূরকে আমরা ঠিক নিকটের জন হিসাবে দেখতে পারি না। আজ যদি বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর উপর এই অত্যাচার হোতো তবে সমস্ত বাঙ্গলা নিঃসন্দেহে সাড়া দিতো, কিন্তু দূরবর্তী মপলাদের প্রতি আমাদের এ আত্মীয়তা বোধ নেই—তাদের অত্যাচার অপমানকে আপন করে দেখতে আমরা পারিনি। আজ মনে হয় কি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কবি সেদিন আমাদের গণ্ডীবদ্ধ ভাবাবেগকে বিশ্লেষণ করেছিলেন।

এ সময়ের আর একটি ঘটনা গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল মনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট হলে কবির অভিনন্দন সভার আয়োজন হয়েছে। তিলার্দ্ধ স্থান অবশিষ্ট নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনকার ছাত্র বুদ্ধদেব বসু, কবিকে স্বাগত জানিয়ে স্বরচিত কবিতা

আবৃত্তি করলেন; আর কে কি বলেছিলেন আজ আর মনে নেই। কিন্তু স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়ে আছে সে সভার সভাপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার মিঃ ল্যাংলি উঠলেন কবিকে তাঁর ভাষণ দেবার আমন্ত্রণ জানাবার জন্য। সেদিনের অভূতপূর্ব জনসমাগম—সভার অনুক্ত জমাট উত্তেজনা বা আর কিছু তাঁকে বিচলিত করেছিল। দু এক ছত্র উচ্চারণ করবার পর তিনি আর অগ্রসর হতে পারেননি—থর থর করে কাঁপতে লাগলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সেই বিশাল জনতার মধ্যে বেশীর ভাগ অধীর অস্থিরতায় অপেক্ষা করছিল এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির অবসানের অপেক্ষায়। সহানুভূতিতে বেদনায় কবির মুখ লাল হয়ে উঠলো—ততক্ষণে অন্য একজন অধ্যাপক মিঃ ল্যাংলিকে সাহায্য করতে ছুটে এলেন ও দুটি একটি কথা বলে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। সমস্ত সভা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লো। কিন্তু কিছু ছাত্র সে ঘটনায় পরিহাসের খোরাক পেয়ে কুৎসিৎভাবে হেসে উঠেছিল।

পরের দিন গেলাম কবির সঙ্গে দেখা করতে, তাঁর বজরায়। বহু দেশী, বিদেশী জ্ঞানী গুণী তাঁকে তখন ঘিরে আছেন—কিন্তু পূর্বদিনের একটি মানুষের গ্লানি, কবি ভুলতে পারছেন না—যতক্ষণ ছিলাম সে অপূর্ব মুখমণ্ডলে সে কি সুতীব্র বেদনার প্রকাশ, সে কী করুণাভরা খেদোক্তি—"How cruel! How could those young men be so cruel!" বিশ্বকে এই সুকুমার অনুভূতির ছোঁয়ায়ই তো তিনি আপন করেছিলেন। এই অনুভূতি, আপন-পরের গণ্ডীকে উত্তীর্ণ করে বিশ্বমানবের ব্যথা-বেদনা-অমান-গ্লানিকে কি সহজে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা দিয়ে অনুভব করেছে, কি সুদুর্লভ দান কবি পেয়েছিলেন তাঁর স্রষ্টার নিকটে।

ঢাকার মেয়েদের প্রতিষ্ঠান দীপালীর পক্ষ থেকে একটি মহিলা সভায় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাবার ইচ্ছা ও তাঁর নিকট থেকে কিছু শোনবার দাবী নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। অতি সহজ আন্তরিকতার সহিত আমাকে দেখেই মন্তব্য করেছিলেন—"লীলা আমাদের অমুকের (তাঁর এক আত্মীয়ার নাম উল্লেখ করে) মত দেখতে।" তাঁর সম্মতি পেলাম সহজেই। সে এক অভূতপূর্ব সভা। ঢাকা শহরে সেদিন মেয়েদের মধ্যে নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে। সকল সভাসমিতিতে তারা বহু সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করতো। কিন্তু সেদিনকার সভা সমস্ত প্রত্যাশা ছাপিয়ে গেল বোধ হয় দশ পনেরো হাজার বা তার চেয়েও বেশি সংখ্যক মেয়েরা সুসজ্জিত সুন্দর সুশৃংখল পরিবেশে কবিগুরুকে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এসে মিলিত হলেন। ছোট্ট ছোট্ট সুসজ্জিত মেয়েরা পুষ্পচন্দনে অর্ঘ্য সাজিয়ে কবিকে বরণ করল :

"ওহে সুন্দর মরি মরি"

কবি ওদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গুণ গুণ করে গান করলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। তারপর তাঁর সে আশ্চর্য্য কণ্ঠে তিনি শুরু করলেন—"সমস্ত এশিয়াতে মেয়েদের এত বড় সভা দেখিনি কোথাও...।" আনন্দে মন ভরে উঠল। মেয়েদের আহ্বান জানালেন "গৃহকে তোমরা আপন করেছ বাহিরকেও তোমাদের আপন করতে হবে। বাহিরকে আপন করে আত্মীয়-পরের গণ্ডী দূর করতে হবে।...সমস্ত সমাজের মাঝে, কাজের মাঝে, ভাবনার মাঝে এগিয়ে এসে তোমাদের অংশ নিতে হবে। তবেই সমস্ত সহজ হবে সার্থক হবে।"

আমাদের কাজকর্মে বিশেষ আনন্দিত হয়ে কবি আমাকে বলেছিলেন শান্তিনিকেতনে মেয়েদের কাজের ভার নিতে এবং একবার তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে। আমার পথের নিশানা ততদিনে নির্দ্দিষ্ট হয়ে গেছে। তবু তাঁর আহ্বানে কিছুটা গর্ব অনুভব করেছিলাম বই

কি! কিছুদিন পর তাঁর অনুরোধ রক্ষার জন্য দিন দুই এর জন্য শান্তিনিকেতনে যাই। তাঁর সাথে দেখা হতে প্রণাম করে চুপ করে রইলাম। তাঁর অনুরোধ রক্ষার অক্ষমতা জানাতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। কবি বুঝলেন। সস্নেহ প্রসন্নতায় পিঠে হাতখানি রেখে আমার অনুক্ত বক্তব্যকে সহজ করে দিয়ে বল্লেন "ঢাকার কাজ ছেড়ে বুঝি আসতে ইচ্ছে করছে না।" অন্তর কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছিল ওঁর প্রতি সেদিন।

এরপর কারাবাসের একবৎসর পূর্বে ১৩৩৮-এর বৈশাখে মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও শঙ্কাহীন দেশ সেবার ভাব জাগ্রত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে 'জয়শ্রী' প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো। অনুরোধ করে পাঠালাম তাঁকে নামকরণ করবার জন্য। 'জয়শ্রী' নাম তাঁরই দেয়া। ওঁর একটা আশীর্বাণী চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। জয়শ্রীর বিশেষ সুরটীকে কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন। লিখে পাঠালেন :

ওঁ

বিজয়িনী নাই তব ভয়,
দুঃখে ও বাধায় তব জয়।
অন্যায়ের অপমান
সম্মান করিবে দান,
জয়শ্রীর এই পরিচয়॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০ ফাল্গুন
১৩৩৮
৩০ শে ফাল্গুন, ১৩৩৮

তারপর গ্রেপ্তার হবার পালা। দীর্ঘ ছয় বৎসর কেটে গেল কারান্তরালে। গ্রেপ্তার করতে এসে কোনো বই সঙ্গে নিতে দিলনা সাহেব পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট; শুধু মহুয়াখানি নেবার অনুমতি পেলাম। প্রতিদিন ভোর রাত্রে লক্ আপ খোলার সঙ্গে সঙ্গে মহুয়াখানি নিয়ে সেলের অল্প পরিসর উঠোনে বেড়িয়ে পড়তাম আমি ও আমার এক তরুণী সঙ্গিনী। পাল্লা দিয়ে মহুয়া মুখস্থ করে ভোর ও সকাল কেটে যেত। একমাস ঐ ভাবে কেটেছিল যতদিন না অন্য কোনো বইপত্র আনবার অনুমতি জুটলো!" কতবার পরস্পরকে বলেছি "মহুয়া না থাকলে কি হোতো!"

অনতিবিলম্বে সরকারের রোষ বহ্নিতে পড়লো জয়শ্রী। জয়শ্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকলেই, এমন কি তার দুইজন কেরাণীও গ্রেপ্তার হোলো। জয়শ্রীর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে জয়শ্রীকে বে-আইনী ঘোষণা করা হোল। ১৯৩৭-এর ডিসেম্বরে মুক্তি পেয়ে কবিকে প্রণাম জানালাম। জেলের নিঃসঙ্গ দিনগুলিতে তাঁর কবিতা কত সঙ্গ দিয়েছে জানালাম। প্রত্যুত্তরে লিখলেন :

কল্যাণীয়াসু,

কারাবাস থেকে নিস্কৃতি পেয়ে তুমি বেরিয়ে এসেছো শুনে আরাম বোধ করলুম। মানুষের হিংস্র বর্বরতার অভিজ্ঞতা তুমি পেয়েছো—আশা করি এর একটা মূল্য আছে। এতে তোমার কল্যাণ সাধনাকে আরো বেশি বল দেবে।

কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করে পাশব বলে মনুষ্যত্বকে চিরকালের মতো পিষ্ট করে দেবে কিন্তু মনুষ্যত্বের মহিমার জোরেই সেটা সত্য না হোক্। পশু শক্তির উর্দ্ধে জয়ী হোক তোমার আত্মার শক্তি।...

ঐ বৎসরই ২রা জ্যৈষ্ঠ জয়শ্রীকে একটী কবিতা পাঠান যার মর্মটী কবির আশ্চর্য্য সার্বভৌমত্বের এক নির্দশন।

মন অপমান উপেক্ষা করি দাঁড়াও,
কণ্টক পথ অকুণ্ঠপদে মাড়াও,
ছিন্ন পতাকা ধূলি হতে লও তুলি,
রুদ্রের হাতে লাভ করো শেষ বর,
আনন্দ হোক দুঃখের সহচর,
নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি।।

২ জ্যৈষ্ঠ *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*
১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কে এমনভাবে জয়শ্রীর মর্মবাণীটিকে ভাষা দিতে পারতেন!

বিভিন্ন সময়ে জয়শ্রীতে উনি বেশ কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি কবিতা পরবর্তীকালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। এগুলির মধ্যে "সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান", "এ প্রাণ রাতের রেল গাড়ি", "রূপ-নারাণের কূলে, জেগে উঠিলাম" প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। অনেকেরই বোধহয় জানা নেই রবীন্দ্রনাথের দাক্ষিণ্যে 'নটির পূজা'র গানগুলির দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত হয় জয়শ্রীতে। জয়শ্রীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের আনন্দ-বেদনাময় যোগসূত্রটী জয়শ্রীর পরম ঐশ্বর্য্য ও অমূল্য পাথেয়।

এ প্রসঙ্গ শেষ করবো জাতীয় জীবনে সাম্প্রতিক ইতিহাসে আর একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা স্মরণ করে। ১৯৪৬ সনে ঢাকা ও নোয়াখালীর দাঙ্গা সমস্ত ভারতকে করেছিল বিচলিত, বিভ্রান্ত। গান্ধিজী গেছেন দাঙ্গা বিধ্বস্ত নোয়াখালীতে। আমরা কয়েকজন আছি সেখানে পূর্ব থেকে। কুখ্যাত রামনগরে বসেছে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভা। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। থমথমে সন্দিগ্ধ আবহাওয়ায় হিন্দু মুসলমান বসেছে দূরে দূরে, পরস্পরের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। গান্ধিজীর প্রিয় গান দুটি পরপর গীত হোলো। "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী" ও "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে"। ভারতের কবি, বাংলার কবিকে সেদিনের সেই বেদনাস্তব্ধ সন্ধ্যায় আবার নতুন করে পেলাম আমরা সেইক্ষণে।

দেশ-বিদেশের অগণিত বিদগ্ধজনের অর্ঘ্যের সঙ্গে জয়শ্রীও তার অর্ঘ্য এনেছে। তাঁর অমর প্রতিভার তর্পণে কবি হিসাবে, বিশ্বসাহিত্যে তাঁর দানের পরিমাণের প্রাচুর্য নিয়ে তাঁর বিশ্বজনীনতা, মানবতাবাদ তাঁর সংগীত ও চিত্রাঙ্কণ প্রতিভা প্রভৃতি কতদিকে তাঁর দান বিশ্বকে, ভারতকে, তাঁর জন্মভূমি বাঙ্গালাকে সম্পদবতী করেছে, তার পরিমাপ বিচার বহুযুগ ধরে চলবে। কিন্তু জয়শ্রী জেনেছে তাঁকে পরমাশ্চর্য একটি ব্যক্তি হিসাবে, যাঁর প্রতিভার পরিচয় জাতির প্রতিটি বিশিষ্টক্ষণেই শুধু নয়, মানুষের বিভিন্ন সময়ের সকল মনোভাবের অনন্যসাধারণ দোসর হিসাবে। বাঙ্গালীর ভাষা, বাঙ্গালীর কৃষ্টি, বাঙ্গালীর

আচার আচরণ, তার সকল সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ও প্রকাশ সবকিছু বাঙালী পেয়েছে কবির নিকটে। আর পেয়েছে বাঙ্গালার যে বিশিষ্ট তপস্যা, সর্বভারতের দেশ সেবার ক্ষেত্রে তার সর্বস্ব পণ করা আত্মভোলা শঙ্কা-হীন ছন্দের অনুপম সুরটি কবির বীণায়। সে বীণা সুললিত মধুর সুরের একটানা মোহজাল সৃষ্টি করেনি। শুধু মুক্তি-পাগল দিন বদলের মৃত্যুভয়হীন সুরটিও বেজেছিল তার রুদ্রবীণার ডম্বরুনিনাদে ·

"দুঃখের মন্থন বেগে উঠিবে অমৃত
শঙ্কা হতে মুক্তি পাবে যারা মৃত্যুভীত।"

হে অমর পথের দিশারী তোমাকে জয়শ্রীর প্রণাম। তোমার ঋণ শোধবার সাধ্য নেই আমাদের। কিন্তু তোমার আশীর্বাদের দায় বহন করার গৌরব নিয়ে পথচলা আমাদের স্তব্ধ হবে না।

রবীন্দ্রনাথের ভারত; ববীন্দ্রনাথের বাংলাকে তাঁর শুভ জন্মক্ষণটির শতবর্ষ পূর্তিতে আজ নূতন করে কঠিনের সাধনায় জাতিকে তাঁর আহ্বান স্মরণ করিয়ে এ শ্রদ্ধা-তর্পণ শেষ করি।

"সত্য যে কঠিন
কঠিনের ভালবাসিলাম
সে কখনও করেনা বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।"

[কবিগুরুর শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত]

জয়শ্রী, বৈশাখ, ১৩৬৮

সাহিত্য ও সমাজ

লীলা রায়

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মহিলা শাখায় সভানেত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান করে আপনারা আমায় সম্মানিত করেছেন। বছরের পর বছর এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যে মিলন-ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে উঠেছে সেখানে উপস্থিত হয়ে বৃহত্তর বাংলার সঙ্গে যোগ অনুভব করে বাঙালী মাত্রই গৌরব ও আনন্দ বোধ করবেন। আজকে প্রবাসী বাঙালী ভাইবোনদের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন ও গভীর যোগ অনুভব করে আমিও গৌরব ও আনন্দ বোধ করছি এবং এই রজত-জয়ন্তী সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রাজনীতি, সমাজনীতি ও সাহিত্যের সামঞ্জস্য চাই

রাজনীতির বন্ধুর পথেই জীবনের অধিকাংশ কাল কাটিয়েছি এই বিশ্বাসে যে পরাধীন দেশের আত্মবিকাশের প্রথম বাধা সর্বপ্রথমে দূর হওয়া চাই। রাজনীতির সঙ্গে সমাজনীতি ও সাহিত্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। রাজনীতিটা প্রাথমিক কিন্তু তারও আসল লক্ষ্য সমাজ-গঠন। নতুন সমাজ, নতুন মানুষ গড়তে হবে। এটাই সবচাইতে বড়ো কথা। এ কাজে রাজনীতি ও সাহিত্য দুয়েরই দায়িত্ব গুরুতর। সমাজবিকাশের বাধা দূর করে পথ খুলে দেয় রাজনীতি, আর পথ নির্দেশ করে সাহিত্য। তাই সাহিত্যিকের চাই সমাজ সম্বন্ধে নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি। যে সাহিত্য তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হয়ে ও তাকে অস্বীকার করে গড়ে ওঠে তা কল্পনাকে তৃপ্তিদান করতে পারে কিন্তু সে তার নিজের ভূমিকাকেই ব্যর্থ করে দেয়। যথার্থ সাহিত্যকে একদিকে দেশ ও কালের প্রতিচ্ছবি হতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে ব্যক্তি ও সমাজের সামনে দেশকালোত্তর আদর্শকে জীবন্ত করে রূপ দিতে হবে—যে-আদর্শ ব্যক্তি ও সমাজের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যায় নূতন নূতন আত্মবিকাশের পথে। একদিকে জাতির আত্মবিকাশের পথের প্রধান বাধাগুলোকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে, অন্য দিকে বাধা অতিক্রম করবার পথেরও নির্দেশ সাহিত্যকে দিতে হবে। ভাঙা এবং গড়া, এ দু'কাজই সাহিত্যকে একই সঙ্গে করতে হবে। সমাজ-সেবক ও সাহিত্যিক কেউ রাজনীতিকে বাদ দিয়ে চলতে পারবেন না। তেমনি রাজনীতিকও সমাজ সংগঠন ও সাহিত্যকে এড়িয়ে পথ চলতে পারেন না। সমাজনীতি, রাজনীতি ও সাহিত্যের এই অঙ্গাঙ্গি যোগকে যাঁরা স্বীকার করে চলবেন তাঁরাই জাতিগঠনে সত্যপথের নির্দেশ দিতে পারবেন।

এই পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই আজকের জীবনকে দেখতে হবে। সর্বাঙ্গীণ জীবনকে গড়ে তুলবার জন্য চাই দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শেরও বহুমুখী পূর্ণতা। এই দৃষ্টি দিয়ে বিচার করেই

সমস্যার সমাধান করা আজ প্রয়োজন। কিছু সমস্যার সমাধান হয়েছে কিন্তু হাজার নতুন সমস্যা তীব্রতর রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনকেও আজ এই-সব সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে। এদের সমাধানের জন্য এক পেশে দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্জন করে সর্বাঙ্গীণ আদর্শকে সম্মুখে রাখতে হবে। আর্থনীতিক, রাষ্ট্রিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক—সকল দিকের প্রতি দৃষ্টি রেখে সর্বাঙ্গীণ জীবনকে গড়ে তুলতে হবে।

জনগণের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে সমাজে ও সাহিত্যে

সাম্প্রতিক কালের প্রধান ঘটনা ইংরেজের রাষ্ট্রচালনার দায়িত্ব ছেড়ে যাওয়া। এই অর্থে আমরা 'স্বাধীন' হয়েছি, এ কথা সত্যি। কিন্তু এ কথা আংশিক সত্য মাত্র। আমরা 'স্বাধীনতা' পেয়েছি বলে যারা নিশ্চিতভাবে মনে করছেন আমি তাঁদের একজন নই। আমার পরিকল্পিত স্বাধীনতার মধ্যে, ইংরেজের চলে-যাওয়া, না-যাওয়াটাই প্রধান স্থান অধিকার করে নেই। স্বাধীনতার কষ্টিপাথর হল, জনগণ তাদের হাজার বন্ধনে নিষ্পিষ্ট ও জর্জরিত জীবনে—অন্তরে ও বাইরে—মুক্তির আস্বাদ পেল কি না। যে মুক্তির ছোঁয়াচ তার রুদ্ধ আত্মাকে মুক্ত করে নূতন নূতন সৃষ্টির পথে অভিযান করাবে। সে অভিযানের পথে হয়তো দুঃখ আছে, ভুল-ভ্রান্তিও আছে, কিন্তু সে মুক্তির ছোঁয়াচ নিশ্চিতভাবে সকল বাধাকে অতিক্রম করবার মতো মনের শক্তি ও বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতাও দেবে। এই কষ্টিপাথরে যাচাই করে যে স্বাধীনতা আজকে লাভ করেছি তার স্থান উচ্চে নয়। জাতির জীবনে আত্মিক বা আর্থিক কোনো প্রকার মুক্তিবোধই এই 'স্বাধীনতা' এনে দেয় নি। আজকের সাহিত্যে ও সমাজনীতিকে এই রূঢ় সত্যটি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে জাতির সামনে। তা না করে সাহিত্য আজ যদি কেবল শ্রেণীবিশেষের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে পুনরুক্তি করতে থাকে 'স্বাধীনতা পেয়েছি' বলে, তবে সে সাহিত্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে শুধু অস্বীকারই নয়, বিভ্রান্তও করবে। কাজেই আজকের সাহিত্য ও সমাজ-সংগঠককে এই 'স্বাধীনতা'র যথার্থ রূপকে উদ্‌ঘাটিত করে দেখাতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে জনগণের যথার্থ মুক্তির নির্দেশও দিতে হবে। যে-মুক্তি তার মনকে ও বুদ্ধিকে জাগ্রত করবে এবং সর্বপ্রকার আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শোষণকে অসম্ভব করবে। বৈদেশিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি মিলেছে, কিন্তু সমাজজীবনে 'স্বাধীনতা' আজও দূরে রয়েছে। শোষণহীন, মুক্ত সমাজ ও জীবনকে গড়ে তোলাই আজ আমাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য। এই কর্তব্য উদ্‌যাপন করার অর্থই হল সমাজের আর্থিক জীবনে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। যুগযুগান্তের দারিদ্র্যকে দূর করে বঞ্চিত জনসাধারণের কাছে মোটা ভাত-কাপড়কে সুলভ করে তোলাই সমাজতন্ত্রের মুখ্য কথা। দেশের কোটি কোটি মূক, অজ্ঞ, অশিক্ষিত ছেলেমেয়েদের মানুষের মতো বাঁচতে শেখানোই আজ প্রাথমিক কাজ। এ কাজে সাহিত্যের ভূমিকা তুচ্ছের নয়। মর্ত্যলোকের পরিপূর্ণ খবর রাখতে হবে সাহিত্যকে, নূতন মর্ত্যলোকে তৈরির মালমসলা ও মনোভাব জোগাতেও হবে সাহিত্যকে। এই কষ্টিপাথরে আজ বাংলা সাহিত্যের বিচার হবে।

মনুষ্যত্বের অধোগতি ও বিকৃতিকে প্রতিরোধ করতে হবে

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবন আজ অগণ্য সমস্যায় অন্ধকার। সিদ্ধি হাতের নাগালে যখন, ঠিক তখনই আমাদের মন্দ ভাগ্যে দূরে সরে গেল তা। কল্পনাতীত ছিল যা, তা-ই আজ বাস্তব হল। মাতৃভূমি হল দ্বিখণ্ডিত। পাকিস্তান আর ভারত রাষ্ট্র স্থাপিত হল। শুধু তাই নয়, ভারতের

দুই বিশিষ্ট কৃষ্টির পীঠভূমি বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ হয়ে গেল। সংঘটিত হল পৃথিবীর বৃহত্তম আবাস-বদল, পঞ্চনদীর উপত্যকা জুড়ে পড়ল লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তাক্ত পদচিহ্ন। যে বাংলা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কূটচক্রে একদিন দ্বিখণ্ডিত হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছিল সমস্ত ভারতবর্ষকে স্বদেশ-প্রেমের দীক্ষা দিয়ে, সেই বাংলাদেশের জাগ্রত আত্মাকে হত্যা করা হল। এবার কিন্তু প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না কোনো ক্ষেত্রে। বাঙালী স্তব্ধ হয়ে সইল তার এই অপঘাত মৃত্যু। পূর্ববঙ্গে, সিন্ধু-সীমান্ত-পাঞ্জাবে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান আজ ভীত, সন্ত্রস্ত এবং পলায়নপর। ভারতরাষ্ট্রে, দিল্লি-বিহার-ইউ.পি.তে মুসলমান আজ শঙ্কিত, আশাহারা ও জীবন্মৃত। মনুষ্যত্ব আজ কাপুরুষতায় ম্রিয়মাণ, নিষ্ঠুর বর্বরতায় লাঞ্ছিত ও বিকারগ্রস্ত। কোথায় সেই সাহিত্যিক যার লেখনীতে আগুনের অক্ষরে জ্বল জ্বল করবে "পাঞ্জাব, দিল্লি, বিহার, নোয়াখালি", কোথায় সে সাহিত্য, কষাঘাত করে জাগিয়ে দেবে যা জাতির মোহাচ্ছন্ন চেতনাকে—সহস্র নারীর লাঞ্ছনার গ্লানিকে জীবন্ত করে ধিক্কার দেবে জাতির ক্লীবত্বকে। দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদের মূলে অনেক পরিমাণে ছিল একটি অক্ষয় সাহিত্যসৃষ্টি—Uncle Tom's Cabin. পাশ্চাত্য জাতির কল্যাণ-বুদ্ধিকে যা জাগ্রত করেছিল। আমাদের এই দুর্ভাগা দেশের গ্লানিকর অধ্যায়ের উপর হয়তো দাঁড়ি টানতে পারে সেই ধরনেরই কোনো সাহিত্য, মানুষের মন, মস্তিষ্ককে যা মুক্ত করবে ঐ বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতার আচ্ছন্নতা থেকে। কী মুসলমান, কী হিন্দু-শিখ, আজ দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা ও বুদ্ধির ভারসাম্যকে হারিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। বৃটিশের চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার চক্রান্তের অন্ধ ঘুঁটি হয়ে কাজ করছে ভারতের হিন্দু-মুসলমান। দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে যুদ্ধের দিকে, নবলব্ধ রাষ্ট্রক্ষমতার মত্ততায় উভয়েই মনে করছে যুদ্ধ দ্বারা মীমাংসা হবে সব প্রশ্নের। আজ এ কথা কেউ বুঝছে না যে, যুদ্ধ উভয় রাষ্ট্রকেই নিয়ে যাবে নিশ্চিত ধ্বংসের পথে। আর তাতে আহুতি হবে উভয় রাষ্ট্রের জনগণ—যাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আজ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল সব চাইতে বেশি। দুই-দুইটা বিশ্বযুদ্ধের কঙ্কাল পৃথিবীময় ছড়িয়ে রয়েছে চোখের সামনে। শুধু জার্মানি, জাপান নয়—বিজয়ী রাষ্ট্র রুশ, আমেরিকা-ইংলন্ডের জনগণের জীবনে কি শান্তি এসেছে? হিরোসিমার উপর নিশ্বাস এখনো ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে বাতাসে। আরেকটা ধ্বংসতাণ্ডবের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বিশ্ব জুড়ে। কই সেই সাহিত্যিকবৃন্দ, সেই সাহিত্য, যা মানুষকে এই আত্মিক মৃত্যু থেকে বাঁচাবে। আত্মাকে নবজন্ম দিতে পারে সেই সত্যসন্ধ শক্তিশালী সাহিত্যের জন্মের জন্য অপেক্ষা করে আছে আজ মানবজাতি, ভারতবর্ষে এবং অন্য সর্বত্র।

নবজাত সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা থেকে বাঁচতে হবে

শুধু যুদ্ধই নয়—সাম্প্রদায়িকতায় আজ আর লজ্জাবোধ নেই—বরং আছে গর্বমিশ্রিত দম্ভ। মাইনরিটি, মেজরিটি, ধর্মের ভিত্তিতে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু, এই সংজ্ঞাতে অপমান বোধ হয় এমন লোকের সংখ্যা বেশি নয়। অতি সহজ গতানুগতিকভাবে একে গ্রহণ করেছে দেশ। অথচ আজ এই দুটি শব্দের ভেতরে যে হীনত্ববোধ ও দম্ভ আত্মগোপন করে আছে, আমাদের সমস্ত সভ্যতা ও কৃষ্টিকে তা করছে অপমানিত।

স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার সাথে হাত ধরাধরি করে এসেছে প্রাদেশিকতা। আসামে, বাংলায়, বিহারে, উড়িষ্যায়, মাদ্রাজে, ভারতের সর্বত্র আজ প্রতিক্রিয়ার এই আর-এক রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে। আজ আসামে বিহারে-উড়িষ্যায় 'বাঙাল-খেদা', কুচবিহারে 'ভাটিয়া-খেদা', পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্রতম স্বার্থের

রেষারেষি—এই কি স্বাধীনতার সার্বভৌম রূপ। স্বাধীনতালাভের সঙ্গে এই কি ভারতীয় জাতীয়তার রূপান্তর? বাংলা ও বাঙালী এই প্রাদেশিকতার বিষাক্ত ফল ভোগ করেছে হয়তো সবচাইতে বেশি। প্রবাসী বাঙালী সাহিত্য সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন যে সুধীবৃন্দ, তাদের আজ অনুসন্ধান ও আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে অনুরোধ করি, এর জন্য বাঙালী নিজে কতটা দায়ী: কতটা দায়ী সেই-সব প্রদেশ যেখানে বাঙালী ঘর বাঁধলো। আমার বি-বাস, এর জন্য বাঙালীও দায়ী কম নয়। নিজেদের বুদ্ধি ও কৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ববোধ থেকে ভিন্নপ্রদেশীকে সে তাচ্ছিল্য করেছে, তার থেকে সর্বপ্রকারে দূরে রেখেছে নিজেকে। সেই প্রতিক্রিয়া আজ দেখা দিয়েছে, সুপ্ত অপমানবোধ সুযোগ পেয়ে মাতা তুলে উঠেছে দিকে দিকে 'বাঙাল-খেদা'র রূপে। প্রবাসী বাঙালী যারা তাদের করণীয় এদিকে প্রচুর। বাংলার বিশিষ্ট কৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তাদের যথাযথভাবে ভিন্নপ্রদেশীর নিকট উপস্থিত করতে হবে। বাংলার কৃষ্টির দূত হয়ে ভারতের কৃষ্টির ভেতরে নিজের বিশিষ্ট রূপটিকে সুস্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং সর্বভারতীয় কৃষ্টিকেও বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। তা না করে যদি শুধু কেরানী ও বড়োবাবু রূপে তাঁদের প্রকাশ হয় ভিন্নপ্রদেশীর কাছে তবে বাঙালীর সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হওয়া অতি সহজ। বাংলাকে ঘরে-বাইরে যথাযথভাবে প্রকাশ করা বাঙালী সাহিত্যিকদেরও প্রধান ভূমিকা। সেদিক দিয়ে প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা চলে না।

বাংলা ভাষা ও কৃষ্টির ঐক্যরক্ষার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের নিতে হবে

আজ বাংলাবিভাগের পর আবার নূতন এক প্রশ্ন জেগেছে, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও কৃষ্টির ঐক্য থাকবে কি থাকবে না। ধর্মগত সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে কৃষ্টি অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত বলে যাঁদের অভিমত, আমি তাঁদের সাথে একমত নই। কাজেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যকে হিন্দু বাংলা ও মুসলিম বাংলাভাষায় দ্বিখণ্ডিত করার প্রয়াসের আমি একান্ত বিরোধী। প্রধানত ভাষাকে আশ্রয় করে বাঙালীর যে বিশিষ্ট কৃষ্টি গড়ে উঠেছে তাকে রূপ দেবার কাজে হিন্দুর দান বা মুসলমানের দান বেশি কিনা সেটা বিচারের বিষয় নয়। সে বিচারের ভিত্তিতে ভাষার ভেতরেও হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যাগত ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টায় জোর করে উর্দু অথবা সংস্কৃত শব্দকে বাহুল্য দেবার প্রয়াসও বাংলাভাষার বিনষ্টি ঘটাবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। ভাষাবিকাশের প্রাকৃতিক বিধিকে অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্রশক্তির জোরে জোড়াতালি দেওয়া কৃত্রিম ভাষা বাংলা কৃষ্টি এবং বাঙালী জাতিকে দুর্গতির দিকে নিয়ে যাবে। সমস্ত হিন্দু-মুসলমান বাঙালীকে এ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধভাবে বাংলাভাষা ও কৃষ্টিকে এই দুর্গতির হাত থেকে রক্ষার জন্য সক্রিয় হতে হবে। বিশেষ করে দ্বিখণ্ডিত বাংলার সাহিত্যিকদের আজ সতর্ক দৃষ্টি ও উদার মনোভাবকে জাগ্রত রাখা চাই যাতে বাংলা সাহিত্য ও ভাষা খণ্ডিত হয়ে সংস্কৃতিক্ষেত্রেও দুই বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে নূতন এক ব্যবধানের দেয়াল না গড়ে ওঠে। তাতে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা কোনোটিই লাভবান হবে না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করাই যুগধর্ম, একে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর করলে আধুনিক মানুষের মনন ও ভাবরাজ্যের উপযুক্ত বাহক সে সংস্কৃতি কখনো হতে পারবে না। আর এই গতিহীন, জমাটধরা, সংকুচিত সংস্কৃতি ও সাহিত্য মানুষের বিকাশের পরিপন্থী হয়ে মানবতার বিকৃতি ঘটাবে।

গণসাহিত্য-সৃষ্টি সাম্প্রদায়িকতার একটা সমাধান

বরং যথার্থ চেষ্টা হওয়া উচিত যাতে সাহিত্যে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের জীবন প্রতিফলিত হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের এক অভিযোগ আছে বলে জানি যে, বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে মুসলমানের বিশিষ্ট কৃষ্টি কোনো স্থান পায় নি। অভিযোগটি আংশিকভাবে সত্য, কাজেই উপেক্ষার নয়। হিন্দু এবং মুসলমানের সামাজিক মেলামেশা ও আদানপ্রদান এত কম যে, আধুনিক বাংলাসাহিত্যে মুসলিম জীবনের ও দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ পড়া তেমনভাবে সম্ভব হয় নি। কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, এযাবৎকাল পর্যন্ত বাংলাসাহিত্য কেবলমাত্র উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহক হওয়ার দরুন বাংলার চাষী, বাংলার মজুর এই সাহিত্যে স্থান পায় নি। অথচ বাংলার চাষী-মজুরের অধিকাংশই মুসলমান। বাংলাসাহিত্যে চাষী-মজুরের জীবন প্রতিফলিত হলে তার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম রীতিনীতি এবং ভাষাও সাহিত্যে সহজভাবে স্থান পাবে। বাংলাসাহিত্যের এই একপেশে ধারাকে আমূল পরিবর্তন করে গণসাহিত্য সৃষ্টি হলে মুসলমান সমাজের এই অভিযোগের প্রতিকার হবে। চেষ্টাটা বিপরীত দিক থেকে হলে অস্বাভাবিক হবে। অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে ওপর থেকে মুসলমানী শব্দ ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি প্রয়োগ দ্বারা সাহিত্যের সহজ সাবলীলতা ও শ্রী বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাই চেষ্টাটা নীচের দিক থেকে হওয়া চাই। বাংলার গ্রামে গ্রামে অঝোর বর্ষায় ভিজে বুকজলে দাঁড়িয়ে পাট বের করে যে চাষী, অগ্নিবর্ষী গ্রীষ্মে তেঁতেপুড়ে ফসল ফলায় যে কৃষক, পদ্মার খরধার স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাছ ধরে যে জেলে, চটকলে কাজ করে তিল তিল করে দেশী-বিদেশী মালিকের মুনাফার পাহাড় গড়ে তোলে যে মজুর, তার জীবনকে—তার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ও বর্তমান-ভবিষ্যৎকে প্রতিফলিত করতে হবে বাংলার নূতন সাহিত্যে। তা হলেই সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ বিলুপ্ত হবে।

সমাজ-গঠনে নারীর বিশেষ ভূমিকা

যেমন আমাদের সাহিত্যে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় জনগণের জীবন ও প্রয়োজন প্রতিফলিত হয় নি, তেমনি মেয়েদের সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারে নি। এর জীবতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে, সে বিষয়ে আজকে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। তবে নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বুনিয়াদও যদি এই অবিচারকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে তবে সভ্যতাকে আরো বহু নূতন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। গোড়াতেই বলি, পুরুষ ও নারীর পৃথক দায়িত্ব ও ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আমি বিশ্বাসী নই। গৃহ, সমাজ ও জাতিগঠনে দুয়েরই দায়িত্ব সমান। বর্তমান যুগে নারী ও পুরুষ উভয়কেই দ্রুত পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনকে গড়তে হবে। এই পারিপার্শ্বিকের ভেতরে অন্তঃপুর ও বহিরঙ্গন বলে কোনো বিভাগ চলবে না। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের হলকা যখন লাগে তখন বহিরঙ্গন ছেড়ে মুহূর্তে সে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। মাতা-জায়া-দুহিতা-ভগ্নীরূপে নারীর জীবনে আসে প্রবল আলোড়ন। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের মতো মানুষের গড়া সর্বনাশ যখন বাংলা জুড়ে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ মৃত্যুকে করে দেয় অতি সহজ, তখন পুরুষের চাইতে নারীর জীবনেই সংগ্রাম হয়ে ওঠে তীব্রতর। লক্ষ লক্ষ নারীর জীবন পুড়ে খাক হয়ে গেছে পাঞ্জাব-দিল্লির আগুনে, সকল সম্প্রদায়ের নারীর যে চূড়ান্ত অপমান ঘটেছে সেখানে, পুনর্বসতি বা আবাস-বদল—কোনো-কিছুতেই তার প্রতিকার হবার নয়। ভারতের

সভ্যতার উপর এত বড়ো কলঙ্ক-লেপন আর কখনো হয় নি। পুরুষের ওপরে নিজেদের ভাগ্যবিধানের ভার দিয়ে বসে থাকার দিন আর নেই। যে-সব সমস্যা তাদের জীবনে অতি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে যদি সেগুলি সমাধান করবার ভার তারা নিজেরা না নেন তবে নিজেদের যে, কী স্বাধীনতার আন্দোলন, কী জাতিগঠন, সবই অসম্ভব হবে যদি মেয়েরা সচেতন না হন। এ দেশের ও অন্যান্য দেশের মেয়েরা এদিক দিয়ে কী ভাবছেন, কী করছেন, কী করা উচিত ইত্যাদি সম্পর্কে প্রধানত মেয়েদের তরফ থেকে মেয়েদের চিন্তাধারা ও বক্তব্যকে সমাজের সামনে স্পষ্ট করে ধরবার জন্য সতেরো (১৭) বছর পূর্বে সম্পূর্ণ মহিলা-সম্পাদিত ও লিখিত 'জয়শ্রী' পত্রিকাখানি কয়েকজন বন্ধুর সাহচর্যে বের করি। অন্যান্য মহিলা-পত্রিকার সঙ্গে পার্থক্য ছিল এই যে, প্রধানত জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনে সমান দায়িত্ব গ্রহণ এবং এর জন্য সকল প্রকার দুঃসাহস ও দুঃখবরণ করতে 'জয়শ্রী' ভারতের ও বাংলার মেয়েদের আহ্বান জানিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রধানত পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গড়া সমাজব্যবস্থার আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের দাবি ও আন্দোলন করেছিল।

আজ ইংরেজ চলে-যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের জীবনে এই আংশিক স্বাধীনতা যাতে যথার্থ পরিপূর্ণ ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে তার জন্য মেয়েদেরও সংঘবদ্ধভাবে সচেষ্ট হতে হবে। আজ অবলা হয়ে অন্তঃপুরে আহারবিহার, অথবা সমাজের ওপরের তলায় ব্যক্তির ও জাতির সমস্ত সমস্যার ছোঁয়াবর্জিত নৃত্যগীতমুখর পরগাছার জীবনযাপন করবার সময় মেয়েদের আর নাই। বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্বের অভিমান যদি থাকে তবে আজ কঠিন বাস্তবের সঙ্গে যুঝতে হবে মেয়েদের। রাষ্ট্র ও সমাজের সমস্যাগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় স্থাপন করতে হবে এবং সেগুল মীমাংসা করবার দায়িত্ব ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। গত বিশ বছর যাবৎ এই মত প্রকাশ পাচ্ছে নারী-আন্দোলনের লক্ষ্য হিসাবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে, প্রতি বৎসর কলেজ ও স্কুল থেকে সারা ভারতবর্ষে যে হাজার হাজার মেয়েরা "শিক্ষিত" মার্কা নিয়ে বের হয়ে আসছেন তাদের শতকরা এক অংশও জাতিগঠন-মূলক দায়িত্বের অংশ নিচ্ছেন না। জীবিকার জন্য অনেক শিক্ষকতার কাজ করেন বটে কিন্তু জাতির শিক্ষাসম্পর্কিত প্রশ্নের মীমাংসায় তাদের গবেষণা অথবা সক্রিয় মতামতদানেরও বড়ো একটা উদাহরণ পাওয়া যায় না।

আজকের দিনের ভারতবর্ষের মেয়েদের সামনে বিশেষ করে কোন্ কর্তব্যগুলি প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে তারি কিছু নির্দেশ দিতে চেষ্টা করব :

১. সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে। আজকে এটাই এদেশের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব শ্রেণীর নারীরা পাঞ্জাবের ঘটনায় যে মর্মান্তিক বেদনা পেয়েছেন নানাভাবে যোগাযোগের সূত্রে তার পরিচয় পাবার সুযোগ আমার হয়েছে। সেই বেদনা যদি ভাষা না পায়, যদি কার্যকর পন্থার নির্দেশ না দিতে পারে, তবে সে শুধু ভাববিলাস হয়েই থাকবে। সর্বসম্প্রদায়ের মেয়েদের আজ নারীর এই অপমান ও অমর্যাদাকে নিজেদের জীবনে অনুভব করতে হবে। এর জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে সাম্প্রদায়িক বর্বরতার বিরুদ্ধে। আমার বিশ্বাস, মেয়েরা এইদিক দিয়ে জাতিকে নূতন পথ দেখাতে পারবে। পূর্বপাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমান মেয়েদের নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করতে গিয়ে এই অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে যে মুসলমান

মেয়েদের মধ্যে এই কাজের সহযোগিতা পাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে।

২. দুইরাষ্ট্রে যাতে যুদ্ধ না ঘটতে পারে, যাতে মৈত্রীসম্পর্ক স্থায়ী হয়, তার জন্য হিন্দু-মুসলমান মেয়েদের অগ্রণী হয়ে মতামত গঠন করা প্রয়োজন। যুদ্ধ যদি হয় তবে তার ফলে মেয়েদের যে অপমান ঘটবে পাঞ্জাবের কাহিনীকে তা হার মানাবে।

৩. কী ভারত, কী পাকিস্তান, উভয়রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার জন্য—যেখানে সে দাবি আজো গ্রাহ্য হয় নি—আন্দোলন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা মেয়েদের হাতে ছেড়ে দেবার দাবি জানাতে হবে। এব জন্য উপযুক্ত সংখ্যার শিক্ষয়িত্রী যাতে পাওয়া সম্ভব হয় তার জন্য নারীপ্রতিষ্ঠানগুলির দুইটি রাষ্ট্রের নিকট দাবি জানাতে হবে। প্রতি শহরে ও গ্রামে শিশুশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার দাবি করতে হবে। যদি দুইরাষ্ট্রে মৈত্রী স্থাপিত না হয় তবে জাতিগঠনের এই প্রথম প্রয়োজন—শিক্ষার জন্য কোনো ব্যবস্থাই করা সম্ভব হবে না। দুটি রাষ্ট্রই নিরক্ষর-সংখ্যাবহুল জনগণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সকল প্রকার উন্নতির পরিপন্থী হবে।

৪. ভারতীয় গণপরিষদে নারী ও পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এই অধিকার কেবলমাত্র পুঁথিগত হয়ে যাতে না থাকে, রাষ্ট্র, শাসন, শিক্ষা, জাতীয় শিল্প বিভাগে সকল ক্ষেত্রে যাতে যথেষ্ট সংখ্যক মেয়েরা প্রবেশ করতে পারেন তার জন্য যোগ্যশিক্ষা নিতে হবে। সমস্ত প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষায় মেয়েদের উপস্থিত হতে হবে এবং যোগ্য বিবেচিত হলে তাদেরকে বিভিন্ন বিভাগে গ্রহণ করতে হবে।

৫. গণিকাবৃত্তি ও নারীব্যবসা দমন সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য রাষ্ট্রের ওপরে চাপ দিতে হবে। মেয়েদের যে অর্থনৈতিক পরাধীনতা অনেক পরিমাণে এর পিছনে রয়েছে তাকে সমূলে বিনষ্ট করতে হবে।

৬. মহিলা সাহিত্যিকদেরও একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে জাতিগঠনে। পাঞ্জাবের এত বড়ো শোচনীয় গ্লানিকর ঘটনার যথাযথ প্রকাশ সাহিত্যে হয় নি, ভাতরবর্ষের নেতা ও জনতাকে কষাঘাত করে যা সচেতন করে দেবে। মহিলা সাহিত্যিকরা এ-সব প্রশ্ন জাতির সম্মুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরুন। এটাও আজকের দিনে মেয়েদের একটা প্রধান কর্তব্য।

মোট কথা, নারীপুরুষের জীবন বিভিন্ন নয়; কাজেই সেই জীবনের পটভূমিকাকে সৃষ্টি করবার বা বদলাবার, ভাঙবার ও গড়বার সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব উভয়ের। মেয়েরা নিজেদের সে দায়িত্ব গ্রহণের অযোগ্য করে রেখেছে। তারি জন্য মেয়েদের মধ্যে আন্দোলন করে মেয়েদের সকল বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা মহিলাকর্মী ও সাহিত্যিকদের আজ একান্ত প্রয়োজন। সকল দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতা ও শক্তি নিয়ে মেয়েরা দলে দলে সমাজ-গঠনের কাজে এগিয়ে আসুন, আজকের দিনে এই হোক মেয়েদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা।

জয়শ্রী, পৌষ ১৩৫৪

বৈজ্ঞানিকের জগৎ

অনিলচন্দ্র রায়

মানুষ চক্ষু মেলিয়াই যে জগৎটাকে দেখে তার সম্বন্ধে তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। দেখিতে দেখিতে কেবল মুগ্ধ হয় তাহা নয়; মানুষ অশান্তও হইয়া উঠে। এই অশান্তির বীজ রহিয়াছে তার অন্তরে কারণ মানুষের বুদ্ধিলোকে রহিয়াছে অনন্ত জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসাকে এড়াইয়া মানুষ নির্দ্বন্দ্ব ক্ষান্তির রাজ্যে পলাতক হইতে পারে না। প্রাণীজগতের সঙ্গে মানুষের প্রভেদ এইখানে। প্রাণীজগৎ বাঁচে তাহার ভুক্ত-রোমন্থনের দ্বারা, মানুষ বাঁচে নিত্য নব মননের দ্বারা। মানুষের মনে চলিয়াছে অনাদিকালের বহ্নি-দাহন। এই দাহনের জ্বালায় মানুষ জ্বালাইয়াছে নিজের জীবন এবং বহির্জগৎকে রাঙাইয়াছে আপন চিত্তাগ্নির পিঙ্গল আভায়। প্রশ্নের আঘাতে আঘাতে সৌরলোককে করিয়াছে জর্জর, জল-স্থল-আকাশকে ছিঁড়িয়া করিয়াছে টুকরা টুকরা। এই অনির্বাণ শান্তিহীন চাঞ্চল্যই মানুষকে একান্তভাবে পৃথক করিয়াছে পশু হইতে। চিন্তায় ও মননে মানুষ স্বতন্ত্র ও একক, একথা হেগেল ঘোষণা করিয়াছিলেন নিঃসংশয় ভাষায়। তাই দর্শনশাস্ত্র তাহার বর্ণনায় হইয়াছে 'thinking study of things', কারণ জিজ্ঞাসু মানব চোখের উপরে যে বিশ্বজগৎ রহিয়াছে তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করে মননার দ্বারা, 'thinkingly'.

এই জিজ্ঞাসা ও মননা হইতে যেমন জন্ম নিয়াছে দর্শন-শাস্ত্র, তেমনি জাত হইয়াছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞান দর্শনেরই সহোদর। এদের দুইয়ের বিচরণ ক্ষেত্র এক, আদর্শ এক; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের পরিধি সংকীর্ণ, তার গণ্ডি নির্দিষ্ট। দর্শনের ক্ষেত্র ব্যাপক, সাম্রাজ্য সীমাতীত। জীবন ও জগতের বিশেষ একটা খণ্ডকে নিয়া কারবার করে বিজ্ঞান; দর্শনের কারবার অখণ্ড বিশ্বসংসারকে লইয়া। ইহা ছাড়া দর্শন ও বিজ্ঞানের পদ্ধতিতেও পার্থক্য রহিয়াছে। পর্যবেক্ষণের সঙ্গে পরীক্ষণ, ইহাই বৈজ্ঞানিক রীতির বৈশিষ্ট্য। দর্শনশাস্ত্র সরাসরি পরীক্ষণের (experiment) ঝঞ্ঝাটে যায় না। বিজ্ঞানের পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলিকে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া, সাজাইয়া ও সামঞ্জস্য করিয়া চরম ও ব্যাপক সত্যের দিকে বুদ্ধিকে প্রসারিত করিয়া ধরে দর্শন। কিন্তু এ পার্থক্যটুকু সত্ত্বেও বিজ্ঞান ও দর্শনের লক্ষ্য এক এবং ইহাদের প্রকৃতিতেও সাদৃশ্য রহিয়াছে। কী দর্শন, কী বিজ্ঞান, উভয়েই চায় সৃষ্টিরাজ্যের দুর্গম রহস্যকে ভেদ করিতে; চক্ষুর উপরে যে বিশ্বজগৎ একটা অমীমাংসিত

প্রশ্নের মতো ঝুলিতেছে, তাহার মর্মমূলে কী আছে জানিতে হইবে। এই প্রজ্জ্বলন্ত প্রশ্ন যুগান্ত ধরিয়া মানুষকে লব্ধ করিয়াছে, মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু জবাব মিলে নাই। জবাব দিতে গিয়াই মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে দর্শন, সৃষ্টি করিয়াছে বিজ্ঞান। যে সীমাহীন অস্তিত্ব চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে, স্তরের পর স্তর যাহার দিক্‌হীন, চিহ্নহীন ব্যাপ্তি—সেই অনন্ত-প্রসারিত অস্তিত্বকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে হইবে, ইহার স্বরূপই বা কী, স্বধর্মই বা কী। অনুসন্ধানে বিজ্ঞান ও দর্শন পরস্পরের সহায়ক; পরস্পরের পরিপন্থী নয়, পরিপূরক। বিশেষ করিয়া বিংশ শতকে দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিতালী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, কাল দর্শনই যে কেবল বিজ্ঞান-ভিত্তিক হইয়াছে, তাহা নয়, বিজ্ঞানও আজ দর্শনমূলক হইয়া উঠিয়াছে। দার্শনিকরা যেমন হইতেছেন বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির অনুগামী, দর্শনমূলক হইয়া উঠিয়াছে। দার্শনিকরা যেমন হইতেছেন বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তির অনুগামী, বৈজ্ঞানিকও বৈজ্ঞানিকও আজিকার জগতে হইয়া উঠিয়াছেন দার্শনিক। বিজ্ঞান আজ এমন এক জগতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে যেখানে দার্শনিক ঊর্ধ্বলোকের উদার তোরণদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিককে আজ দার্শনিকের রাজ্যে পদক্ষেপ করিতে হইতেছে। ইহাতে কেহ আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু নব নব পরিণতি বিজ্ঞানকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর পথে যে বিচিত্রলোকে আনিয়া উপনীত করিয়াছে তাহাতে বিজ্ঞানকে দর্শন-ঘেঁষা না হইয়া আর উপায় নাই। তাই আজ বৈজ্ঞানিকরা দর্শনের ভাষায় কথা বলিতেছেন, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। যে-সকল সমস্যা চিরকাল দার্শনিক সমাজকে বিচলিত ও চিন্তিত করিয়া আসিয়াছে, আজ বৈজ্ঞানিকের সম্মুখেও সেই-সব সমস্যা ভীড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই আজ বিজ্ঞানের মুখে তত্ত্বকথার দুর্বোধ্য বাণী শুনিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইতেছেন।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ চোখের উপরে জগৎটাকে দেখে, স্পর্শ করে, অনুভব করে, পথে ঘাটে চলিতে চলিতে মানুষ পদে পদে এই কঠিন, বাস্তব জগতের অস্তিত্বের প্রমাণ পায়। প্রাত্যহিক জীবনের সকল কাজে, উঠিতে-বসিতে সর্বাঙ্গে এই নিরেট পৃথিবীর স্থূল হস্তের স্পর্শ তাহাকে আঘাত করে। তার সকল ইন্দ্রিয়ে দিনেরাত্রে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের মিশ্র সংগীত বাজিয়া উঠে অশ্রান্ত কলরোলে। তাই সাধারণ মানুষের মনে এই পৃথিবী সম্বন্ধে এতটুকু সন্দেহ নাই, স্বল্প মাত্রও অবিশ্বাস নাই। পৃথিবীর অস্তিত্ব লইয়া তাহার মনে কোনো অস্বস্তি নাই, পৃথিবীর স্বরূপ লইয়া কোনো সংশয় নাই। এই ইট-কাঠ-পাথরের কঠিন পৃথিবীকে, এই জল-স্থল-আকাশকে, এই অগণিত গ্রহ-তারকা-ছায়াপথকে সে অচল-প্রতিষ্ঠ শাশ্বত সত্য বলিয়া ধরিয়া লয়। বৎসরের পর বৎসর মাথার উপরে আকাশ দুই পাখা ছড়াইয়া রহিয়াছে; দিনের পর দিন একই সূর্য আকাশকে পরিক্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে; রাত্রির পর রাত্রি রাশিচক্রের উপর দিয়া দলে দলে নক্ষত্র-তারকারা ভীড় করিয়া পথ চলিয়াছে; ঋতুর পর ঋতু বহিয়া চলিয়াছে, বর্ষার মেঘে, বসন্তের পুষ্পসম্ভারে; গ্রীষ্মের প্রাখর্যে আর শীতের তীক্ষ্ণতায়; যুগের পর যুগ আসিতেছে অব্যর্থ নিয়মে; শুক্লা রাত্রির পরে কৃষ্ণা তিথির আগমনে; দিবালোকের পরে রাত্রির অন্ধকারে। এই পৃথিবী তাহার অসন্দিগ্ধ চেতনার উপরে বিপুল ভারের মতন চাপিয়া আছে, ইহাকে সে অস্বীকার করিবে কী করিয়া? তাহার অস্তিত্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই স্থূল পৃথিবী প্রবেশ করিয়া প্রতি মুহূর্তে কঠিন আঘাত কবিতেছে; সে আঘাতের সহিত অহরহ তাহার মর্মের পরিচয় ঘটিতেছে, ইহাকে সে উড়াইয়া দিতে পারে না। দেয়ালে মাথা ঠুকিলে সে ব্যথা পায়, গায়ে আগুন

লাগিলে সে দহন-জ্বালা অনুভব করে; তাহার সকল ইন্দ্রিয় একযোগে সাক্ষ্য দেয় এই সুখদুঃখময় স্থূল পৃথিবীর নিত্য অস্তিত্বের। প্রাকৃত মানবের কাছে জগৎ অকাট্য সত্য। প্রাকৃত মন বিচার করে সরল বুদ্ধির দ্বারা; ইন্দ্রিয়ের সহজ অনুভূতির দ্বারা। ইন্দ্রিয় তাহাকে যাহা বোঝায় তাহাতেই সে বিশ্বাসী; চক্ষুতে যাহা দেখে, কানে যাহা শোনে, তাহা তাহার কাছে অমোঘ ও অকাট্য। ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগৎ-ই হইল সাধারণ মানুষের জগৎ, যাহাকে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন 'প্রাকৃত বুদ্ধির জগৎ', 'common sense world'.

বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথমে এই সাধারণ বুদ্ধির জগৎকে লইয়াই শুরু করিয়াছিল। এই নিরেট স্থূল পৃথিবীকে অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া বিজ্ঞান তাহার পরীক্ষণ আরম্ভ করিয়াছিল। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, শক্ত, ভরাট পৃথিবীকে ছাড়া অপর কোনো অদৃশ্য জগতের সত্তা বিজ্ঞান কোনোদিন মানে নাই। তাহার কারবার প্রত্যক্ষকে লইয়া; কাজেই স্থূল বস্তু ও প্রত্যক্ষ দ্রব্যের স্বধর্মকে আবিষ্কার করা বৈ বিজ্ঞানের অন্য কাজ নাই। ইন্দ্রিয় যাহা দেখায়, শোনায় ও বোঝায়, তাহাতে সংশয়ের কোনো কারণ নাই। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার; বাহিরের জগৎ এই দ্বারপথে যে সংবাদ পাঠাইতেছে, তাহা মিথ্যা নয়, ভূয়া নয়। ইন্দ্রিয় নির্ভরযোগ্য বন্ধুর মতন কাজ করে, তার রিপোর্ট সরকারি রিপোর্টেরই মতো নিখুঁত ও নির্দোষ। তবে ইন্দিয়ের সামর্থ্য কম এবং তাহার এক্তিয়ার অতি সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ। কাজেই তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে, তাহার শক্তিকে প্রখরতর করিবার জন্য সহায়ক যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিতে হইবে। তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়জ্ঞান গভীরতম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিবে, বস্তুর স্বরূপকে উন্মোচন করিয়া চোখের সম্মুখে ধরিতে পারিবে। দেখিতে দেখিতে পরমাশ্চর্য যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইল; সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ ও বিলোকন যাহাতে সম্ভব হয় তাহার জন্য নিত্য নূতন ব্যবস্থা হইতে লাগিল। সুদূরকে কাছে আনিবার জন্য আসিল দূরবীক্ষণ, ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিবার জন্য আসিল অনুবীক্ষণ। স্থূল জগৎকে ভালো করিয়া জানিবার ও বুঝিবার পথ উন্মুক্ত হইল; স্থূল জগৎ কিন্তু অকাট্য সত্য হইয়াই বৈজ্ঞানিকের চিত্তে আসন পাতিয়া রহিল। সে আসনের নড়চড় হওয়ার সম্ভাবনা কেউ ভাবে নাই; সারা ১৯ শতক ভরিয়া বৈজ্ঞানিকের মনোলোকে জড়জগৎ নিশ্চিন্ত আধিপত্য করিয়াছে। এইকালে বৈজ্ঞানিকের বিশ্বে এবং প্রাকৃতজনের বিশ্বে কোনো পার্থক্য ছিল না, সাধারণ লোকের আটপৌঢ়ে পৃথিবীকেই বিজ্ঞান সাজাইয়া গোজাইয়া ও গুছাইয়া লইয়া সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের জগৎ সে যুগে ছিল আমাদেরই দৈনন্দিন জগতের একটা উন্নত সংস্করণ মাত্র।

কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষদিক হইতে বিজ্ঞানের চক্ষুতে নতুন দৃষ্টি বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল। বিজ্ঞানের রাজ্যে মুহুর্মুহু ভূমিকম্প ঘটিয়া পুরাতন কল্পনা ও ধারণা ভূমিসাৎ হইয়া যাইতে লাগিল। সূক্ষ্মতম যন্ত্রপাতি মানুষের দৃষ্টিকে লইয়া গেল গভীর হইতে গভীরতর লোকে। নতুন পদার্থ-বিজ্ঞান ইতিমধ্যে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, তাহার প্রভাবে এই সাধারণ প্রাকৃত পৃথিবীর বুকের মধ্যে নব নব জগৎ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্মদৃষ্টির সমুখে উদ্‌ঘাটিত হইল প্রত্যাশিত লোক-লোকান্তর। ফলে বৈজ্ঞানিকের মনে সংশয় ছায়াপাত করিল। এতদিনের নিঃসংশয় নিরেট পৃথিবী সম্বন্ধে নানা গভীর জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য যে কতদূর সত্য সে সম্বন্ধে সন্দেহ উচ্চকিত হইয়া উঠিল। এই যে কঠিন পৃথিবী এর সত্যিকার রূপ কী? যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, ছুঁইতেছি, তাহা কি সত্য, না, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রজাল? যেমনটি দেখি, শুনি বা অনুভব

করি, আমাদের জগৎ কি ঠিক তেমনটিই? চোখের সমুখে যে রূপের মেলা মিলে, তাহাই কি শেষ ও চরম? না, এই রূপের পরপারে আছে কোনো নিত্যকালের অরূপ? জ্ঞানের ওপারে কি অজ্ঞাত বাস করে? দৃশ্য-বৈচিত্র্যের পরপারে কি অদৃশ্য সত্যের শাশ্বত আবাস আছে? যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহা কি মিথ্যা মায়া?

বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রশ্ন প্রবল হইয়া উঠিল। পদার্থবিজ্ঞান ও শারীর বিজ্ঞান (physiology) অনুভূতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে বৈজ্ঞানিকের পুরানো জগৎ অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। তাহার বদলে উদ্ভব হইল বৈজ্ঞানিকের নবকল্পিত জগৎ, পৃথিবীর নবতর ধ্যানমূর্তি। এ এক অজ্ঞাত, অপরিচিত পৃথিবী! এই পরিচিত পৃথিবীর আড়ালে যে সত্যিকার পৃথিবী বাস করে তাহার সংবাদ বিজ্ঞান তাহার যন্ত্রপাতির মারফতে আমাদের কাছে বহন করিয়া আনিল। আজো এ জগৎকে আমরা জানি না, বুঝি না। শুধু আভাসে ইহাকে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে; কল্পনায় ইহার ছবি আঁকিবার সাধনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, ইহাকে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে আটকাইয়া রাখা যায় না। এ জগৎ অভিনব, অপরূপ ও স্বতন্ত্র। সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা এ জগতের কোনো ঠিকানা পাওয়া যায় না; কারণ সাধারণ বুদ্ধির (common sense) অতীত এই জগৎ। সাধারণ বুদ্ধির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পার্থক্য প্রবল হইয়া উঠিয়াছে; এ জগৎকে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও পরীক্ষায় ধরা যায় কিন্তু প্রাকৃত বুদ্ধির নাগালের বাহিরে এই জগৎ।

সাধারণ বুদ্ধি বলে, বহির্জগতে আছে দ্রব্য (substances) এবং দ্রব্যগুলির আছে কতকগুলি গুণ (qualities)। এই দ্রব্যগুলি বাইরের জগতে আছে এবং ইহাদের অস্তিত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপরে নির্ভর করে না। ইহারা স্বয়ংসিদ্ধ ও স্বাধীন। আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে এই দ্রব্যজাত (substances) তাদের স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করে; ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া আমরা বস্তুর সত্যিকার স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয় যে জ্ঞান আমাদের দেয় তাহা ভুল জ্ঞান নয়। যাহা দেখি, যাহা শুনি, সবই সত্য এবং বাস্তব। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, সাধারণ বুদ্ধি (common sense) কখনো সত্যকে ধরিতে পারিবে না। ইন্দ্রিয়গুলি অতি সাধারণ, অতি স্থূল কতকগুলি ব্যাপারকে মাত্র ধরিতে পারে; তাহাও আবার খুব ভাসাভাসাভাবে ও নিতান্ত অসম্পূর্ণরূপে। ইন্দ্রিয় যাহা বলে তাহা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়; ইন্দ্রিয় যাহা বহন করিয়া আনে তাহা পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। ইন্দ্রিয় মানুষকে ঠকায়, মানুষের চেতনাতে এমন সব ইন্দ্রজাল রচনা করে যাহার দ্বারা মানুষ বিভ্রান্ত হয়। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের চাইতে অজ্ঞানই উৎপাদন করে বেশি, কাজেই সত্যকে পাইতে হইলে ইন্দ্রিয়জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে, অতি সাবধানে ইন্দ্রিয়-জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, কতটুকু খাঁটি, কতটুকু ভেজাল। ইন্দ্রিয়গুলি যে আমাদের বিভ্রান্ত করে তাহা একটু আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে।

বাহিরের জগতের জিনিসগুলি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয় কিরূপে? পাঁচটা ইন্দ্রিয় হইল আমাদের চেতনালোকের পাঁচটা বাতায়ন; সেই বাতায়ন-পথে জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলি আমাদিগকে ছুঁইয়া যায়। বস্তুজগতের সেই স্পর্শ কতগুলি বিশেষ নাড়ীর (nerve) দ্বারা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কে পৌঁছায়। ইহার পরেই আমরা বস্তুগুলির পরিচয় পাই। কিন্তু এই পরিচয় সত্যিকার পরিচয় নয়। এই যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় ইহার মধ্যে অনেক অবান্তর মালমশলা মিশ্রিত হইয়া পড়িতেছে। মানুষের চেতনা যদি পরিষ্কার আরসীর মতো একখানা

অক্রিয় ফলকমাত্র হইত, তবে বাইরের বস্তুটির অবিকল প্রতিচ্ছবি উহার উপরে প্রতিফলিত হইত। তাহা হইলে আমাদের জ্ঞান হইত বহির্জগতের অবিকৃত একখানা ছবি। কিন্তু আসলে তাহা হয় না। আমাদের জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া নির্ভর করে আরো কতকগুলি জিনিসের উপরে, যথা আলো, হাওয়া ইত্যাদির পরিস্থিতি, আমাদের ইন্দ্রিয়ের তদানীন্তন অবস্থা এবং জ্ঞাতার নিজের অবস্থিতি। যেমন ধরুন, টেবিলের উপরে আমরা একটা টাকা দেখিতেছি। টাকাটাকে উপর দিক হইতে যদি দেখি তবে গোল একটা চাক্‌তির মতো দেখাইবে। নীচের দিক হইতে দেখিলেও ঠিক গোল দেখাইবে। কিন্তু যদি পাশে দাঁড়াইয়া দেখি তবে গোল চাক্‌তির মতো কখনোই দেখিব না; দেখিব একটা বৃত্তাভাসের (elliptical) আকৃতি। তাহা ছাড়া এই বৃত্তাভাসটিও (ellipse) যে কতটুকু পুরু বা পাতলা দেখিব তাহা নির্ভর করিবে যে দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিব তাহার উপরে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে টাকাটার আকৃতি কেমন তাহা নির্ভর করিতেছে দর্শকের অবস্থানের উপরে। এখন প্রশ্ন হইবে, কোন্ আকৃতিটি টাকার প্রকৃত আকৃতি? কোনো একটি বিশেষ অবস্থান হইতে যে রূপটি দেখি তাহাই যে সত্যিকার রূপ এ কথা জোর করিয়া বলা চলে না। বলিলেও তাহার পিছনে কোনো যুক্তি নাই।

ধরুন, একটা ঘরের ভিতরে একটা লালরঙের গোলাপ ফুল রাখা হইয়াছে। কিন্তু যদি ঘরটিকে নীলরঙের আলোর দ্বারা প্লাবিত করিয়া রাখা হয় এবং তারপর একজন লোক সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, তবে আগন্তুক দেখিবে, টেবিলের উপরে একটা কালো রঙের গোলাপ আছে। তাহাকে হাজার তর্কের দ্বারাও এ কথা বিশ্বাস করানো যাইবে না যে গোলাপটা লাল। কারণ তাহার প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-জ্ঞান তাহাকে বলিতেছে, গোলাপটি কালো। বিজ্ঞান এই কারণেই বলে যে রঙ জিনিসটা আগাগোড়াই আলোক-প্রতিফলনের কারসাজি। বস্তুর নিজস্ব কোনো রঙই নাই; যে ধরনের আলোক-তরঙ্গের সঙ্গে আমাদের চক্ষুর সংযোগ ঘটে সেই ধরনের অনুভূতি আমাদের হয়। সেই অনুযায়ী আমরা বস্তুটিকে সাদা, নীল বা লাল দেখি।

সকলেই জানেন জলের ভিতরে যদি একটা লাঠির কিয়দংশ ঢুকাইয়া দেওয়া হয় তবে লাঠিটা বাঁকা দেখাইয়া থাকে। লাঠিটা কি সত্যি সত্যি বাঁকা? না, সোজা? সবাই বলিবেন, লাঠি সোজা, কিন্তু চক্ষু আমাদিগকে ধোকা দিতেছে, ধাঁধা সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রিয় আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে। এই ধাঁধার কারণ হইল আলোর একটা বিশেষ রকমের তির্যকসম্পাত। লাঠি যদি উপরে থাকে তবে সোজা দেখায়। যদি জলে থাকে, তবে দুই রকম মধ্যবর্তী উপাদানের (medium) ভিতরে দিয়া আলোর বক্র সঞ্চারণের ফলে লাঠিটা বাঁকা দেখায়। লাঠির প্রকৃত রূপ কোন্‌টা? বেশিক্ষণ সময় জমির উপর থাকে বলিয়া লাঠিটা সচরাচর সোজা দেখি আমরা। আসলে এর নিজস্ব রূপ বা আকৃতিটা আমাদের জানিবার উপায় নাই। এক-এক অবস্থায় চক্ষু আমাদিগকে এক-এক রকমের অনুভূতি জন্মাইতেছে; সত্যিকার বস্তুটিকে ইন্দ্রিয় কখনোই আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দিতেছে না।

মনুমেন্টকে দূর হইতে ছোটো দেখায়, কাছে আসিয়া দেখিলে বড়ো দেখায়। কোন্‌টি ইহার আসল আকার (size)? কাছে থেকে যে রূপটা দেখি তাহাকেই বিশেষ মূল্য ও স্থান দিবার কোনোই যুক্তি নাই। ইন্দ্রিয়, স্থানবিশেষ হইতে, আমাদিগের কাছে বিশেষ বিশেষ রূপকে প্রকট করিয়া ধরে, ইহাদের কোনোটিই সত্যিকার স্বরূপ নয়। পনীরের মধ্যে যে কীটাণু আছে সে অতি ক্ষুদ্র। এই কীটাণুর পা-গুলি এত ছোটো যে সাদা চোখে দেখাই যায়

না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দরকার হয়। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না বলিয়া কি কীটাণু নিজেও নিজের পা দেখিতে পায় না? পায়, বরং কীটাণুর চক্ষুর কাছে তাহার নিজের পা খুবই বড়ো মনে হয়, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে পনীর-কীটাণুর পায়ের আকার (size) দর্শকের বা জ্ঞাতার ইন্দ্রিয়ের শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। বিভিন্ন ধরনের ইন্দ্রিয়ের শক্তি অনুযায়ী পায়ের বিভিন্ন রকমের আকার অনুভূত হয় : পনীর-কীটের পায়ের আকার আমরা এক রকম দেখি, পনীর-কীট নিজে এক রকম দেখে। কিন্তু পনীর-কীটাণুর একই সঙ্গে দুই রকমের আকার (size) তো সম্ভব নয়। কাজেই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে পনীর-কীটাণুর পায়ের সত্যিকার নিজস্ব আকার কিছু আছে কিনা সন্দেহ। যদিও বা থাকে তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। যখনই আমরা জানিবার চেষ্টা করিব, তখনই ইন্দ্রিয়ের মারফত জানিতে হইবে। অথচ দেখা গিয়াছে যে ইন্দ্রিয় আমাদিগকে সত্য প্রতীতি কখনোই দেয় না।

কাম্‌লা রোগে (jaundice) একজন লোক ভুগিতেছে। তাহাকে সাদা দেয়াল বা সাদা কাগজ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করুন, কাগজ বা দেয়াল কোন্ রঙের; সে নিঃসন্দেহে বলিবে, কাগজ হল্‌দে, দেয়ালও হল্‌দে। তাহার ইন্দ্রিয় তাহাকে হল্‌তে রঙ দেখাইতেছে, সে কী করিবে? তাহাকে খুন করিয়া ফেলিলেও সে কস্মিন্‌কালেও বলিবে না, কাগজ সাদা। এইরকম, জিহ্বা আমাদের আস্বাদ গ্রহণের যন্ত্র। জিহ্বার ক্রিয়াশক্তির কোনো বিকৃতি হইলে, মিষ্টি জিনিস চিনিও তিক্ত বোধ হইতে পারে, এ কথা সবাই জানে। কাজেই স্বাদ জিনিসটি আমার জিহ্বার গুণ ও জিহ্বার অনুভূতি; চিনি নামক বস্তুর গুণ নয়। জিহ্বার এক-এক অবস্থায় বস্তুর স্বাদ অনুভূতিতে এক-এক ধরনের বলিয়া মনে হয়। আসলে স্বাদ বা রঙ কোনোটিই বস্তুর গুণ নয়; এরা হইল ইন্দ্রিয়ের গুণ, জিহ্বা ও চক্ষুর মাহাত্ম্য।

টেবিলে অঙ্গুলীদ্বারা চাপিয়া ধরিলে মনে হয় টেবিলটি শক্ত। আবার রবারের উপর চাপ দিলে অনুভূতি হয় রবারটি নরম। এই যে 'শক্ত' বা 'নরম' এর অনুভূতি, ইহাও স্পর্শেন্দ্রিয়ের মায়া বই আর কিছুই নয়। আমার অঙ্গুলীর প্রান্তে যে নারী-কোষ (nerve cells) আছে তাহার উপরে একটা বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ (repulsion) বা চাপ লাগার ফলেই আমার মনে হইতেছে যে একটা শক্ত জিনিস আমাকে ঠেলিতেছে। টেবিলটা কতকগুলি বিদ্যুৎ-কণার সমষ্টি মাত্র। এই শক্ত টেবিলের অনুভূতিটি বিনা টেবিলেও উৎপাদন করা চলে। আমার নাড়ীসংস্থিতির (nervous system) মধ্যে ঠিক ঠিক নাড়ীটিকে উদ্দীপিত করিয়া (stimulate) লইতে পারিলে কৃত্রিমভাবে টেবিলের অনুভূতি সৃজন করা যাইতে পারে। যদি ত্বক্-ইন্দ্রিয় কাহারও অবশ ও অসাড় হইয়া যায়, তবে তাহার আঙুল হাতুড়ি মারিলেও তাহার শক্ত কোনো জিনিসের অনুভূতি হইবে না। এই রকম শ্রবণ ও ঘ্রাণ সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায়। কানে বিশেষ আকারের তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিলে কর্কশ বা মিষ্টি শব্দ আমরা শুনিয়া থাকি। তেমনি নাসিকায়ও বিশেষ ধরনের যোগাযোগের ফলে আমাদের মৃদু বা তীব্র, মিষ্টি বা উৎকট গন্ধের অনুভূতি হয়।

আর একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আকাশে এমন তারা আছে যাহার নিঃসৃত আলো পৃথিবীতে আসিয়া পৌঁছিতে এক বৎসর লাগে। এমনই কোনো একটি তারা হইতে ১৯৩৭ সনের ১লা জানুয়ারি যদি এক ঝলক আলো বাহির হইয়া আসে, তবে সে আলো আমাদের চক্ষুতে আসিয়া আঘাত করিবে ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারি। আমার চক্ষুতে আলো-কণিকাগুলি আসিয়া স্পর্শ না করা পর্যন্ত আমি উক্ত তারকাটিকে দেখিতে পারিব

না। আলোর সঙ্গে চক্ষুর সংগতি হওয়া মাত্র আমি বলিলাম যে আমি তারাটিকে দেখিলাম। কিন্তু আলোককণিকাগুলি নিঃসৃত হইবার পর হইতে এক বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে: ইতিমধ্যে যদি উক্ত তারকাটি বিনষ্টও হইয়া গিয়া থাকে, তবুও ১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারির দিন আমার চোখে উক্ত তারকার অস্তিত্বের অনুভূতি হইবেই। ব্যাপার দাঁড়াইল এই যে আমার ইন্দ্রিয় আমাকে এমন একটি বস্তুর অনুভূতি দান করিতেছে যাহার অস্তিত্ব মোটেই নাই।

ইহাতে এই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য আমাদিগকে বহির্জগতের সম্বন্ধে অবিকৃত জ্ঞান দান করে না। ইন্দ্রিয় যাহা উপস্থিত করে, তাহা বর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া আমাদের চেতনার দ্বারে উপস্থিত হইতেছে। ইন্দ্রিয়পথে যাহাই বাহির হইয়া আসিতেছে তাহাই বিকৃত হইয়া আসিতেছে। অথচ এই ইন্দ্রিয়কে বর্জন করিয়া মানুষের জ্ঞানের আর পথ নাই। বহির্জগতের দ্রব্যগুলির যে-সব গুণ আছে বলিয়া আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে ধরিয়া লই, আসলে দ্রব্যগুলির মধ্যেই সে-সব গুণ অধিষ্ঠান করে না। গুণগুলি আমাদের অনুভূতি মাত্র: তাদের অস্তিত্ব বাহিরে নাই, আছে আমাদেরই ইন্দ্রিয়ে, আমাদেরই চেতনায়। যে প্রকৃতিকে আমরা দেখি, সে প্রকৃতি যেমন দেখি ঠিক তেমন নয়। তাহার রূপ অন্য প্রকার, তাহার স্বধর্ম অন্যবিধ। আমরা যেন রঙিন চশমা আঁটিয়া বসিয়া আছি। বহির্জগৎকে সেই চশমা দিয়া দেখিয়া মনে করি, যাহা দেখিলাম তাহা বাস্তব সত্য ও নিশ্চিত সত্তমান। কিন্তু চশমা যে আমাদের সকল জ্ঞানকে রাঙাইয়া অপরূপ মায়া সৃজন করিতেছে তাহা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না।

জয়শ্রী, ফাল্গুন ১৩৪৫

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় সংস্কৃতি

কাজী মোতাহার হোসেন

রবীন্দ্রনাথের মানব-প্রীতি সুপ্রসিদ্ধ। দেশের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া যে প্রীতি সমগ্র মনুষ্য সমাজকে অভিষিক্ত করে। এ প্রবন্ধে স্বদেশের প্রতি তাঁহার কী মনোভাব ছিল এবং তার ঐতিহ্য সৌষ্ঠবে তাঁর কোনো বিশিষ্ট দান আছে কিনা, এই বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব। প্রথমে ঐতিহ্য কথাটি সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট করিয়া লওয়া দরকার। এ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথের উক্তিই উল্লেখ করিব। তিনি লিখিয়াছেন :

"কোনো দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাব কী, দেশের মূল মর্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না—তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ও ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর, আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে--আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না--তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। এই বিচিত্র-উদ্যম-সম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে সংশয়ী জিজ্ঞাসুর কাছে আমরা সংজ্ঞা দ্বারা দুই-চার কথায় ব্যক্ত করিব কী করিয়া?... ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা--বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মাণ হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।"

এখানে কবি বলিতেছেন ঐতিহ্যের কাজ, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এক সূক্ষ্ম অথচ নিঃসংশয়িত যোগসূত্র রক্ষা করা। শিশুকাল হইতেই, জ্ঞান, শিক্ষা, প্রেম ও কল্পনার সাহায্যে সংগোপনে এই কাজ চলিতে থাকে। ভারতীয় ঐতিহ্যের মূল সূত্র কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে কবি বলিতেছেন, বিভেদকে বড়ো করিয়া না দেখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ঐক্যের প্রতি মনঃসংযোগ করাই ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশেষত্ব।

আমরা নিজেকে যখন নিতান্ত দীন ও ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতেছিলাম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে আমাদের নয়ন-মন বিভ্রান্ত হইতেছিল, সে সময় কবি আমাদের

আত্মপ্রত্যয় জোগাইয়াছেন, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন। যথা—

"য়ুরোপ বলে, এই সন্তোষই, এই জিগীষার অভাবই, জাতির মৃত্যুর কারণ। তাহা য়ুরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ বটে, কিন্তু আমাদের সভ্যতার তাহাই ভিত্তি। যে লোক জাহাজে আছে তাহার পক্ষে যে বিধান, যে লোক ঘরে আছে তাহারও পক্ষে সেই বিধান নহে। য়ুরোপ যদি বলে, সভ্যতা মাত্রেই সমান, এবং সেই বৈচিত্র্যহীন সভ্যতার আদর্শ কেবল য়ুরোপেই আছে, তবে তাহার সেই স্পর্ধারবাক্য শুনিয়াই তাড়াতাড়ি আমাদের ধনরত্নকে ভাঙা কুলা দিয়া পথের মধ্যে বাহির করিয়া ফেলা সংগত হয় না।... সন্তোষে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলে কাজে শৈথিল্য আনে ইহা যদি সত্য হয়, তবে অত্যাকাঙ্ক্ষার দম বাড়িয়া গেলে যে ভূরি-ভূরি অনাবশ্যক ও নিদারুণ অকাজের সৃষ্টি হইতে থাকে, এ কথা কেন ভুলিব? প্রথমটাতে যদি রোগে মৃত্যু ঘটে, তবে দ্বিতীয়টাতে অপঘাতে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।... অতএব... ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, সন্তোষ, সংযম, শান্তি, ক্ষমা এ-সমস্তই উচ্চতর সভ্যতার অঙ্গ। ইহাতে প্রতিযোগিতা চক্‌মকির ঠোকাঠুকি-শব্দ ও স্ফুলিঙ্গবর্ষণ নাই, কিন্তু হীরকের স্নিগ্ধনিঃশব্দ জ্যোতি আছে। সেই শব্দ ও স্ফুলিঙ্গকে এই ধ্রুবজ্যোতির চেয়ে মূল্যবান মনে করা বর্বরতা মাত্র।"

এখানে কবি অতি স্পষ্ট ভাষায় ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা ও সৌন্দর্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এ-সভ্যতা লইয়া আমাদের লজ্জিত হইবার কোনো কারণ বা প্রয়োজন নাই।

কোরো না কোনো না লজ্জা হে ভারতবাসী,
শক্তিমদমত্ত ওই ধনিক বিলাসী
ধনদৃপ্ত পশ্চিমের কটাক্ষসম্মুখে
শুভ্র উত্তরীয় পরি শান্ত সৌম্যমুখে
সবল জীবনখানি করিতে বহন।

শুনো না কী বলে তারা; তব শ্রেষ্ঠ ধন
থাকুক হৃদয়ে তব, থাক্ তাহা ঘরে,
থাক্ তাহা সুপ্রসন্ন ললাটের' পরে
অদৃশ্য মুকুট তব। দেখিতে যা বড়ো,
চক্ষে যাহা স্তূপাকার হইয়াছে জড়ো,
তারি কাছে অভিভূত হয়ে বারে বারে
লুটায়ো না আপনায়। স্বাধীন আত্মারে
দারিদ্র্যের সিংহাসনে করো প্রতিষ্ঠিত
রিক্ততার অবকাশে পূর্ণ করি চিত।"

অন্যত্র,

"হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন,
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।
আজি সভ্যতার

অন্তহীন আড়ম্বরে, উচ্চ আস্ফালনে,
দরিদ্ররুধিরপুষ্ট বিলাসলালনে,
অগণ্য চক্রের গর্জে মুখর ঘর্ঘর
লৌহবাহু দানবের ভীষণ বর্বর
রুদ্ররক্ত-অগ্নিদীপ্ত পরম স্পর্ধার
নিঃসংকোচে শান্তচিত্তে কে ধরিবে, হায়,
নীরব গৌরব সেই সৌম্য দীনবেশ
সুবিরল, নাহি যাহে চিন্তাচেষ্টালেশ?

কে রাখিবে ভরি নিজ অন্তর আগার
আত্মার সম্পদ রাশি মঙ্গল উদার?"

আমরা মঙ্গলবর্ষী ত্যাগধর্মী ভারতীয় সভ্যতাকে অবহেলা করিয়া নিষ্করুণ বিলাস-পুষ্ট পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মঘাতী চাকচিক্যে মুগ্ধ হইতেছি, ইহা বড়োই পরিতাপের বিষয়।

আবার, ভারতবর্ষীয় নিষ্ক্রিয় মনোবৃত্তি যে সভ্যতার অঙ্গ নয়, এ কথাও রবীন্দ্রাথ বলিয়াছেন। আমরা যেন কিছুর জন্য চেষ্টা না করিয়া মন্ত্রবলে সমস্তই লাভ করিবার আশায় বসিয়া রহিয়াছি, যেন আমাদের বাঁচাইবার ভার বা দায়িত্ব অন্যের। আমরা যেন কেবল গর্ব করিব, আর অন্যেরা কর্ম করিয়া সেই গর্বের যোগ্য উপাদান জোগাইয়া দিবে। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমার দেশকে আমি যত ভালোবাসি, তার দশ গুণ বেশি ভালোবাসা ইংরেজের কর্তব্য, এ কথা আমরা মুখে বলি না, আমাদের ব্যবহারে তাহাই প্রকাশ পায়। এইজন্য ভারতবর্ষের হিত-সাধনে বিদেশীর যত-কিছু ত্রুটি, তাহা ঘোষণা করিয়া আমাদের শ্রান্তি হয় না; আর, দেশী লোকের যে ঔদাসীন্য, সে সম্বন্ধে আমরা একেবারেই চুপ।...

শাণ্ডিল্য মুনির আশ্রমের জায়গাটার যদি আজ হঠাৎ আবিষ্কার হয়, তবে আমি শাণ্ডিল্য গোত্রের দোহাই দিয়া সেটা দখল করিতে গেলে আইনের পেয়াদা তা মানিবে না। পাঁচ-সাত হাজার বৎসর পূর্বের উপর স্বদেশের স্বকীয়ত্বের উপর বরাত দিয়া গৌরব করিতে বসিলে কেবল গলা ভাঙাই সার হয়। স্বকীয়ত্বকে অবিচ্ছিন্ন নিজের চেষ্টায় রক্ষা করিতে হয়।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। অর্জিত গৌরব না হইলে গৌরবের মর্যাদা হয় না। আর, পূর্বপুরুষের অর্জিত গৌরবের প্রকৃত অধিকারী হইতে হইলে, সে গৌরবকেও যোগ্যতা দ্বারা রক্ষা করা আবশ্যক; নতুবা উহা হাস্যকর হয়। এজন্য কর্ম চাই, কিন্তু সে কর্ম ফলাকাঙ্ক্ষাহীন নিঃস্বার্থ নিঃশব্দ কর্ম, কোলাহলময় প্রতিযোগিতা নয়। নিষ্কাম কর্মের ভিত্তি প্রেমে, আর প্রতিযোগিতাপূর্ণ কর্ম-ব্যস্ততার মূল হিংসায়। হিংসার চেয়ে প্রেম উচ্চ-ধর্মী। এ কথাও রবীন্দ্রনাথ উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াছেন। যথা—

"ভারতবর্ষ মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে বড়ো করিয়া তোলে নাই। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মকে মাহাত্ম্য দিয়া সে বস্তুত কর্মকে সংযত করিয়া লইয়াছে। ফলের আকাঙ্ক্ষা উপড়াইয়া ফেলিলে কর্মের বিষদাঁত ভাঙিয়া ফেলা হয়। এই উপায়ে মানুষ কর্মের উপরেও নিজেকে জাগ্রত করিবার অবকাশ পায়। হওয়াই আমাদের দেশের চরম লক্ষ্য, করা

উপলক্ষ্যমাত্র।... ঘূর্ণ্যমান চক্রগুলিকে নিম্নে গোপন করিয়া, স্থিতিকেই গতির ঊর্ধ্বে রাখিয়া, প্রকৃতি আপনাকে নিত্যকাল প্রকাশমান রাখিয়াছে—ঊর্ধ্বশ্বাস কর্মের বেগে নিজেকে অস্পষ্ট এক সঞ্চীয়মান কর্মের স্তূপে নিজেকে আচ্ছন্ন করে নাই।"

"ভারতবর্ষীয় যেখানে থাকে, সেখানে কোনো বাধা রচনা করে না—তাহার স্থানের টানাটানি নাই, তাহার এককীত্বের অবকাশ কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না। গ্রীক হইক, আরব হউক, চৈন হউক, সে জঙ্গলের ন্যায় কাহাকেও আটক করে না; বনস্পতির ন্যায় নিজের তলদেশে চারিদিকে অবাধ স্থান রাখিয়া দেয়; আশ্রয় লইলে ছায়া দেয়, চলিয়া গেলে কোনো কথা বলে না।"

"য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে কর্ম করে একাকী। য়ুরোপের ধনসম্পদ আরাম সুখ নিজের; কিন্তু তার দানধ্যান, স্কুল-কলেজ, ধর্মচর্চা, বাণিজ্য-ব্যবসায়, সমস্ত দল বাঁধিয়া। আমাদের সুখসম্পত্তি একলার নহে; আমাদের দানধ্যান, অধ্যাপন—আমাদের কর্তব্য একলার।...যন্ত্রতন্ত্রকে অত্যন্ত সরল ও সহজ করিয়া কাজকে সকলের আয়ত্ত করা, অন্নকে সকলের পক্ষে সুলভ করা প্রাচ্য আদর্শ।"

"য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক, ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে তাহা পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় রাজায়, ধনীতে দরিদ্রে, বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদা জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে। তাহারা সকলে মিলিয়া যে নিজ নিজ নির্দিষ্ট অধিকারের দ্বারা সমগ্র সমাজকে বহন করিতেছে, তাহা নয়, তাহারা পরস্পরের প্রতিকূল—যাহাতে কোনো পক্ষের বলবৃদ্ধি না হয়, অপর পক্ষের ইহাই প্রাণপণ সতর্ক চেষ্টা।"

এখানে রবীন্দ্রনাথ কী চমৎকার অন্তর্দৃষ্টি দিয়া আমাদের নিবৃত্তি-প্রধান কর্মের সহিত পাশ্চাত্যের প্রবৃত্তি-প্রধান কর্মের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। পাশ্চাত্যের কর্মশক্তিকে তিনি প্রশংসা করেন, কিন্তু তাহার বিরোধমূলক উৎস মুখে যে গলদ রহিয়াছে সেদিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। তিনি ভারতবাসীকে নিজের সত্তা অনুভব করিয়া প্রকৃত কর্মযোগী হইতে বলেন; আর বাহ্য আড়ম্বরকে বাড়াবাড়ি মাত্র জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে নিষেধ করেন। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি কী, তার প্রশান্ত ধ্যানগম্ভীর মর্যাদার মর্ম কী, এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি উদ্ধৃতি দিতেছি :

"আমাদের প্রকৃতির নিভৃততম কক্ষে যে অমর ভারতবর্ষ বিরাজ করিতেছেন, আজ নববর্ষের দিনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, তিনি ফললোলুপ কর্মের অনন্ত তাড়না হইতে মুক্ত হইয়া শান্তির ধ্যানাসনে বিরাজমান; অবিরাম জনতার জড়পেষণ হইতে মুক্ত হইয়া আপন একাকীত্বের মধ্যে আসীন; এবং প্রতিযোগিতার নিবিড় সংঘর্ষ ও ঈর্ষা-কালিমা হইতে মুক্ত হইয়া তিনি আপন অবিচলিত মর্যাদার মধ্যে পরিবেষ্টিত।... 'য়ুরোপে যাহাকে 'ফ্রীডম' বলে... সে মুক্তি চঞ্চল, দুর্বল, ভীরু, তাহা স্পর্ধিত, তাহাত নিষ্ঠুর, তাহা পরের প্রতি অন্ধ; তাহা ধর্মকেও নিজের সমতুল্য মনে করে না এবং সত্যকেও নিজের দাসত্বে বিকৃত করিতে চাহে। তাহা কেবলই অন্যকে আঘাত করে, এইজন্য অন্যের আঘাতের ভয়ে রাত্রিদিন বর্মে-চর্মে, অস্ত্রে-শস্ত্রে কণ্টকিত হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা আত্মরক্ষার জন্য স্বপক্ষের অধিকাংশ লোককেই দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখে—তাহার অসংখ্য সৈন্য মনুষ্যত্বভ্রষ্ট ভীষণ যন্ত্রমাত্র। এই দানবীয় ফ্রীডম কোনো কালে ভারতবর্ষের

তপস্যার চরম বিষয় ছিল না, কারণ, আমাদের জনসাধারণ অন্য সকল দেশের চেয়ে যথার্থভাবে স্বাধীনতর ছিল। এখনো আধুনিক কালের ধিক্‌কার সত্ত্বেও এই ফ্রীডম আমাদের সর্বসাধারণের চেষ্টার চরমতম লক্ষ্য হইবে না। না-ই হইল—এই ফ্রীডমের চেয়ে উন্নততর বিশালতর যে মহত্ত্ব, যে মুক্তি ভারতবর্ষের তপস্যার ধন, তাহা যদি পুনরায় সমাজের মধ্যে আমরা আবাহন করিয়া আনি, অন্তরের মধ্যে আমরা লাভ করি, তবে ভারতবর্ষের নগ্নচরণের ধূলিপাতে পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাজমুকুট পবিত্র হইবে।"

এখানে দেশগুরু রবীন্দ্রনাথ সমাজকে তার ঐতিহ্যের দিকে ডাক দিতেছেন। সে ডাক আত্মশ্লাঘামূলক দম্ভ নয়, কল্যাণের পথে আহ্বান—ঈর্ষা দ্বন্দ্ব বিসর্জন দিয়া মিলনের প্রেমতীর্থে সম্মিলিত হইবার আবেদন, আজিকার বিষাক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে এই আহ্বানই একমাত্র মুক্তির আহ্বান। আমরা প্রাচ্যের মহান সংস্কৃতি ভুলিয়া গিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ তাহা নিজের অন্তরের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া আমাদের কানে সেই জ্ঞানের মন্ত্র দিতেছেন। আমরা বস্তুত প্রাচ্যের মহান ঔদার্যের স্থলে চাকচিক্যময় সর্বনাশী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছি, এবং মুখে না বলিলেও কার্যত সেই পথেই চলিতেছি। আমাদের আরো বিশেষ দুর্গতি এই যে, আমরা অন্ধ মোহে বা স্বার্থে ভুলিয়া বীভৎস পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ধর্মের নামে শুদ্ধ করিয়া সনাতন বলিয়া চালাইতে চাহিতেছি। আমাদের এই অবস্থা হইতে বাঁচাইবার জন্যই রবীন্দ্রনাথের আকুল আহ্বান ও সতর্ক বাণী। ভারতীয় নৃপতি, বীর, কর্মী এবং গৃহস্থের সনাতন আদর্শ কী, এ সম্বন্ধে কবির একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াই শেষ করিব।

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে
ভুলি জয়-পরাজয় শর-সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব ফল স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার।
গৃহীরে শিখালে তুমি গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্ম-বন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদের পুণ্য কর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

ইহার উপর টীকা টিপ্পনি অনাবশ্যক। ভারত ও আরবের মধ্যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতৈক্য আছে। কিন্তু ভারতীয় (ও পাকিস্তানীয়) হিন্দু মুসলমান নিজেদের ঐতিহ্য ভুলিয়া ভিখারীর মতো পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিয়া অঙ্কুশতাড়িত হস্তীর মতো ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে। ইহার কি কোনো প্রতিকার নাই?

জয়শ্রী, অগ্রহায়ণ ১৩৫৪